আশাপূর্ণা দেবী

শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

রূপলেখা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
২০৬, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

SHAPURNA DEBI SHRESHTHYA PANCHTI UPANYAS
/ Ashapurna Debi

কাশক ঃ
নিরুদ্ধ ভট্টাচার্য
পলেখা প্রকাশনী
০৬, বিধান সরণি
লকাতা - ৭০০ ০০৬

থম প্রকাশ ঃ
ইমেলা - ২০১২

ন্থস্বত্ব ঃ
কাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ক্ষর বিন্যাস ঃ
ারদা লেজার প্রিন্ট
লকাতা -৫৯

ল্য ঃ ২৪০ টাকা

ুদ্রক ঃ
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬, বিধান সরণি

সূচিপত্র

১। নাছোড় ৫-৪৪
২। বৃত্তপথ ৪৫-১১৬
৩। শুক্তিসাগর ১১৭-১৯৪
৪। হয়তো সবাই ঠিক ১৯৫-২৬২
৫। মুখর রাত্রি ২৬৩-৩৪৪

নাছোড়

গাড়িটা চলে যাবার পরও একটুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল নীরা। মনটা উদাস উদাস লাগছে। আবার ক-দিনের জন্যে বাড়িছাড়া হয়ে থাকতে হবে বিরামকে। আজ আর সন্ধ্যা বেলা অফিসের ওই গাড়িটা ফের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াবে না।

ব্যাপারটা অবশ্য নতুন নয়। মাসের মধ্যে অর্ধেকের বেশিদিন তো বাড়িছাড়া হয়েই থাকে বিরাম। কিন্তু ব্যাপারটা নতুন নয় বলেই যে সহনীয় হতে হবে তার মানে নেই।

খুব খারাপ লাগে নীরার, বিরামের এই হরদম ট্যুরে যাওয়া।

তাই কি যাত্রাকালে একটি বিষণ্ণবিধুর মুহূর্ত হাতে এসে ধরা দেয়?

বারোমাসই এই চলছে, তবু বিরাম ওই যাবার কথা ওঠামাত্রই শুরু করে দেবে সাবধানতার উপদেশবাণী। যেন বিরামের অনুপস্থিতির খবর পাওয়া মাত্রই জগতের যত বিপদ-আপদ আর চোর-বদমাসরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে বিরামের এই ছোটোখাটো দোতলা বাড়িটায়।

অতএব গাড়িতে ওঠার সময় পর্যন্ত কানাইকে বলে দেবে, চেনা লোক ভিন্ন কোনো অচেনা লোককে হঠাৎ দরজা খুলে না দেয়।...ডাক্তারবাবুর ফোন নাম্বারটা সবসময় হাতের কাছে রাখবে।...রান্নার গ্যাসটা কোনোসময়ই যেন খুলে-টুলে না রাখে। তুমিও একদম তোমার ওই নাইলন শাড়িফাড়ি পরে রান্নাঘরে যাবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সবাই যেন সাবধান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নীরা এক-এক সময় বিরক্তই হয়ে ওঠে। বলে, 'তোমার অনুপস্থিতিতে দুর্ঘটনা ক-টা হয়েছে?'

—হয়নি বলেই যে হতে পারে না তা বলা যায় না।

বিরামের যুক্তি, একটু সাবধান হতেই-বা ক্ষতিটা কী?

এ ছাড়া আগাগোড়া সবসময় তো বিরামের স্নেহময়ী পিসিমার উপস্থিতি। এমনিতে তো বারোমাস বিরাম যতক্ষণ বাড়িতে পিসিমা ততক্ষণ তার আশেপাশে ঘুরঘুরোচ্ছেন। আর এইরকম বাইরে যাওয়া-টাওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে তো ভাইপোটির সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকবেন। আর তিনিও আবার বিরামকে শিশুতুল্য জ্ঞান করে অবিরাম সাবধানবাণী আর উপদেশবাণী বর্ষণ করে চলবেন।

অফিসের কাজ কাজ করে কাণ্ডজ্ঞান হারাসনি, রোদ লাগাসনি, পিত্তি পড়াসনি, হোটেলে মোটেলে থাকতে হবে ছাইভস্ম খাসনি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্য! এক বারও রেগে ওঠে না বিরাম।

রাগে হাড় জ্বলে যায় নীরার। বলে উঠতে ইচ্ছে করে, পিসিমা এ আপনাদের চিরকালের ধারণার জগতের পচা মাছ চালানো হোটেল নয়, কোম্পানির ব্যবস্থা, সেরা সেরা হোটেলেই ওঠা হয়। কিন্তু বলে না।

হয়তো ওটুকু বললেও বিরাম ভেবে বসবে তার পিসিমাকে অবমাননা করা হল। একদা তিনি মাতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে নাকি মানুষ করেছিলেন। তা সে-ঋণ আর শোধ হবে না জীবনভর।

সেকালের নিয়মে গুরুজনের সামনে বরের সঙ্গে কথা বলা বেহায়ামি অসভ্যতা বলে গণ্য হলে নীরার হয়তো বরের সঙ্গে দিনমানে একটা কথাও হত না। নেহাত একালে সে-নিয়মটি চালু নেই বলেই—

কিন্তু কথাই নাহয় বলা যায়, সব কথা কি বলা যায়? গল্প? অকারণ কোনো বাড়তি কথা? দেশের কথা? বাইরের জগতের কথা? শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-সিনেমা, টি. ভি.? রাজনীতি দুর্নীতি? এইসব প্রাসঙ্গিক আর তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গ কি রাত্তিরের জন্যে তুলে রাখবে নীরা?

রাত্তিরে কি ওই আপাতশান্ত চেহারার লোকটা নীরার গল্প আড্ডা চায়? চায় তো কেবলমাত্র নীরাকে। আর তারপর চায় ঘুমোতে। রীতিমতো নাম ডাকিয়ে।

পিসিমা সম্পর্কে কেন যে বিরাম এত বেশি স্পর্শকাতর, তা বুঝতে পারে না নীরা। তবে সাবধানে কথা বলতে হয় পিসিমা সম্পর্কে।

হয়তো নীরা একটু বেশি তলিয়ে বুঝতে পারলে বুঝত, নীরা যে পিসিমা সম্পর্কে বিরামের মতো অত ভক্তি বিগলিত নয়, তা অনুভব করে বলেই বিরাম পক্ষীমাতার ভূমিকায় থাকে। পাছে নীরা কোনো বেফাঁস কথা বলে বসে। পাছে নীরা পিসিমার কর্তৃত্বের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে যায়।

আশ্চর্য! পিসির তো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। একটু আক্কেলও কি নেই? বিরামের খাবার সময়টিতে নড়বেনই না, চা খাবার সময়ও শত কর্ম ফেলে এসে দাঁড়াবেন। এমনকী দাড়ি কামানোর সময়ও।

একগাল হেসে বলবেন, হ্যাঁ রে, জ্যোতি বসু নাকি বলেছে, হ্যাঁ রে রাজীব গান্ধী নাকি বলেছে, হ্যাঁ রে পাতালরেলে নাকি বর্ষায় জল ঢুকে যায়?

প্রসঙ্গের তো শেষ নেই।

কী ধৈর্য বিরামের যে, যেনতেন করে উত্তরটা দিয়ে চলে। এক বারও বলে ওঠে না বোকার মতো কথা বোলো না বাবা! এই পিসিমা যদি গাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে ভাইপোর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং ফেরার সময় চোখে আঁচল চাপা দেন, নীরা নামের মেয়েটা কখন আর তার স্বামীর যাত্রাকালে বিদায়বেলার চাহনিটি একটু চাইবে? গভীর একটু স্পর্শ রাখবে হাতের ওপর, আচ্ছা তাহলে, বলে।

হয়তো ওইটুকুতেই এতটা শূন্য ভাব আসত না।

হয়তো ওইটুকুতেই মনটা একটু ভরাট হয়ে থাকত।

ওইটুকুও হয় না।

নীরা সেই শূন্যতাটা নিয়েই খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠল।

এই সেরেছে। বিরাম কোনো দরকারি কাগজপত্র ফেলে রেখে যায়নি তো?

ছুটে এসে রিসিভারটা তুলল, —হ্যালো।

সঙ্গে সঙ্গে কাকলির কলকণ্ঠের কাকলি ঝংকৃত হল। —এই নীরা! ঘরে কে আছে?

—কেউ না।

—কর্তা?

—কর্তা? কর্তা এইমাত্র দিন দশেকের মতো হাওয়া হয়ে গেল।

—তাই বুঝি? কী? সেই অফিসের ট্যুর?

—আবার কী? মাসের মধ্যে কদিনই-বা বাড়ি থাকে?

—ভারি বিচ্ছিরি চাকরি বাবা। তা যাক তুমি আমায় তোমার চাকরি থেকে মুক্ত করো দিকি। আমারও এদিকে ঘোরতর অবস্থা।

—চাকরি! মানে?

—আহা নেকু! মানে মনে পড়ছে না! তোর নাছোড়বান্দা প্রাক্তন প্রেমিকের প্রেমপত্তরের দায় আর বইতে পারছি না আমি। তুই চিঠি দিবি না আর সে অবিরত চিঠি দিয়ে চলবে। এতে আমার বর কোনদিন না আমায় সন্দেহ করে বসে। এই ভেবে মরছিলাম। তো যাক সেকথা। আমার কর্তারও সুখের পায়রাটা বেরিয়ে গেল। তড়ো এসেছে ওপরতলা থেকে। বদলির অর্ডার। এখন তোর—

—বদলির অর্ডার! অ্যাঁ। নীরা প্রায় বসে পড়ে বলে, কোথায়?

—আর বলিসনি। আলাদা জায়গা। কানপুর।

—কাকলি! তুই যে আমায় শুইয়ে দিলি। তুইও চলে যাবি তো?

—না স্যার। আপনার উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের প্রেমপত্র রিসিভ করবার জন্যে বাসা আগলে বসে থাকব। আপনি আসবেন, পড়বেন, আবার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে যাবেন, আর আমি জুলজুল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব।

—তোকে তো আমি কতদিন বলেছি, তুইও পড়। তো তুই যে আবার—

—দায় পড়েছে আমার পরের লাভ লেটার পড়তে! সেটাও কি তেমনি হাঁদা! তুই জবাব দিস না তবু একতরফা চিঠি লিখে মরে।

—ও একরকম আত্মপ্রেম আর কী! নিজেকে বিকশিত করার একটা পথ।

—থাক! থাক! আর ধোওয়া তুলসীপাতাটি সাজতে হবে না। বলছিস অথচ গলা কাঁপছে।

—মা-র খেতে ইচ্ছে?

—খেতে হলে খাব। সত্যি কথা বলতে ডরাব নাকি?...—এই ঘরে কেউ নেই তো?

—বললাম তো নেই।

—না, তোর ওই পিসশাশুড়ি বুড়ি সর্বত্র নাক গলায় তো। যাক, বলছি বুকে হাত দিয়ে বল দিকিনি তুই কুণালকে এখনও ভালোবাসিস কি না।

—বুকে হাত দেওয়া-দিয়ির কী আছে? বলেছি তোকে কোনোদিন ওকে আমি ভালোবাসি না? প্রথম প্রেম একটা অন্য জিনিস বুঝলি? ও একটা স্বর্গীয় ব্যাপার। চিরঅমর।

আমি আর কী করে বুঝব মাণিক। ওসব স্বর্গীয় বস্তুর স্বাদ তো আর জানা হয়নি জীবনে। প্রথম ও শেষ এক বারই মাত্র ওর স্বাদ জেনেছি, আর জেনে চলেছি। ছাদনাতলায় যার শুরু।

—ছাদনাতলায়? হি-হি-হি। তখন থেকেই শুরু?

—কেন নয়? দর্শনমাত্রেই প্রেমসঞ্চার প্রেমশাস্ত্রে নেই একথা?

—তা অবশ্যই আছে। তবে সর্বদা যা লাঠালাঠি দেখি—

—ও তুই বুঝবি না। যাক শোন, অবিলম্বে তোর 'প্রথম প্রেমের' প্রেমপত্রের গোছাটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যা বাবা! আমার তো তল্পি গোটাতে হচ্ছে।

—নিয়ে আসব?

নীরার মুখটা শুকিয়ে যায়।

অসহায় অসহায় গলায় বলে, 'নিয়ে আসব? এখানে রাখব কোথায়?'

—সে আমি কী জানি? হৃদয় পিঞ্জরের মধ্যে সোনার কৌটোয় ভরে রাখতে পারো।

—দ্যাখ জ্বালাসনি। বলছি তোর বাক্স সুটকেসের গভীর গোপনে যেমন আছে থাক-না। কত মালপত্তর নিয়ে যেতে হবে বরের বদলির সময়। ওটুকু আর কত ভারী হবে।

—হাঁদার মতো কথা বলিস না নীরা। ওই উচ্ছ্বসিত প্রেমপত্রগুলি যদি আমি বুকে করে বয়ে নিয়ে বিদেশেও যাই, তাহলে আমার মহাপুরুষ বরেরও সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয়। এমনিতেই তো বলে, 'কেন মিথ্যে অন্যের ঝামেলার জালে জড়িয়ে পড়ে বসে আছ? অবিরতই তোমার নামে বিদেশি ছাপ মারা চিঠি আসছে এ আবার কী?' ওকে অবশ্য দাবড়ানি দিয়ে থামাই। ভাবি চলছে চলুক। দেখি কতদিনে তার আবেগে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু—এখন তো পরিস্থিতি বদলাল।

নীরা আরও অসহায় গলায় বলল, 'এখন কী করা যায় পরামর্শ দে।'

কাকলি সহানুভূতির গলায় বলল, 'আমি আর কী পরামর্শ দেব বল। লোকটাকে এবার একটা কড়া করে চিঠি দিয়ে দে যাতে আর কোনোদিন চিঠি না লেখে। আর আমি যে আর কলকাতায় থাকছি না, সেটাও বলে দে। তারপর আর কী? চিঠিগুলো যদি প্রাণ ধরে নষ্ট করতে না পারিস তো—'

—নষ্ট!

নীরার গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনায়।

নষ্ট করতে তো প্রত্যেক বারই চেষ্টা করি। পারি কই? তোকে জব্দ করতে তোর ঘাড়েই চাপিয়ে রেখে আসি।

কাকলি নরম গলায় বলে, 'কিন্তু সে-ব্যবস্থা তো আর চালানো যাবে না। তা ছাড়া এর একটা শেষও তো দরকার নীরা?

নীরা একটু চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, 'আচ্ছা কাল সকালের দিকেই একবার চলে আসছি তোর ওখানে। তারপর দেখা যাবে। কালই হাওয়া হয়ে যাচ্ছিস না তো? না কি রাতারাতিই কেটে পড়বি?'

—দারুণ রেগে গেছিস বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করব বল? বেশ তো চলছিল। তোরও দর্শন পাওয়া যেত মাঝে মাঝে। হঠাৎ যে এমন একটা বেয়াড়া পরিস্থিতি এসে যাবে তা কে ভেবেছিল। তবে তোর কুণালকেও বলিহারি দিই বাবা। এতদিন হয়ে গেল এখনও সেই প্রথম প্রেম আঁকড়ে বসে থাকা। এতদিনেও একটা মেমটেম জোটাতে পারল না? ওসব দেশে তো শুনি চেষ্টা করে জোটাতেও হয় না। তারা নিজেরাই জুটে এসে স্কন্ধে ভর করে। একটা ম্যারেড মেয়েকে এভাবে জ্বালাতন করে লাভ কী বাবা! —আচ্ছা আসছিস তো কাল? ছাড়ছি। মনে হচ্ছে প্রভু বোধ হয় ফিরলেন।

—অফিস যাননি?

—না। বদলির অর্ডারে কাল থেকে এক সপ্তাহের জন্যে ছুটি পেয়েছে।

—তাই নাকি। তো কাল সকালে গেলে তোকে একা পাবার আশা রইল না তো।

—রইল। কাল সকালে ও মেমারি যাবে, কানপুরে যাবার আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে।

—তোর বাবা বেশ! আত্মীয়রা দূরে থাকেন। এদের একটা দেশের বাড়ি-ফাড়িও নেই। আচ্ছা ছাড়ছি।

টেলিফোনটা ছেড়ে বিছানায় বসে পড়ল নীরা। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন রণক্লান্ত সৈনিক সবে শিবিরে ফিরল।

অকারণ জীবনটা কী জটিল হয়ে আছে নীরার।

নীরা তো কোনোদিনই ভাবত না তার প্রায় সমবয়সি পাড়ার ছেলে কুণালের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া সম্ভব। তবু কুণালের উদাস আবেগ, কুণালের পরম আকুলতা, একে একেবারে প্রত্যাহার করারও তো উপায় ছিল না। ঝুরো বালির ওপর পোঁতা চারাটাতে ও জল দিয়ে মরেছে। প্রশ্রয় দিয়েছে সেই প্রবল ছেলেটাকে।

প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় কী ছিল?

ও বলত, তুই কিছুটা দিন অপেক্ষা কর নীরা, কয়েকটা বছর! দেখিস আমি দাঁড়িয়ে পড়তে পারি কি না। রীতিমতো একখানা সুপাত্র হয়ে উঠি কি না। তাহলে তো আর মাসিমা-মেসোমশাই ইয়ে করতে পারবে না।

—ওই আনন্দেই থাক।

নীরা মুখ ঘুরিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলত, 'ততদিন তোর মাসিমা-মেসোমশাই তাঁদের সুন্দরী মেয়েটিকে ফেলে রেখে দেবেন যে? এখুনি তো মার্কেট রেট দেখে বেড়াচ্ছেন।

—ওঁরা বেড়াচ্ছেন বলেই তুই—

—তুই এত বোকার মতো কথা বলিস কুণাল! তোর এখন বয়েস কত?

—জানিস না?

—জানব না কেন? জানি বলেই তো। আমার থেকে মাত্র মাস আষ্টেকের বড়ো! আর কামলায়েক হতে? একখানা বিয়ে করে ফেলার মতো এলেমদার হতে? অন্তত বছর আষ্টেক। বেশিও হতে পারে। তো এতদিন আমার মা-বাবা বসিয়ে রেখে দেবেন?

—ওঃ। মা-বাবা!

ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিল, 'মা-বাবা দেখাচ্ছিস এখন?'

—কেন, বসে থাকবার মতো এলেম তুই দেখাতে পারবি না?

—দ্যাখ! মেয়েদের অবস্থা বোঝবার ক্ষমতা তোর নেই। আইনের হিসেবে আমিও তো এখনও নাবালিকা!

—চিরকাল নাবালিকা থাকবি?

—থাকব না তা ঠিক। কিন্তু তুই যে শেষপর্যন্ত কী করতে পারবি, তা কী করে জানব বল?

কুণালের বয়েস উনিশ। কিন্তু চেহারাটি দিব্যি বাড়বাড়ন্ত। পাতলা গড়ন হলেও প্রায় ছ-ফুট লম্বা একখানি পূর্ণ যুবাপুরুষ। তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে।

অথচ আবার কথাবার্তা আচার-আচরণ প্রায় অবোধ বালকসদৃশ!

নীরাদের বাড়ির যা ধরন, তা তো সে বরাবর দেখে আসছে। এরকম বাড়িতে তাদের একমাত্র সুন্দরী (অর্থাৎ দামি) মেয়েটিকে একখানি অকৃতি অধম বাল্যপ্রেমিকের জন্যে বসিয়ে রেখে দেবে এ অসম্ভব।

আর নীরা?

সেই-বা-কোন ভরসায় সে-আবদার করবে? নীরার প্রকৃতিও ঠিক তেমন নয়। বিয়ের জন্যে যে একটি নির্ভরযোগ্য পাত্র আবশ্যক, এ তার মনেও বদ্ধমূল।

কুণালকে সে ভালো না-বেসে পারে না। কুণালকে প্রশ্রয় না-দিয়েও পারে না, তবু ওই ছেলেমানুষ ছেলেটাকে বিয়ে করে ফেলে সংসারসমুদ্রে ভেসে পড়ার কথাও ভাবতে পারে না।

ও ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, জীবনে সফল হবেই, অন্তত সেই চ্যালেঞ্জ ওর। কিন্তু সেই হওয়াটা যে সুদূর পরাহত।

নীরা নিজে ছাত্রী হিসেবে ভোঁতাই। কোনোমতে পড়াটা চালিয়ে যাচ্ছে মাত্র। ওর এবং ওর মা-বাবারও লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে বি. এ.-টা পাস করা। তা সেটাই এখন মধ্যপথে। এরপর আরও পড়া চালিয়ে উচ্চতর বিদ্যা আহরণের খাতে সময় ব্যয় করে কুণালের নাগাল ধরতে পারবে এ আশা রাখে না।

তাহলে?

তাহলে আর কী?

তবু কুণালের কাছ থেকে সরে যাওয়াই-বা হয় কই?

এমনিতে তো পাড়ার ছেলে। যখন-তখন মাসিমা বলে ডেকে এসে হাজির হয়। এবং নীরার মা মাসিমাজনোচিত স্নেহপ্রকাশই করে থাকেন। ওদের দুটোর যে খুব ভাব তাও অনুধাবন করেন। কিন্তু ছেলেটা যে হঠাৎ খানিকটা লম্বা হয়ে উঠেছে বলেই মাসিমার মেয়েটাকে বিয়ে করবার সংকল্পে স্থির হয়ে বসে আছে, এমন কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

আর এবাড়িতে তো অন্যভাব।

কুণাল যে তার প্রেমিকার জন্যে আসে, এমন ভাব তার আচার-আচরণে প্রকাশ পায় না। ভাব দেখে মনে হয় মাসিমার হাতের তৈরি খাবার-টাবারের প্রতিই তার ষোলো আনা আকর্ষণ।

মহিলাও এই শৈশবে মা-হারা ছেলেটার প্রতি বিশেষ মমতা পোষণ করেন। খুড়ি জেঠির সংসারে মানুষ! আহা!

আর নীরা? সেও তো কম চতুর নয়। সে অনায়াসেই বলে ওঠে, 'এসেই মুখ চালাতে বসে গেছিস?' আচ্ছা পেটুক ছেলে তো বাবা! মা যে আজ চপ ভাজছে টের পেলি কী করে?

নীরার মা রেগে বলেন, 'তুই তো আচ্ছা অসভ্য মেয়ে। এইভাবে বলছিস?'

—যা সত্যি তাই বলছি।

—খবরদার বলবি না।

—ঠিক আছে বলব না। আমার ভাগে কম না পড়লেই হল।

—ওঃ! ওনার ভাগে কম পড়ার ভয়। ভারি আমার খাইয়ে মেয়ে রে! খাবার নিয়ে তো সেধে বেড়াতে হয়। হিংসুটি কোথাকার।

কুণাল অম্লানবদনে আরও চেয়ে নিয়ে বলে, 'যেতে দিন-না ওর কথা! ওরা কথা কে ধরছে?'

নীরাদের বাড়িতে পাড়ার (মা-হারা) ছেলেটার এই লীলা। লীলা অন্যত্র।

তবে মেসোমশাইয়ের উপস্থিতিটি বেশ সযত্নে এড়িয়ে চলে কুণাল।

মেসোমশাইটি গম্ভীর আত্মস্থ। তবে দেখা হয়ে গেলে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করেন এবং আক্ষেপ করে বলেন, 'এই তো তুমি কেমন ভালো রেজাল্ট করে এগিয়ে যাচ্ছ। অথচ তোমার বন্ধুটি তোমারই তো সমবয়সি, কতটা পিছিয়ে আছে! তুমি যদি মাঝেমধ্যে একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দাও—'

যদিও প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নীরার বরাবরই একটি দিদিমণি আছেন। তবুও বলেন ভদ্রলোক।

হয়তো ভদ্র বলেই বলেন। ভালো ছেলেটাকে একটু 'আপ' করবার জন্যে। তবে ছেলেটা আসলে তো মুখচোরা নয়।

সে স্বচ্ছন্দে উত্তর দেয়, 'আমায় মানছে কে? বলতে গেলে হয়তো বলবে সর্দারি করতে আসিস না। তো ওই যে কোন সহপাঠিনীর বাড়ি গিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ। কাকলি না কে তার বাড়িতে গিয়ে একসঙ্গে পড়ে বটে। সে ভালো ছাত্রী!

হ্যাঁ, সেই তখন থেকেই কাকলি নীরার রক্ষয়িত্রী, আশ্রয়দাত্রী!

ওর বাড়ি থেকে নীরা আর কুণাল ঘুরতে বেরোয়। তবে কাকলি সাবধান করে দেয়, —দেরি করবি না কিন্তু। দেরি হলেই টেলিফোনাঘাত আসবে। কত সামলাব? .....তবে সামলায়ও।

—ও, মেসোমশাই? এইমাত্র বেরোল নীরা। তবে বলছিল টুকটাক কী কেনার আছে। তা সে তো রাস্তাতেই পড়বে। ...কী বলছেন? কী কিনবে? তা তো জানি না। বলল এমন কিছু নয়। তবে ও যা খুঁতখুঁতে হয়তো একটা রুমাল কিনতেই হি-হি—আমিও কম না।

আবার কোনো কোনো দিন নিজে থেকেও ফোন করে কাকলি।

মাসিমা, আমি কাকলি বলছি। রেগে উঠবেন না মাসিমা প্লিজ। ম্যাটিনি, শো-এ দুটো টিকিট কেটে রেখেছি। 'পথে হল দেরি।' নীরাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে তো, ভাববেন না। ...না না, মেসোমশাই ফেরার আগেই ফিরে এসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

আবার তিন জনে এক-এক সময় হি-হি করে হাসে।

—কী মারকাটারি অভিনয় করে চলেছি আমরা! অ্যাঁ? বম্বে চলে গিয়ে ঝুলে পড়তে পারলে ভবিষ্যতে স্টার হয়ে যেতে পারতুম।

কুণাল বলে, 'এই নীরাটা হচ্ছে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। বাড়িতে মাসিমার সামনে এমন ভাব করে—'

'আর নিজেই-বা কম কী? মাসিমা। আজকাল আর সেই নারকেলনাড়ু করেন না? মাসিমা আপনার রান্নাঘর থেকে ভীষণ মন উতলা করা একটা গন্ধ আসছে দেখছি। পোস্তর বড়া ভাজছেন বুঝি?

কুণালের সুরের আর ভঙ্গির নকল করে ভ্যাঙায় নীরা!

এই লুকোচুরি আর অভিনয়ের পরিণামটা কোথায় পৌঁছোতে পারে, তা নিয়ে মাথা ঘামাত না তিন জনের একজনও। এ যেন একটা মজার খেলা। কিংবা একটা কৌতুকনাট্যর মহলা।

কিন্তু কাকলির বাড়ির লোক?

সে একটা অন্য ধরনের পরিস্থিতি। কাকলির বাবার বদলির চাকরি। কলকাতায় দৈবাৎ আসা। গিন্নিটিকে আর ছোটোমেয়েটিকে নিয়ে ঘোরেন। ছোটো-মেয়ে আর বড়োমেয়ের সঙ্গে বয়েসের তফাত এক দশক। তার এখনও পড়া নিয়ে তত মাতামাতি নেই। কাকলিকে কলকাতার বাড়িতেই থাকতে হয়। তাকে আগলাতে তাদের বাড়িতে এসে আছেন কাকলির দিদিমা আর ছোটোমামা।

বড়োছেলে-বউয়ের সংসার থেকে পালিয়ে আসার একটা সুযোগ পেয়ে ভদ্রমহিলা বেঁচে গেছেন। প্রাণের শান্তি ছোটো ছেলেটা কাছে আছে। এখান থেকেই স্কুলে যায়। এদিকে আবার বেঁচে গেছেন কাকলির মা-বাবা। এবং কাকলি ও তার সম্প্রদায়। একই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি বিভিন্ন পার্টি বেঁচে যাবার সুযোগ পেল এটা আশ্চর্যের বই কী। তবে সংসারে আশ্চর্য ঘটনা তো সর্বদাই ঘটছে।

কুণাল নামের ছেলেটার জীবনে তেমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তবে ও ভাবল না এটা আশ্চর্য! ও তো নিশ্চিত ছিল ও কোনো একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে বিদেশে পড়তে যাবে। যাবেই যাবে।

অতএব যাওয়াটা ওর কাছে আশ্চর্য নয়।

আশ্চর্য হল যে, নীরার বিয়ের সম্বন্ধ এগোচ্ছে।

আড়ালে একদিন দেখা করে কুণাল বলল, কথাটা সত্যি?

নীরা বলল, 'মিথ্যের কী আছে? কোনকালে সেই মাধ্যমিকের সময় থেকেই তো শুনছিস আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

—তার মানে তুইও ওই দলেই।

নীরা হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, 'কী চিরকাল ফ্যাচফ্যাচ করে মরলি। সাহস থাকে তো দে আমার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে। বিয়ের বারোটা বেজে যাক।'

—কী? কী বললি? আমি সেরকম ছোটোলোক?

—তুই কী, তা তুই নিজেই জানিস না। তুই একটা বুদ্ধু। যা হবার নয়, তাই নিয়েই জেদ।

—নীরা তোকে না পেলে আমি মরে যাব।

—এবার নীরা কেঁদে ফেলেছিল।

বলেছিল, 'কেন তুই আমায় এত কষ্ট দিস বল তো? তুই বিদেশ চলে যাবি পাঁচ বছরের মতো। তারপর তোর মতিগতি বদলাবে কি না কে জানে। আমি যদি এখন বাবাকে বলি আমি কুণালের জন্যে বসে থাকতে চাই, বাবা আমায় কচুকাটা করবে। শেষ অবধি বিদেশ থেকে শুনবি নীরা সুইসাইড করেছে।

—অ্যাই খবরদার।

নীরা উদাসভাবে বলেছিল, 'উপায় কী? যা দেখছি আমার কপালে ওই আছে। বাবা-মার অবাধ্য হয়ে নীরার ওই উদাস উদাস কথায় ভারি মুষড়ে গিয়েছিল কুণাল। বলেছিল ঠিক আছে। বাবা-মার অবাধ্য হসনে। তবে একটা কথা দে। পরে আমি যখন ভালোভাবে স্টেন করব, তখন ডিভোর্স করে দিয়ে আমার কাছে চলে আসবি। আর মাঝখানের সময়টায় চিঠি লিখবি।

কুণাল রে। এতদিন ভাবতাম তুই একটু পাগল। এখন দেখছি বদ্ধপাগল।

তারপর?

তারপর অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক তর্কাতর্কি। অবশেষে কাকলি মধ্যবর্তিনী হয়ে রফা করেছে, ঠিক আছে কাকলিই ওদের দু-জনার পত্রালাপ কেন্দ্র হয়ে থাকবে।

কুণাল নীরাকে চিঠি দেবে কাকলির কেয়ারে, এবং নীরা সে-চিঠির উত্তর দেবে কাকলির ঠিকানা [illegible]।

[illegible] বলতে পারে নীরার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়িটা কেমন হবে, বউ বিদেশে চিঠি পাঠাচ্ছে তার বাল্যবন্ধুকে, [illegible] কালাম করবে কি না। এটাই সুবিধে।

আর তোর? তোর বুঝি বিয়ে হবে না?

[illegible] না। আমি তোর মতো ভীতু নই। আমি পয়লা রাত্তিরেই বেড়াল কাটব। বরটার কাছে সব [illegible] বলব এবং বলব এতে আপত্তি করা চলবে না। আর অপত্তিই-বা কীসের? আমি তো আর [illegible]।

[illegible] তো অনেক দিনের কথা।

কুণাল [illegible]টায় চলে যাবার পর প্রায় বছর খানেক বাদে নীরার বিয়ে হয়েছে। তারপর এই চলছে।

[illegible] বলেছিল বেশিদিন কি আর চালাতে পারবে হে কুণাল রায়? নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, [illegible]

[illegible] সিওর?

[illegible] স্বাভাবিক সেটাই ভাবছি।

[illegible] আছে। দেখা যাক।

[illegible] তারপর তো দেখা যাচ্ছে। কুণাল তার কথায় ঠিকই আছে। এখন পড়া-টড়া সাঙ্গ করে [illegible] একটি ভালো চাকরি নিয়ে বোস্টনে বাস করছে এবং সেখান থেকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে [illegible] নীরাকে কাকলির কেয়ারে।

[illegible] প্রথম প্রথম, মানে যতদিন বিয়ে হয়নি ওর চিঠির নিয়মিত উত্তর দিত, কিন্তু বিয়ের পর [illegible] করেছে এবার তোমার ছেলেমানুষি খেলা থামাও কুণাল। আমাকে ভুলে যাও। এই [illegible] মানে আছে?

[illegible] আর তুই করে লেখে না নীরা।

[illegible] কুণাল?

[illegible] পালিয়ে যাচ্ছে। সে নীরার কথা কানেও নেয় না। লেখে, ডিভোর্সের কতদূর? জমি প্রস্তুত [illegible] লোকটার সঙ্গে সবসময় ঝগড়া করবি, সারাক্ষণ খেঁকিয়ে থাকবি, সর্বদা অবাধ্য হবি [illegible] ভুল করেছিস ভায়া কাকলি চিঠির ব্যবস্থা করায়। তোর ঠিকানায় প্রতি ডাকে চিঠি চলে [illegible] লোকটা নিজেই কেস ঠুকত।

[illegible] নীরা হাসবে না কাঁদবে?

[illegible] অবশ্য চিঠি জুড়ে থাকত কখন কোথায় গেল, কী দেখল, আর দেখে মনে কী ভাব উদয় [illegible] বিশদ বর্ণনা।

লেখে, 'হ্যাঁ ভোগের দেশ বটে। দেখে দেখে নিজের দেশের জন্যে ভীষণ মন খারাপ লাগে। কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ...মাঝে মাঝে মনে হয় এদের এই আরাম আয়েস ভোগবিলাসের একটু প্রসাদ পেয়ে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে পড়ে থাকাটা বোধ হয় অন্যায়। অপরাধ, খেলোমি, চলেই যাই।

কিন্তু যাব কোথায়? কার কাছে? বাবা তো কেটে পড়েছে জানিস। জানি না, মা-র কাছে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসতে পেরেছে কি না। বরাবর সেটাই তো ধারণা ছিল বাবার। এদিকে জ্যাঠা আর কাকারা সবাই কোথায় কোথায় যেন চলে গিয়ে আলাদা সংসার পেতেছে। তাদের ঠিকানাও জানি না। অথচ দ্যাখ বাবা যতদিন ছিল বাড়ির চেহারাটা একইরকম ছিল। কারণটা বোধ হয় বাবার আয়ের অঙ্কটা বেশ মোটাসোটা ছিল, আর সেটা বেওয়ারিশ ছিল। যাক গে সেকথা। তবে ফিরে যাবার পর জীবনটাকে কোথায় পুঁতব ভেবে পাই না। দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ? তাহলে এখানটাই-বা কী দোষ করল? ফিরে কলকাতায় না থাকলাম তো ফেরার কী মানে? অথচ নিশ্চয়ই জানি ওই চিরকালের চেনা জায়গায় যদি তোকে তোর ওই বরটার কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে এসে সুখে ঘরকন্না করতে বসি, কেউ ভালো চোখে দেখবে না। ডিভোর্সটা যে একটা ব্যাপারই নয়, একেবারে জলভাত সেটা এদেশে এসে মালুম হচ্ছে। নিজের দেশে গেলেই ধারণা বদলে যাবে। তাই ভেবে দেখছি তোরই এখানে চলে আসা ঠিক।'

যদিও নীরা এরপর চিঠি দিয়েছিল, 'তোমাকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। হবে না। অতএব জানিয়ে রাখছি এই আমার শেষ চিঠি। আর চিঠি লিখব না। সেটাই তোমার চিঠির জবাব। লক্ষ্মীটি কুণাল, পাগলামি ছেড়ে এবার একটি সুন্দর আর বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো। বয়েসের একটু তফাত থাকাই তো ভালো। বিশেষ করে বাঙালি সমাজে। বাঙালি মেয়েরা তো পঁয়তাল্লিশ পার করলেই বুড়ি। অথচ ছেলেদের? পঁয়তাল্লিশে টাটকা তাজা পূর্ণ যুবক। এই অসামঞ্জস্যর কথা ভাবা ভালো। 'শেষ চিঠি বলে অবশ্য চিঠির শেষে অনেক অনুরোধ ছিল, কুণাল যেন নীরার ওপর অভিমান না করে। রেগে না যায়।

কিন্তু কুণাল? সে কি চিঠি লেখা ছেড়েছে?

ছাড়েনি।

অতএব ওর চিঠি এলেই কাকলি ফোন করে, এই চলে আয়! তোর প্রেজেন্টেশন এসে গেছে। নীরা তখনও ভাবতে পারে না, নাঃ, আর যাব না।

যায় ঠিকই। চিঠিটা পড়ে। কাকলির সঙ্গে একটু আড্ডা দেয়, চা খায়, এবং চলে আসার সময় বলে আসে, 'সাবধানে রেখে দিস পাগলটার চিঠিখানা।'

কাকলি বলে, 'কুণালটার মতো এমন অক্ষয়প্রেম আমি আর কখনো দেখিনি।'

নীরা বলে, 'এটা হচ্ছে এক ধরনের আত্মপ্রেম বুঝলি? নিজের ভালোবাসাটিকে ভালোবাসা।'

তবু এ একটা কোনো পত্রিকার পাতায় দীর্ঘতর ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো চলছিল অবিচ্ছিন্ন ধারায়।

এখন ছেদ পড়ল।

ভিজে হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে নীলনলিনী এসে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ালেন। তিনি এখন তাঁর বিশুদ্ধ ডিপার্টমেন্টে আছেন। ফট করে শোবার ঘরে ঢুকে পড়বেন না। দেখে নেবেন ঘর মোছা-টোছা হয়েছে কি না।

দেখলেন বিছানায় শুয়ে আছে নীরা। চোখের ওপর একটা হাত চাপা।

—অসময়ে শুয়ে যে বউমা? শরীর খারাপ লাগছে?

নীরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

বলল, 'না ঠিক আছে।'

—আমি বলি বুঝি মাথা ধরেছে। তা ধরতেও পারে। একঘণ্টা ধরে কে এত টেলিফোন করছিল বউমা? বিরুর অফিসের কেউ না কি?

অফিসের!

নীরার ভুরুটা অজ্ঞাতসারেই কুঁচকে যায়।

—কেন, অফিসের লোক আমায় ফোন করবে কেন?

—কী জানি। যদি কোনো ফাইলপত্তরের কথা বিরু বলে গিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে চালাচ্ছিল তো। তো কে করছিল ফোন?

তার মানে কৌতূহল অদম্য।

নীরা শান্ত গলায় বলল, 'আমার বন্ধু কাকলি।'

—ও! সেই হাসিখুশি ছটফটে মেয়েটি? তাই। তাই ভাবছিলুম ফোনের মধ্যে এত হি-হি হু-হু হাসি। বোধ হয় বউমার কোনো বন্ধুই হবে।

নীরার চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করল, 'এক্ষুনি জানতে চাইলেন অফিসের লোক কি না।'

বলল না।

বলা মানেই কতকগুলো বাড়তি আবোল-তাবোল কথা শুনতে হবে। চুপ করে থাকল।

নীলনলিনী আবার বললেন, তা সব খবর ভালোটালো?'

নীরার তখন মনটায় অন্যমনস্কতা। চমকে বলল, কাদের খবর?'

—ওমা! কাদের আর? ওই তোমার বন্ধুর?

—হ্যাঁ ভালো। না মানে খুব ভালো নয়। ওর স্বামীর বদলির অর্ডার এসেছে। কলকাতা থেকে চলে যেতে হবে।

—ওমা! তাই বুঝি? আহা! তো ছেলেপুলে কী?

—এখনও কিছু হয়নি।

—দ্যাখো কাণ্ড। দুই বন্ধুর একই ভাগ্যি। এই তোমারও তো আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে। কোলে একটিও এল না এখনও।

—ওঃ। অসহ্য! অসহ্য এই অকারণ গায়ে পড়া গ্রাম্যতা। আর গাঁইয়া গাঁইয়া কথা।

নীরার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, আপনি এখন যাবেন ঘর থেকে? আমায় একটু রেহাই দেবেন?

কিন্তু মেয়েদের মানে নীরার মতো ভদ্র মেয়ের এরকম কোন ইচ্ছেই-বা মেটে?

—তাহলে শরীর ভালো আছে? বাঁচলুম বাবা! হঠাৎ অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে—

কী ভাগ্যি চলে গেলেন নীলনলিনী।

নীরা আবার চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগল, এই মানুষটাকে সারাজীবন সহ্য করে চলছে বিরাম। শুধু সহ্যই-বা কেন? মাথার মণি পরমপুজ্যি করে রেখেছে। কী করে পারে?

এবং আবার এমনই ইচ্ছে আর নির্দেশ বিরামের, নীরাও তার মতো পিসিমা সম্পর্কে সদা তটস্থ সম্ভ্রম সমীহশীলা হোক।

হতেও হয় তাই। বাইরে সেইরকম চালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জমে ওঠে তিক্ততা বিতৃষ্ণা।

এই জীবনটাকেই ঠেলে নিয়ে চলতে হবে নীরাকে!

পিসিমা-র দেখাদেখি বিরামও আজকাল এক-আধ বার আক্ষেপ করে ওঠে, বাড়িতে ছোটো বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে মানায় না।

কিন্তু কাকলির শিষ্যা নীরা চায় না এখনই ছেলে-মেয়ে নিয়ে জড়িয়ে পড়তে। অতি সঙ্গোপনে সে-সাবধানতা দাওয়াই চালিয়ে চলে।

আমার জীবনটা মন্দ নয়। ভাবল নীরা।

একদিকে এক বিলাসবহুল ভোগের স্বর্গ থেকে এক উদ্দাম প্রেম এখনও নীরার জন্যে পাগলের মতো ছটফট করছে আর অন্য এক জীবনের আশ্বাস দিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, অপরদিকে এই তার ঠাকুমা, দিদিমা-র আমলের লক্ষ্মী বউয়ের জীবনের ভূমিকায় কাটিয়ে চলতে হচ্ছে।

স্বামী? তিনিও তো সেই মান্ধাতার আমলের মতো মতবাদে বিশ্বাসী! নীরা চেয়েছিল কিছু কাজকর্ম করতে। বিরামের তাতে ঘোরতর আপত্তি। কেন, বিরাম কি তার বউটাকে বসিয়ে খাওয়াতে পেরে উঠবে না?

দিন কাটে না?

কী আশ্চর্য! এত বই পড়তে ভালোবাসো, দিন কাটার অভাব কী?

আবার বলে, 'আমি তো ঠিক করে রেখেছি রিটায়ারের পর বইটই পড়ব। যত পারব! সারাজীবন তো সময় হবে না। তুমি যখন পাচ্ছ—'

ঠাকুমা-দিদিমাদের আমলের সঙ্গে তফাতের মধ্যে একেবারে হারেমে বন্দি নয় এই মাত্র।

একা একা পথে ঘাটে বেরোবার স্বাধীনতা আছে। তা সে তো নীলনলিনীরও আছে।

কিন্তু নীরার দৌড় তো কাকলির বাড়ি বাপেরবাড়ি আর মার্কেটিং অবধি। এর বেশি নয়। তাও কোথায় গিয়েছিলে গো? এতক্ষণ কী করলে? মা-বাবা ভালো আছেন? ও বাপেরবাড়ি যাওনি? বন্ধুর বাড়ি? সে তো কাছেই না? তো এত দেরি?

এই ধরনের একঝাঁক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

আচ্ছা নীরা কি একদিন বিরামকে বলে উঠতে পারবে না তোমার পিসিমা-র সঙ্গে ঘর করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। হয় তাঁকে দেশের বাড়িতে চালান করো, নয় আমায় তালাক দাও।

আঃ! নীরার যদি এত সাহস থাকত।

কাকলি বলে, 'তোর জায়গায় আমি হলে কবে একথা বলে ফেলতাম!'

নীরা কাকলিকে বলেছিল, 'চিঠি এসেছে? উত্তম কথা। শুনে সুখী হলাম। কিন্তু তুই তো আর আজই রাতারাতি পিঠটান দিচ্ছিস না? কাল যাব।'

কিন্তু নিজেই অধৈর্য হল। বেরিয়ে পড়ল বিকেল বেলা।

নীলনলিনী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। —বউমা বেরোচ্ছ?

নীরা অকারণ দৃঢ়সুরে বলল, 'হ্যাঁ।'

—চা খেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—ফিরতে বেশি দেরি হবে না তো?

—বলতে পারছি না।

বিরু বাড়ি নেই। সন্ধেটা একা একা ফাঁকা ফাঁকা লাগে গো মা! তাই বলছি—

নীরা তবু কাঠিন্যের ভঙ্গিতেই থাকল।

—একা কেন? শ্যামলী, শ্যামলীর মা নেই?

—সে তো আছে। ওরা আছে বলেই তো মন টিঁকিয়ে যো সো করে থাকা। বিরু বাড়ি না-থাকলে কথা কইবার সাথি বলতেও তো ওরা।

এটি অবশ্যই একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান। নীরা যে তাঁর সঙ্গে গালগল্প করতে চায় না, সে তো তিনি ভালোই বোঝেন। শেষ চেষ্টার মতো বলেন, 'আজ টি. ভি.-তে একটা ভালো বাংলা ছবি ছিল—'

—আপনি দেখবেন ওদের নিয়ে।

—আমি তো বাছা তোমার টি. ভি.-মিভি খুলতে পারি না।

শ্যামলী খুব পারে।

বেরিয়ে গেল হাতের ব্যাগটাকে কাঁধে তুলে।

আচ্ছা ওই মহিলার কথা বলতে এত ভালো লাগে কেন? না কি নীরার জীবনটা মহানিশা করে তোলবার জন্যেই—

কাকলি হইচই করে উঠল।

—কী? আজই এলি যে বড়ো? হুঁ বাবা! মুখে যতই ইয়ে করো—এই নে।

সেই পরিচিত বিদেশি ফিকে নীলরঙা লম্বাছাঁদের খামটি।

—বাবাঃ! তোর যে আর তর সইছে না।

নীরা হাত বাড়িয়ে নিল চিঠিটা। তক্ষুনি খুলল না।

তা খোলেও না। চা-টা খেয়ে গালগল্প সেরে, অতঃপর পড়ে। হয়তো একাধিক বারই পড়ে। তারপর কাকলিকে বলে, 'নে রেখে দে।'

কাকলি কোথায় লুকিয়ে রাখে সেই কুণাল নামের ছেলেটার পাগলামির নিদর্শন এই বেপরোয়া চিঠিগুলো? সে একটা মজার ব্যাপার।

কাকলির বরের এই পুরোনো আমলের বাড়িটার ঘরে ঘরে দেওয়ালে দেওয়ালে দেওয়াল আলমারি! আর তার মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে একটি করে গুপ্ত চেম্বার। ছোট্ট একটি চাবিকে কাজে লাগিয়ে পিঠের কাঠটাকে দু-ধারে ঠেলে দেওয়া যায়। এবং দেখা যায় দিব্যি একখানি গোপন কক্ষ।

কাকলি তার ছোটোখাটো গহনা, এর মধ্যে রেখে দেয়। বাড়ি থেকে যখন বেরোয়, বাড়ি লোকজনের ভরসায় রেখে, তখন বেশি টাকাফাকা থাকলে লোহার আলমারিতে না রেখে ওর মধ্যে রেখে যায়।

সেই চেম্বার থেকে অনেকগুলো তাড়া বাঁধা বাঁধা চিঠি বার করল কাকলি। গোলাপিরঙা সিল্কের ফিতে বাঁধা বাঁধা।

হাতড়ে ভেতরটা আর একবার দেখে নিয়ে বলল, 'নে, তোর গচ্ছিত সম্পত্তি। দ্যাখ আমি নিরুপায়।'

এত চিঠি!

দেখে যেন অবাক হয়ে যায় নীরা।

তারপর কাকলির দিকে তাকিয়ে বলে, 'কুণালটা আর ম্যাচিওর হল না।'

বাইরের জীবনটা তো বেশ গেঁথে ফেলেছে বাবা। দাক্ষিণ্য করে আমায়ও মাঝে মাঝে এক-আধ খানা দেয় তো। দেউড়ির দারোয়ানকে ঘুষ দেবার মতো। তো এই যে একটা লিখেছে—খুব ভালো আছে। সম্প্রতি একটা বাড়ি কিনেছে। এই তো সবে ওখানকার ওই চাকরিটা—

নীরা অবাক হয়ে বলে, বাড়ি কিনেছে! ওখানে বাড়ি কিনেছে?

—আরে! এতে অবাক হবার কী আছে? বাড়ি কেনা তো ওদের দেশে জলভাত। আবার বাড়ি বদলানোও। একটা বেচে আর একটা। ওসব খুব সহজ ওদের।

নীরা চিঠির গোছাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, 'একটা বিয়ে কেন করছে না বোকাটা।'

ওই তো। এখনও দিন গুনছে কবে তার বাল্যবান্ধবী বরটাকে তালাক দিয়ে গিয়ে ওর হাতে ধরা দেয়।

—আচ্ছা হ্যাঁ রে একেই বোধ হয় বদ্ধপাগল বলে তাই না? কোনো একটা কিছু বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে—

—জানি না বাবা 'বদ্ধ' না 'উন্মাদ', তবে এইবার যখন তোর বাড়িতে এইসব প্রেমপত্র গিয়ে আছড়ে আছড়ে পড়বে, তখন বোধ হয় সহজেই অবস্থা ওর অনুকূলে চলে যাবে। বিরামবাবু তো আবার বেশ একটু পুরোনোপন্থী।

—আমার ঠিকানা ও জানে না।

—জানে না। এইবার তো জানাতে হবে। আমিই ভাবছি আমার হঠাৎ এই অসুবিধের কথা জানিয়ে—

—এই কাকলি খবরদার।

—বাঃ, তাহলে?

—আমিই একটা চিঠি দেব। ঠিকানা না দিয়ে কড়া করেই লিখতে হবে এর পরিসমাপ্তি করতে। আর, দে একটা দেশলাই দে, চিঠিগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে যাই—

—ইস, তা আর নয়!

কাকলি ভুরু তুলে বলে, 'প্রাণ ধরে পারবি?'

—পারতেই হবে।

—তো ইচ্ছে হয় নিজের বাড়ি গিয়ে যা-খুশি কর গে যা। আমার এখানে ওসব মারণযজ্ঞটজ্ঞ অ্যালাউ করব না।

নীরা একটু কাতর গলায় বলে, 'তাহলে তোর এই দেওয়ালের গহ্বরে রেখেই দে-না বাবা! বাড়িটা তো তোরই। আসবিও তো পরে। বন্ধ বাড়ির মধ্যে কে আর—'

কাকলি ঝংকার দিয়ে ওঠে। —ও বাবা তা আর নয়! বাড়ি কি আর বন্ধ রেখে যাওয়া যায় আজকালকার দিনে? আমার ননদ-ননদাই এসে থাকবে। আর ননদের ওই গহ্বরের খবর ভালোই জানা। আগেই তো ওটকাবে।

—চাবি রেখে যাবি কেন?

—চাবি? ফুঃ। ছাড়। ভারি তো চাবি। আমার ননদের কাছে ও কিছুই না! না ভাই। তোর সম্পত্তি তুই নিয়ে যা।

নীরা বলে ওঠে, 'ঠিক আছে। চিঠিগুলো ওকেই ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

—ওকে?

—সেটাই ঠিক হবে। হয়তো একসঙ্গে সবগুলো দেখে নিজের পাগলামির ওজন বুঝতে পেরে—

হঠাৎ চুপ করে গেল নীরা।

কাকলির কাছ থেকে মোটা একটা ব্রাউন পেপারের খামের মধ্যে প্যাকেটগুলো ভরে ফেলে সুতো বেঁধে ব্যাগে পুরে নিয়ে নীরা বলল, 'তাহলে আজই টা-টা? পরশু সকালের গাড়িতেই চলে যাচ্ছিস যখন!'

হঠাৎ এতক্ষণের বহু কষ্টে আটকে রাখা বাঁধ ভেঙে দুই আবাল্যের সখী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

বিয়ে হয়েও দু-জনে বেশি দূরত্বে গিয়ে পড়েনি। দু-জনেই কলকাতার দক্ষিণে।

ভাগ্যের সেই দাক্ষিণ্যটুকু গেল।

আর নীরার তো অনেক কিছুই গেল।

তার পাথরচাপা জীবনে একটি দক্ষিণের জানালা তার এই চিরহিতৈষী বান্ধবী।

ফেরার সময় অন্যমনস্ক ছিল ঠিকই। তবু এতটাই কি? এর নামই ভাগ্য বিপর্যয়।

জনা দু-তিন অচেনা ছেলে যখন নীরাকে প্রায় ধরাধরি করে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে বাড়ির দরজা ঠেলল, তখন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা।

দেখেই নীলনলিনী ডুকরে কেঁদে উঠে কপালে হাত চাপড়ালেন, ওমা আমার এ কী সর্বনাশ হল গো, বলে।

নীরা হাত তুলে ইশারায় থামতে বলে কষ্টে বলল, 'ভয় পাবেন না। মরিনি। থামুন।'

ছেলে তিনটেও বলল, 'না না অত ভয় পাবেন না। তেমন কিছু হয়নি আপনার মেয়ের।'

নীলনলিনী আবার ডুকরে ওঠেন, —ওমা! মেয়ে কেন হতে যাবে? আমার বউমা। তবে হ্যাঁ মেয়ের অধিক। তো কী করে এমন হল? পায়ে এতবড়ো ব্যান্ডেজ! কী হয়েছে পায়ে?

নীরাকে যন্ত্রণা নিবারণের ওষুধ দিয়েছিল ডাক্তার। ঘুম ঘুম ভাব। তবু তার মধ্যে থেকেই ক্লান্ত বিরক্তস্বরে না বলে পারল না, —পিসিমা পরে শুনবেন। এখন শ্যামলীর মাকে বলুন এদের একটু চা খাওয়াতে।

—না না, চা লাগবে না।

ওরা হইহই করে উঠল।

আমরা কাল সকালে আসব। এর মধ্যে যদি আপনাদের ফ্যামিলি ফিজি..., ইয়ে বাড়ির ডাক্তারবাবুকে মানে হয়তো একটা এক্স-রে করলে ভালো হয়।

পিসিমা আঁতকে উঠে বললেন, 'ও বাবা। কে এসব করবে গো। আজই সকালে আমার ভাইপো অফিসের কাজে বিদেশ গেল—'

একটি ছেলে বলে উঠল, 'ঠিক আছে ডাক্তারের নাম-ঠিকনাটা বলুন আমরা খবর দিয়ে যাব—'

নীরাকে এনে নীরার ঘরে খাটের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ক্লান্তিতে দুশ্চিন্তায় ওষুধের প্রভাবে। তবু আস্তে বলল, 'ওই কোণে ছোটো টেবিলে টেলিফোনের কাছে ফোন নাম্বারের খাতাটা আছে। প্রথম পাতাতেই পাবেন ডক্টর আর, এন, চৌধুরী। এবাড়ির ঠিকানা তো খাতার ওপরেই পাবেন। বলবেন বিরাম চ্যাটার্জির বাড়ি থেকে বলছি, মিসের চ্যাটার্জির হঠাৎ একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে'—কথা শেষ করার আগেই—

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে গিয়ে ছেলেটি টেলিফোনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবং তারপরই তার গলা শোনা গেল, হ্যাঁ এখনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের আউটডোরে ফার্স্ট এড দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যান্টিটিটেনাসও দেওয়া হয়েছে। তবু যদি কাইন্ডলি এক বার—মানে ওঁরা বলেছিলেন একটা এক্স-রে করলে—ও। কাল সকালেই চলে আসবেন? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মিস্টার চ্যাটার্জি বাইরে গেছেন...ওঃ জানেন?....আপনাকে বলে গেছেন খোঁজখবর রাখতে?...ঠিক আছে। আমি? কেউ না। রাস্তার ছেলে। হঠাৎ হেসে উঠে বলে, আপনারা যাদের মস্তান বলেন তাদেরই একজন। ...ঠিক আছে। ঠিক আছে। ধন্যবাদের কোনো কোশ্চেন নেই। ওঃ। ওই তো বললাম বাস থেকে নামা-র সময় একটা বিশাল চেহারার বেয়াড়া লোক হঠাৎ আগে নামা-র চেষ্টায় ভদ্রমহিলাকে ঠেলে এগোতে গিয়ে ভারী জুতো দিয়ে এমন পা মাড়িয়ে দিল যে উনি হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে

প্রায় সেন্সলেস!..না। বোধ হয় ইচ্ছাকৃত নয়, ব্যস্ততার জন্যেই। তবে ধোলাই খেয়েছে খুব। ...কে আবার? রাস্তার লোকই। ভদ্রমহিলা পড়ে কাতরাচ্ছেন আর সবাই লোকটাকে ধোলাই দিতে ব্যস্ত। ...যাক গে এসব তো সাধারণ সিম্পলি ব্যাপার। আচ্ছা...রাখছি।

নীরা টেলিফোনের বাক্যালাপ শুনে ডাক্তারবাবুর প্রশ্নগুলো বোঝবার চেষ্টা করছিল। পারছিলও।

তিন জনের মধ্যে এই ছেলেটাই যেন মুখপাত্র বা দলনেতা। হেসে বলল, 'আচ্ছা দিদি, আমরা তাহলে চললুম। আপনার ডাক্তারবাবু কাল খুব সকালেই আসবেন।'

নীরার মনে পড়ল, যখন এরা নীরাকে রাস্তা থেকে তুলে সেবা প্রতিষ্ঠানের আউটডোরে নিয়ে গিয়েছিল, এবং ফার্স্ট এই দিইয়ে ফিরিয়ে এনেছিল তখন বা ততক্ষণ নীরাকে ম্যাডাম বলে কথা বলছিল।

আচ্ছন্নের মতো থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, এরা এইভাবেই কথা বলতে অভ্যস্ত। এখন 'দিদি' বলল। কেন বলল কেন জানে। তবে ভালো লাগল।

নীরা তাদের হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বলল, 'আপনারা আমার জন্যে এতখানি করলেন ভাই, এতক্ষণ থাকলেনও কিন্তু একটু চা পর্যন্ত খেলেন না, খুব খারাপ লাগছে। কাল আসবেন কিন্তু? আসবেন তো?'

ওরা নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে বলল, 'কী দরকার? আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান তো এসেই যাচ্ছেন। তা ছাড়া মিস্টার চ্যাটার্জি ওঁকে বলেই গেছেন—'

নীরা বলল, 'হ্যাঁ ওই এক বাতিক। কোথাও গেলেই ডাক্তারকে জানিয়ে যাওয়া। তা হোক আপনারা আসবেন। এত করলেন, অথচ নামটামও তো জানলাম না। পরিচয়ও হল না।'

—আমাদের আবার নাম পরিচয়।

হেসে উঠল ওরা। —ওই তো শুনলেন রাস্তার ছেলে। যাকে আপনারা মস্তান বলেন।

নীরা তাকিয়ে দেখল।

দিব্যি ভদ্র চেহারার ছেলে। সাজসজ্জাও দৈন্যদশাগ্রস্ত নয়। তার মানে এই বাজে পরিচয়টা ওদের ইচ্ছাকৃত বা শখ।

শ্যামলী আর শ্যামলীর মা বসেছিল নীরার খাটের ধারে মাটিতে। নীরা জানে এরা নীলনলিনীর রিপোর্টার। অতএব রিপোর্টটা এই দণ্ডেই গিয়ে দেবে ওরা, ছেলেগুলো আর আসতে চাইছিল না, তবু বউদিমণি, দৈ দস্তুর করল।

তা বলুক গে।

নীরা এদের সম্পর্কে একটুও সৌজন্য প্রকাশ না করে পারবে না। রাস্তার মুটেমজুর ক্লাসের হলে কিছু টাকার দেওয়া যেত। এবং দিয়ে বিবেককে শান্ত করা যেত।

কিন্তু এরা তা নয়।

কাজেই নীরা পিসিমা-র সমালোচনার ভয়কে মন থেকে তাড়িয়ে বলে উঠল, 'ছাড়ুন ওকথা। আপনাদের আবার আসতেই হবে। আমার সামনে বসে একটু চা-টা খাবেন। তা ছাড়া—এক্স-রে রিপোর্টটা জানবেন না? সেই বিশাল ভদ্রলোকের ভারী জুতোর চাপে পায়ের হাড়গোড়গুলো চূর্ণ হয়ে গেল কি না না-জেনে স্বস্তি পাবেন?

ওরা হেসে ফেলল।

আর সেই দলনেতা ছেলেটি বলে উঠল, 'ঠিক আছে। আসব। তাহলে কাল এসে লাভ নেই। পরশু-তরশু—'

নীরার মধ্যে একটা প্রশ্ন অবিরাম পাক খেয়ে চলেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে।

নীরার কাঁধে ঝোলানো স্ট্যাপ লাগানো ব্যাগটা? সেটা কোথায়? তার মধ্যেই যে নীরার জীবন-মরণ মানসম্ভ্রম!

কিন্তু ব্যাগের কথা জিজ্ঞেস করলে এরা যদি কিছু মনে করে? যদি ভাবে নীরা ওদের সন্দেহ করছে।

হয়তো রাস্তায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

হয়তো কেউ সুযোগ বুঝে হাতিয়ে নিয়েছে।

উদগ্র প্রশ্নকে ঠেকিয়ে রেখে নীরা ভাবতে চেষ্টা করল অজানা অন্যের হাতে পড়লে ঘটনাটা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে।

কুণালের চিঠিগুলোয় নীরার ঠিকানা না থাকলেও নাম তো আছেই। আবার কাকলির ঠিকানা আছে। তা ছাড়া—আছে প্রেরকের নাম-ঠিকানা, পুরো হদিস!

হায়!

একটা বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে নীরা মরে গেল না কেন?

নীরা চোখ বুজল।

নীরার মাথা ঝিমঝিম করছে। ভাবতে পারছে না।

হঠাৎ ঈশ্বরের দৈববাণীর মতো একটি দৈববাণীই কানে এল। একটা কথা বলে যেতে ভুলে গেছলাম। নীচেরতলায় নেমে আবার ফিরে এলাম। আপনার হাতের ব্যাগটা আপনার ওই আলনায় ঝুলিয়ে রেখে গেছি।

ব্যাগটা।

নীরার সেই ব্যাগটা!

সেটা আছে। নীরার ঘরে এসে পৌঁছেছে।

কে দিল এ খবর? কোনো দেবদূত?

নীরা তাকিয়ে দেখল।

সেই ঈষৎ শ্যামলা রং মার্জিত চেহারার ছেলেটি।

একা। শ্যামলী কোম্পানি তো আগেই অন্তর্হিত!

নীরা চোখ খুলেছে। কষ্টে নিজেকে সামলে বলে, 'ওমা! সেটা আছে? আমি তো ভেবেছি রাস্তায় পড়ে গিয়ে—'

নীরার গলার স্বর কাঁপছিল। কথা শেষ করতে পারল না।

ছেলেটা বলল, না না পড়ে যাবে কেন? কাঁধে ঝোলানো ছিল তো। ট্যাক্সিতে তোলার সময় রেখে দিয়েছিলাম। এই যে—

হাত বাড়িয়ে আলনা থেকে নিয়ে এসে নীরার সামনে ধরল। চামড়ার কাজ করা সুন্দর সেই ব্যাগটা নীরার। ছেলেটা একটু হেসে বলল, 'খুলে দেখতে পারেন, অ্যাজ ইট ইজ আছে কি না!

নীরা একটু আবেগ আর ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ।'

ছেলেটা অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, 'এমনি বললাম। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা ভালো থাকবেন।'

নীরা ভালো করে তাকিয়ে দেখল।

নীরার মনে হল ছেলেটা যেন তার আগে দেখা। চেনা চেনা। ব্যগ্রভাবে বলল নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।

জানতে হবে?

ছেলেটা হাসল। বলল, 'নাম অলোক। অলোকরঞ্জন নন্দী।'

নীরার আবার মনে হল এই হাসিটি কোথায় যেন দেখেছে সে।

ব্যাগটা বিছানার ওপরই নামিয়ে রেখে গিয়েছিল অলোকরঞ্জন। তবু তক্ষুনি হাত দিল না নীরা।

যদি ও আবার কোনো দরকারে ফিরে আসে। কী মনে করবে?

তা ছাড়া—

হ্যাঁ তা ছাড়াও একটা ভয় সারা শরীরে শিরশিরিয়ে উঠছে। যদি খুলে দেখে সেই আসল জিনিসটাই নেই।

মোটা ব্রাউন পেপারের সেই বড়োসড়ো খামটা!

একটু পরে সাহস সঞ্চয় করে খুলল।

আস্তে হাত ঢোকাল। তারপর দু-হাত জোড় করে অদৃশ্য এক শক্তির কাছে কৃতজ্ঞ প্রণাম জানাল।

এই কিছুক্ষণ আগেই যাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, আজই আমায় এই বিপর্যয়ে ফেললে? এত নিষ্ঠুর তুমি?

এখন তাঁকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে বলল, 'তোমার কত দয়া।'

শুয়ে শুয়েই দেখছিল।

এখন কীভাবে এটাকে লুকিয়ে রাখবে? ওঠবার ক্ষমতা তো খতম!

হঠাৎ সিঁড়িতে নীলনলিনীর কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। তার মানে আসছেন হানা দিতে। সঙ্গে রিপোর্টারদের কেউ একজন।

নীরা তাড়াতাড়ি সেই ভারী খামটাকে মাথার বালিশের তলায় চালান করে দিয়ে চেপে শুল। এবং সাধ্যমতো চেষ্টায় শাড়ির আঁচলটা ছড়িয়ে দিল ঘাড়ের কাছে।

এইটুকুতেই হাঁপিয়ে গেল। ঘেমে গেল।

তবে ঘুমের ওষুধের আচ্ছন্নতা কেটে গেছে। এত চাঞ্চল্যে আর থাকে?

হাঁফাচ্ছিল। চোখ বুজল।

নীলনলিনীর অবস্থাটি যাকে বলে আহ্লাদে ফুটিফাটা। অনেক চেষ্টাতেও ঢাকতে পারছেন না।

হবে না আহ্লাদ?

আজ একহাত নিতে পারবার সুযোগ পেলেন না? ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার অলৌকিক সম্মান? সে-সম্মান আর কেউ না দিক, নিজেই দিলেন!

প্রথমে অবশ্য এসে মমতা নিংড়োনো গলায় বলে উঠলেন, 'এই গরম দুধটুকু আর সন্দেশ দুটো খেয়ে নাও বউমা! এতক্ষণ বাইরের লোকের ঝামেলায় দিতে পারছিলুম না।'

শ্যামলীর এক হাতে কাচের গ্লাসে একগ্লাস দুধ আর অন্য হাতে প্লেটে দুটো সন্দেশ।

এসব ওদের অশুদ্ধ দিকের জিনিস অর্থাৎ ফ্রিজের জিনিস। কাজেই পিসিমা স্পর্শ করেন না।

নীরা হাত নেড়ে বলল, 'খাব না। খিদে নেই।'

নীলনলিনী বললেন, 'ওমা! তা বললে হয়? সেই কোনকালে ভাত খেয়েছ? তারপর এই র‍্যালা গেছে।

নীরা কষ্টে বলল, 'কাকলি অনেক খাইয়ে দিয়েছিল।'

—কাকলি! ও! বন্ধুর কাছে গেছলে বটে! তা সেও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। গরম দুধটুকু অন্তত—

নীরা হাত নাড়ল

তবে আর কী করা! আর অনুরোধ চলবে না।

কিন্তু কথা বলতে তো বাধা নেই।

তাই উচ্ছ্বসিত গর্বকে বিষণ্ণতার মোড়কে পুরে বলে ওঠেন তিনি, 'আজ তোমার বেরোবার কালেই আমার মনে কু গাইছিল বউমা! আজই ছেলেটা বাড়ি থেকে যাত্রা করল। আর আজই শনিবার সন্ধের মুখে তোমার অকারণ বন্ধুবাড়ি যাবার বাসনা হল! তখনই ভগবানকে ডেকেছি, ঠাকুর। যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে বউমা!'

নীরা বিরক্ত হয়ে চোখে বুজেই ঘুমের ভান করে আছে। হঠাৎ শ্যামলীর খিলখিল হাসি শুনতে পেল।

—ঠাকুর তো তোমার কথা খুব শুনল গো ঠাকুমা? হি-হি!

ঠাকুমা আর একটা সুযোগ পেলেন। কড়া গলায় বললেন, 'তো মানুষ যদি সাবধানের কথা কানে না নিয়ে আগুনে হাত দিতে যায়, হাত পুড়বে না? আমি তো তখনই বুঝেছি আজ একটা অঘটন হবেই। তবু ভাগ্যি যে আরও বেশি কিছু হয়নি। তো ছেলেগুলো তোমার চেনা বউমা?'

এবারও বউমাকে রক্ষা করল ওই ফ্রক পরা পাকাচোকা খুকিটা।

—শোনো কথা। মামিমা-র আবার চেনা হবে কোত্থেকে? বললই তো আমরা রাস্তার ছেলে।

—তুই থাম তো!

পিসিমা ঝংকার দিয়ে উঠলেন। —সব কথায় সর্দারি। বলি চেনাজানা না হলে এত যত্ন করে এনে পৌঁছে দেয়? এতক্ষণ থাকে? দরজা থেকেই পৌঁছে দিয়ে খালাস হয়! দোতলায় উঠে এসে—

তোমার যত এঁড়েতক্কো ঠাকুমা। বাড়িতে ব্যাটাছেলে কেউ নাই, কে ডাক্তার ডাকে তার ঠিক নাই, তাই এতটা করেছে। মামাবাবু ঘরে থাকলে করতে আসত না। বলল, রাস্তার ছেলে। ভালো ভদ্দর লোকের ঘরের ছেলেদের মতনই দেখতে।

—তুই থামবি?

নীলনলিনী চড়া গলায় বলেন, 'যা, দুধটা আবার ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ গে যা। শয়তানের হাড়। ঝেঁচকে ডান। বলি মানুষের তুই কী চিনিস রে? দেখতে তো ভদ্দর ঘরের মতন, বলি এখন ওইসব ঘরের ছেলেরাই খুন জখম করছে না? লুঠপাঠ করছে না? ব্যাঙ্ক ডাকাতি করছে না? এই যে তিন-চনটে মস্তান শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে অন্ধি-সন্ধি সব দেখে গেল। কোথায় আলমারি, কোথায় দরাজ দেখে গেল, আর জেনে গেল বাড়িতে ব্যাটাছেলে নেই, থাকবার মধ্যে ক-টা অবলা মেয়েমানুষ, তার পরিণামে কী হবে কেউ বলতে পারবে?...এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে সঙের মতন? যা দুধটা রেখে গে যা।'

—যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। দুধটা তোমায় কামড়াচ্ছে? সাধে বলছি এঁড়েতক্ক। ওনারা ভালো করতে এল আর তুমি ওদের খুনে গুন্ডা চোর ডাকাত বানাচ্ছ। ওরা যদি মন্দই হবে, তো তোমার বউকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি খরচ করে হাসপাতাল থেকে ডাক্তার দেখিয়ে আবার ট্যাক্সি খরচ করে পৌঁছে দিয়ে গেল কেন? অ্যাঁ?

—আ মরণ ছুঁড়ির!

হঠাৎ সুর ফেরতা করে একটু রসের হাসি হেসে নীলনলিনী বলে ওঠেন, ওদের মধ্যে কোনো ছোঁড়ার প্রেমে পড়ে গেলি না কি? বলি সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি চেনাজানা কি না। আজকালকার দিনে অপরের জন্যে কে এত করে? তো বউমা, ওমা! ঘুমিয়ে পড়লে না কি? এই তো কথা বললে?

বউমা। অ বউমা! শরীর খারাপ লাগছে! এই শ্যামলী তোর মাকে ডাক তো। মুখে-চোখে একটু জল দিক!'

—আঃ।

নীরা তীক্ষ্ণ বিরক্তির গলায় বলে, 'একটু শান্তিতে ঘুমোতে দিন! ঘুমের ওষুধ দিয়েছে।'

—ঘুমের ওষুধ।

—অ! তাই বুঝি? তা কেমন করে জানব বাছা। বিরু আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বিদেশ গেল! একটুতেই হাঁকপাঁক করে মরি। বাছা আমার বলে, পিসিমা, তুমি আছ তাই আমার এই চাকরি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। ওর মান্যে ভক্তিতেই এ সংসারে টিকে আছি। যাই।

বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'এই শ্যামলী, তুই এই ঘরের মেজেতেই শুয়ে পড় ভেতর থেকে দোর দিয়ে। আমিই শুতাম! তো তোর মামির অস্বস্তি হবে কি না—'

আর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে যান।

ডাক্তার চৌধুরী বিরামের বন্ধুস্থানীয়ও বটে, এবং একটু রসিকও বটে।

দেখেশুনে বলেন, 'এক্স-রে একটা করে নেওয়া যেতে পারে। তবে মনে হচ্ছে না-করলেও চলত। যাক মিস্টার চ্যাটার্জি তো আবার বিশেষ খুঁতখুঁতে। তবে দুটি সপ্তাহের মতো এখন নট-নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।'

—দু-সপ্তাহ।

নীরা চমকে বলে, 'হাড় না ভাঙলেও?'

—দেখুন পায়ের পাতায় লাগা বড়ো খারাপ ব্যাপার! সহজে ব্যথা যায় না।

নীরা খুব কাতরভাবে বলে, 'দেখুন তো শুধু শুধু কী বিপদ।'

ডাক্তার তাঁর প্রেসার মাপার যন্ত্রটি গুটিয়ে বাক্সয় ভরতে ভরতে একটু হেসে বলেন, 'এই জন্যেই সেকালে মেয়েদের হারেমে ভরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের পথে বেরোলেই পদে পদে বিপদ। কর্তার ফিরতে তো দশ দিন? তাই না? এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যেতে পাবেন না এই যা দুঃখ।'

—সেই দুঃখে তো মরে গেলাম।

নীরাও হাসে।

তারপর বলে, 'পায়ে লাগাটা সত্যিই বড়ো বেশি বিপদ। বরং যদি হাতে লাগত, ভালো ছিল!'

—চমৎকার! তখন মনে হত হাতটাই সব থেকে দামি।

—না না। পা জখম হলে বড়ো পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে হয়!

—তা অবশ্য!

চৌধুরী হাসেন। —ভালো থাকবেন। ওষুধপত্র ঠিকমতো খাবেন। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করবেন।

—শুয়ে শুয়ে আবার ভালো করে খাওয়া।

—আহা, শুয়ে কেন? বসছেন তো। টেবিলটা কাছে নেবেন। মনের আনন্দে সারাদিন শুয়ে শুয়ে বই পড়বেন। আমাকে একবার একটা ছোটোখাটো অপারেশনের জন্যে কয়েকটা দিন নার্সিং হোমে থাকতে হয়েছিল, দু-চার বছরের মতো পড়ে ফেলেছিলাম তার মধ্যে!

—আপনার সঙ্গে আমার তুলনা? আমার কি আপনার মতো সময়ের অভাব?

ডাক্তার উঠলেন।

আর ডাক্তার তখন গতকালকের সেই প্রসঙ্গে বললেন, 'এটা সত্যি যেসব ছেলেদের আমরা বাজেমার্কা হলে বলে অবজ্ঞা করি, অনেকসময় দেখা যায়, তারাই কাজের ছেলে। আসলে কাজের শক্তির অপচয় ঘটে চলেছে দিনের পর দিন, কাজ নেই কাজের পরিবেশ নেই, তাই অকাজ করে বেড়ায়।'

নীরা ভাবতে লাগল কথাগুলো। আর তারপর ভাবতে লাগল সেই ছেলেরা কি সত্যিই আর আসবে? এরা কী অকাজ করে বেড়ায়?

আচ্ছা ওই অলোকরঞ্জন নামের ছেলেটিকে সত্যিই কি আগে কোথাও দেখেছে? হাসিটা, মুখের মমনীয় ভঙ্গিটি কেমন যেন দেখা দেখা, ছায়া ছায়া মতো।

তারপর ভাবল, কাকলি জানতেও পারল না, তার কাছ থেকে ফেরার পথে নীরার এই দুর্গতি! আজও সে কলকাতাতেই রয়েছে কিন্তু তার বাড়িতে পাওয়া যাবে না। বলেছিল আজকের সারাটা দিন বাপেরবাড়ি থাকবে। ওখানেই দু-বেলা খাওয়া-দাওয়া করবে। সেখানে টেলিফোন নেই।

আর থাকলেই-বা কী। নীরা কি উঠে গিয়ে ফোন করতে পারত? পা-টাকে এমনভাবে বেঁধেছেঁদে দিয়েছে!

দূর বাবা! এর থেকে গাড়ি চাপা পড়াও ছিল ভালো। লোকের কাছে বলবার মতো কিছু থাকত। এ কী!

একটা লোক জুতোসুদ্ধু পায়ে নীরার সুন্দর পা-টা মাড়িয়ে থেঁতলে দিল! ছিঃ! তুচ্ছ কারণে কী নিরুপায়তা! এখন কী করে কুণালকে চিঠি দিয়ে জানাবে, কুণাল আর নয়।

আর কী করেই-বা ওই চিঠির বোঝা তার কাছেই ফেরত পাঠাবে নীরা? মাথার বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রাখবে কতদিনই-বা?

কখন কোন সময় দয়া করে বিছানা ঝাড়তে আসবেন ওরা!

তবু ঈশ্বর রক্ষা করেছেন যে বিরাম এখন উপস্থিত নেই!

বালিশের তলায় হাত চালিয়ে সেই ব্রাউন খামটাকে অনুভব করল। বড়ো মমতার সঙ্গে! একটা বোকা ছেলের পাগলামির উচ্ছ্বাস।

কিন্তু এখন কি কুণাল সেই বোকা ছেলেটা আছে? এখন তো রীতিমতো কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঁচু পোস্টে গিয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে চিঠির মধ্যে পাসপোর্ট সাইজের ফটো পাঠায়!

সাগরতীরে আমি।...পাহাড়চূড়ায় আমি। ঘরের মধ্যে আমি।

নীরা কি সেই ছবিগুলোও ফেরত দেবে? নীরা কি সত্যিই একটা পাষাণী?

ডাক্তার চৌধুরী বলে গেলেন শুয়ে শুয়ে বই পড়ে কাটিয়ে দিন ক-টা দিন।

নীরা কি ওই চিঠিগুলোকেই খুলে খুলে আবার পড়বে? সবসময়ই তো পড়েছে কাকলির বাড়িতে বসে। নীরা যখন চিঠি বের করে পড়ে তখন ও বলেছে, 'নে তুই ততক্ষণ তোর পাগলা প্রেমিকের চিঠি পড়, আমি তোর চা নিয়ে আসি।'

সে-পড়ায় কি সুখ আছে?

একেই তো ওই বেপরোয়া প্রেমপত্র ভেতরে একটা অপরাধবোধ, অস্বস্তি জাগায়। তার মনে আবার একটা করুণ মমতা এইসব চিঠি, উত্তর দেয় না নীরা!

নীরার জীবনটা কী অদ্ভুত!

চিঠিগুলো বার করে খুলে পড়বে কখন? কোন সময়? স্নেহময়ী পিসিমা তো সর্বদা নজরবন্দি করে রেখেছেন। ডাক্তার চলে গেলেই এসে হাজির হন।

ডাক্তারের সঙ্গে এত হাসির কথা কী হচ্ছিল বউমা? ছেলেটি খুব রগুড়ে, তাই না?

কোন সময় টুক করে ঘরে ঢুকে এসে হয়তো বললেন, এত সব বিলিতি চিঠি কোথা থেকে এল বউমা? বিরুর অফিসের? তা নয়? তোমার? ওমা তোমার আবার বিলেতে কে আছে গো?

নীলনলিনীর অভিধানে বিদেশ মানেই বিলেত!

সে যাক! এখন আবার রাতেও একা হবার জো নেই! ওই পাগলটা ঘরে থাকে।

থাকতে হবে না বলবার উপায় তো নেই।

উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করবে, এবং আবার সকালে দরজা খুলে দেবে এমন ক্ষমতা তো নেই নীরার।

তা ছাড়া রাত্রেও তো কিছু সাহায্য লাগে!

সকালে ডাক্তারবাবুপ্রেরিত এক জন আয়া আসে। সে চানটান সব কিছু করিয়ে যায়।

কতদিন এই যন্ত্রণা কপালে আছে কে জানে।

যে লোকটা মাড়িয়ে দিয়েছিল, সে খুব প্রহার খেয়েছে শুনে প্রথমটা মায়া হয়েছিল নীরার, এখন আর হচ্ছে না। চিঠিগুলো সম্পর্কে যা কিছু করার বিরাম আসার আগেই করতে হবে। দেখতে দেখতে তো তিন-তিনটে দিন পারও হয়ে গেল।

নীরার কী দুর্ভাগ্য! একটা ভাই নেই তার। একটা বোনও না। আপন বলতে শুধু মা আর বাবা। তাঁদের কাছে আর কোনো সাহায্য পাবে নীরা?

কাকলি যে নীরার কতটা ছিল, এখন বেশি করে বুঝতে পারছে।

সকালে চা খাওয়ার পর ব্যান্ডেজ বাঁধা পা-টা ছড়িয়ে বসে কোমর থেকে হালকা একটা চাদর চাপা দিয়ে খবরের কাগজখানা পড়ছিল নীরা। শ্যামলী হাঁপাতে হাঁপাতে, —মামিমা গো, সেদিনের সেই ছেলেগুলোর মধ্যে এক জনা এয়েছে। এই লেখাটুকু দিল তোমায় দেখাতে।

—লেখা আবার কীসের?

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিল নীরা।

একটা স্লিপে লেখা—শ্রদ্ধেয়া! এসময় এসে আপনাকে অসুবিধেয় ফেলা হল কি? বলেন তো পরেও আসতে পারি।

প্রণত

অলোকরঞ্জন।

বাঃ! হাতের লেখাটি তো বেশ সুন্দর! ভাষাও সভ্য।

তাড়াতাড়ি বলল, 'যা যা ডেকে নিয়ে আয়।'

সিঁড়ির মুখে গ্রেপ্তার হল মেয়েটা।

—অমন হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে গেলি, আবার হাঁপাতে হাঁপাতে এলি, যাচ্ছিস কোথায়?

গ্রেপ্তার তো স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে। অতএব শ্যামলী ঠাকুমার এই প্রশ্নকে নস্যাৎ করে দিয়ে ছুটে রাস্তার দরজার দিকে চলে গেল, ঘুরে এসে বলছি, বলে।

—একা যে?

'তুমি আপনি' বাঁচিয়ে প্রশ্ন করল নীরা, 'আর দু-জন? চা খেতে আসতে বলেছিলাম!'

—ওরা? এল না।

হাসল অলোক।

—কেন? আপত্তিটা কীসের?

—এমনি কিছু না। বলল, 'দূর চা খেতে আবার যাব কী? তুই খবরটা জেনে আয়।'

আবার একটু হাসল অলোক।

বলল, 'আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম আসব। তা ছাড়া অন্য একটা কৌতূহলও ছিল। সে যাক, আছেন কেমন বলুন?'

—ভালোই। দাঁড়িয়েই থাকা হবে? এই তো সামনেই চেয়ার।

একটু আগে ডাক্তার চৌধুরী তাঁর ডিউটি পালন করতে ঘুরে গেছেন। তার জন্যেই বিছানার ধারে চেয়ার।

অলোক একটু কুণ্ঠিত হয়ে চেয়ারটাকে কিঞ্চিৎ পিছিয়ে নিয়ে বলল, 'এক্স-রে রিপোর্ট কী বলে?'

—লিখিত রিপোর্ট এখন মেলেনি। এমনি তো বলল, খুচখাচ কিছু ভাঙেনি। তবে ব্যথা সহজে যাবে না!

হেসে উঠল। —অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বলুন? রাস্তার লোক জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে এটা কপালে ছিল।

আপনি এইসব কপালের লেখাটেখা মানেন?

—না মেনে উপায় আছে? অদৃশ্য অদৃষ্ট মানিয়ে ছাড়ে। যাক, কী যেন কৌতূহলের কথা ছিল?

—সে একটা মজা।

অলোক বলল, 'আগে বলুন তো আপনি কখনো বেলতলা স্কুলের ছাত্রী ছিলেন?'

—ওমা! কখনো আবার কী? ওইখানেই তো বরাবর। ওখান থেকেই স্কুল-ফাইন্যাল পাস করে—কেন কী ব্যাপার?

বলব। —আচ্ছা, অলকানন্দা নন্দী নামে কোনো সহপাঠিনী ছিল আপনার?

—অলকানন্দা নন্দী? আরে ছিল না আবার? ভীষণ ভালো মেয়ে! কেন চেনা বুঝি?

—তা একটু চেনা। তাহলে ঠিকই ধরেছি। আমাদের বাড়িতে আপনার ফটো আছে।

নীরা এখন আর 'তুমি' 'আপনির' দোলাচলে না থেকে অবাক হয়ে বলে, 'তোমাদের বাড়িতে আমার ফটো?'

—না মানে, ঠিক আপনার একার ফটো নয়। গ্রুপফটোর মধ্যে। স্কুল থেকে কোনোসময় ডায়মন্ডহারবারে পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই একবার জন্মের মধ্যে কর্ম! তখন বোধ হয় ক্লাশ নাইনে পড়ি! সেখানে ছবি তুলেছিল। সে-ছবি তোমাদের বাড়িতে আছে? কী আশ্চর্য! অলকানন্দা তোমার চেনা? মানে কেউ হয়?

আমার পিসিমা হন।

—অ্যাঁ। সত্যি! কীরকম পিসিমা?

অলোক হেসে ওঠে।

বলে, 'রকমফের কিছু নেই। বাবার বোন।'

তারপর বলে, 'প্রথম দিনই আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে। তারপর ডাক্তারকে খবর দেবার সময় নামটা জেনে গেলাম, বাড়ি গিয়ে ফটোটা দেয়াল থেকে নামিয়ে দেখলাম ঠিকই। তলায় তলায় সব নাম লেখা। তখন বোধ হয় নীরা গাঙ্গুলি?'

নীরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাত বাড়িয়ে অলোকের কাঁধটা ছুঁয়ে বলে, 'কী আশ্চর্য! আর কী মজা! অলকানন্দা তোমার নিজের পিসিমা! তুমি ওর ভাইপো? আর আমি বোকার মতো 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে মরছি! তাহলে তো আমিও তোমার পিসিমা অ্যাঁ? কী বলো?

অলোক একটু হাসল।

নীরা এখন ভীষণ উদ্‌বেলিত।

বলল, 'ওটা তো আমার ক্লাশ নাইনের সময়ের ছবি। চিনতে পারলে কী করে?'

অলোক বলল, 'খুব বেশি বদলাননি তো। শাড়িটাড়ি পরা চেহারা—'

—হ্যাঁ আমাদের আসলে ইস্কুলের ওই নিয়ম ছিল। ক্লাশ নাইনে উঠলেই শাড়ি। এখন কী হয়েছে জানি না। সে যাক গে তুমি তাহলে সেই বাড়িটির ছেলে? যার লোহার গেটে স্বস্তিক চিহ্নমতো ডিজাইন ছিল। উঃ কী ভালো যে লাগছে! আর বলা হচ্ছিল আমি রাস্তার ছেলে। তুমি একটি ডেঞ্জারাস ছেলে। আচ্ছা গেটটা এখনও আছে?

—তা আছে।

—অলকানন্দার দাদাই তাহলে তোমার বাবা? দাদাকে ভীষণ ভালোবাসত অলকানন্দা। আবার ভয়ও করত খুব। ভারি সরল ছিল। অনেকসময় চুপচাপ থাকত। আর আমরা খ্যাপাতাম, অলকানন্দা নন্দী! আঁটছে কীসের ফন্দি?...করব তোমায় বন্দি। ঘুচবে অভিসন্ধি।...ওঃ কী খেপেই যে যেত!

অলোক বলল, 'এখনও প্রায় তেমনিই আছে। পিসেও হয়েছে তেমনি। কেবল খ্যাপাতে ওস্তাদ!'

পিসে।

ওঃ। তাও তো বটে।

নীরা ভাবে, আমি ভাবছি যেন সেই মেয়েটাই আছে।

বলল, 'তা ভালো। স্কুল ছাড়ার পর আর দেখা হয়নি। কোথায় বিয়ে হয়েছে?'

—বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে অবশ্য বর্ধমানে। তবে থাকে বাইরে।

—বাইরে? মানে বিদেশে?

—হ্যাঁ। বোস্টনে। পিসে ওখানেই পোস্টেড।

বোস্টন।

শব্দটা শোনামাত্র নীরার সারা শরীরে দুরন্ত একটা আলোড়ন ওঠে। রক্তের মধ্যে যেন দামামা বাজতে থাকে।

বোস্টন। অলকানন্দা নামের সেই আলাভোলা প্রায় শ্যামলারঙা মেয়েটা এত জিতে গেছে ক্লাশের মধ্যে সবথেকে সুন্দরী মেয়েটার থেকে?

পিসে খ্যাপাতে ওস্তাদ।

নীরা কি তার একদার সহপাঠিনীকে হিংসে করবে? ভাবতে বসবে সেই অতি সাধারণ মেয়েটা কি না স্বর্গোদ্যানের ধারে বাসা বেঁধেছে। কেন? কোন গুণে? কয়েক মুহূর্তের জন্যেই এই দুর্বলতা। নিজের মনের এই নীচতায় মনে মনে ভারি লজ্জা পেল।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা সব শুনব। এক্ষুনি তোমায় ছাড়ছি না। এখন বলি, তাই তোমায় দেখেও আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি। আসলে তোমার মুখের আদলে তোমার পিসির ছাপ আছে।

অলোক হেসে ফেলে।

বলে, 'অনেকে বলে বটে। মানে পিসি আর তার দাদার মতো। আর আমি বাবার মতো।

হেসে উঠল দু-জনে।

তারপর নীরা গলা ছেড়ে ডাক দিল, 'এই শ্যামলী। কী হল? চা বানাতে বুড়ো হয়ে গেলি না কি?'

অলোক বলল, 'ইস! আবার আপনি ওই নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন। থাক-না।'

নীরা যেন তার স্কুল জীবনে ফিরে গেছে। তাই ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে বলে, 'আহা, তা আর নয়? কী বলেছি, মনে আছে তো? আইনত আমিও তোমার পিসিমা। আর জানো তো—

একটু গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'পিসিমাই হচ্ছে সংসারে সবথেকে আপনজন। তার মানে তুমি আমার নিজের দিকের লোক।'

কথাটা নিজের মধ্যেই শ্লেষের সুর আনে।

নীরা তো নিশ্চিত যে ধারেকাছে কান পাতা আছে।

তাই এমনিই বেশ গলা খুলেই কথা বলছে। শুধু ওই কথাটা গলা নামিয়ে।

এবাড়িতে পিসিই যে সবথেকে আপনজন আর ভাইপোই যে সবথেকে নিজের লোক সেটি তো নীরা হাড়ে হাড়ে জানছে।

শ্যামলী যখন অলোকরঞ্জনকে পৌঁছে দিয়ে গেছল তখনই নীরা অলক্ষ্যে জানিয়ে দিয়েছিল চা বানাতে, আর বেশ ভালোমতো জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। এতে এখন সে রপ্ত। কারণ বিরামের বন্ধুজন বা আত্মজন কেউ এলে বিরাম তাদের বেশ রাজকীয় অভ্যর্থনা না দেখলে ক্ষুণ্ণ হয়।

নীলনলিনী অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে ঝংকার দেয়, 'যে আসবে তাকেই থালাভরতি খাবার দিতে হবে?'

বিরাম তো আর পিসির ওপর রাগ দেখাতে পারে না। শুধু বলে, 'আহা! ওরা কি রোজ আসে?'

অলোকরঞ্জন চমকে উঠে বলল, এই একথালা খাবার। অসম্ভব। অর্ধেক তুলে নিতে বলুন।

শ্যামলী হি-হি করে হেসে বলে, 'তা আর না। মামিমা যে তুলতে দেবে! এখন বাপেরবাড়ির লোক পেয়েছে। সব খেতে হবে।'

বাপেরবাড়ির লোক পেয়েছে।

অতএব বুঝতে অসুবিধে হয় না কথোপকথনের সবটাই অপরের কর্ণগোচর হয়েছে।

উঃ। এইভাবে টিকে থাকতে পারে মানুষ!

—ছ-টা ইয়া বড়ো মিষ্টি। আপনি খেতে পারেন?

—আমি পারব মানে? মেয়েরা মিষ্টি খায়? মিষ্টির দোকান বড়োলোক হয় স্রেফ ছেলেদের জন্যে।

অনেক দিন নীরা এমন সহজভাবে প্রাণ খুলে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। সত্যিই যেন মনে হচ্ছে, এই ছেলেটা তার নিজের দিকের লোক।

এ অনুভূতি কি শুধু বাল্য কৈশোরের স্মৃতির ঢেউ এসে লাগায়? না সেই একটি তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ নীরাকে এদের সঙ্গে একাত্ম করতে চায়?

—এবার বলো তোমার পিসির কথা। কতদিন আছে ওখানে?

বছর চারেক। এর মধ্যে এক বারও আসতে পায়নি। একবার বাবার ছোটো মাসি চলে গিয়েছিল ওর কাছে। একটু লজ্জিত হাসি হাসল, 'পিসির বাচ্চা হল একটা।'

—ওমা! তাই নাকি? ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে।

—বাঃ। কী সুন্দর!

আবার মনে হল সেই বোকা আর শ্যামলী মেয়েটা নীরার থেকে জিতে গেছে।

আবার লজ্জা পেল।

তারপর প্রশ্ন আর প্রশ্নোত্তরের স্রোত!

—না আসতে পেলে কী হবে, দারুণভাবে বাঙালি থাকতে চায় পিসি। শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরবে না! যে যখন ওখানে যায় তার সঙ্গে পিসিকে শুক্ত রান্নার মশলা পাঠাতে হয়, ডালের বড়ি পাঠাতে হয়। আর নারকেলের নাড়ু!

—হ্যাঁ পুজোর সময় আবার বাংলা শাড়ি না হলে চলবে না। কী সব টাঙাইল, ঢাকাই, ধনেখালি চলল পার্সেলে!

নীরা শুনে যাচ্ছে। তবু কথাগুলো নীরার কান থেকে মন পর্যন্ত কি পৌঁছোচ্ছে?

নীরার মনের মধ্যে এই ক-টি প্রশ্ন কেবলই ঠেলা মারছে, আচ্ছা এই ঠিকানাটা কি অলকানন্দার কাছাকাছি?....আচ্ছা আমায় একটা এয়ারোগ্রাম এনে দিতে পারে না? আর চিঠিটা লেখা হলে পোস্ট করে দিতে?

সেই পাগলটাকে তো তাড়াতাড়ি একটা বাঁধ দিতে হবে? নইলে আবার যদি কাকলির ঠিকানায় চিঠি চলে আসে নীরার! আর কাকলির ননদ-নন্দাইয়ের হাতে পড়ে!

তা ছাড়া কুণালকে ফেরত দেবার চিঠিগুলো? রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠিয়ে দিতে পারে না তার ঠিকানায়!

না-পারবার কী আছে?

শাড়ি পাঠায় যখন। আর বলল তো ও-ই পাঠায়-টাঠায়।

কথা বলে যাচ্ছে, কথা শুনে যাচ্ছে, অথচ মনের মধ্যে ড্রাম পিটে চলেছে।...

আচ্ছা মাত্র দুটো দিন তো দেখলাম ছেলেটাকে! ওর হাতে বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া যায় কুণালের ওই পাগলামির সম্ভার?

ও কি ভয়ানক কৌতূহলের বশে খুলে পড়বে? ও কি সত্যি রাস্তার ছেলের মতো অতঃপর সেই চিঠিগুলো নিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে নীরাকে?

ছি ছি! তাই কি সম্ভব?

এমন ভদ্র মার্জিত একটি ছেলে!

ওর পরিচয়ও তো পরিষ্কার।

কিন্তু সত্যিই কি পুরোপুরি পরিষ্কার?

তবে কেন প্রথম দিন নিজেদের মস্তান বলে ব্যঙ্গ করেছিল?

ব্যঙ্গটা কি তাহলে সমাজকে? এই বয়েসের বেকার ছেলেদের সমাজ সন্দেহের চোখে দেখে বলে?

ওকে আমি বিশ্বাস করব?

যা কিছু করার সেটা তো বিরাম এসে পড়ার আগেই করে ফেলতে হবে। বিরাম আসার পর তো আর বাল্যপ্রণয়ীর প্রেমপত্রের বস্তা মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়ে ঘুমোনো চলবে না।

অন্তঃস্তলে প্রবহমান এই দুশ্চিন্তার ধারাকে সংহত রেখে কথা চালিয়ে যায় নীরা! আর শেষপর্যন্ত হঠাৎই বলে ফেলে, 'আচ্ছা অলোক আমি যদি তোমায় একটা কাজের ভার দিই, ব্যাজার হবে না তো?'

অলোক চোখ তুলে বলে 'আপনি এমন কোনো কাজ আমায় দিতে পারেন, যা ব্যাজার হবার মতো? না, ব্যাজার হব না। গ্যারান্টি দিচ্ছি। কই বলুন কী কাজ?'

—আজ নয়!

নীরা বলে, 'কাল দেব। একটু গুছিয়ে নিতে হবে। কাল আর একবার আসতে পারবে না?'

—আপনি যদি হুকুম করেন, রোজ আসতে পারি। দু-বেলাও পারি।

নীরা একটু সন্দিগ্ধ হয়। তবু একটু হেসে ফেলে বলে, 'কেন বল তো?'

—বাঃ! একটু আগে বললেন-না আপনি আমার পিসিমা হন!

মনের মধ্যেকার সমস্ত কুয়াশার বাষ্প কেটে যায়।

ঝলমলে সূর্য ওঠে।

শ্যামলী যখন সেদিনের সেই ছেলেগুলোর একজনকে সঙ্গে করে দোতলায় নীরার কাছে তুলে দিয়ে এল, তখনই নীলনলিনী তাঁর প্রিয় সখী শ্যামলীর মা-র কাছে চুপি চুপি সন্দেহ ব্যক্ত করেন, 'এ ছোঁড়া আবার আজ এল কেন বলো তো শ্যামলীর মা? এইটাই না সেদিন আবার ঘুরে এসে রাত অবধি ঘরে ঘুর ঘুর করে গেল। আলমারি দেরাজ কোথায় কী সব দেখে গেল। বাড়িতে ব্যাটাছেলে নেই তাও দেখে গেল। বললুম তো তোকে সেদিন? আবার দ্যাখ আজ আবার এসে উদয় হয়েছে। কী মতলবে বল তুই?'

শ্যামলীর মা বলল, 'কী জানি পিসিমা তাইতো ভাবছি। আবার শ্যামলী বলে গেল বউদির অর্ডার হয়েছে জম্পেস করে জলখাবারের জোগাড় করতে!'

—চমৎকার! তারপর তিনি যদি একখানা ছোরা বার করে বুকের সামনে উঁচিয়ে ধরে বলেন, কোথায় কী আছে বলে দাও—। তখন?

তারপরই চঞ্চল হয়ে বলেন, 'তুই জলখাবার গোছা, আমি চললুম দেখতে কী বিজ্ঞপ্তি!'

—আড়ি পাতা দেখলে যে আবার বউদিদির গোঁসা হয় গো পিসিমা।

—মরণ! দেখবে কোথা থেকে? ওঠা-হাঁটা করতে পারছে? পাশের ঘরে থাকি গে!

একটু নিশ্বাস ফেলেন।

—বিরু আমায় সব দায়দায়িত্ব দিয়ে গেছে। যদি একটা অঘটন হয়, আমায় কী বলবে? এই ছোঁড়াকে দেখে অবধি-ই মনে নিচ্ছে যেন কিছু একটা ঘটবে। ...কী হল? ফ্রিজের থেকে সব মিষ্টিগুলো বার করলি? আবার নিমকির ময়দা মাখতে বসলি? মর! খোসামোদ করে মর বউদিদির!

গটগট করে চলে গিয়েছিলেন তখন দোতলায়।

ছোঁড়াটা চলে যেতেই আবার নেমে এলেন নীলনলিনী।

কটা কটা চোখ দুটি ঠিকরে বললেন, 'সেদিন শুধিয়েছিলুম আগের চেনাজানা? তো গিন্নির কী রাগ! এখন দ্যাখ গে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ল কি না। এখন সম্পর্ক বেরোল পিসি-ভাইপো। পিসির সঙ্গে এক স্কুলে পড়া। কত আদিখ্যেতা, কত গালগল্প, কত হাসাহাসি, আড্ডা আর ফুরোয় না!...আমার বিরু বাড়ি নেই, তাই যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। হলেও বা বয়েসে ছোটো তুই একটা সুন্দরী যুবতী বাঁজা মেয়েমানুষ, আর ও একটা তাজা জোয়ান ছোঁড়া! একা ঘরে এতক্ষণ কীসের এত আড্ডা গল্প? অ্যাঁ? খতাপটি কেমন বোঝ এখন! ডাক্তার এল তো তার সঙ্গে হাসি আড্ডা! শুধু যত গোমড়া মুখ সোয়ামির কাছে। ওই যে একটু পিসি পিসি করে তাতেই হিংসেয় মরেন। বেশি রূপসি ভালো নয় বুঝলি শ্যামলীর মা! আমাদের মতন খ্যাঁদা বোঁচাই ভালো। সেই কোনো কালে বিয়ের বছর না-ঘুরতেই বিধবা হয়েছি। কেউ কোনোদিন একটা কথা বলতে পেরেছে? দাদা মাথার মণি করে রেখেছিল, এখন ভাইপোও তাই। অকালে মা গেছেন, পিসিকেই মা বলে জানে। এসব বুঝবে বউ?

তারপর আরও কিছুক্ষণ নানা প্রসঙ্গের পর বলেন, 'কাল আবার আসতে বলা হয়েছে। কালকে আবার রাজসূয়ো আয়োজন করিস।'

কিন্তু নীরা এত কথা জানছে না। শুনতেও পাচ্ছে না, ভাবছেও না। নীরা শুধু তার বিপদের বোঝা, চিঠির বোঝাগুলো থেকে একটি একটি বারে করে দেখছে। আর ঘরে কেউ এসে পড়লেই তাড়াতাড়ি চাপা দিচ্ছে।

খুবই আঘাত পাবে কুণাল।

কিন্তু আর কী করার আছে নীরার?

শুধু কি প্রাণ ধরে নষ্ট করতে পারবে না বলেই? নষ্ট করবার পরিস্থিতিই-বা কই?

ছিঁড়ে ছিঁড়ে স্তূপাকার করলেও ফেলতে দেবে কাকে? সেই নিয়েই তো হইচই পড়ে যাবে। হয়তো সেই ছেঁড়া টুকরোগুলোই নীলনলিনীর সংগ্রহশালায় উঠে যাবে।

বিরামের কাছ থেকে কখনো একটা চিঠি এলেও পিসিমা একগাল হেসে বলেন, 'কী লিখেছে গো বিরু? পড়ো তো একটু শুনি।'

নীরা অগ্রাহ্যের গলায় বলে, শোনবার আর কী আছে? আপনার কাছেও তো চিঠি এসেছে।'

তা এসেছে। সে তো সেই ক-দিন আগে পোস্ট কার্ডে। কুণালের চিঠির শেষ পরিণতি হতে পারত মোমবাতি জ্বেলে তার ওপর একটি একটি করে ধরা। পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত খানিকটা মূঢ়তা। ...কিন্তু নীরার ভাগ্যে সেই নিভৃতিই-বা এখন কোথায়?

নীরা কি ছাদে চলে যেতে পারবে?

নীরা কি বাথরুমের মধ্যে দরজা বন্ধ করে অতক্ষণ থাকতে পারবে? নীরাকে নীরার ভাগ্য ঠিক এই সময়ই কী জব্দটাই করল। পরদিন সকালেই অলোকরঞ্জন এল। হাস্যবদনে বলল, 'কই বলুন কী কাজ?'

তারপর জানাল দিন তিন-চার ও কলকাতায় থাকবে না। ওদের একটা দল মেদিনীপুরের দিকে রিলিফের কাজে যাচ্ছে, অলোকও তার সঙ্গী হচ্ছে।

তার মানে আর ভাবনাচিন্তার সময় নেই। ও ফিরে আসতে আসতে বিরাম এসে যাবে।

যা থাকে কপালে।

এমন বিশ্বস্ত মুখ, এমন নির্মল দৃষ্টি কখনোই বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করবে না।

কিন্তু কথাগুলো বুঝিয়ে বলার উপায় কোথা?

পাশের ঘরেই তো জোড়া দুই কান উৎকর্ণ হয়ে আছে। নীরা ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে নীরবতার ইশারা করে বিছানার ধারে রাখা নিজের চিঠির প্যাডটা আর কলমটা টেনে নিয়ে দ্রুত হাতে লিখল—

অলোক, বাড়ির কারুকে না জানিয়ে একদম অজ্ঞাতসারে এই কাজটি তোমায় দিচ্ছি। নীচের ঠিকানায় এই প্যাকেটটা রেজিস্ট্রি পোস্টে যথাযথভাবে ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেবে। এইসঙ্গে সাদা খামে একটা চিঠিও রইল। কে এখন আমায় বিদেশি ডাকের লেফাফা এনে দেবে? সঙ্গে কিছু টাকা রইল। আরও লাগলে পরে দিয়ে দেব। আশা করি আমার বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছ।

এই বিশেষ কাজটি তোমাকেই দিলাম। মনে আছে তো আমি তোমার নিজের লোক, পিসিমা?

নীরা যখন—

এলোমেলোভাবে দ্রুত হাতে এই লেখাটা লিখছিল, তখন অলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল নীরার উদ্‌বিগ্ন ত্রস্ত অস্থির মুখ-চোখ।

দেখছিল আর ভাবছিল আমরা বাইরে থেকে যাকে যা ভাবি তার সঙ্গে তার প্রকৃত অবস্থার কত তফাত।

এঁকে দেখে মনে হয়েছিল কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুন্দর জীবন। এখন দেখছি দেখাটা কী ভুল।

নীরা বালিশের তলা থেকে সেই আষ্টেপৃষ্টে সুতো বাঁধা ব্রাউন পেপারের মোটা খামটা টেনে বার করল। খুব সন্তর্পণে অলোকের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল, সেইসঙ্গে এইমাত্র লেখা কাগজটাও।

আর একবার নীরবতার ইশারা করে।

কাগজটায় এক বার চোখ বুলিয়ে নেয় অলোক। নির্বাক চোখে তাকায় নীরার দিকে।

নীরা কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে হতাশার ভাব করে। কাগজটা আস্তে নীরাকে ফেরত দেয়।

হাতের কাছেই ব্যাগটা রয়েগেছে সেদিন থেকে। সেটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে থেকে বার করে নেয় একমুঠো নোট, দশ টাকার পাঁচ টাকার পঞ্চাশ টাকার যা হাতে উঠে আসে।

কুণালের ঠিকানা লেখা কাগজটায় মুড়ে এগিয়ে দেয় অলোকের দিকে।

অলোক অস্ফুটে বলে ওঠে, 'কী আশ্চর্য! বোস্টন! পিসির বাড়ির কাছাকাছি।'

এই প্রশ্নটাই তো নীরাকে উত্তাল করছিল। অলকানন্দার ভাইপোর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াটাকে সে ভাগ্যের একটি আশীর্বাদের মতো মনে করছিল। কিন্তু এখন ঠিক সেই অনুক্ত প্রশ্নটির প্রত্যাশিত উত্তরটিই পেয়ে সমস্ত স্নায়ু-শিরা আলোড়িত হয়ে উত্তপ্ত এক ঝলক জল উপছে উঠল চোখের কোলে।

কেন? কেন? অলকানন্দা কেন এতখানি সৌভাগ্যের অধিকারিণী হবে!

প্রায় নীরবেই বলল, 'ঠিক আছে। আজই ঠিকমতো ব্যবস্থা করে পোস্ট করবার চেষ্টা করব। না হলে কাল। ফিরে এসে দেখা করব।'

প্যাকেটটা ঠিকানাটা আর টাকাটা অলোক তার নিজের কাঁধের ঝোলায় ভরে নিল। বলল, 'চলি।'

আর সঙ্গে সঙ্গে নীরার মনে হল যেন একটা চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তার যথাসর্বস্ব!

হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল অলোকের হাতটা।

বাতাসে পাতা নড়ার মতো স্বরে বলল, 'অলোক! তোমায় বিশ্বাস করতে পারি?'

অলোক ওই উদ্ভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'পারেন।'

—এর মধ্যে কী আছে জানো?

—জানি না। জানবার চেষ্টাও করব না।

নীরা বোধ হয় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে। তাই ওর হাতটা জোরে চেপে ধরে বলে, 'ঠিক?'

এখন একটু হাসে অলোক। বলে, 'সন্দেহ হলে দেবেন না।'

বার করতে যায় ঝোলা থেকে।

নীরা ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে, 'আমায় মাপ করো বাবা! আমি বড়ো দুঃখী।'

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

নিশ্বাস ফেলে বলে অলোক, 'আচ্ছা আমি ফিরেই দেখা করব। বিশ্বাসে অচল থাকুন।'

চলে গেল।

য়ে পড়ল নীরা দু-হাতে মুখ ঢেকেই।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন শূন্য হয়ে গেল নীরার।

মৃত প্রিয়জনকে নিজের হাতে চিতাশয্যায় তুলে দিলে কি এইরকম শূন্যতা অনুভব হয়?

চিঠিগুলো আর একবার পড়া তো দূরের কথা গুনেও দেখা হয়নি ক-খানা ছিল।

আশি, নব্বই, এক-শো? তার বেশি? অনেক বেশি?

যে বস্তুটাকে অবাস্তব ভেবে এতদিন আমল না দিয়ে দিয়ে সরিয়ে রেখে এসেছে নীরা, ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি, পাগলের পাগলামি বলে শুধু একটু সন্দেহ প্রশ্রয়ের চোখে দেখে এসেছে এবং হঠাৎ এখন পরিস্থিতির বদল ঘটায় সেই প্রশ্রয়ের চিহ্নগুলো পর্যন্ত 'বিপদ' বলে মনে হচ্ছে, সেই বস্তুটাই যে হৃদয়ের এতখানি জায়গা দখল করে রেখেছিল তা তো কোনোদিন বুঝতে পারেনি নীরা। বুঝতে পারেনি একটা 'অবুঝ ভালোবাসা' এতখানি সম্পদ।

সেই ভালোবাসাকে আমি এতদিন হেলায়ফেলায় কাছে রেখে দিয়েছিলাম, আজ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ামাত্রই অনুভব করছি কী মূল্যবান ছিল সে-বস্তু!

এ যেন এক টুকরো সত্যি হিরাকে কাচ ভেবে অবহেলায় ফেলে রেখে দিতে দিতে হঠাৎ ঘর ঝেড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল পথের ওপর ধুলোর মধ্যে সূর্যের আলোয় ঝকমক করে আলোর ছুরি হানছে সে। কিন্তু ফেলে দেওয়া জিনিস আর কী করে কুড়িয়ে আনবে নীরা?

আশ্চর্য। বলেছিলাম বলে কি আজই চলে আসতে হয় ওই ছেলেটার? এসেই তাড়া লাগাতে হয়, অপেক্ষা করার সময় নেই তার, আজই তুলে দাও তার হাতে তোমার যথাসর্বস্ব।

ও যদি না আসত। ও যদি এই ব্যস্ততা না দেখাত।

নীরা যদি ভাববার জন্যে একটু সময় পেত।

এই 'যদি'টাকে নিয়ে পিছু হাঁটতে থাকে নীরা।

যদি নীরার এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা না-ঘটত!

যদি সেদিন কাকলির বাড়ি থেকে একটা ট্যাক্সি করে চলে আসত।

যদি কাকলির বরের বদলির ঘটনা না-ঘটত!

তাহলে?

হে ঈশ্বর। তাহলে তো নীরাকে এমন নিষ্ঠুরের ভূমিকায় নামতে হত না!

তার চিরকালের প্রেমাসক্ত অবুঝ নির্ভেজাল আপন বিশ্বাসে অটল কুণালের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে হত না নীরাকে তার হৃদয় উচ্ছ্বাসের দলিলগুলি।

আমি নিজের নিরাপত্তার কথাই ভাবলাম শুধু!

তার আঘাতের কথা ভাবলাম না।

কতখানি আহত হবে কুণাল নীরার এই নির্মম ঔদাসীন্যে!

নীরার যদি উপায় থাকত ছুটে গিয়ে কেড়ে নিয়ে আসত অলোকের কাছ থেকে তার জীবনের পরমসম্পদের স্মারক সেই প্যাকেটটা!

নীরা জানে না অলোকদের বাড়িতে টেলিফোন আছে কি না! থাকলে কোন নামে আছে। অলোকের বাবার অর্থাৎ অলকানন্দার দাদার নাম কী? কতশত নন্দী আছে শহরে। স্বস্তিক চিহ্নমার্কা লোহার গেট দেওয়া সেই বাড়িটা কোন রাস্তার ওপর? স্কুলের কাছাকাছি ছিল মনে আছে কিন্তু কোন দিকে?

হয়তো নিজে গিয়ে খুঁজে বেড়ালে আবিষ্কার করতে পারত। কিন্তু না, কিছু করার নেই আর এখন নীরার।

উদ্দাম কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো একটা নিরুপায় হাহাকার মাথা খুঁড়তে থাকে নীরার মধ্যে।

নীরার মধ্যে কোথায় ছিল এই অস্থিরতা? কোথায় ঘুমিয়েছিল এই ব্যাকুল চাঞ্চল্য?

নীরা তো তার এই অতি স্বাভাবিক 'বাস্তব' জীবনটাকেই মেনে নিয়ে মোটামুটি একটি সংসারী জীবনের চেহারা গড়ে তুলেছিল!

শুধু মনে হত 'নীলনলিনী' নামের ওই ক্রূর আর বিরক্তিকর প্রাণীটার উপস্থিতি যদি না-থাকত নীরার সেই সংসারে। যদি বিরাম নামের লোকটা সেই অহিতকারী মানুষটাকে পরমহিতকারী মনে করে মাথার মণি করে না-রাখত!

তাহলে নিজেকে তো নীরা মোটামুটি একটি সুখী সংসারী গৃহিণীই ভাবতে পারত! কাকলিরই মতো! আর কুণাল নামের লোকটা?

সেই সহজ সাধারণ জীবনের মধ্যে তার ছায়া ক্রমেই মিলিয়ে যেত!

হঠাৎ কোথা থেকে এল এই উদ্দাম ঝড়?

কিন্তু শেষপর্যন্ত তো ঝড় প্রশমিত হয় প্রবল বর্ষণে!

এজীবনে এত কান্না কি কেঁদেছিল কোনোদিন নীরা?

তবু নীরা কি তখন জেনেছিল 'সর্বস্ব' হারানো সতর্কতাও বৃথা হয়ে যাবে নীরার তুচ্ছতম একটু অসতর্কতায়?

সেই একটুকরো কাগজ! অলোককে উদ্দেশ্য করে এলোমেলো করে লেখা নির্দেশনামাটুকু! নীরার মধ্যেকার ঝড়-বৃষ্টির উত্তালতার অবকাশে সেটাও যে ঘরের ফুলফোর্সে ঘোরা পাখার হাওয়ার ঝড়ে উড়ে গিয়ে কোনো একখানে লুটোপুটি খেয়ে তার শত্রুপক্ষের হাতে গিয়ে পড়বে!

খেয়াল হল অনেক পরে।

যখন শ্যামলী এসে ডাকাডাকি করতে লেগেছে, 'অ মামিমা, অসময়ে এত ঘুমোতে লেগেছ ক্যানো? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একদম চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে যে গো! ....হি-হি-হি ওই বাবুটাও বেরিয়ে গেল আর তুমিও ঘুমোতে লেগে গেলে। ও তোমারে নিদুলি মন্তর দিয়ে গেল না কি?'

অসহ্য এই বাচাল মেয়েটার বাচালতা।

তাকিয়ে দেখে উঠে বসল নীরা!

দেখল খবরের কাগজখানা খাট থেকে পড়ে গিয়ে পাখার জোর হাওয়ায় ঘরের মেঝেয় এলোমেলো হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু সেই কাগজের টুকরোটা।

অলোক ফেরত দেওয়ার পর যেটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলব ভেবে খবরের কাগজের ভাঁজে রেখে দিয়েছিল?

যত বিরক্তই হোক, ওই বাচাল মেয়েটার সঙ্গে কথা কইতেই হবে নীরাকে!

আসলে মেয়েটা হয়তো খুব খারাপ নয়, কিন্তু তাকে গুপ্তচরবৃত্তি ও সংবাদ সংগ্রহকারিণীর কাজে লাগানো হয় বলেই হয়ে উঠেছে ধুরন্ধর। এই কাজটাকে সে তো দোষের ভাবে না, ভাবে মজার। এটা নীরা বুঝতেও পারে। তবু ওকে দেখলেই রাগ ধরে যায়। তা সত্ত্বেও বলল, 'ঘুমিয়ে তোদের কোনো ক্ষতি করেছি?'

—ওমা তা কেন? এখন তো তুমি রান্নাঘরের কাজ-টাজও.কিছু করতে পারছ না যে ঠাকুমা-র খাটুনি বৃদ্ধি। এমনি বলছি--

—কাগজগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে রয়েছে তুলতে পারিসনি?

—এই তো তুলছি গো।

তাড়াতাড়ি কাজটায় হাত লাগায়। আর তখনি নীরা প্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠে বলে, 'এই ওর সঙ্গে একটা লেখা চিঠি ছিল দ্যাখ দ্যাখ।'

কিন্তু কোথায় সে-চিঠি?

দ্রুত হাতে কাদা-খোঁচা করে লেখা সেই নির্দেশনামাটি?

নাঃ। কোথাও নেই। ঘরে না দালানে না উঠোনে না। খুঁজে বার করতে পারলে বখশিস পাবি এ আশ্বাস সত্ত্বেও খুঁজে বার করতে পারল না।

বিরাম যেদিন ফিরল, সেদিন ডাক্তার চৌধুরী নীরাকে বলেছিলেন, 'ইচ্ছে করলে আপনি আজ কর্তাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে যেতেও পারেন। মানে গাড়ি থেকে নাহয় না-নামলেন—

নীরা বলল, 'তেমন ইচ্ছে নেই!'

—পরে যেন কর্তাকে বলবেন না, চৌধুরী যেতে দেয়নি।

—বললেও আপনার পসার কমে যাবে না।

মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ যাই থাকুক বাইরে তো এইভাবেই কথা বলতে হবে।

দিন দুই আগে অলোক এসেছিল। বলে গেছে ওটা ঠিক মতো চলে গেছে।

নীরার মনে হল কেউ যেন কাউকে খবর দিয়ে গেল, যার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, তারও ফাঁসি হয়ে গেছে।

তবু এক ধরনের শান্তিও। বিরাম আসার আগেই মিটেছে।

নীরা বলল, 'ওনাকে রিসিভ করতে তো অফিসের গাড়িই যাবে। সঙ্গে অবশ্যই কেউ-না-কেউ। অন্য অন্য বার যে যাই, সেটা বাড়তি।'

—অর্থাৎ একটু প্লিজ করতে?

—যা বলেন।

—চ্যাটার্জি জানে আপনার এই খবর?

—না, একটা বাইরের লোক তাঁর গিন্নিকে মাড়িয়ে থেঁতলে দিয়ে গেছে, এ খবর তাড়াতাড়ি জানাবার কী আছে?

হা-হা করে হেসে উঠে চলে যান ডাক্তার।

আর নীচেরতলায় মন্তব্য ওঠে, —ওই! ওই হচ্ছে! ডাক্তারের সঙ্গে হাসি-মরা। ওঃ, বিরু বাড়ি এলে বাঁচি আমি।

তা বিরু আসামাত্রই খানিকটা বাঁচলেন তিনি। নীরা তো এখনও দোতলায় হাঁটি হাঁটি পায়ের স্টেজে। অতএব বিরু আসামাত্রই তার বউয়ের আদ্যোপান্ত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করে ছাড়লেন তিনি।

সেই যেদিন বিরাম রওনা দিল, সেদিন শনিবারের ভরসন্ধেয় নীলনলিনীর এক-শো বারণ সত্ত্বেও অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়ে বন্ধুর বাড়ি যাওয়া থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত ঘটনার ধারাবিবরণী শুনিয়ে যায়, মায় সেই মস্তান ছোঁড়ার হাত চেপে ধরে কাঁদা, এবং তার বারে বারে এসে উদয় হওয়া পর্যন্ত।

আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! আশ্চর্য বক্তব্যের নির্লিপ্তভাব! অভিযোগের সুরমাত্র নেই, শুধুই আক্ষেপের আর হতাশার সুর।

তবে খুব সুকৌশলে একটা কথা বাদ দিলেন মহিলা। সেটি হচ্ছে ডাক্তারের সঙ্গে হাসি-তামাশা, কারণ ডাক্তার বিরামের বন্ধু। কী হতে কী হয়।

আর আরও সযত্নে একটি হাতিয়ার হাতে রাখলেন সময়ে প্রয়োগের জন্য।

তারপর হঠাৎই খুব আঁকুপাঁকু করে উঠলেন। —ওঃ! আমার দুর্মতি, এসে পর্যন্তই বকবক করে মরছি, কোথায় তুই একটু হাত-মুখ ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে সুস্থ হবি তা না। আসলে এবারে তুই বাড়ি না থাকা কালে এইসব ঘটনায় আমার প্রাণের মধ্যে আছড়াচ্ছিল বাবা। নে নে হাত-মুখ ধো! একটু কিছু মুখে দে।

বিরাম অবশ্য এ ব্যস্ততায় কর্ণপাত করল না।

জানিয়ে দিল সে তো আর ভয়ংকর ট্রেন জার্নি করে আসেনি। অফিসের লোকেদের সঙ্গে এয়ারপোর্টেই চা-টা খেয়ে তবে বাড়ি এসেছে। অতএব—

অতএব এখন সেই দুর্গতিগ্রস্ত এবং দুর্মতিগ্রস্ত পত্নী সন্দর্শনে—

অনেকক্ষণ আগেই জেনেছে নীরা বিরাম বাড়ি এসেছে। এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল এসে পৌঁছেছে বলে। এবং বাড়ির কী খবর।

হয়তো যথানিয়মে নীরা এয়ারপোর্টে উপস্থিত না থাকায়।

গাড়ি একটা আছে বটে বিরামের, তো সেটা অফিস থেকে দেওয়া। চালায় নিজে, নীরা জানালে তারা ড্রাইভার পাঠাত। নীরা জানায়নি।

দোতলায় উঠে এল বিরাম থমথমে গম্ভীরমুখে। কোনো কুশল প্রশ্ন না-করে প্রায় কড়া গলায় প্রশ্ন করল, 'এসব খবর আমায় জানানো হয়নি কেন?'

নীরা খানিকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষার চাঞ্চল্যের পর, স্তিমিতভাবে একটা বই নিয়ে বসেছিল। নীলনলিনী সম্পর্কে চিন্তা করতেও ইচ্ছে হয়নি।

এখন বইটা মুড়ে চোখ তুলে বলল, 'এমন কী সুখবর যে তাড়াতাড়ি জানাতে হবে?'

—শুধু সুখবরই জানাতে হয়? বাড়ির কর্তার আর কোনো খবর জানার দরকার নেই?

'বাড়ির কর্তা' শব্দটার ওপর বেশ ভালোরকম জোর দিল।

নীরা বলল, 'অকারণ ভাবানো। মন দিয়ে কাজ করতে পারতে না।'

—বিরাম চ্যাটার্জির মন এত পলকা নয়। তবে অনেক কিছুই শুনলাম!

—তা জানি!

হঠাৎ যেন চমকে উঠল বিরাম।

মনে হল এ ভঙ্গিটা যেন নীরার নয়। হঠাৎ এই নতুন ভঙ্গিটা আয়ত্ত করল কেন নীরা? এই আত্মস্থ আর অগ্রাহ্যর ভঙ্গি?

ওর তো অভিমান করবার কথা এতক্ষণ নীচে বসে থাকার জন্যে। ছুটে এসে নীরাকে না-দেখার জন্যে!

—পিসিমা বুড়োমানুষ, এইসব গণ্ডগোল আর উলটোপালটা ব্যাপারে খুবই বিচলিত হয়ে রয়েছেন বলেই আমায় না-জানিয়ে পারলেন না।

নীরা একটু হাসল।

—কী আশ্চর্য! কৈফিয়ৎ দিতে বসছ কেন?...জানানোই তো স্বাভাবিক। ওনার নিষেধ না-শুনে বেরিয়ে গিয়ে বিপদ বাঁধিয়ে বাড়ি ফিরলাম, সেসব না জানিয়ে স্থির থাকা সম্ভব?

বিরামের আবার মনে হল নীরা যেন সেই তার চিরচেনা নীরা নয়। তার মানে ওইসব বাজে লোকদের সঙ্গে মেশার কুফল।

'টাই'টা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, রাঁস্তায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে রাস্তার লোক তাকে হসপিটালে দিয়ে-টিয়ে আসে, এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তা বলে তাদের সঙ্গে মাখামাখি চালিয়ে যেতে হবে? একটা মস্তান ছোকরাকে বেডরুমে নিয়ে এসে বিছানায় বসিয়ে আদর করে খাওয়াতে হবে?'

নীরার ফর্সা মুখটা রক্তোচ্ছ্বাসে লাল থেকে অধিক লাল হয়ে উঠছে। নীরার বুকটা একটা ফেটে পড়া প্রতিবাদের আলোড়নে ওঠা-পড়া করছে।

নীরা তবু শান্ত গলায় বলল, 'আর কী কী অভিযোগ আছে?'

নীরার এই ভয়লেশহীন ভাবটা বিরামকে আরও খেপিয়ে তোলে। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'যা আছে তার কোনোটাই তুমি মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারো?'

নীরার মুখের চামড়াটা কি ফেটে যাবে?

এতদিন পরে এসে নীরার এত কষ্ট যন্ত্রণার খবর জেনেও তিলার্ধ ধৈর্য না ধরে এইভাবে কঠোর আক্রমণ? ভীষণ তোলপাড় হতে থাকে ভেতরে।

নীরা কি তবে ভেঙে পড়ে খেলো হয়ে পড়বে?

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে নীরা, নীরা, তুমি তোমার এই সুখের সংসার আর এই পরম আশ্রয়কে পরম গৌরবের ভেবে এতদিন ধরে কী অদ্ভুত বঞ্চিত হয়ে কাঁটিয়ে এলে?

এক মুহূর্তে যে-সম্মানের আসন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে, সেই আসনটাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থেকেছে নীরা! এই শ্রেয় এই শ্রেয় বলে।

নীরা কতগুলো দিন কী অদ্ভুতভাবে ভয়ের শিকার হয়ে কাটাল! নীরা তার স্বামীর বিরাগের ভয়ে, হৃদয়টিকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অথচ সেই বিরাগের হাত এড়াতে পারল না।

নীরার কাছ থেকে কোনো কথা শোনবার ধৈর্য হল না বিরামের, সেই পরম পূজনীয়া পিসিমার কাছে শোনা কথাই শেষ কথা?

নীরা বলল, 'প্রমাণের কথা উঠছে কেন? আমি তো আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বসিনি।'

বিরাম একটু গুম হয়ে থেকে বলল, 'বাড়িতে একজন গুরুজন থাকলে তার নিষেধ-টিষেধগুলো মেনে চলাই উচিত!' নীরা কি তাহলে সত্যিই অন্য নীরা হয়ে গেছে?

বিরাম অবাক হয়ে শুনতে পেল—গুরুজন যদি তাঁর অধিকারের সুযোগ নিয়ে গুরুতর হয়ে ওঠেন, তাহলে সবসময় মেনে চলা শক্ত।

না। এর আগে পিসিমা সম্পর্কে নীরা এমন অবমাননাকর উক্তি করেনি কখনো।

বিরাম তাকিয়ে দেখল নীরার দিকে।

তারপর একটু তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, 'হুঁ! নীচ সংসর্গের ফল এই ক-দিনেই বেশ ফলেছে দেখছি।'

চলে গেল ধড়াচুড়া ছেড়ে স্নানের ঘরে।

নীরার মনটা হঠাৎ যেন ভাবলেশ শূন্য হয়ে গেল। নীরার খেয়াল হল না বিরামকে হঠাৎ এতটা

চটিয়ে দেওয়া ঠিক কাজ হল কি না। লোকটা নিঃশঙ্কচিত্তে বাড়ি ফিরছিল ক-দিনের বিরহরাত্রির অবসানের আনন্দে।

এসেই নানান ঘাত-প্রতিঘাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

নীরা সেটা খেয়াল করল না।

কিন্তু হায় নীরা।

এখন তুমি যতই আত্মমর্যাদায় মর্যাদাময়ীর ভূমিকায় থাকো, তোমার আসল মৃত্যুবাণটি যে তোলা আছে শত্রুপক্ষের হাতে তা কি জানতে?

রাত্তিরটা কাটল যাহোক করে।

পরদিন সকালটাও থমথমে। ডাক্তারের নির্দেশ সম্পর্কে দু-চারটে কথা হল।

টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হল। এবং ডাক্তার যখন বলল, 'চ্যাটার্জি, ওই পায়ের পাতার ব্যথা জিনিসটা বড়ো সাংঘাতিক! সহজে যেতে-চায় না। এখন কিছুদিন গিন্নির পদসেবা করো।' তখন একটু শব্দ করে হাসতেও হল।...

কিন্তু খুব অধিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবার মেয়ে নীলনলিনী নয়।

অতএব বিরামের যখন খাওয়া হয়ে এসেছে, তখন টেবিলের ধারে এসে খুব নিরীহ গলায় বললেন, 'দ্যাখ তো বিরু এই হাতের লেখাটা বউমা-র বলে মনে হচ্ছে না? সিঁড়ির তলায় ধুলো জঞ্জালের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছিল, আমি তো পড়ে মাথামুন্ডু কিছু বুঝতেই পারলুম না। সেই ছোলটাকেই তো 'অলোক অলোক' করছিল।'

তারপর?

তারপর নীরার জীবনের একটি অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পড়ে গেল।

না এমন কথা বলব না বিরাম চ্যাটার্জি নামের উচ্চশিক্ষিত আর উচ্চপদস্থ ভদ্র ব্যক্তিটি তার বিবাহিতা স্ত্রীকে সামান্য কারণে ত্যাগ করল। অথবা বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দিল। সেকালে যেমন হতটত।

না তা করেনি বিরাম।

কিন্তু তার সেই বিবাহিতা স্ত্রী যদি নিজেই স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে চায়? যদি স্বামীর কোনো প্রশ্নের সদুত্তর না দেয়?

যদি বলে, কী ব্যাপার আমি বলব না।

কোথায় কী পাঠিয়েছি, বলব না।

অলোক নামের 'ভ্যাগাবন্ড মস্তানটার' সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, বলব না।

'নিজের লোক' মানে কী, তাও বলব না।

এসব খুব গর্হিত কথা?

সন্দেহজনক কথা?

এ থেকে বিরাম চ্যাটার্জি তার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতে পারে?

হারাক।

উপায় কী?

নীরা কৈফিয়ৎ দিতে বসবে না। নীরা প্রকৃত ব্যাপারটা কী, তা তার স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করবে না।

নীরাকে তাহলে বিদায়ই দাও।

কোথায় যাবে নীরা? করবেটা কী।

সে-ভাবনা ভাবার দরকার নেই বিরামের। আপাতত শুধু তাকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক।

তবে শেষ পর্যায়ে একবার বলেছিল নীরা, 'তোমার জীবনের ছকটার সাজানো ঘুঁটিগুলো হয়তো আবার ফিরে পেতে পারো, যদি তোমার পিসিমাকে তোমার জীবনের চুড়ো থেকে সরাতে পারো।'

—তার মানে? পিসিমাকে ত্যাগ করতে হবে? কারণ তিনি তোমার স্বেচ্ছাচারিতায়—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওনাকে যখন ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তখন যাকে সম্ভব তাকেই করো।

—আমি তোমায় ত্যাগ করতে চাইনি। তুমি নিজেই তোমার সংসারকে ত্যাগ করতে চাইছ।

—ঠিক। ঠিক। ত্যাগটা আমার দিক থেকেই হল।

—তোমার অন্যায় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করার অধিকার নেই আমার?

—নিশ্চয়ই আছে। করেওছ। কিন্তু কিছুটা স্বাধীনতা তো আমারও থাকতে পারে?

মাসখানেকের জন্যে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন নীরার মা-বাবা। এত কথার কিছুই জানতেন না।

ফিরে এসে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী? তুই? কখন এলি?'

—এই তো ক-দিন।

—ক-দিন। কেন? এই একা বাড়িতে।

—একা কেন? বাঃ! সাধনদা রয়েছে না। যে আমায় কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

বাবা সন্দেহের গলায় বললেন, 'কিন্তু আমি তো ঠিক—'

—তোমাদের জগন্নাথ দর্শনের ফল হাতে হাতে বাবা! বিলিয়ে দেওয়া জিনিস আবার ফিরে পেলে।

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, 'বিলিয়ে দেওয়া নয় মা, 'দান' করা। দান করা জিনিস ফেরত পাওয়ায় আর আনন্দ কী?'

এরপর আর কী বলবে নীরা?

মেয়ের যে হঠাৎ স্বামীর সঙ্গে বড়ো রকমের কিছু একটা ঘটেছে তা মা-বাপ দু-জনেই ভালোই বুঝতে পেরেছেন তীর্থ থেকে ফিরে একা বাড়িতে সহসা মেয়েকে দেখে।

কিন্তু ব্যাপারটা এমনই ('সুকুমারই' বলি) যে, বেশি কিছু জিজ্ঞেস করাও শক্ত। আবার তলে তলে যে এক বার জামাইয়ের কাছে গিয়ে জেনে নেবার চেষ্টা করবেন তাতেও সাহস আসছে না।

কে জানে কার দোষে কী! কতখানিই-বা সেই দোষ!

যদি মেয়েই কোনো অন্যায় অসঙ্গত ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তো গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া। জামাই হয়তো অপমানই করে বসবে।

আর যদি উলটো হয়?

জানতে পারলে মেয়ে ধিক্কার দেবে। প্রশ্ন করবে, বাবা! আমি তোমাদের এতটাই ভার হয়েছি? তাই ঘাড় থেকে নাবাবার জন্যে—

নাঃ। কোনো দিকেই কিছু করার নেই।

চুপচাপ থেকে যাও দর্শকের ভূমিকায়।

দান করা জিনিস মাঝে মাঝে হাতে পাওয়ায় আনন্দ আছে। আনন্দের স্রোত উত্তাল হয়।

কিন্তু চিরতরে ফিরে পেলে?

সংসারটা থেকেই আনন্দের নির্বাসন।

প্রথম প্রথম দু-চার দিন চেষ্টা করেছিল নীরা। বিয়ের আগে যে-স্টাইলে থেকেছে বাড়িতে, সেই স্টাইলেই থাকার ভান করেছে, কিন্তু এই ভান ধোপে টেকেনি।

অতএব আনন্দবর্জিত সংসারে থমথমে একটা নিরানন্দ পরিবেশে দিন কাটছে নীরার।

বিরাম চ্যাটার্জি নামের সেই উচপদস্থ ব্যক্তিটি এক বারের জন্যেও কোনো সাড়াশব্দ জানাননি।

অলোক নামের ছেলেটা একদিন বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসে বলল, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম একদিন। আপনার সেই কাজের মেয়েটা বলল, পায়ে ব্যথা। তাই রেস্ট নিতে বাপেরবাড়ি এসেছেন। ভালোই করেছেন। থাকুন কিছুদিন। যা একখানি শাশুড়ি আপনার।'

নীরা একটু অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, কিছুদিন? হয়তো চিরদিনও থেকে যেতে পারি।

অলোক নিঃশব্দে একটু তাকিয়ে থেকে আস্তে বলল, 'পিসিকে আপনার কথা লিখেছিলাম। দারুণ খুশি।'

আচ্ছা। আর কোনোদিন আসব?

নীরাও আস্তে বলল, 'যদি বলি না।'

—ঠিক আছে।

নীরা মনে মনে ভাবল সন্দেহর প্রশ্নে শাশুড়ি আর মাতে খুব বেশি তফাত নেই।

শুধু শুধুই সর্বদা সন্দেহের দৃষ্টি।

দিনের পর রাত রাতের পর দিন। অবধারিত এই নিয়মের তালে চালিয়ে চলা। এর বেশি আর কিছু করার নেই। একটা দোলাচলের মধ্যে কেটে যাচ্ছে।

অবশেষে দোলাচল থামাল নীরা। স্থির সিদ্ধান্তে এল।

একটা বিদেশি ডাকের লেফাফায় চিঠি লিখতে বসল।

লিখল—কুণাল বহুদিন ধরে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে সেধেছিলি, তখন বুদ্ধির অহংকারে অগ্রাহ্য করে গ্যাঁট হয়ে বসেছিলাম কিন্তু এখন টের পাচ্ছি অতি বুদ্ধির নাকে দড়ি।

সোনার খাঁচা আর সইল না। শেকলটা কেটেই ফেললাম। এখন উধাও আকাশে উড়তে বাধা নেই।

আকাশটা তো এক ও অখণ্ড, তাহলে ভারতবর্ষের আকাশ মার্কিন দেশের আকাশ মূলত তো একই। তাই ভাবছি উড়ে চলে যাব, তবে যাবার যা কিছু ব্যবস্থা তোকেই করতে হবে। অবহিত করে দিলাম।

শেকলের দাগটা এখনও লেগে রয়েছে, যেটা মুছতে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হবে। কিছুটা সময় ব্যয় হবে!

নীরা

নিজে গিয়ে চিঠিটা পোস্ট করে এল।

এখন শুধু প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।

কাকলির ঠিকানা জানা নেই। আর এও জানা নেই কাকলি তার ঠিকানা দিয়ে বিরাম চ্যাটার্জি ভবনে

চিঠি দিয়ে দিয়ে উত্তর না পেয়ে রেগে আগুন হয়ে বসে আছে। নীরার পৃথিবীতে কোথাও কেউ নেই। যেন বিশ্ব পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগশূন্য হয়ে গেছে।

যে-আশ্রয়ে রয়েছে সেখানেও ওই দুটি মানুষের সঙ্গে সহস্র যোজনের ব্যবধান।

তা বলে মা কি মেয়ের খাওয়া-দাওয়ায় সম্যক যত্ন নেন না? নীরা কোনটি খেতে ভালোবাসে সেটি মনে রেখে রান্না করে খাওয়ান না? আর বাবা দু-বেলা মেয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন না? উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন না দিন দিন এত রোগা হয়ে যাছিস কেন বলে?

করেন না, এমন অন্যায় অপবাদ দেওয়া যায় না তাঁদের। তবু নীরার মনে হয় বাবা-মার সঙ্গে ওর দূরত্ব সহস্র যোজন।

অতএব এখন ওর আক্ষরিক অর্থেই যে-লোকটা সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত, তার দিকেই তাকিয়ে থাকা।

কে জানে এই থাকাটা নিশ্চিত বিশ্বাসের না অনিশ্চিত শঙ্কার।

নীরা কি আর তার জায়গাটুকু রাখতে পেরেছে সেখানে?

এক-একটা দিন এক-একখানা পাথরের চাঁই।

প্রতীক্ষার দিন-রাত্রি এমনই হয় অবশ্য।

তবে শেষ হল একদিন সেই প্রতীক্ষা।

এসে হাজির হল সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা সেই চিরপরিচিত বিদেশি ডাকের চিঠিটি।

সম্বোধনহীন চিঠি।

এইভাবে শুরু—

মার্ভেলাস! খুব একখানা দেখালি বটে! একেবারে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখার মতো বুদ্ধি।

হতভাগা কুণালটার সঙ্গে একদম বীরবিক্রমে সব সম্পর্ক কাট আপ! তার চিঠিগুলো দূরে নিক্ষেপ। এমনকী সে-হতভাগার তুচ্ছ দু-একটা ফটো পর্যন্ত তোর সুখের সংসারে কাঁটা ফোটাচ্ছিল বলে দূর দূর করে ছুঁড়ে মারলি সেগুলো দিয়ে। আর এখন হঠাৎ বলে বসলি কিনা, এক বার ডাকিলেই খাইতে যাইব।

কী বলে একে? অ্যাঁ?

এদিকে ওই পত্রবাণ্ডিলের ভয়ংকর আঘাতে খেপচুরিয়াস হয়ে গিয়ে তৎক্ষণাত একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসে আছি।

ওল ছাড়ানোর মতো মুখ, বয়েসের গাছ-পাথর জানা নেই, উৎকট সাজে সদা সজ্জিতা আমার অতি হ্যাবলা ল্যান্ড লেডিটার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে এলাম।

(এরকম তাৎক্ষণিক বিয়ের মতো অফিসও আছে এখানে। কোথাও কোথাও আমাদের কালীঘাটের মতো আর কী?)

কী করব?

সা যোয়ান একটা পুরুষ তো আর খেপচুরিয়াস হয়ে গেছি বলেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে পারি না?

তা যাক গে, ওটা কোনো একটা ব্যাপারই নয়। এখানে বিয়ে ভাঙতে কাঠখড় দুটোই না পোড়ালেও চলে, শুধু খড়েও কাজ মিটতে পারে। কাজেই আর ক-টা দিনমাত্র সবুর কর।

কী? ভাবছিস অমানবিকতা হবে?

সে-চিন্তা নেই।

ইতিমধ্যেই, মানে ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেই তিনি নিজমূর্তি ধরেছেন।

আসলে ওই হ্যাবলা মূর্তিটি ছিল ছদ্মবেশ। ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার মাত্র।...(এই মরেছে আমার ব্যাপারেও তাই ভেবে বসিস না যেন)—এই আজই সকালে আমার অবাধ্যতা দেখে মেজাজ দেখিয়ে ট্রে-ভরতি চায়ের বাসন আছড়ে ফেলে ভেঙে গুঁড়ো করল।

ঠিক করেছি এখন অবিরত অবাধ্যতা আর নিরেট বোকামি চালিয়ে যাব। ও নিজেই কেস ঠুকতে ছুটবে। তবে সবই যৎসামান্য দিনের ব্যাপার। এতদিনে তোর কাঠখড়গুলো পুড়লেই বাঁচি।

তোর যে বুদ্ধিটা একটু লেট-এ খুলেছে এজন্যে ধন্যবাদ। যদি ভাবিস এর সবটাই, সবটাই অমানবিকতা তারও জবাব আছে। আমিও মানবগোষ্ঠীর একজন তো? না কি? তো সেই আমার ওপর নিষ্ঠুরতা করলেও অমানবিকতা হয় না?

হলেও নাচার।

তবে রাগের মাথায় সেকেন্ড হ্যান্ড হয়ে বসলাম। যাক গে কী আর করা। তুইও তো তাই। শোধবোধ।

ইস! এত খুশি লাগছে। ক-টা দিন সবুর কর। টিকিটপত্রের ব্যবস্থা করে তোর কাছে পৌঁছোলাম বলে। মাসিমা কি এখনও তালের বড়া বানান? না কি তার কোনো সিজন আছে? জিজ্ঞেস করে রাখিস। নচেত পাটিসাপটা।

তোর চিরহ্যাংলা কুণাল।

তাবলে তালের বড়ার হ্যাংলা নয় অথবা পাটিসাপটার।

রক্ত পথ

পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ

বৃত্ত পথ

গ্রাম তেঁতুলগোড়ার তেরোশো সত্তর সালের প্রথম আর প্রধান খবর হল সস্ত্রীক জিতু লাহিড়ীর গ্রামের বাড়িতে এসে বসা। বড়ো লাহিড়ী বাড়ির শ্যাম লাহিড়ীর মেজো ছেলে জিতু লাহিড়ী।

প্রধান খবর হচ্ছে এই জন্যে যে, ওর চাইতে জোরালো খবরের ঘটনা তারপর থেকে এই তেঁতুলগোড়া গ্রামে আর ঘটল না। ওর ধারেকাছে পৌঁছোয় এমন ঘটনাও নয়।

কিন্তু শুধুই কি এই তেরোশো সত্তর সালে? তার আগে? না, মনে তো পড়ে না। সেই বোমা-পালানোর আমলেই যা খুব কিছু জোরদার ঘটনা ঘটেছিল, তারপর আর নয়। বন্যার জল সরে যাওয়ার মতো শহরের 'বোমা-পালানে' লোকগুলো গ্রাম ছেড়ে আবার শহরে চলে যাবার পর গ্রাম তেঁতুলগোড়া ফের সেই তার একশো বছর আগের শান্ত চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। যেন অনন্তকালের ঘুমের বিছানায় হঠাৎ দুটো পোকামাকড় এসে হানা দিয়েছিল তাই চমকে আর ছটফটিয়ে জেগে উঠেছিল তেঁতুলগোড়া। পোকাগুলো উড়ে গেল, ও আবার নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরল, ঘুমিয়ে পড়ল।

শান্ত তেঁতুলগোড়ার পাঁজর থেকে দৈবাৎ যদি কোনো অশান্ত নিশ্বাস পাক খেয়ে ওঠে, সে-নিশ্বাস তেঁতুলগোড়ার বাতাসকে চঞ্চল করে না। সে-নিশ্বাস চার মাইল মাঠ ভেঙে 'ডাহুকি' স্টেশনে গিয়ে শহরের টিকিট কেটে পালায়। শহরের সদাউত্তাল চিরঅশান্ত নিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে ফেলে বাঁচে। তেঁতুলগোড়ার পাঁজরাটা হয়তো কিছুদিন শূন্য শূন্য ঠেকে। ক্রমশই যেন হালকা হয়ে আসে, কিন্তু তার জন্যে তার কোনো পরিবর্তন হয় না। শুধু ঘুমের ছন্দটা আর একটু ক্লান্ত হয়ে আসে তেঁতুলগোড়ার।

কিন্তু অনেক দিন আগে তেমনি এক অশান্ত নিশ্বাস লাহিড়ী বাড়ির জিতু যখন তেঁতুলগোড়ার মাটি ত্যাগ করেছিল, তখন আর যেখানেই শূন্যতা ধরা পড়ুক তেঁতুলগোড়া গ্রামের পাঁজর ভরাট ছিল। ছিল, কারণ তখন বড়ো লাহিড়ী বাড়ির শ্যাম লাহিড়ী বেঁচেছিলেন, বেঁচেছিলেন ছোটো বাড়ির ভুবন লাহিড়ী। ওঁরা ওঁদের দেব-দ্বিজ, গোরু, জমিজমা, বাগান, পুকুর নিয়ে এযাবৎ যে-ছন্দে কাটিয়ে আসছিলেন, সেই ছন্দের ছন্দপতন হতে দিলেন না। উদ্ধত অবিনয়ী জিতু ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেল।

ওঁরা আরও অনেক দিন রইলেন, তারপর মরলেন, আর শ্যাম লাহিড়ীর মরার পর দেখা গেল তিনি তাঁর গৃহত্যাগী মেজো ছেলের জন্যে একটা মহল সারিয়ে-সুরিয়ে চাবি বন্ধ করিয়ে রেখে গেছেন, এবং উইলে লিখে গেছেন, যদি দূর ভবিষ্যতে সে কখনো ফেরে, যেন উচিত অধিকারে বাস করতে পারে।

তা সে উইল শুনে তাঁর জ্ঞাতিভাই ভুবন লাহিড়ী, আর ভুবন লাহিড়ী মারফত গ্রামের সবাই হেসেছিল। জিতু লাহিড়ী বাপের ওই পুরোনো ইটের দুর্গটুকুর ভাগ নিতে আসবে, এ চিন্তা ততদিনে হাস্যকর। ভুবন লাহিড়ীর এক শালা দিল্লিতে চাকরি করে, তার সূত্রে জিতু লাহিড়ীর বোলবোলাওয়ের কাহিনি শুনেছেন ভুবনরা।

গৃহত্যাগী জিতু না কি কে জানে কোন মন্ত্রবলে সেক্রেটারিয়েটের এক কেষ্টবিষ্টুর মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং নিজে বিরাট এক কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসে আছে। ভুবনের শালা তার অধস্তন স্টাফ। সাহেবের সাহেবিয়ানার বর্ণনার আর মহিমায় ভদ্রলোক বোন-ভগ্নীপতিকে প্রায় স্তব্ধ করে রেখেছিলেন।

তা তার কথাটা অপ্রমাণিত হল না। জিতু লাহিড়ী জীবনে কোনো চিঠিপত্র দিল না, বাপ-মার মৃত্যুসংবাদ শুনেও কোনোদিন গ্রামে পদার্পণ করল না। শালা মারফত অনেক দিন পরে ভুবন লাহিড়ী জানলেন, জিতু মাতৃ-পিতৃবিয়োগে মাথা ন্যাড়া তো দূরের কথা, পা-টা পর্যন্ত খালি করেনি। যথানিয়মে জুতো মসমসিয়ে অফিসে এসেছে, চপ-কাটলেট টিফিন খেয়েছে।

ভুবন মারফত শুনে কেউ বলেছিল 'কুলাঙ্গার', কেউ বলেছিল 'নির্ঘাত ধর্মত্যাগী'। সন্দেহ কী, শ্বশুরটা বেম্ভ অথবা খিস্টান! পাড়ার বুড়োরা ছিল তখন অনেকে। বলেছিল বুব। তারা মরে হেজে গেছে, মাঝারিরা এখন বুড়ো হতে চলল।

এরা সঠিক মনে করতে পারে না জিতু লাহিড়ী কীরকম যেন দেখতে ছিল। বলে, 'ছেলেবেলায় খেলেছি বটে একসঙ্গে, তবে—'

যারা খেলেছে, তারা তো বলেই, যারা কস্মিনকালেও খেলেনি তারাও বলে। নিজেকে জিতু লাহিড়ীর বাল্যকালের খেলুড়ি বলতে ভালো লাগে, কারণ জিতু লাহিড়ী সম্পর্কে হঠাৎ হঠাৎ কিছু কিছু খবর আসে দেশে। আর খবরগুলো রোমহর্ষক। জিতু লাহিড়ী নাকি এম. পি. হয়েছে, জিতু লাহিড়ীর হুকুমেই নাকি পার্লামেন্ট চলে, জহরলাল নাকি জিতু লাহিড়ীর পরামর্শ না-নিয়ে কোনো কাজে এক-পা এগোন না। এই তেঁতুলগোড়ার শ্যাম লাহিড়ীর ছেলে জিতু লাহিড়ীই নাকি এরপর মন্ত্রী হবে। এমন কত কী!

একবার নাকি ভুবন লাহিড়ীর অগাবগা বড়ো জামাইটা 'জয় মা কালী' বলে দিল্লি গিয়েছিল জ্ঞাতি জ্যাঠতুতো শালাকে ধরে একটা চাকরি বাগাতে। ভুবনের প্ররোচনাতেই গিয়েছিল, তা সেই জামাই নাকি জিতুর বাড়ি-গাড়ি আর উর্দিপরা চাকর দারোয়ান দেখে ভেবড়ে গিয়ে চোঁ চোঁ দৌড় মেরে ফিরতি ট্রেনে ফিরে এসেছিল। আর ভুবন গঞ্জনা দিতে গেলে উলটে ভুবনকেই গঞ্জনা দিয়েছিল সে, যাতায়াতের ট্রেন ভাড়াটাই বরবাদ গেল আমার। আপনার ইয়েতেই গেল। আমার তো মাথা খারাপ হয়নি যে, সেই অট্টালিকার গেটে ঢুকে পরিচয় দেব, মশাই আমি আপনার জ্ঞাতি বোনাই।'

এইসব কারণেই জিতু লাহিড়ীকে তেঁতুলগোড়া একেবারে ভুলে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। আর এই কারণেই তেরোশো সত্তরের প্রধান খবর হল জিতু লাহিড়ীর প্রত্যাবর্তন। তা ছাড়া আরও কারণ ছিল, যেটা প্রতিনিয়ত ওই খবরটায় রস জোগান দিয়ে চলেছে। যার জন্যে বড়ো লাহিড়ী বাড়িটা এখন গ্রামসুদ্ধ লোকের আরও কৌতূহলের জায়গা হয়ে উঠেছে। যেসব ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে মাসে দু-মাসে ছুটিতে বাড়ি আসে, তারাও তাদের অমূল্য সময় খরচ করে এক বার উঁকি দিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, মাস-দুই হল এসেছেন জিতু। তখনও বৈশাখের যত 'কুমারী ব্রতে'র কুমারীরা ফুল তুলতে বেরোয়নি, শিব গড়বার মাটিতে জল দেয়নি। লোকেদের গোয়ালে 'ভগবতী যাত্রার' আয়োজন তো দূরঅস্ত, গোয়ালের ঝাঁপই ওঠেনি তখনও। চাষাদের ঘরের পুরুষরা তখন বোধ করি সবে আড়মোড়া ভাঙছে, মেয়েরা ঘুমের ঘোরে তাদের নড়াচড়া টের পাচ্ছে। ভদ্দরদের ঘরে পুরুষরা ঘুমে অচেতন, তাদের মেয়েরা কেউ কেউ গোবরজলের হাঁড়ি নিয়ে উঠোনে নেমেছে, কেউ বা বিছানায় বসে বিড়বিড় করে ভুল উচ্চারণে প্রাতঃস্তোত্র আওড়াচ্ছে। শুধু ছোটো লাহিড়ী বাড়ির 'জন্মবিধবা' সরযূ স্নান সেরে কমণ্ডলু হাতে ঠাকুরদোরে জল দিতে বেরিয়েছে। তা জল অনেক জায়গায় দিতে হয় তাকে। তেঁতুলগোড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বড়ো কম নেই। গ্রামদেবতা 'লক্ষ্মীনারায়ণ' আর 'পুরানো কালী' ছাড়াও ষষ্ঠী, শীতলা, বুড়ি মনসা, জোড়াশিব, আছেন কয়েক জন।

তা সরযূ যখন জল দিতে বেরোয়, মন্দিরগুলি তখন বন্ধ থাকে। তেঁতুলগোড়ার দেবতাদের সাধ্য নেই যে ভোরে ওঠার ব্যাপারে সরযূর সঙ্গে তাল দেন।

সরযূ বলে, 'তাল দেবে কোথা থেকে? হাত-পা ঠুঁটো যে। নিজে জাগবার খ্যামতা আছে? ওই গাঁজা-গুলিখোর পুরুতের পোয়েরা বেলা দশটায় খোঁয়াড়ি ভেঙে অ্যাড়ামুখে একটু জলের ছিটে মেরে এসে তালা-চাবি খুলে বাছাদের নড়া ধরে ধরে টেনে তুলবেন তবে তো বাছারা জাগবেন! আমার এত সময় নেই যে সেই পিত্যেশে বসে থাকি।'

বসে থাকে না। বন্ধ মন্দিরের দরজায় দরজায় খানিক করে জল ঢেলে দৈনিক জোগান সারে সরযূ।

সবশেষে অশ্বত্থতলা। তা সেই অশ্বত্থতলায় জল দিতে গিয়েই প্রথম চোখে পড়ল সরযূর। প্রণাম করে মুখ তুলছে, দেখল ক্যাঁচ কোঁচ করে একখানা গোরুর গাড়ি আসছে দক্ষিণের মাঠের ওপর দিয়ে।

সরযূ দাঁড়িয়ে পড়ল। না, গোরুর গাড়ি একটা দুর্লভদর্শন বস্তু বলে নয়। গোরুর গাড়িই তো ভরসা এখানের। সরযূ দাঁড়াল এত ভোরে কার গাড়ি আসছে তাই দেখতে। তার মানে কোন গাড়োয়ানের। এ তল্লাটের সবাই তো চেনা সরযূর। ভাবল কার গাড়ি, কার মাল। আর মালের হলে মাত্র একখানাই-বা কেন? প্রায়শই একাধিক গাড়ি থাকে মাল বইতে। সারি দিয়ে চলে ইটের গাড়ি, বালি-মাটি-চুন-সুরকির গাড়ি। ধান-চাল-অড়র-ছোলার গাড়িও থাকে। শেষের এগুলো অবশ্য এ পথ থেকে আসে না, এ পথ দিয়ে যায়। ডাহুকির কাছে আড়তদারের গুদামে যায়। সেখান থেকে মালগাড়িতে।

কিন্তু সে যাক, এলটা কী?

গাড়িটা যেন সরযূর ধৈর্য পরীক্ষা করছে। তবু ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল সরযূ, আর খানিক পরে দেখল মাল নয়, মানুষ। দু-জন মানুষ আসছে গোরুর গাড়িতে। যার মধ্যে একজন আবার মেয়েমানুষ। হ্যাঁ, মেয়েমানুষই বলে এখনও সরযূ, 'মহিলা' বলতে শেখেনি। শিখবেও না, কারণ 'আজকালে'র কিছু শেখবার ইচ্ছে নেই সরযূর। ঘুমন্ত তেঁতুলগোড়ায় যেটুকু 'আজকাল' ঢুকেছে, সেটুকুও না।

মানুষ দেখে অবাক হল সরযূ। অবাক হবার দুটো কারণ। প্রথম হচ্ছে কে এরা? গ্রামের সকল ভদ্দলোকের বাড়ির খবরই তো সরযূর নখদর্পণে, চাষাভুষোদেরও বাদ যায় না। কারও বাড়িতে এ ধরনের কোনো কুটুম আসার খবর তো শোনেনি সরযূ, তা ছাড়া বছর পয়লা ভোরে এসে পৌঁছেছে মানে, চৈত্র সংক্রান্তিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ভাবনার কথা। অহিন্দু নয় তো? তাই-বা কে?

বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ, ইদানীং গোরুর গাড়িকে আর বড়ো একটা মানুষ বইতে হচ্ছে না, 'ডাহুকি'-তে বেশ দু-চারখানা সাইকেল-রিকশা হয়েছে। ওদিক থেকে আসতে সাধ্যপক্ষে বাবু ভাইরা আর কেউ গোরুর গাড়ি চড়ছে না।

গাড়িখানা কণ্ঠস্বরের নাগালে আসামাত্রই সরযূ চাঁচাছোলা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কার গাড়ি রে?'

গাড়োয়ানও বিশেষ একটা পরিচিত স্বরে উত্তর দিল, 'চরণ ঘোষের গো।'

—অ ! চালাচ্ছিস তুই বিধু বুঝি?

—বাবা বেরোয়নি?

—না পিসিমা, বাবার দেহটা আজ্ঞে ভালো যাচ্ছে না।

তা চরণ ঘোষের খবর নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই সরযূর, দুশ্চিন্তা তার গাড়ির আরোহীদের নিয়ে। তাই গাড়িটা মাঠের কোনা পথ ধরে আবার কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে হাঁক পাড়ে, আসছিস কোথা থেকে?'

—এস্টেশন।

—রাত চারটের গাড়িটা ধরতে গেছলি বুঝি?

বিধু চেঁচিয়ে বলে, 'মাল পৌঁছে রাতে ওখানেই ছিলাম—

—তা ভালো। একটু থামল সরযূ, বলতে যাচ্ছিল, সাইকেল-রিকশে বাবুদের ঘুম ভাঙেনি বুঝি, তাই তোর কপাল ফিরেছে? বলল না। বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

—আজ্ঞে—বড়ো লাহিড়ী বাড়ি।

বড়ো লাহিড়ী বাড়ি! শুনে হাঁ হয়ে গেল সরযূ। ওবাড়িতে আবার এল কে? আসবার মতো আছেই-বা কে? বিধু ছোঁড়া ভালো করে কথা কইল না। সরযূও কিছু মাড়িয়ে মরবার ভয়ে অশ্বত্থতলা ছেড়ে বেশিদূর এগোতে পারল না। মুশকিল করল তো!

অবিশ্যি মুশকিল বললেই মুশকিল। কে কী বৃত্তান্ত শুনলেও তো সরযূকে যেতে হত বড়ো লাহিড়ী বাড়ি। ও-পথটায় রাজ্যের ওঁচলা জঞ্জাল থাকলেও যেতে হত। বাড়তি এক বার চান করার ভয়ে গ্রামের তত্ত্বতল্লাশ স্বরূপ মহান দায়িত্বটি তো এড়াতে পারত না সে!

তবু, বিধুর বাবা চরণ ঘোষ হলে নিশ্চয় ওই উত্তরটাকে লম্বা করে বলত, 'শ্যাম লাহিড়ীমশাইয়ের মেজো ছেলে জিতু লাহিড়ীমশাই এলেন গো দিদিমণি! 'রিটায়াট্' করে দেশঘরে বসতে এলেন।

—রেকছা গাড়ি নিলেন না আজ্ঞে, আমায় ডেকে বললেন, গোরুর গাড়ি চড়েই গাঁ ছেড়েছিলাম বাপু, আবার গোরুর গাড়িতেই ফিরতে চাই।'

বলত এসব বিশদ করে, কথার জাহাজ চরণ ঘোষ। কিন্তু বিধু বেশি কথা বলে না। যেটুকু প্রশ্ন সেটুকু উত্তর। বিধু নিজেকে দামি রাখতে চায়।

কমণ্ডলু নিয়ে 'নে থো' করে হরিসভার তুলসীমঞ্চে একটু জল দিয়ে বাড়ি ফিরল ছোটো বাড়ির ভুবন লাহিড়ীর শেষতলানি সন্তান জন্মবিধবা সরযূ।

ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যে সারা তেঁতুলগোড়ার ইতর ভদ্র আর, ওই যে কী বলে, আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জেনে ফেলল, বড়ো লাহিড়ী বাড়ির মরচে ধরা তালায় আবার চাবির মোচড় পড়েছে, শ্যাম লাহিড়ীর ছেলে জিতু লাহিড়ী দেশে ফিরেছে।

কিন্তু মরচে পড়া ওই তালাখানার চাবিটা জিতু লাহিড়ী পেলে কোথায়? শেষ যে-জন তালাটা লাগিয়েছিল, সে তো গ্রামের কোনো বিশ্বস্ত ভদ্রসন্তানের কাছে রেখে যায়নি চাবিটা? বলে যায়নি তো—রইল তাহলে? আমি ফিরি আর না ফিরি, বাড়ির মালিকদের কেউ যদি কখনো ফেরে, খুলে দিয়ো তাকে দরজাটা।

না বলেনি।

বড়ো লাহিড়ী বাড়ির শেষ অধিবাসী গুণদা সরকার কবে কখন কোন সময়ে যে ওই প্রকাণ্ড তালাটা বাড়ির সদরে ঝুলিয়ে দিয়ে বাড়ির দায়িত্ব ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তা কেউ টের পায়নি। মস্তবড়ো বাগান ঘেরা বাড়িটার কোনো একটু গহ্বরে গুণদা সরকার বাস করে এই জানত সবাই, আর জানত বুড়ো কোনোদিন ওইখানেই কোথাও হুমড়ে পড়ে মাটি নিয়ে নিমকের ঋণ শোধ করবে। সেটাই জানা স্বাভাবিক ছিল, কারণ বাড়ির যারা দাবিদার, তারা তো একে একে দাবি ত্যাগ করে চলে গেছে, ফিরে এসে ফের দখল নেবে এমন কে আছে? কেউ নেই।

শ্যাম লাহিড়ীর বড়ো ছেলে হিতু, অর্থাৎ হিতেন তো বাপ থাকতেই অপুত্রক মরেছে, তার বউটাও দীর্ঘকাল শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে আর তারপর দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে শেষপর্যন্ত বাপের বাড়ি গিয়ে মরল। আর ছোটো বউ, মানে ছোটো ছেলে রীতেনের বউ? সে তো স্বামী মারা যেতে-না-যেতেই মেয়েটাকে নিয়ে.....না, তার কথা উচ্চারণের যোগ্য নয়।

তবে সে অথবা তার সেই মেয়েটা কোনোদিন তেঁতুলগোড়ায় ফিরে এসে বসবাস করবে না সেটা নিশ্চিত। করতে চাইলেও গ্রামের লোক করতে দেবে না। সেকালের 'সমাজ' বলে বস্তুটা একালে না-থাক, আর সমাজপতিরাও না থাক, তবু গ্রামে যারা আছে, তাদের রক্ত-মাংস বলে কিছু তো আছে? শ্যাম লাহিড়ীর মেয়ে ছিল না।

অতএব বাকি থাকে দীর্ঘদিনের গৃহত্যাগী মেজো ছেলে জিতু অর্থাৎ জিতেন লাহিড়ী। তা তার কথা তো প্রশ্নের অতীত। অতএব জানা কথা, শেষ অবধি ওই চিরদিনের গুণদা সরকারই থাকবে। থাকবে ঘাঁটি আগলে।

তারপর তার অবর্তমানে গাঁয়ের লোক জানালা-দরজা খুলে নেবে তারপর ফাঁকা বাড়িটা চোরছ্যাঁচড়ের

আগাছা হবে, আর তারও পর বয়সের ভারে হুমড়ে পড়া বাড়িটা ভাঙা ইটের স্তূপ হয়ে 'কালের ইতিহাস' রচনা করবে। যেমন করছে ঘোষালদের ভিটেটা, বসুরায়েদের ভিটেটা। দীর্ঘকাল ধরে পাড়াপ্রতিবেশীর প্রয়োজনীয় ইট-কাঠের জোগানদার হয়ে ওদের স্তূপগুলো শেষপর্যন্ত এখন শুধু আগাছার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু গুণদা সরকারের শেষ পরিণতি তেঁতুলগোড়া গ্রামে হল না। তার অন্তর্ধানটা রহস্য হয়েই রইল। হঠাৎ একদিন সবাই দেখল লাহিড়ী বাড়ির গেটে তালা ঝুলছে। কোথায় গেল বুড়ো? প্রথম প্রথম পাঁচজনে কৌতুকচ্ছলে বলাবলি করতে লাগল, নিয্যস বাড়ির মধ্যে কোথাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে গুণদা সরকার, তাই লোক দেখিয়ে বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে ভিতরে ঢুকে খুঁড়ছে।

অবশ্যি কৌতুকের কথা কৌতুকেই পর্যবসিত হল। গুণদা সরকারের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। পকাণ্ড সেই তালাটায় আস্তে আস্তে মরচে ধরতে লাগল।

সেই তালায় চাবি লাগালেন জিতু লাহিড়ী। অদ্ভুত একটু হেসে পার্শ্ববর্তিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ক-বছর যেন আগে সরকার চাবিটা পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছিল?'

পার্শ্ববর্তিনী, যিনি এযাবৎ 'মিসেস লাহিড়ী' নাম নিয়ে এক উঁচুতলার সমাজে বিচরণ করে এসেছেন, একদা যাঁর এককণা হাসির দাম ছিল লাখ টাকা, আর সেদিনও যাঁর ধারেকাছে আধাপ্রৌঢ় স্তাবককুলের মধুগুঞ্জন লেগেই থাকত। উগ্র তরুণী তিন-তিনটে মেয়ে, আর কৃতবিদ্য দুই ছেলের মা হয়েও যাঁর আকর্ষণ উপেক্ষার বস্তু ছিল না, তিনি তাঁর পাথরের গড়া মুখটা একটু ফিরিয়ে নিলেনমাত্র, উত্তর দিলেন না।

জিতু লাহিড়ী চাবিটায় মোচড় দিলেন, বলিষ্ঠ পুষ্ট হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠল, বললেন, 'ভাগ্যিস চাবিটা তখন হেসে হেসে রাস্তায় ফেলে দিইনি, কী বলো? কে জানত সেই চাবি আমিই নিজের হাতে এসে খুলব!'

পাথরের মুখের কয়েকটা পেশি একটু বিকৃত হল—'আমি জানতাম।'

'জানতে নাকি? বলো কী? কই বলনি তো?

মিসেস লাহিড়ী বলে—কিন্তু তেঁতুলগোড়া গ্রামে কি 'মিসেস লাহিড়ী মানায়? না ওই সাদাসিধে একখানা লাল পাড় শাড়ি আর তুচ্ছাতিতম তুচ্ছ একটা সাদা ব্লাউজ পরা শুধু শাঁখা হাতে ওই মহিলাটিকে সে-নামে খাপ খায়? খাপ খাচ্ছে না।

অতএব প্রায় ভুলে-যাওয়া পরিত্যক্ত একটা নামকেই আবার কুড়িয়ে তুলে নিতে হচ্ছে। বাল্যজীবনের পোশাকি নাম। ডাকনাম একটা ছিল, বহুদিনাবধি চালুও ছিল। লাহিড়ী সাহেবের মেয়েরা যখন তরুণী হয়ে ওঠেনি, তখনও লাহিড়ী সাহেব সে-নামটাকে যখন-তখন ব্যবহার করতেন। আদরে সোহাগে কৌতুকে। কিন্তু মেয়েরা তরুণী হয়ে ওঠার পর থেকেই আস্তে আস্তে কীরকম যেন বদলে যেতে শুরু করলেন লাহিড়ী সাহেব, আর সেই বদলানোর সূত্রেই বরুণা লাহিড়ীর সেই 'বেবি' নামটা লাহিড়ী বাড়ির দরজায় ঝোলানো এই তালাটার মতোই মরচে পড়ে গেল।

অতএব বরুণা লাহিড়ী। হয়তো-বা বরুণা দেবী বললেই আরও জুতসই হয়। কিন্তু তাই কি কেউ ডাকবে এই হতভাগা তেঁতুলগোড়া গ্রামে? ডাকতে জানে কেউ? হয়তো-বা বরুণা লাহিড়ীর শাশুড়ির নামটাতেই ডাকবে তাকে লোকে। বলবে লাহিড়ীগিন্নি।

কিন্তু এখনও ওরা আসেনি।

এখন সবে পুরোনো লাহিড়ী বাড়ির বন্ধ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে ভিতরে পা দিয়েছেন জিতু লাহিড়ী, এখন বরুণা নামটাই চলুক। বরুণা! বরুণা লাহিড়ী বললেন, 'বলার সময় আসেনি তাই বলিনি।

কিন্তু দেশকে ভালোবাসতে এসে প্রথমেই দেশের সাপখোপের ভালোবাসায় ধরা নাই-বা দিলে। এতদিনের বন্ধ বাড়ি। ওই বাজে লোকটা ঢুকে দেখুক-না আগে।'

'বাজে লোক।' অতএব সাপের ছোবলে মরে তা ওই মরুক? জিতু লাহিড়ী গম্ভীরহাস্যে বলেন, 'এখনও তোমার অনেক শিক্ষার বাকি আছে বরুণা! হয়তো-বা কিছুই হয়নি।'

বরুণা লাহিড়ীর মুখটা আর একটু পাথুরে দেখাল। কিন্তু শুধুই মুখটা। গঠনভঙ্গিটা কেমন যেন ঢিলে আর অসহায় লাগছে বরুণা লাহিড়ীর। বহুবিধ প্রসাধনে টাইট করা দেহে শিফন নাইলন চড়ানো যে-মহিলাটি অনেক তরুণীকে টেক্কা দিয়ে দুরন্তবেগে ড্রাইভ করে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে বেড়াতেন রাজধানীর রাজপথে, রাজধানীর আশেপাশে, তাঁকে আর চেনার উপায় নেই যেন।

বরুণা স্বামীর মতো অত ফর্সা নয়। লাহিড়ী বংশের দুধে ধোওয়া রং, যা নাকি জিতু লাহিড়ীর মধ্যে এখনও টিঁকে আছে, তা নেই বরুণার। তার ধারেকাছেই নেই। মাজা মাজা বলে পাথরের মতো রং বরুণার, কিন্তু নিখুঁত মুখ আর ওই নিটোল গঠন ভঙ্গিমার গুণে পাথরের গড়া পুতুলের মতোই দেখতে লাগত বরুণাকে। আকর্ষণীয়া মোহিনী!

কিন্তু এখন আর লাগছে না। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই নিটোল কঠিন লাবণ্যটুকু ঝরে পড়েছে বরুণার। লালপাড় শাড়িতে ঢাকা দেহটা কাদামাটির পুতুলের মতো লাগছে।

শুধু মুখটা আছে। আঁকা ভুরু চোখা রং মুছে ফেলেও আছে। খাটো করে কাটা রুক্ষ ফাঁপানো চুলগুলো টান টান করে আঁচড়ে গোড়া বেঁধে খোঁপা করার জন্য আরও বড়ো বেশি পাথুরে দেখাচ্ছে। জিতু লাহিড়ী বোধ করি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে 'বাজে লোক' বিধু এগিয়ে এসে নিবৃত্ত করে, —খপ করে পা দেবেন না বাবু, উঠোন ভরতি জঙ্গল, গোড়ায় গোড়ায় এখনও আঁধার। আমি দেখছি—'

—তুমি দেখবে? সাপ বুঝি তোমায়—

—আমাদের অব্যেস আছে। বলে বিধু হাতের খেটে লাঠিটা দিয়ে উঠোনের লতাপাতা আগাছা জঙ্গলগুলো ঠেঙাতে ঠেঙাতে চক-মিলানো বাড়ির এক দিকের দাওয়ায় উঠে পড়ে। উঠোনটা এককালে শান-বাঁধানো ছিল, এখন ভেঙে ফেটে খাবলা উঠে এই জঙ্গলস্তূপকে রচিত হতে দিয়েছে।

লাহিড়ীর পরনে একখানি থান ধুতি, খালি গায়ে মোটা একখানা চাদর জড়ানো, অনভ্যাসের দরুণ বারে বারে খসে যাচ্ছিল সেটা, আর দুধসাদা রঙের গা-টা বারে বারে যেন ঝলসে উঠছিল বরুণার চোখের সামনে। তবু বরুণার স্বামীর এই নগ্নতার কুশ্রীতায় চোখ বুজতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ঈশ্বরের এইটুকু কৃপা, মানে ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, ওই কুশ্রীতা দেখবার জন্যে চোখ নেই কোথাও। বলতে যাচ্ছিলেন, গায়ে একটা জামা দিলে কিছু আর আধুনিক সভ্যতা তোমাকে দাঁত বসিয়ে দিত না। কিন্তু বললেন না বরুণা লাহিড়ী। মনে পড়ে গেল, কথাটা যেন বলেছিলেন ট্রেনে ওঠার আগে। ঠিক ওই কথাটা না-হলেও ওইরকম কথা।

জিতু লাহিড়ী উত্তর দেননি, মৃদু হেসে গায়ের চাদরটা ভালো করে সাপটে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। এখনও কথাটা না-বলতেও তেমনি সাপটে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'বলছিলে না 'বাজে লোক'? তা কথাটা মিথ্যে নয়, বাজে লোক না হলে কেউ অপরকে ঠেলে সরিয়ে রেখে সাপের মুখে নিজেকে এগিয়ে দেয়?'

বরুণা লাহিড়ীর মুখটা অবজ্ঞায় বেঁকে গেল, —সাপ থাকলে যেত না। জানে নেই।

—জানে, তা বটে!

গোরুর গাড়ি থেকে সামান্য যা-কিছু মালপত্র ছিল টেনে এনে দাওয়ায় তুলে দিয়ে বিধু পাওনা পয়সা গুনে নিতে নিতে বলে, 'মজুর লাগবে তো?'

মজুর! মজুর—!

আজ্ঞে এই জঙ্গল উপড়োতে তো প্রথমে দুটো মজুর চাই, তারপর আপনার মেরামতি মিস্ত্রিরা আসবে।

কিন্তু বাড়ি তো আমি মেরামত করব না বাবা। জিতু লাহিড়ী নরম গলায় বলেন।

মেরামত করাবেন না? স্বল্পবাক বিধু বাক্‌শক্তি হারিয়েই বসে প্রায়। তবু কষ্টে বলে, 'তবে যে বলেছেন বাস করতে এলেন?'

—তা তো বলেছি, এখনও বলছি, কিন্তু মিস্ত্রি লাগিয়ে হইহই তুলে বাস করব তা তো বলিনি—কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকব।

বিধু মুখে আর কিছু বলল না, চলে গেল, কিন্তু মনে মনে বলল, তার মানে বাস করবে না কাঁচকলা! ওই শখ হয়েছে, তাই একবার ভিটেয় বেড়াতে এসেছে। কিন্তু বাড়ি মেরামতের মুরোদ আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না, হালচাল যা দেখছি 'অদ্যভক্ষ্য' মতন। ইনি আবার লাহিড়ী বাড়ির কোন ছেলে? এক জনাই তো শুনেছিলাম ছেলে। মস্তবড়ো লোক, দিল্লির মন্ত্রী না কী যেন, তিনি তো না। আরও ছেলে ছিল তবে? চেহারাটা কিন্তু রাজরাজড়ার মতন, গিন্নিও কম যায় না। হালচাল দারিদ্দির, অথচ হাবভাব বড়োমানুষের মতন, আশ্চয্যি!

জিতু লাহিড়ীও তখন চমকে অস্ফুটে উচ্চারণ করে উঠেছেন, 'আশ্চর্য! ঠাকুরদার অয়েল পেন্টিং পোট্রেটটা রয়েছে এখনও!'

ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে বটে, তবু আছে।

কিন্তু চমকাবারই-বা কী আছে? অয়েল পেন্টিং তো থাকেই, শ্যাম লাহিড়ীর বিয়ের সময় তোলা বর-কনের ফটোটাও তো ঝুলছে তাঁর ঘরের দেওয়ালে মাকড়সার ঝুলে আবরিত হয়ে। জিতু লাহিড়ী যদি এখন ছবিটা পেড়ে ধুলো ঝেড়ে দেখতে যান, পোকা-কাটার মধ্যে থেকেও সেই মাথায় টোপর চড়ানো বোকা বোকা ছেলেটাকে, আর মাথায় সোনার মুকুট পরা গাল ফুলো ফুলো বাচ্চা মেয়েটাকে দেখতে পাবেন। ছেলেবেলায় যাদের মা আর বাবা ভাবতে ভারি হাসি পেত জিতুর। ছবিটা পেড়ে নিয়ে দেখত আর হাসত!

আচ্ছা সেই সোনার মুকুটটা কোথায় গেল? যেটা নাকি তার ঠাকুমাও বিয়ের সময় মাথায় এঁটেছিলেন। ঠাকুমার বাবা নাকি মস্ত বড়োলোক ছিলেন, আপাদমস্তক সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন মেয়েকে।

কী সস্তা ছিল তখন সোনা! কী সরল ছিল জীবনযাত্রা!

ভাবলেন জিতু লাহিড়ী।

মনে পড়ল না, ওই জীবনযাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল জিতু নামক চাবুকের মতো সেই ছেলেটা। বলেছিল, 'সোনার পাহাড় ঘরে মজুত রেখে ভিখারির মতো বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। একটা ছেলেকে অন্তত কলকাতায় রেখে পড়াবার পয়সা নেই আপনার?'

শ্যাম লাহিড়ী বলেছিলেন, 'থাকবে না কেন, পাঁচটা ছেলেকে পড়াবার পয়সাও আছে। কিন্তু পয়সা থাকলেই অনর্থক অপব্যয় করতে হবে?'

—অপব্যয়? ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোটা আপনার কাছে পয়সার অপব্যয়?

—অপব্যয় লেখাপড়া শেখানোয় নয়। শহুরে বাঁদর করায়।

—শহরে গেলেই মানুষ বাঁদর হয়?

—সবাই হয় না, তোমার মতো ছেলেরা হয়। দেখতে পাচ্ছি তোমার পাখনা উঠেছে। কলকাতায় পাঠালে উড়তে দু-দিনও লাগবে না।

উদ্ধত অবিনয়ী বংশছাড়া ছেলেটা বাপের মুখে মুখে চোপা করে বসেছিল, —পাখনা যদি উঠেই থাকে, আটকাতে পারবেন?

—কী, কী বললি? বলে বোধ করি স্তব্ধই হয়ে গিয়েছিলেন শ্যাম লাহিড়ী। আর জিতুর সেই মা, সোনার মুকুট পরা ফুলো ফুলো গাল ওই ছবিটা ছাড়া যাঁর আর কোনো ছবি ছিল না, আর ছবিটার সঙ্গে যাঁর তখন কিছুমাত্র মিল ছিল না, সেই মা হঠাৎ ছুঁতমার্গ ভুলে কোথা থেকে যেন এসে তেরো-চোদ্দো বছরের মাথা ছাড়ানো লম্বা হয়ে যাওয়া ছেলেটার মাথাটা ধরে ঠাঁই করে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে বলেছিলেন, 'গুরুজনের মুখে মুখে চোপা? হতভাগা কুলাঙ্গার ছেলে! জন্মেই তুমি মরনি কেন?'

ছেলেটা আঘাতের জায়গায় হাত বুলোয়নি, শুধু দ্বিতীয় বার আঘাতের আগে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'জন্মেই মরিনি, সে-আক্ষেপটা ঘোচাব তোমার। মরে আবার জন্মাব। মনে মনে জেনো তোমার মেজো ছেলে মরেছে।' আর কাউকে কিছু বলার অবকাশ দেয়নি ছেলেটা, ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

আশ্চর্য! শ্যাম লাহিড়ী ফেটে পড়ে ছুটে গিয়ে তার কান ধরেননি, পায়ের খড়ম খুলে মারেননি, শুধু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েও খড়মের খট খট শব্দ শুনতে পেয়েছিল বুনো রাগী ছেলেটা। দ্রুত পদক্ষেপের ঈষৎ এলোমেলো শব্দ।

সেদিনের সেই কথাগুলো তেমন মনে নেই জিতু লাহিড়ীর, মনে করতেও পারলেন না। শুধু যেন খড়মের খট খট শব্দটা শুনতে পেলেন। কোথায় কোন ঘর থেকে শব্দটা উঠছে? উৎকর্ণ হলেন, থেমে গেল। আবার অনুসন্ধানের জন্যে এগিয়ে গেলেন, ধ্বনিত হতে থাকল কানের পর্দায়, কান থেকে মাথায়। কী এ? কার খড়মের শব্দ?

সহসা লজ্জিত হয়ে প্রায় শব্দ করে হেসে উঠলেন জিতু লাহিড়ী। খড়মটা তারই পায়ে। দিল্লির বাজারে অনেক খুঁজে ঠিক শ্যাম লাহিড়ীর মতো হাতির দাঁতের গুল দেওয়া যে-খড়ম জোড়াটা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি বত্রিশ জোড়া জুতো ত্যাগ করে, বহুদিনের রুদ্ধ শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনি উঠছে তার। অনভ্যাসে খেয়াল হচ্ছিল না।

অথচ তেঁতুলগোড়াতেও এখন খড়মটা হাস্যকর! গ্রাম তেঁতুলগোড়া তার মাঠঘাট ধুলো জঙ্গল আর কাঁচা রাস্তায় এক-শো বছর আগের চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকলেও মানুষগুলোর সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বই কী!

খড়ম এক জোড়া এখন সারা তেঁতুলগোড়া গ্রামটা উটকে ফেললেও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। যাবেই না। হয়তো কারও রান্নঘরের মাচায় জ্বালানিকাঠের নীচে সঙ্গীহীন একটা পাটি পড়ে আছে। অন্য প্রথম পাটিটা জ্বলন্ত উনুনের জ্বাল বাড়াতে ঠেলে দিয়ে বউমার হয়তো মনে পড়ে গেছে, জিনিসটা তার মরা শ্বশুরের, তখন বিবেকের দংশনে তাড়াতাড়ি বাকি পাটিটা মাচায় ছুঁড়ে দিয়েছে।

এটাও 'হয়তো'। মোটকথা, খড়ম আর তেঁতুলগোড়ায় নেই। আর সেকালের শ্যাম লাহিড়ীর মতো, অথবা বর্তমানে জিতু লাহিড়ীর মতো, শুধু চাদর গায়ে দিয়ে কাটায় না কেউ। পুরুতরাও মোটরগাড়ির ছেঁড়া টায়ারে বানানো চটি পায়ে দেয়, আর শীতকালে পুরোহাতা সোয়েটার গায়ে চড়িয়ে পুজো করে।

কিন্তু জিতু লাহিড়ী সে-পরিবর্তনটুকু টের পাননি এখনও। স্টেশনে গোরুর গাড়ি দেখে পুলকিত হয়ে চড়ে বসেছিলেন, আর সদ্য প্রত্যুষের গ্রাম্যপ্রকৃতি যেন এক অনাদিকালের বার্তা বয়ে এনেছিল তাঁর কাছে। দেখছিলেন যেমনটি দেখে গিয়েছিলেন তেঁতুলগোড়াকে, ঠিক তেমনটিই আছে। সেই গাছপালা ধানখেত, ধূসর মাঠ, সেই গোরুর গাড়ি চাকার খাঁজকাটা রাস্তা, সেই পানা, মজা পুকুর, কাকচক্ষু দিঘি। কী মধুর কী মধুর! আজও পৃথিবীতে এই শুচিতা, এই পবিত্রতা আছে। আধুনিক সভ্যতার পঙ্কিল স্পর্শহীন আদিম ভূমি আছে।

জ্বলন্ত একটা জ্বালাময় চিত্তের উপর যেন স্নিগ্ধ স্নেহময় একটা মাতৃস্নেহের প্রলেপ পড়েছিল। মনে হয়েছিল নিজের থান ধুতি, মোটা চাদর, কাষ্ঠপাদুকা যেন একটা গৌরবময় কালের প্রতীক স্বরূপ হয়ে অনির্বচনীয় মহিমা বিস্তার করছে।

একটার পর একটা দরজা খুলছিলেন জিতু লাহিড়ী। এসব ঘরে তালার পাট নেই। শুধু শেকল খুলে খুলে কপাট হাট করে দিচ্ছেন, প্রথমটায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ যেন ভিতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, তারপর আবার করুণ অভিমানের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকছে। যেন অনেক কথা বলার আছে তার, শুধু যদি একটু এসে বসো।

তা ঘরে ঘরে বসবার জায়গাও যে নেই তা নয়। জরাজীর্ণ হয়ে এলেও দু-তিনটে ঘরে পালঙ্ক আছে ছেঁড়া গদির তুলোর ব্যঙ্গ নিয়ে, বাকি ঘরে তক্তপোশ। পায়ায় উই লেগেছে, ভিতরে ঘুণ ধরেছে, বসতে গেলে হয়তো মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবে, কিন্তু দেখতে অবিকল, মনে হচ্ছে ধুলোটা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়।

চাবির সঙ্গে যে-চিঠিখানা ছিল গুণদা সরকারের, তার দু-চার লাইন মনে পড়ল জিতু লাহিড়ীর।

'দাদাবাবু' লেখেনি গুণদা, 'আপনিও' লেখেনি। লিখেছিল 'মেজো খোকা', ভাবিয়াছিলাম হাড় ক-খানা লাহিড়ী বাড়িতেই শেষ করিয়া তিন পুরুষের নিমকের ঋণ শোধ করিব, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিলাম না। ভিতরে ভিতরে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা বোধ করিতেছি। জেলখানার কয়েদির মতো এই যন্ত্রণা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া মারিতেছে, তাই শেষ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করিয়া ভারমুক্ত হইতে চাহিতেছি। বৃদ্ধের অক্ষমতা মার্জনা করিও।'

ভার! তা ভার বই কী।

গচ্ছিত সম্পত্তির মতো ভার আর কী আছে?—ভাবলেন লাহিড়ী, তাই-না বংশের মানসম্ভ্রম রক্ষার দায় এতবড়ো দায়! পূর্বপুরুষের গচ্ছিত সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে না পারলে পীড়িত হয় মানুষ।

সেদিন কিন্তু হেসেছিলেন জিতু লাহিড়ী। অথবা লাহিড়ী সাহেব। পুরুষানুক্রমে বঞ্চিত সম্পদ 'বংশ মর্যাদার' দায় যখন তাঁর কাছে হাস্যকর ছিল। তখন ভেবেছিলেন, কী দায় আমার গুণদা সরকারকে দায়মুক্ত করবার? তেঁতুলগোড়ায় লাহিড়ী বংশের নাম নিশ্চিহ্ন হচ্ছে তো হোক-না। তিনি তো মরে আবার নতুন জন্ম নিয়েছেন। মায়ের সামনে উচ্চারণ করা শপথবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

সেই শপথ পালনের আনন্দে হা-হা করে হেসেছিলেন লাহিড়ী সাহেব। বেবি লাহিড়ীকে ডেকে বলেছিলেন, 'শুনেছ? শ্যাম লাহিড়ী তাঁর মেজো ছেলের মহল আলাদা করে রেখে গিয়েছিলেন। আর এখন নাকি সবগুলো মহলই সেই মেজো ছেলের। চাবিকাঠিটি হাতে এসে গেছে। আর ওয়ারিশান নেই।'

কিন্তু বারে বারেই বুঝি জন্মান্তর ঘটছে লাহিড়ীদের মেজো ছেলেটার? তাই আবার সে তিন-চারটে ওয়ার্ডরোব ভরতি সিল্ক, রেয়ন, টেরেলিন, গ্যাবার্ডিন, ছেঁড়া ন্যাকড়ার সমান ত্যাগ করে, শ্যাম লাহিড়ীর মতো থান ধুতি পরে ফের তেঁতুলগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ঐতিহ্যের দায় বহন করতে?

আচ্ছা জিতু লাহিড়ী নাহয় ফিরলেন? বেবি লাহিড়ীকেও নাহয় তার সমস্ত বিলাস বৈভবের জাল থেকে মুক্ত করে লাহিড়ীগিন্নিদের সাজে সাজিয়ে টেনে নিয়ে এলেন নিজের সঙ্গে, কিন্তু তারপর? পরবর্তীকাল? কে রক্ষা করবে পরবর্তী কালকে?

জিতু লাহিড়ীর যেই গোল্ড মেডালিস্ট এঞ্জিনিয়ার ছেলেটা একটি মার্কিন মহিলার তৃতীয় পক্ষের স্বামী হয়ে মার্কিন মুলুকেই বাস করছে, সে? না যে ব্যারিস্টারি পাস ছেলেটা একটা আধাবয়সি গোয়ানিজ মেয়েকে নিয়ে মদ খেয়ে মা-বাপের সামনে বেলেল্লাপনা করে সে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। পাথরের মুখ থেকে একটা ধাতব স্বর প্রতিধ্বনি হয়ে অনেকগুলো শব্দে বেজে উঠল, 'এইখানেই তুমি বরাবর বাস করবে?'

মুখ ফিরিয়ে হাসলেন জিতু লাহিড়ী, —করব বলেই তো এলাম।

—পারবে?

—আমি তো পারবই ঠিক করেছি।'

—আর যদি আমি না পারি?

—তুমি? হেসে উঠলেন জিতু লাহিড়ী।

—তুমি যদি না পারো? তোমার দরজা তো খোলাই আছে, খোলাই থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার বড়ো ছেলের কাছে আমেরিকায় গিয়ে থাকতে পারো, তোমার ছোটো ছেলের গোয়ানিজ বউয়ের সঙ্গে হোটেলে বসবাস করতে পারো, তোমার বর্মি আর বাঙালি দুই জামাইয়ের সংসারে পালা করে অতিথি হয়ে বছর কাটিয়ে নিতে পারো, অথবা তোমার সেই ছোটো মেয়ের জাহান্নামটা খুঁজে বার করে নিয়ে সেখানেই আড্ডা গাড়তে পারো। সেই জাহান্নামটার হদিস পেলে, চাইকী তোমার হারিয়ে যাওয়া জুয়েলারি সেটটা আর দামি দামি শাড়িগুলোর হদিসও মিলে যেতে পারে।

বরণা লাহিড়ী স্থির স্বরে বলেন, 'অপমান করে তুমি আমায় বিচলিত করতে পারবে তা ভেবো না। তা পারলে অনেক আগে সুইসাইডের ছেলেমানুষি পথটাই বেছে নিতাম, তোমার সঙ্গে এতদূর এসে সঙের ভূমিকা নিয়ে স্টেজে উঠতাম না। তবে এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, কিছুতেই কেন মনে থাকে না তোমার ওই জানোয়ারগুলো তোমারও সন্তান!'

—মনে থাকে না? বলো কী! অহরহ মনে থাকে। মনের মধ্যে শেলের মতো বিঁধে থাকে। আর সেটা থাকে বলেই তো সেই পিতৃত্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে—

বরুণা লাহিড়ীর মুখটা ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো টান টান কঠিন কঠিন দেখতে লাগে, আর গলার শব্দটাও তেমনি ধাতব শব্দের মতোই লাগে, —ওটা যে তোমার মুখের কথা, সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। মানে, জান সব অপরাধ আমার। কিন্তু তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো, ছেলে-মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী একা আমিই কি না। নিজেও কি তুমি অলওয়েজ—

—উঁহু উঁহু, প্রতিজ্ঞা ভুলে যাচ্ছ। ইংরিজি নয়, ইংরিজি নয়, বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজো।

—প্রতিশব্দ খুঁজে খুঁজে তোমার সঙ্গে গল্প করি এ শখ আমার নেই আর। শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি, জোয়ারের জল চিরস্থায়ী নয়। তোমার এই অতি অবাস্তব ভাবের জোয়ারটা কাটলেই দেখতে পাবে, তার নীচেও কাদা। যে-কাদায় পা বসে গিয়ে দুর্গতিই ডেকে আনে, গতি কেড়ে নেয়।

জিতু লাহিড়ী তেমনি হাসির সঙ্গে বলেন, 'দুর্গতি? মন্দ কী? সেটাই নাহয় কেমন দেখতে দেখা যাক।'

—ওঃ। দ্রষ্টব্য হিসেবে ওটা বোধ করি বেশ আকর্ষণীয়?

—তা গতির স্বাদ তো পাওয়া গেল অনেক দিন, মোটরের গতি, প্লেনের গতি, রকেটের গতি, উত্তরোত্তর গতির বেগ। যে-গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তোমার বান্ধবীদের স্বামীরা স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত হত, আর তোমার অনুরক্ত ভক্তরা পিছিয়ে পড়ে যাবার রাগে তোমার স্বামীকে মনে মনে অভিশাপ দিত, থামুক-না সেই গতির ঝাঁকুনি? টগবগিয়ে ফোটা রক্তটা ঠান্ডা মারুক-না একটু?

—চমৎকার! শুধু ভাবছি তোমার থিওরিটা যদি পৃথিবী এক বার নিতে চাইত! অনেক ছুটেছি বলে যদি একবার ঠান্ডা হতে চাইত!

—আরেক বার তুমি প্রতিশব্দ খুঁজতে ভুললে, থিওরিরও বাংলা আছে। কিন্তু সে যাক, আর একটা

বড়ো ভুল করছ, পৃথিবী বেপরোয়া ছোটে না, শুধু নিজের কেন্দ্রে আবর্তিত হয়। কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছুটতে শুরু করলে—'

স্ত্রীর ভুল সংশোধন আপাতত থামাতে হল জিতু লাহিড়ীকে, নীচেরতলা থেকে একখানি শানানো ধারালো গলা বেজে উঠল, —ওমা! নতুন মানুষরা যে এসেই ওপরতলায় উঠেছে। ওপরতলার মানুষ কিনা! কিন্তু এতদিনের বন্ধ বাড়ি, সিঁড়িতে চামচিকের আড্ডা, চট করে ওঠাটা ঠিক হয়নি। তা এ অধম মানুষটা যাবে নাকি?'

জিতু লাহিড়ী এবং বরুণা লাহিড়ী দু-জনেই চকিত হলেন, জিতু এগিয়ে এসে বারান্দার জাফরিতে ঝুঁকে গম্ভীর প্রশ্ন করলেন, 'কে?'

—কেউ না। এই লাহিড়ীদেরই একটা হতভাগা মেয়ে।

—আসুন। বলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর এক বার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দু-জনের দুরকম ভাষা।

এক জনের ভাষাটা কথায় পরিণত করলে এই দাঁড়ায়; দ্যাখো এইবার অডিয়েন্স এসে গেছে, যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে, অভিনয়ে যেন ত্রুটি না-থাকে তোমার।

অপর জনের ভাষাটা অনেকটা এই : পেয়েছ তো এইবার মনের মতো মানুষ? তোমার মতে আধুনিক সভ্যতার প্রলেপে যারা ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠেনি? তা ওসব তুমিই বোঝো। আমি কিছুর মধ্যে নেই।

এই অনুক্ত কথাগুলি অবশ্য অনুক্তই থাকল। নীচেরতলার মানুষটি ওপরতলায় উঠে এল।

আর একই মুহূর্তে দু-পক্ষেরই মনে হল, এরকমটি তো ভাবছিলাম না।

আড়ষ্ট হল দু-পক্ষই। কয়েকটা মুহূর্ত।

বেশিক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সরযূ নয়। মানে বছর চল্লিশের এই বিধবাটিকে মহিলা না-বলে যদি মেয়েই বলা হয়। চোদ্দ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত তো একইভাবে কাটিয়ে এল সরযূ। তাই বোধ করি 'মেয়ে' শব্দটাই তার সম্পর্কে ব্যবহার করে সবাই।

ভুবন লাহিড়ীর মেয়ে। শ্বশুবাড়ি ঘুরে এল না, মা হল না, তাই নতুন কোনো পরিচয়ের ছাপ পড়ল না তার গায়ে। অথচ চোদ্দো বছর বয়েস থেকেই একখানা থানমাত্র সম্বল করেছে, পিসি আর খুড়ির সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনের যাবতীয় বিধিপালন করে আসছে, বাড়ার ভাগ শুচিবাই। সক্কলকে টেক্কা দিয়েছে তাতে। আর টেক্কা দিতে পারে গলার জোরে।

পাড়ার এ প্রান্ত থেকে কথা বললে ও-প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। গ্রামের কোনো মেয়ের খরখরে কথা হলে লোকে তুলনা দিয়ে বলে, 'এটার দেখছি ভুবন লাহিড়ীর মেয়ের মতো গলা হচ্ছে।'

তা সে গলাকে একটু খাটো করল সরযূ। ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'তবে যে বিধু বলল, বড়ো লাহিড়ীমশায়ের ছেলে বউ এলেন—'

বরুণা লাহিড়ীর হঠাৎ কেন যে তাঁর থেকে বয়সে বেশ খানিকটা ছোটো এই মেয়েটাকে প্রতিপক্ষ মনে হল কে জানে। তবে মনে হল। আর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুরুটা কুঁচকে এল, বললেন, 'বিধু কে?'

—ওই যে গাড়োয়ান ছেলেটা। ফেরার মুখে দেখা, কে এল শুধোতে বলল, বড়ো লাহিড়ীমশায়ের ছেলে-বউ এলেন—

জিতু লাহিড়ীর হঠাৎ মনে হল, একে যেন আগে কোথাও দেখেছেন, কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব! তিনি যখন দেশ ছেড়েছেন, তখন এ জন্মেছে কি না সন্দেহ। তবে কি দেখেছেন এর মতো আর কাউকে। বেশ যেন পরিচিত। অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, মৃদুহাস্যে বললেন, 'তাঁরা যে আসেননি, সেটা কে বলল?'

সরযূ বেশ নিরীক্ষণ করে আর একবার যুগল মূর্তিটি দেখে নিয়ে বলে, 'তা তাঁর ছেলে বলতে তো এক জনই আছেন—'

—এক জনকেই তো দেখছেন—

—ওমা! সরযূ সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলে, 'তিনি কি এই আপনার মতো?'

—আমার মতো নয়? দেখেছেন তাঁকে?

—নাঃ, দেখব আর কোথা থেকে? তিনি কি আর কখনো এই হতভাগা দেশে পদধূলি দিয়েছেন? তবে শুনেছি নাকি তিনি নিজে সাহেব, গিন্নি মেম, বাংলা বুলি মুখে আসে না, বাঙালির খাদ্য জিভে রোচে না, কর্তা-গিন্নি নাচের আসরে গিয়ে নাচ করেন।

বরুণা বোধ করি আর বরদাস্ত করতে পারেন না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আরও কী কী শুনেছেন তার একটা লিস্ট করে আনলে সুবিধে হত না? আর আপনার সংবাদদাতা—'

—কী মুশকিল! জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন, —তুমি চটে উঠছ কেন? সত্যি কথা শুনলে রেগে ওঠা রোগটা তোমার আর গেল না। সংবাদদাতা যেই হোক, ভুল সংবাদ তো আর পরিবেশন করেনি। কিন্তু আচ্ছা—আপনিও তো লাহিড়ীদের কে যেন হন বললেন না?

—লাহিড়ীদের কেউ সেকথা আর বলতে দেয় কই? গোত্তর পদবি সব তো কোন কালে কেড়ে নিয়েছে। এদের বাড়িতে জন্মেছিলাম, সেইটুকু দাবির জোরে আজন্ম এদের অন্ন ধ্বংসাচ্ছি। সে যাক, আপনাদের পরিচয়টা না-শোনা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছে না। হঠাৎ দেখে যেন আচমকা জ্যাঠামশাইয়ের চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল! অথচ—

—জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই কাকে বলছেন বলুন তো?

গুরুজনের নামোচ্চারণে মফস্সলিদের যে-ধরনের ইতস্তত ভাব দেখা যায়, সরযূর কণ্ঠেও সেই সুর ধ্বনিত হল। থেমে আস্তে বলল, 'আমি শ্যাম লাহিড়ী মশাইয়ের কথা বলছি—'

—শ্যাম লাহিড়ী আপনার জ্যাঠামশাই হতেন? আপনি—

—ভুবন লাহিড়ীর মেয়ে। ছোটো মেয়ে।

জিতু লাহিড়ী সকৌতুকে বলেন, 'ওঃ! ওবাড়ির ভুবন লাহিড়ীর মেয়ে আপনি? তাই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন দেখেছি। নিশ্চয়, আপনি আপনার বাবার ধরনের দেখতে?'

—লোকে তো তাই বলে। আবার এও বলে পিতৃমুখী কন্যা সুখী। তা আজন্ম তো সুখের সাগরে ভেসে শাস্তরবাক্য সত্যি করছি! কিন্তু যাই হোক আপনার নামটা বলে সন্দেহ ভঞ্জন করুন বাবু।

—নাম? তেঁতুলগোড়ায় কি আর আমার নাম কেউ মনে রেখেছে? এখানে যখন ছিলাম, লোকে তো 'জিতু জিতু' করে ডাকত।

—ওমা! সে কী! সরযূ গালে হাত দেয়। তাহলে তো দিল্লির সেই সাহেবই হচ্ছেন গো। তবে তো দেখছি লোকের সব বানানো। হিংসে করে সেইসব রটিয়েছে। এ তো দেখছি একেবারে কাশীর টুলোপণ্ডিত। নাঃ, রটা কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

বলেই সরযূ সহসা থানের আঁচলটা গলায় বেড় দিয়ে ঘট ঘট করে দু-জনার পায়ের কাছেই এক-একটা প্রণাম ঠুকে বলে, 'অপরাধ নেবেন না দাদা, এতক্ষণ কে-না-কে বলে পেন্নামটা তুলে রেখেছিলাম। তবে এও বলব, অবিকল জ্যাঠামশাইয়ের মতো দেখতে না-লাগলে বিশ্বাস করতাম না। ভাবতাম জাল প্রতাপচাঁদের মতন—'

জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন। এবং সম্পর্কটা স্থির হয়ে যাওয়ায় আর 'আপনি' না বলে 'আপনি তুমি' বর্জিতভাবে বলেন, 'সর্বনাশ। ভেজালটেজাল নয়, একেবারে পুরোপুরি জাল। কিন্তু জাল করতে কি

কেউ চাল বদলে আসে? বরং প্রাণপণে ময়ূরপুচ্ছটা আঁকড়েই থাকে। ভেজালের জাল ছিঁড়ে ফেলে দেখতে এলাম তেঁতুলগোড়ায় এখনও আমায় মনে রেখেছে কি না।'

সরযূ হেসে ফেলে বলে, 'ও বাবা, মনে খুব রেখেছে। বেশিরকম মনে রেখেছে। তবে এরকম খড়ম পরা টুলোপণ্ডিত জানলে কি আর মনে রাখত? হোমচোমরা সাহেব বলেই মনে রেখেছে।'

—তাই নাকি? হেসে ওঠেন জিতু লাহিড়ী।

আর বরুণার মনে হয় বহুকাল স্বামীর এমন কৌতুকোজ্জ্বল সরস হাসি শোনেননি। যা হাসেন, যা এতদিন ধরে হেসে এসেছেন, সে শুধু ব্যঙ্গ হাসি। রাগে হার জ্বলে যায় বরুণার। এই একটা গ্রাম্যবিধবা, অসভ্যর চরম, গায়ে একটা জামা পর্যন্ত দিতে শেখেনি, ভদ্রভাবে কথা কইতেও জানে না, তার সঙ্গে কথা বলতে ওনার মন একেবারে আহ্লাদে উথলে উঠল।

আর কিছু নয়। মূল গোড়ায় যে এই তেঁতুলগোড়ার গ্রাম্যতা! ছিটকে বাইরে গিয়ে, আর 'বেবি লাহিড়ী'র হাতে পড়ে, ওপরে একটু পালিশ পড়েছিল। এতটুকু একটু ধাক্কাতেই সেই পালিশের পলস্তারা খসে পড়ল। নইলে এযুগে, সভ্য সমাজে ক-টা ছেলে-মেয়ে জাতি গোত্র মিলিয়ে বিয়ে করছে, অথবা সুবোধ সুশীল হয়ে দিন কাটাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা এতটুকু একটু এদিক-ওদিক করেছে বলে বাপ একেবারে আধুনিক সভ্যতার ওপরই খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন।

অথচ এখানের এই বাচালতা অসভ্যতা আর ধৃষ্টতাটি দিব্যি উপভোগ করেছেন। হবেই তো, ওই দেখে দেখেই তো বনেদ গড়েছে!

কথা বলতে নেহাত প্রবৃত্তি হচ্ছে না তাই চুপ করে আছেন বরুণা। নইলে ওকে এমন দু-একটি কথা শুনিয়ে দিতেন যে চিরদিনের মতো ওর ওই বাচালতা বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু সত্যিই কি শুধু প্রবৃত্তি হচ্ছে না বলে?

চিরদিনের নির্ভীক বেবি লাহিড়ী কি চিরদিনের প্রশ্রয়দাতা স্বামীটিকে আজকাল বেশ একটু ভয় করছেন না? মুখে স্বীকার না করলেও মনের মধ্যে আশঙ্কা রয়েছে, হয়তো সেই প্রশ্রয়ের অবসান হয়েছে। অবসান হয়েছে যবে থেকে বেবি লাহিড়ীর তিন মেয়ে শিলা, শেলি আর সোমা বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনোদিন ভেবে পাননি বেবি লাহিড়ী, স্ত্রীর সর্ববিধ বাচালতাকে যিনি চিরদিন সকৌতুকে অবহেলা করে এসেছেন, মেয়েদের ব্যাপারেই-বা তিনি এমন কঠিন হয়ে উঠলেন কেন? বেবি লাহিড়ীর দৌড়টা নেহাৎই তাঁর নিজের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলেই কি খেলাচ্ছলে দৌড়োতে দিতেন? কিন্তু বেবি লাহিড়ীর দৌড় সীমাবদ্ধ না-হয়ে উপায় কী? বেপরোয়া হবার জোরটা তার কোথায়? মেয়েদের মতো তো তাঁর এম. এ, বি. এ পাস করা বিদ্যের জোর নেই? ওইখানেই যে অসহায়তা।

স্বামী সঙ্গে না-থাকলে বাইরের হাটে সেই 'না বিদ্যের' হাঁড়িটি ফেটে যাবার ভয়ে সর্বদা স্বামীর খুঁটিটি আঁকড়ে থাকতে হয়েছে বেবি লাহিড়ীকে। কিন্তু ওদের সে-ভয় থাকবে কেন? ওদের বিদ্যেই ওদের বুকের বল।

ওরা জানে বাপ-ভাই-স্বামীর সঙ্গে না-বনলে নিজে 'করে' খেতে পারবে। জানে ইংরেজি ভাষাটা ভালোমতো রপ্ত থাকলে পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়। অথএব পৃথিবীকে ভোগ করবার নেশায় মাততে ভয় পায়নি ওরা। অবিশ্যি ছেলে-মেয়েগুলো ওইভাবে বেইমানি করে মা-বাপকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্যে পাঁজর ভেঙে গেছে বরুণার, তবু স্বামীর কাছে অপ্রতিভ হওয়ার লজ্জাটাই বেশি বেজেছে। ওরা যদি এক জনও 'মা' বলে জায়গা দিত, লাহিড়ীর সাধ্য ছিল বরুণাকে এই কারাবাসে এনে ফেলতে? এই সং সাজাতে?

তবু সং সাজার বিরুদ্ধে লড়তে কি চেষ্টা করেননি বরুণা?

কিন্তু ক্রমশ ভয় হল, মানুষটা খেপে যাবে। ডাক্তারেও আড়ালে পরামর্শ দিল, উনি যা বলেন শুনে যান। নইলে খেপে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথচ খেপে যাওয়া কি আটকাতে পারলেন বরুণা? এই খড়ম, এই চাদর, এই গোরুর গাড়ি, আর এই পচা ভাঙা বাড়িতে এসে শাক-ভাত গ্রহণের সংকল্প, এসব কি সুস্থতার পরিচয় দিচ্ছে? দিচ্ছে না। তার উপর যদি তাল দিতে এমনই সব প্রতিবেশী এসে গায়ে পড়ে! জনমানবশূন্য দেশে সেলে থাকা কয়েদির মতোই থাকবেন ভেবে এসেছিলেন বরুণা, অর্থাৎ যতদিন না স্বামীর এই 'ভাবের ফেনা' শুকোয়। কিন্তু মনে হচ্ছে সে-ফেনা এরা শুকোতে দেবে না। এইভাবে এসে পায়ে পড়বে, জিইয়ে রাখবে।

অনেকক্ষণ নিজের তীব্র বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন বরুণা। ওরা যে এতক্ষণ কী বলাবলি করছিল ঠিক শুনতে পাননি। শেষ কথাটা শুনতে পেলেন, 'আচ্ছা সে যখন করবেন তখন করবেন, আজ আপনাকে ছাড়ছে কে! সরযূকে তো চেনেন না? ওই কথাই থাকল তাহলে। আর বউদিদি তো এই গাঁইয়া ননদের সঙ্গে কথাই কইলেন না। আচ্ছা বাবা এ খোট্ ক-দিন রাখতে পারেন দেখব। এখন বলে যাইগো বউদি, ছোটো লাহিড়ী বাড়িতে হরগৌরীর নেমন্তন্ন থাকল। না গেলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাব।'

বলে আর একবার গলবস্ত্র হয়ে 'গড়' করে সরযূ। আর অসতর্কে পিঠের কাপড়টা একটু সরে গিয়ে পাঁজরের কাছের একাংশের দুর্দান্ত ফর্সা রঙের একটুখানি যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠা এক চিলতে আগুনের মতো ঝলসে ওঠে বরুণার চোখে। আগুনই মনে হল, মুখ-হাত-পা তো এতটা ফর্সা নয়।

কটু একটা বিদ্বেষে মনটা বিষিয়ে ওঠে বরুণার। যেন সরযূর সেটা প্রাপ্য পাওনা নয়, বিধাতাপুরুষ সেটা ওকে অন্যায় করে দিয়ে ফেলেছেন। তা ছাড়া কী অসভ্যতা! কী অশ্লীলতা!

কিন্তু শুধু কি অসভ্যতা? কী ধৃষ্টতা! কী দুঃসাহস! নেমন্তন্ন করতে চাইছে! লাহিড়ী সাহেব আর বেবি লাহিড়ীকে।

তা সরযূর নিকটজনেরাও সেকথা বলে ওঠে। পিসি আর খুড়ি গালে হাত দিয়ে বলে, 'ধন্যি বুকের পাটা! নেমন্তন্ন করে এলি তাদের?'

সরযূও গালে হাত দেয়, —ওমা নেমন্তন্ন কীসের? বাড়ির ছেলে এতকাল পরে বাড়ি ফিরল, প্রথম দিন দুটো খেতে বলব না? বলি লাহিড়ী বাড়িতে তো এখনও মানুষজন রয়েছে, ভাতের হাঁড়ি চড়ছে—'

সরযূর বিধবা ভাজ বলে, 'সেই হাঁড়ি আর ওরা? ওরা তোমার ডাল-ভাত-মাছের ঝোল খাবে?'

—দ্যাখো খায় কি না? ওগো বলি তাহলে, যা শুনে এসেছ তার কিছু নয়। সাহেবটাহেব কিছু না, সদ্য যেন শ্যাম জ্যাঠা দাঁড়িয়ে। ঠিক তেমনি থানধুতি, মোটা চাদর, হাতির দাঁতের গুলোদেওয়া খড়ম—

—ধুতি! চাদর! খড়ম!

—তবে আর বলছি কী গো? যতদূর বুঝলাম, সাহেবিআনা আর বড়োমানুষি করে আশা মিটে গেছে, অরুচি ধরে গেছে, তাই বানপ্রস্থ নিতে এসেছেন কর্তা-গিন্নি। কোনো সদ্‌গুরুর দীক্ষার ফলও হতে পারে। এমন হয়। লালাবাবুর কথা তো জানা আছে? তবে গিন্নির এখনও সে-মন হতে বাকি আছে। দাঁড়িয়ে আছেন যেন কাঠ-পাথরের পুতুল! যা বুঝলাম আমার ওপর রেগে লাল হয়ে গেছে।

—এই মরেছে! তুই আবার এক্ষুনি কী বলতে গেলি তাকে?

—তাকে আবার কী বলব? গাঁইয়াভূত দেখেই ভদ্দরমহিলার চিত্ত চটে গেছে আর কী! অবিশ্যি সাজসজ্জা করেছে খুব হিন্দুয়ানি। কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে যেন? ঠিক থিয়েটারের সাজা গিন্নি! যাক গে বাবা পরচর্চা, খুড়ি তোমার হেঁসেলের খবরটা শুনি—

—পোড়া কপাল! আমার হেঁসেলের আবার খবর! এই কাঁঠাল বীচি দিয়ে ভাজা কড়ায়ের ডাল নামিয়েছি, কুমড়োডাঁটার চচ্চড়ি আর, আর আলুপটলের সর্ষে ঝাল কুটেছি। একটু বড়ির টক যদি করি।

—হবে হবে ওতেই হবে। এখন সাহেবের মুখে দিশি রান্নাই রুচবে। দু-খানা বরং কুমড়ো ফুলের বড়া করো, আর পায়েস চড়িয়ে দাও একটু। আমি দুলালের মাকে একবার মাছের কথা বলে আসি।

সরযূর ভাজ বলে, 'দুলালের মা তো গেলকাল খয়রা মাছ বই কিছু আনেনি, তোমার ছোটো ভাইপো রেগে লাল। বলে, উঠোনে ইট পেতে হাঁসের ডিম রেঁধে খাবে—'

—ওরে বাবা খয়রা মাছ, খয়রা মাছই ভালো। সাহেব হয়তো দেশ ছেড়ে পর্যন্ত ও-জিনিস চোখেই দেখেনি। আমার জন্মের ক-বছর আগে দেশ ছেড়েছিল গো?

—তা বছর চার-পাঁচ হবে।

—বাবা! একেই বলে নিরুদ্দিশ রাজার উদ্দিশ! যাক গে! তোমরা হাত চালিয়ে নাও। পারো তো সহজের মধ্যে রান্নার আর দু-একটা পদ কোরো—আমি চললাম গাঁয়ে খবর দিতে।

—তা তো যাবিই, পিসি হাঁক দেয়, —তুই হলি গেজেট। তা ভিজে কাপড়ে চললি যে?

—আবার তো ডুব দিয়ে ফিরব গো?

—মরতে তবে এক্ষুনি ডুব দিলি যে?

—ওমা! শোনো কথা! এই বন্ধ বাড়ির উঠোনে কী-না-কী জমেছে এতকাল ধরে, মাড়িয়ে মরিনি? কত ডিঙিয়ে যাব? ভিজে কাপড় কতক্ষণ ভিজে থাকবে? যা ধুপ ফুটছে—

দ্রুত ছুটে বেরিয়ে পড়ে সরযূ। খবরটা বিলি করা দরকার।

শুধু ওদের খবর দেওয়াই নয়, দুলালের মা আবার মাছগুলো-না আর কারও ঘরে জোগান দিয়ে বসে। গয়লানিকেও বলতে হবে। বাড়িতে মজুর মিস্ত্রি লাগিয়ে বসবাসযোগ্য করে নিতে ওদের এখন লাগবে দু-দশ দিন, সে-কদিন তো ওদের জোর করে এখানেই খাওয়াতে-দাওয়াতে হবে। তা ছাড়া যা বোঝা যাচ্ছে, সাতটা দাস-দাসীর ওপর থেকেছে চিরকাল। এখনই হঠাৎ খেয়াল পড়ে...তবু নিজে আর রেঁধেছে গিন্নি। একটি বামুনের মেয়ে জোগাড় করে দিতে পারলে—

সমস্ত দায়িত্ব যেন সরযূরই। কে যে তার ওপর চাপিয়েছে সে-দায়িত্ব, কে জানে। কিন্তু শুধুই কি আগন্তুক মানুষটা লাহিড়ী বাড়ির বলে? গ্রামে যত বাড়ি আছে, সকলের সব দায়িত্বই কি সরযূর নয়? বাগদি বাড়িও তো বাদ যায় না। গ্রামের সব্বাই সরযূরই হেফাজতে আছে কেন? কেউ কোনো অসুবিধেয় পড়েছে কি সরযূ মাথায় সাপ বেঁধে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সরযূর ভাজ বলে, 'পারবে না কেন! আপন সংসারের দায়দায়িত্ব তো আর নিতে হল না কোনোদিন? সারা রাজ্যি টহল দিয়ে এসে বাড়া ভাতটি খেতে পাচ্ছে—'

পিসি কুটুস কামড় দিয়ে বলে, 'এই বুড়ি দুটো যে-কদিন সেই ক-দিনই পাবে বউমা! তারপর তো আর নয়।'

ভাজ মনে মনে বলে, তাঁরা তো চিরদিনই থাকবেন। তা বলে মেয়েমানুষ কখনো হাঁড়িতে হাত দেবে না? মুখে বলতে সাহস পায় না। তেঁতুলগোড়া এখনও অত সাহস যোগান দিতে শেখেনি।

তা সরযূর সত্যিই দোষ আছে। রান্নঘরের দিকে নেই সরযূ।

বলে,'রক্ষে করো বাবা, তোমাদের ওই চালার নীচে ঢুকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে আসে আমার। রন্ধন না বন্ধন। তা ছাড়া ওর ভেতর ঢুকলেই তো আমার মনে হবে সব সকড়ি ঠেকা। ধুতে মুছতেই দিন কাবার হবে, রান্না আর হবে না।'

ভাজ বলে, 'জ্ঞানপাপী।'

পিসি বলে, 'ওই নিয়েই তো ওর জীবনটা কাটালো। একটা কিছু অবলম্বন তো চাই মানুষের।'

ভাজ মনে মনে বলে, অবলম্বনটা বেশ ভালোই। পাড়াবেড়ানো, গালগল্প আর শুচিবাই। মনে মনে বলে, মুখে বলার সাহস নেই। মাথার ওপর দু-দুটো শাশুড়ি! অথচ নিজেরই তার শাশুড়ি হবার সময় হয়ে এল। ছেলে বড়ো হয়ে উঠল।

সরযূ অবিশ্যি বলে, 'এমন তপস্যা কে কোথায় বসে করেছে বউ যে, তোমার ওই সোনার চাঁদ ছেলেদের জামাই করবে?' কিন্তু সরযূ কাকে কী না-বলে? নইলে আর বরুণা লাহিড়ীকে ঠোকর মেরে যায়?

সেই ঠোকরের ঘায়ে সরযূ চলে গেলে বরুণা লাহিড়ী মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন দাঁতে ঠোঁট চেপে। তারপর তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে ওঠেন, 'এটাই বোধ করি তোমাদের দেশের দেশীয় সভ্যতার 'নিদর্শন?'

জিতু লাহিড়ীও স্তব্ধ হয়েছিলেন। বোধ করি চিন্তা করছিলেন যখন দেশটা ছেড়ে গিয়েছিলেন, আর কে কে ছিল। যাদের সঙ্গে সম্পর্কের কণিকাটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে চাননি, তাদের সকলকে এত মনে আছে? অথচ স্মরণ করেননি কখনো। ভুবন কাকার বড়ো ছেলেটা বোধ হয় জিতুর বয়সিই ছিল। ঢের দুষ্টুমি করা গেছে তার সঙ্গে। বেঁচে আছে না নেই জিজ্ঞেস করা হল না সরযূকে। হয়তো নেই। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বড়ো তাড়াতাড়ি মরে। তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়, তাড়াতাড়ি মরে। হিতু, তার নিজের দাদা, সেও তো কোন কালে মরে গেছে। চিরকালই হিতু একটু রুগ্ন রুগ্ন ছিল বটে, বনত না দুরন্ত জিতুর সঙ্গে, রাত-দিন ঘরে বসে থাকতে ভালোবাসত, তবু মরে গেল। ছোটোটাও তো গেছে। তাকে অবিশ্যি খুব একটা মনে পড়ে না। মা-পিসির কোলে কোলেই থাকত তখনও। পিসিটিসি আরও কতই তো সব ছিল, সব নিঃশেষ। শেষ অবধি সরকার মশাই। তিনিই কীভাবে জিতুর ঠিকানাটা সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে বিশেষ ঘটনার সংবাদ দিয়ে এক-একখানি চিঠি দিতেন। বরাবরই দিতেন। কেন কে জানে!

বিশেষের মধ্যে মৃত্যুটাই প্রধান। সেই খবরগুলো খবরের কাগজের শোকসংবাদের মতো গ্রহণ করতেন জিতু লাহিড়ী। কাগজ মুড়ে সরিয়ে রাখার মতো সরিয়ে রাখতেন।

শুধু মায়ের মৃত্যুর খবরে মনের মধ্যে তোলপাড় একটা হয়েছিল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বসেছিলেন বেশ খানিকক্ষণ। ভেবেছিলেন কালীবাড়ির পুরুতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কি না কতদূর কী করণীয়, তারপর মনের জোর করে দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যথারীতি জুতো জামা পরে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বরুণাও জানেনি। পরে বাবার মৃত্যুখবরটা বরুণার হাতেই আগে পড়েছিল। সে-সময় সে বলেছিল, 'তাহলে এখন কী করবে?'

জিতু লাহিড়ী জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'করবার আবার কী আছে? আমি সে-বংশের কে? আমি তো ত্যাজ্যপুত্র। ত্যাজ্যপুত্রের কি জাতি গোত্র থাকে, না বংশধারার সঙ্গে যোগ থাকে? থাকলে বাড়ির সরকারের কাছ থেকে মা-বাপ মরার খবর—' কথাটা অসমাপ্তই থেকেছিল।

—তাহলে কিছু করা হবে না? বরুণা অসমাপ্ত কথারই জের টেনেছিল।

—না না না।

—খাওয়া-দাওয়া—

—বলছি তো কিছু করতে হবে না। বার বার ও-কথা তুলছ কেন?

—বেশ আমার কী? আমার বলবার কথা, বললাম। এরপর কেউ যেন না-বলে আমার বলা উচিত ছিল।

নিশ্চিন্ত থাকো, তোমায় কেউ কিছু বলবে না।

সন্দেহ নেই, স্বামীর ওই আত্মীয়দের প্রতি ক্ষুব্ধ বিদ্রোহাত্মক উক্তিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন করুণা।

আর জিতু লাহিড়ী পাঁচ-সাত-দশ দিন পর্যন্ত অনবরত জপ করেছেন, ঠিকই করেছি। সত্যিই তো আমি কে তেঁতুলগোড়ার লাহিড়ী বাড়ির? আমি তো কেন্দ্রচ্যুত, বংশচ্যুত। আমি জল পিণ্ড দিতে গেলেই কি শ্যাম লাহিড়ী সে-জল নিতে আসতেন নাকি?

আশ্চর্য নিয়তি! আজ জিতু লাহিড়ী নিজে এসেছেন সেই বংশধারার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। আধুনিকতার তীব্র বিষে জর্জরিত জীবনটাতে একটুখানি কোমল শান্তির প্রলেপ লাগাতে।

এই শুচিস্নিগ্ধ সুনির্মল সকালের আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেন নতুন করে অনুভব করেছেন জীবনটাকে কী অপচয় করেছেন। সারাটা জীবন তাঁকে যেন একটা উন্মাদ প্রভু চুলের মুঠি ধরে তাড়িয়ে নিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে গ্লানির মধ্যে, ক্লেদাক্ত আবিলতার মধ্যে, আর তিনি 'ভাগ্যের ঘরের চাবিকাঠিটি পেয়ে গিয়েছি' ভেবে গর্বে আর পুলকে সেই প্রভুর দাসত্ব করেছেন।

'উঠতে হবে, আরও উঠতে হবে, ছুটতে হবে, আরও ছুটতে হবে—' এই নেশার ঘোরে কেটে গেছে এমন কত সকাল কত সন্ধ্যা, কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেননি।

আলো ঝলমলে শহর কোনোদিন টের পেতে দেয়নি পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামে। মনে পড়িয়ে দেয়নি জীবনেও সন্ধ্যা নামে।

সুখ? সুখ পেয়েছেন কখনো? পেয়েছেন আনন্দ?

পেয়েছেন বই কী। সুখ পেয়েছেন অপরের ঈর্ষার মধ্যে, অপরকে অবজ্ঞা করার মধ্যে, অন্যকে 'ক্ষুদ্র প্রাণী' ভাবার মধ্যে! মানুষকে মানুষ মনে না-করার মধ্যে পেয়েছেন সুখের উপাদান।

আর আনন্দ খুঁজেছেন নতুন গাড়িতে, বড়ো বাড়িতে, বেপরোয়া অপব্যয়ে, বিলাসিতার উন্মাদনায়। আর দুরন্ত ছোটাছুটির ক্লান্তিতে বিশ্রাম খুঁজতে গেছেন নাচের আসরে, কক্‌টেল পার্টিতে। বেবি লাহিড়ীর কায়দাদুরস্ত উন্নাসিক অফিসার বাপকে 'থ' করে দিয়েছেন বেবি লাহিড়ীকে 'ড্রিঙ্ক' করার কুসংস্কার ভাঙিয়ে।

প্রথম জীবনে বেবি লাহিড়ী তার পতিগৃহকে পিতৃগৃহের তুলনায় ফ্যাশানে আর রুচিতে খাটো ভাবত, এইটুকুই হয়তো ছিল ওই ছোটার চেষ্টার মূল বনেদ। বেবি লাহিড়ীকে তাক লাগিয়ে দেবার ছেলেমানুষি দুর্মতি শুরু করাল জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

কিন্তু তবু জিতু লাহিড়ীই যেন হারলেন শেষ অবধি।

তাক লাগানোর খেলায় বেবি লাহিড়ীই অবিরত জিততে থাকল। আর তার সহায় হয়ে উঠল ছেলে-মেয়ে পাঁচটা। জিতু লাহিড়ীর পয়সার শ্রাদ্ধ করে করে যারা সবচেয়ে নামি আর দামি বিলেতি স্কুলের বোর্ডিঙে থেকে লেখাপড়া করল, আর সেই লেখাপড়ায় সমাপ্তির রেখা টানতে সমুদ্র পারাপার করল। মেয়েরা অবশ্য নয়, ছেলেরা। মেয়েরা তো তখন দিল্লির আকাশে উড়ছে, আর বেবি লাহিড়ী লাটাইয়ের সুতো ছাড়ছেন।

কিন্তু বেচারা বেবি লাহিড়ীর আত্মবিশ্বাসটা বড়ো বেশি খর্ব হয়ে গেল। ছাড়া সুতো গোটাতে গিয়ে দেখলেন ঘুড়ি হাতছাড়া। বল-বুদ্ধি-ভরসা তিন মেয়ে বেবি লাহিড়ীর, একটাও হাতে রইল না। বিলকুল বেহাত হয়ে গেল। ছেলে দুটো তো আগেই গেছে। তাদের কথা ভাবতে ঘৃণা হয়। কী অশুচিতা! কী অপবিত্রতা!

কোন কোন উপায় অবলম্বন করে নিজে তিনি উন্নতির এক-একটি সোপান গেঁথেছিলেন, সেটা আর

কিছুতেই মনে পড়ে না জিতু লাহিড়ীর। বিলাস বৈভবের লবণ রসে জারিত ফেনিল সেই অতীত জীবনটাই শুধু ব্যঙ্গহাসি হেসে হেসে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু প্রথমটা কি নিজেই চোখ বুজতে চেষ্টা করেননি লাহিড়ী সাহেব? পরিচিত সমাজে যখন লাহিড়ী সাহেবের মেয়েরা একটা মুখরোচক আলোচনা হয়ে উঠেছে, তখনও কি সেই নিন্দাকারীদেরই 'ননসেন্স' বলে অগ্রাহ্য করেননি তিনি?

তারপর? তারপর যখন মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠল, তখন—

স্ত্রীর প্রশ্নে চিন্তাভঙ্গ করে চকিত হলেন জিতু লাহিড়ী, বললেন, 'কী বলছ?'

—বলছি এটাই বোধ করি তোমাদের গ্রামীণ সভ্যতা?

—কোনটা?

—বলছি, এই যে চেনা নেই, জানা নেই, গায়ে পড়ে আত্মীয়তা জানাতে এসে যাকে যা খুশি বলা, এই বাচালতা, বেহায়াপনা—

—বেহায়াপনা! বেহায়াপনার কী দেখলে?

—সভ্যতারও কিছু দেখলাম না। গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই। মেয়েরা একটু খাটো ব্লাউজ পরলে চক্ষুশূল হত তোমার, সে-বার রাউথ সাহেবের স্ত্রীর বার্থডে পার্টিতে যাবার দিন গাড়িতে উঠতে গিয়ে তুমি শেলিকে সাজবদল করতে বাধ্য করেছিলে, আর একদিন সোমার একখানা দামি শিফন শাড়ি একটু বেশি পাতলা এই অপরাধে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলে। সেকথা ভোলনি নিশ্চয়? অথচ এই খালি গায়ে পিঠ-পাঁজরা দৃশ্যমান করে প্রণাম করার ঘটাকে বেশ অম্লান বদনে—

শুধু 'দৃশ্যমান' নয়, বলতে যাচ্ছিলেন বরুণা 'দৃশ্যলোভন,' সামলালেন। সামলালেনও নয় ঠিক। সামলাতে হল।

ধমকে উঠেছেন জিতু লাহিড়ী। —থামো! যা মুখে আসে তাই বলতে হয় এ অভ্যাসটা ত্যাগ করো, কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা করছ ভেবে করো!

—ভেবেই করেছি! তফাৎটা আমাকে বোঝাও।

জিতু লাহিড়ী নির্নিমেষ নেত্রে একটু তাকিয়ে থেকে বলেন, 'বোঝালেও বুঝবে না। ওটা নিজে বোঝবার। আর সে-বোধশক্তি তোমার নেই।'

বরুণা ঈষৎ গুম হয়ে থেকে বলেন, 'না, তোমাদের দেশীয় সভ্যতা বোঝবার মতো বোধশক্তি সত্যই নেই আমার! বোঝার সত্যিই দরকারও দেখি না। যাক, মনে হচ্ছে আপাতত হবিষ্যান্নের শখটা মুলতুবি থাকল। মহোৎসাহে নেমন্তন্নটা গ্রহণ করলে।'

—তা বোধ হয় করলাম।

—প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ বোঝবার মতো বোধশক্তিও আমার নেই বোধ হয়।

—থাকলে তো কারণ জানতেই চাইতে না! কিন্তু তোমার আর এতে রাগ কেন? তুমি সেই কল্পিত হবিষ্যান্নে খুব যে একটা উৎসাহ বোধ করছিলে তাও তো নয়?

—অবশ্যই নয়। তবে নেমন্তন্নেও উৎসাহ বোধ করছি না। তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝো। আমি যাব না।

—সেই অনুমানই করছিলাম। কিন্তু যেতে পারলে হয়তো লাভবানই হতে।

—লাভবান? থাক আমার লাভ-লোকসানটা তুমি একটু কম করে দ্যাখো।

—তাহলে দেখব না। নইলে মনে পড়িয়ে দিতাম আজ হয়তো তোমার ভাগ্যে উপবাস। এই বাড়ি সাফ না-করানো পর্যন্ত—

—সেটা বোধ করি এইমাত্র মনে পড়ল? নাকি জ্ঞাতি বোনের ভরসাটা মনের মধ্যে ছিল?

—জ্ঞাতি বোনের খবরটা জানা থাকলে ভরসা থাকত। ছিল না। সেটাকে আকস্মিক লাভের অঙ্কেই জমা দিচ্ছি।

—লাভের মাপকাঠিটার এই উন্নত পরিবর্তনে বাহবা দিচ্ছি।

—ভালো। তবে আমিও তোমার সুন্দর বাংলা বলার জন্যে বাহবা না-দিয়ে পারছি না। সত্যি ইংরিজি আর হিন্দি ছাড়া তো কথাই বলতে না এতদিন। এত ভালো ভালো বাংলা শব্দ তুমি শিখলে কখন?

—তোমার স্মৃতিশক্তিটা যখন এত তীক্ষ্ণ, আশা করি ভাবলে মনে করতে পারবে, নিজেও তুমি ইংরিজি ছাড়া আর কিছু বলতে না।

জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন। বলেন, 'কী মুশকিল! ভাবতে হবে কেন? মনে তো সর্বদাই জ্বলজ্বল করছে। নিজের চেহারা তো নিজের চোখে দেখতে পায় না মানুষ, দেখে আর্শির গায়ে। মনে করো তুমিই সেই আর্শি। ওর মধ্যেই নিজেকে স্পষ্ট দেখে নিয়েছি।'

বরুণা লাহিড়ী রূঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আমাকে এভাবে গড়েছ তুমিই।'

—না, এটা কিন্তু ঠিক বললে না। জিতু লাহিড়ী হেসে ওঠেন। —গড়নের জন্যে বাকি কিছুই ছিল না। সেটা তোমার বাবার হাতেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পালিশ, ওটা বাকি ছিল।

—রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যখন রাস্তার ভিখিরির মতো শূন্যহাতে আমার বাবার কাছ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যদি বাবা সাহায্য না করতেন, এত অহংকার তোমার থাকত কোথায়? তীব্র এই প্রশ্নের আবেগে বরুণা লাহিড়ীর মুখটা লালচে দেখায়।

কিন্তু জিতু যেন নির্বিকার। সেই নির্বিকার হাসি হেসে বলেন তিনি, 'আরে একটা কথা তুমি ভুলেই যাচ্ছ বেবি, ভিখিরির মতো তোমার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কোথায়? দাঁড়িয়েছিলাম তোমার বাবার মেয়ের কাছে। ভুলে যাচ্ছ? তোমার স্মৃতিশক্তি তো এত দুর্বল নয়!...কতদিন তারপর হেসেছিলাম সেই কথা নিয়ে মনে নেই? হাসতাম, "কচ-দেবযানীর ঘটনা বারে বারেই ঘটে পৃথিবীতে" বলে। সেই যে তার কী যেন চমৎকার লাইনটি বলতাম? সেই যে..."আসিয়াছি তব দ্বারে, তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে—।" তার গোড়াটা কী?'

—থাক! তোমার সঙ্গে কাব্য আউড়ে পুরোনো স্মৃতির মন্থন করবার সময় আমার নেই। শুধু এইটকু মনে করিয়ে দিচ্ছি ড্রিঙ্ক করবার জন্যে তুমি অন্তত দশ দিন অনুরোধ উপরোধ করেছ আমায়।

—দিনটা হয়তো একটু বাড়াচ্ছ বেবি, জিতু হাসেন, —তবে হ্যাঁ অনুরোধ করতে হয়েছে। ওই তো, ওটাই তো সেরা পালিশ, শেষ পালিশ। ওতেই তো তোমার বাবাকে টেক্কা দিয়েছিলাম। ওটা পেরে ওঠেননি তোমার বাবা তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে। তবে হ্যাঁ, সাহায্য তুমি আমায় সবসময় করেছ বই কী। সেই যখন আমি ভিখিরির মতো ছিলাম, তুমি সেকালের রাজকন্যাদের মতো লুকিয়ে আমার সঙ্গে প্রেম করে তোমার বাবার কাছে আমার উন্নতির জন্যে আবদার করেছ, সেকথা ভুলে যাব এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই।

বরুণা লাহিড়ীর আজ ক-দিন ধরে 'নিরম্বুর' পালা চলছে, তাই ভয়ানক একটা ছটফটানি ধরেছিল শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু শিরায়। তার উপর এই অদ্ভুত জীবনে এসে পড়া! জীবনে আর কোনোদিন সেই মাদকতার স্বাদ পাবে কি না কে জানে! কে জানে জিতু লাহিড়ী সত্যিই এদের সঙ্গে মিশে এখানেই

বসবাস করবে কি না! ...হয়তো আর কখনো শীলা, শেলি, সোমাকে দেখতে পাবেন না, দেখা হবে না টম আর জিমের সঙ্গে। এই পাগল লোগটার সাহচর্যে ধীরে ধীরে 'ফসিল' হয়ে যেতে হবে বরুণা লাহিড়ীকে। এসব ভেবে ভিতরটা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

এতদিন পরে কি বরুণা লাহিড়ী সুইসাইড করার ছেলেমানুষিটাই বেছে নেবেন? হার মানবেন পৃথিবীর কাছে? যে-পৃথিবী তাঁকে ভয়ানকভাবে ঠকিয়েছে! ঠকিয়েছে বই কী, নির্লজ্জভাবে ঠকিয়েছে।

নইলে এখনও পর্যন্ত যে-স্তাবকদের দল অহরহ তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন করেছে, তাঁর মেয়েদের নির্লজ্জতা দেখে এবং ছেলেদের নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার দেখে সহানুভূতি জানিয়েছে, লাহিড়ীর হঠাৎ মতি পরিবর্তনে ব্যঙ্গহাসি হেসে তাঁর 'মিসেস'কে সান্ত্বনা জানিয়েছে—একে বলে শ্মশানবৈরাগ্য বুঝলেন মিসেস লাহিড়ী, ও-বৈরাগ্য বেশিদিন টেঁকে না। আবার নিজের জীবনে ফিরে আসতেই হবে তাঁকে—, তাদের মধ্যে একজনও তো বরুণার চলে আসার খবরে বলল না, পাগল হয়েছেন? আপনি যাবেন কী? লাহিড়ীর মাথাখারাপ হয়ে গেছে বলে কি আপনারও হতে হবে? আপনি সেই গণ্ডগ্রামে কোথায় যাবেন? থেকে যান থেকে যান, আমি আপনার দেখাশোনা করব!

কেউ বলেনি। বরং ঘৃণায় লজ্জায় ধিক্কারে মাথা কাটা গেছে বরুণা লাহিড়ীর, তাদের লুব্ধতায়।...লাহিড়ী যখন তাঁর সমারোহময় জীবনযাত্রায় পরিসমাপ্তি টানতে দীর্ঘদিন সঞ্চিত, আর দীর্ঘদিনের আহরিত সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্যময় উপকরণ জলের দরে বেচে দিচ্ছিলেন, ওদের মধ্যে যেন কামড়াকামড়ি পড়ে গিয়েছিল। কী ঘৃণ্য দেখিয়েছিল তখন ওদের!

অবশ্য ওদের সেই লুব্ধতার উপর একটা আবরণ দেবার চেষ্টা ওরা করেছিল। কিন্তু সে-চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল ওদের চকচকে চোখ। ওদের সেই চোখকে নিজেরা ওরা দেখতে পায়নি, তাই কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঞ্জনা মিশিয়ে বলেছিল, 'জিনিসের জন্যে নয় মিসেস লাহিড়ী, ফার্নিচারের তো আর অভাব নেই, বরং জায়গাই নেই আর আমার বাড়িতে, তবু আমি এটা নিতে চাইছি কেবলমাত্র স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা রাখবার জন্যে। ওগুলো যখনই দেখব, মনে পড়বে আপনার কথা, মনে পড়বে আপনার এখানের এই মনোরম সন্ধ্যা।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'আপনার ব্যবহার করা আলমায়রা পালং ডিভ্যান সোফা, যে-কেউ কিনে নিয়ে যাবে, যথেচ্ছ ব্যবহার করবে, এ আমি ভাবতেই পারছি না মিসেস লাহিড়ী! তাই নিজেই আমি, ...ছেলেমানুষি একটা সেন্টিমেন্টই বলতে পারেন।'

সেই 'ছেলেমানুষি সেন্টিমেন্টের' বশেই তাঁরা অপরিচিত লোক পাঠিয়ে বেনামিতে কিনে নিয়েছিলেন লাহিড়ী সাহেবেরও দামি দামি সুট, টাই, জুতো এবং প্রসাধনের অজস্র টুকিটাকি। কিনে নিয়েছিলেন পাপোস, কার্পেট, ফ্যান, টেবিল ফ্যান, আর অজস্র পুতুল, আলো, ফুলদানি, কাচের বাসন।

বাড়ি খালি করে ফেলেছিলেন জিতু লাহিড়ী। কে একজন বলেছিল, 'আপনি যে দেশবন্ধুকেও ছাড়ালেন মিস্টার লাহিড়ী!'

মিস্টার লাহিড়ী হেসে উঠে বলেছিলেন, 'কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা সিংহের সঙ্গে ছুঁচোর? আমি তো বেচে খাচ্ছি।' তবে বেচে অবশ্য খাননি লাহিড়ী সাহেব, সব কিছু বেচে দিয়ে তার টাকাটা মিশন হাসপাতালে দান করে দিয়েছিলেন।

বরুণা বলেছিলেন, 'ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বলতে তো কিছু নেই, এ টাকাটাও দাতব্যে গেল, দেশে গিয়ে বোধ হয় ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করবে?'

লাহিড়ী সাহেব বলেছিলেন, 'পেনসনের টাকাটা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। ইনসিওরেন্সগুলোও আছে।'

—তাতেই সব চলবে?

—যতটুকু চলে, তার বেশিটা বাদ দিতে হবে।

বরুণা লাহিড়ীর মনে হয়েছিল ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, হাতের কাছ যা পান তাই একটা ছুঁড়ে মারেন এই বৈরাগ্যের মুখোশ ঢাকা শয়তানের মুখটার উপর, তবু নিজেকে সামলে চুপ করে গিয়েছিলেন।

বেশ কিছুকাল থেকেই স্বামীর মনের গতির এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন বরুণা, এবং আগুন হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও কম করেননি। কখনো ক্রোধ, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো অগ্রাহ্য, নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন স্বামীর বোকামি আর পাগলামি, তথাপি পারেননি দাবাতে। বেড়েই চলেছে অপ্রকৃতিস্থতা। দিন দিন একগুঁয়ের চরম হয়ে উঠেছেন লাহিড়ী, আর অভ্যস্ত জীবনযাত্রার প্রতি যেন খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন।

শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন, পাগল হয়ে গেছে লোকটা।

বরুণারও দুর্ভাগ্য। যে-সময় থেকে লাহিড়ী সাহেবের এই খ্যাপামি দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ই যেন ছেলে-মেয়েগুলোও যা-তা করতে লেগেছে। আশ্চর্য!

হয়তো কার্যকারণটা উলটে ধরলে মানেটা সহজে পাওয়া যেত, কিন্তু উলটে ধরেননি মিসেস লাহিড়ী। আপন দুর্ভাগ্যকেই দোষ দিয়েছেন। তবু ওই—প্রথম দিকে অনেক লড়তে চেষ্টা করেছেন।

বড়ো মেয়ে শীলা যখন একটা বাজে ধরনের বর্মি ছেলের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করেছিল, লাহিড়ী সাহেব মেয়েকে ডাকিয়ে এনে তীব্র প্রশ্ন করেছিলেন, কে ও? কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে শীলা ওর সঙ্গে? এবং কঠোর নিষেধ করেছিলেন মেয়েকে ওর সঙ্গে মিশতে, তখন বরুণা কি লাহিড়ীর এই শুচিবাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, ব্যঙ্গহাসির শাণিত ছুরিকা নিয়ে? বলেননি কি, পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া উচিত হচ্ছে তোমার? .....মনে রাখতে চেষ্টা কোরো এটা ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের পরবর্তীকাল নয়, সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের পরের যুগ। যে-যুগে মানুষ চাঁদে পৌঁছোচ্ছে।

লাহিড়ী বলেছিলেন, 'চাঁদে পৌঁছোচ্ছে বলেই যে ফাঁদে পড়তে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। শীলার এই রুচিহীনতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না আমি।'

বরুণা তিক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র তোমার রুচির নির্দেশেই পৃথিবীটা চলবে না।'

—আমার সংসারে চলবে!

—না, তাও চলবে না। সংসারটা একটা ইট কাঠের বস্তু নয়, সেটা জীবন্ত প্রাণী দিয়ে তৈরি।

লাহিড়ী তখনও ক্রোধ দমন করতে শেখেননি, তখনও উগ্র হয়েছেন। বলেছেন, 'প্রাণী? ও! তা মানুষ না-ভেবে যদি শুধু 'প্রাণী' মাত্রই ভাবতে হয় তাহলে তো প্রবলেম সলভড্‌ই হয়ে যায়। যেকোনো প্রাণীকে শায়েস্তা করার ওষুধ কী জানো তো?

—শীলা সাবালক হয়েছে তা জানো?

—হয়েছে বুঝি? জানতাম না। লাহিড়ীসাহেব টেবিলে ঘুষি মেরে বলেছেন, 'ডাকো এক বার তোমার সেই সাবালিকা হয়ে ওঠা মেয়েকে। দেখব কতটা স্বাধীনতা খাটাতে পারে সে!'

সত্যি কথা বলতে, বরুণা লাহিড়ীও মেয়ের এই শিথিল রুচিকে খুব প্রশংসা করছিলেন না, এবং মুখে যতই বলুন 'একটা মেয়ে আর একটা ছেলে দু-জনে এক বার একসঙ্গে ঘুরলেই তারা বিয়ে করতে বসবে, এমন অদ্ভুত মনোভাব কেন তোমাদের? বন্ধুত্ব, প্রীতি, এসব নেই জগতে? তবু ভীষণ একটা অশান্তিতেই ছিলেন। কিন্তু স্বামীর কাছে তর্কে পরাস্ত হবেন বরুণা লাহিড়ী? এটা তো হতে পারে না!

কাজেকাজেই নিজের পক্ষেই সমর্থনের যুক্তি তোলেন, 'একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একটু একত্র হলেই ধরে নিতে হবে তারা বিয়ে করবে? বন্ধুত্ব প্রীতি এসব হয় না?'

লাহিড়ী বলেছিলেন, 'হবে না কেন? সোনার পাথরবাটি তো হতে পারে। কিন্তু সবসময় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না? অতএব পাথরটাকে পাথর আর' সোনাটাকে সোনা ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

বরুণা বলেছিলেন, 'সভ্যসমাজ ভৌগোলিক ব্যবধানটাকে বড়ো করে দেখে না। শীলা যদি সত্যিই ওকে বিয়ে করে, দেখো আমাদের কেউ কিছুই বলবে না।'

লাহিড়ী বলেছিলেন, 'সমাজ সম্পর্কে তোমার জ্ঞানটা প্রখর দেখছি। তবে আমিও তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, শীলা যদি এ বিয়ে করে, আমাকে মনে করতেই হবে ওই নামের কোনো মেয়ে আমার কোনোদিন ছিল না!'

বরুণা ভাগ্যের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তেমন ভয়াবহ দুর্মতি যেন না-হয় শীলার, যেন সে নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে, যেন এই রাজধানীর সমাজে বরুণার মাথাটা হেঁট না করে, তবু বলে উঠেছিলেন 'বাঃ বাঃ! একেবার মধ্যযুগীয় জমিদারের রাজকীয় মেজাজ!'

—ভুল করছ! সে-মেজাজ থাকলে তোমার ওই মেয়েটিকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে তার ওই বন্ধুকে গুলি করতাম!

অনবরত এই তীব্রতার মুখোমুখি হতে ক্রমশ ভয় ধরছিল বরুণার। গোপনে ডাক্তারের পরামর্শ চেয়েছিলেন, এবং ডাক্তার বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় এখন ওঁকে বেশি উত্তেজিত না-করাই ঠিক। ওঁর কথার প্রতিবাদ করবেন না।'

কিন্তু ডাক্তারের কাছে নির্দেশ চাওয়া যত সোজা, ডাক্তারের নির্দেশ পালন করা কি ঠিক তত সোজা? স্বামীর কথার প্রতিবাদ করবেন না বরুণা লাহিড়ী? তবে তাঁর পাগল হয়ে যাওয়াটা বন্ধ করবে কে? কী অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে আজকাল লোকটা, ডাক্তার জানে সব?

অবশ্য ভেবে দেখলে দেখাই যায়, চিরদিনই ওই এক অদ্ভুত টাইপের লোক জিতেন লাহিড়ী। ওঁর এযাবৎ কালের যা-কিছু কার্যকলাপ সবই যেন ইচ্ছের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে নয়। যেন সেই যে আড়ম্বরবহুল উত্তাল জীবনযাত্রার পদ্ধতি, সে যেন সবই বরুণার বাসনা চরিতার্থ করতে। লাহিড়ী যে সেই আড়ম্বরের রসদ জোগাচ্ছেন, সে যেন কতকটা ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়া মতো। জোগাচ্ছেন তাচ্ছিল্যে ভঙ্গিতে।

বরুণা যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সে-প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেষ্টা করতে গেছেন স্বামীকে, স্বামী তাতে কর্ণপাতমাত্র না-করে কথা থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'থাক-না, অত বোঝাবার কী আছে? কী চাই? টাকা তো? কত? পেনটা আর চেক বইটা দাও—'

হ্যাঁ, এই ভঙ্গি ছিল লাহিড়ীর। সংসারের সবটাই যেন বরুণার দরকারের, তিনি কৃপার দৃষ্টিতে সেই বালিকার বাল্যলীলার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অবশ্য নিজে কি তিনি কিছুই করেননি? তা করেছেন বই কী। শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেছেন, সেখানে গালচেওলা এলে লাহিড়ী বেপরোয়া বলে দিতেন, 'খান দুই রেখে দাও তো বেবি!'

আর সেই খান দুইটা প্রায়শ দামিই হত।

বরুণা তাঁর মায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে উপহার কিনতে গিয়ে একটু বেহিসেবি খরচ করে ফেলে হয়তো মনে মনে লজ্জিত হচ্ছেন। লাহিড়ী দরাজ গলায় বলেছেন, 'আচ্ছা বেবি, তোমার নজর এত ছোটো কেন বলো তো? নিজের মা-র জন্যে খরচা করতেও দ্বিধা করছ? সিল্কের শাড়ি কেনো? 'বেনারসি' বলে কী যেন একটা শাড়ি আছে না? দিল্লির বাজারে পাওয়া যায় না সে-জিনিস?...টাকা নেই? না-থাকে বললেই পারতে। ঠিক আছে, দেখি পেনটা আর চেক বুকটা!'

চেক বই! এযাবৎকাল ওই চেকবুকের অহংকারেই মট মট করেছেন। কিন্তু সেই অজস্র টাকা, সে কি কেবলমাত্র উচ্চপদের ন্যায্যপদমর্যাদা বাবদ আসত?

পাগল! তাই কি হয়? কত মাইনে দেয় সরকার যে, তার থেকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব হবে? হয় না, চেক বইয়ের উৎস আলাদা।

কই, তখন তো ধর্মজ্ঞান হয়নি? এখন যত ধর্ম উথলে উঠছে! এখন উনি 'বুনো রামনাথে'র আদর্শ নিতে বসেছেন!

অথচ বরুণা লাহিড়ী চিৎকার করে উঠে তার প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না। বরুণা লাহিড়ী জব্দ হয়ে গেছেন। নিজের ছেলে-মেয়েরাই তাঁকে জব্দ করে দিয়েছে।

বরুণা লাহিড়ীর শত প্রার্থনা বিফল হল, শীলা সেই কাণ্ডই ঘটিয়ে বসল। নেশার ঝোঁকে প্রায় বেসামাল সেই বর্মিটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল একদিন, হি-হি করে হেসে বলল, 'মা এই হচ্ছে সেই শয়তানটা, যে তোমার বড়ো মেয়েটিকে লুঠ করে নিতে চায়।'

সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল ওরা দু-জনে। বরুণার ইচ্ছে হল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন, পড়ে যাক চূর্ণ হয়ে যাক! তবু আত্মসংবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি তো জিতু লাহিড়ীর মতো রাগ প্রকাশ করে গ্রাম্য হতে পারেন না? আর চেঁচামেচি করা মানেই তো লোক জানাজানি করে নিজের গালে চুনকালি মাখানো। আমার মেয়েকে আমি এঁটে উঠতে পারিনি, সে বিরক্তিকর একটা বাঁদরকে বিয়ে করেছে, বারণ মানেনি, একথা রাষ্ট্র করলে অগৌরবটা কার? সেই হতভাগা মেয়ের, না মিসেস লাহিড়ীর?

তাই ভিতরের আগুনকে ভিতরে দমন করে নীচু গলায় বাংলায় বলেছিলেন, 'এই নির্বাচনটাকে খুব ভালো মনে করছ তুমি?'

শীলা হেসে উঠে বলেছিল, 'ভালো-মন্দর প্রশ্ন আর রইল কই? ও তো ছাড়বে না! বিয়ে না করলে খুন করবে বলে শাসিয়েছে!'

অবশ্য শীলার মুখ দেখে মনে হল না সেই শাসানিতে খুব কাতর সে। শীলার মা-রই বুকটা কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, তা ওদের অসাধ্য কাজ নেই। খুন শুধু ওকেই করবে কি আরও কাউকে তারই-বা ঠিক কী? শীলাকে লাহিড়ী বাড়ির দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে চাইলে লাহিড়ী বংশটাই ঘুচিয়ে দেবে কি না কে জানে।

গলা নরম করে বলেছিলেন, 'তুমি তাহলে ভয়েই রাজি হয়েছ?'

শেলি আর সোমা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল শীলা। বলেছিল, 'শুনছিস মা-র কথা? শুধু শাসানির ভয়ে!'

সোমা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছিল 'অসহ্য' বলে।

কিন্তু সেই সোমাই সবচেয়ে নৃশংসতা করল। খুন সে নিজে হাতেই করল। বরুণা লাহিড়ীর প্রাণের একেবারে ভিতরঘরে যে-আশাটুকু, যে-বিশ্বাসটুকু সোমার মুখ চেয়ে জ্বলছিল, সেই বিশ্বাস আর আশাকে ছুরি বিঁধে হত্যা করল সোমা।

বরং শেলিই অপেক্ষাকৃত ভালো। শেলিই তবু মোটামুটি একটা বিয়ে করে সুখে আছে। যদিও সেই বিয়ের বরটা লাহিড়ী সাহেবেরই একটা নিতান্ত অধস্তন, তবু ভদ্র।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শীলার ওই মাতাল বর্মিটাকে বিয়ে করার চাইতে বেশি নিন্দনীয় হয়েছিল শেলির বিয়েটা। সবাই বলেছিল, 'ছি ছি! এটা কী করল আপনার মেয়ে? আপনারা অ্যালাউ করলেন কী করে?'

মেয়ে-পুরুষে বলেছে একথা। বরুণা অবশ্য এক্ষেত্রেও আপন মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বলেছিলেন,

'একথা আপনারা কী করে বলছেন? শেলি তো বাচ্চা নয়? অবশ্যই নিজের জীবন সম্পর্কে ডিসিশান নেবার স্বাধীনতা ওর আছে। তা ছাড়া প্রেম কি পাত্রাপাত্র বিচার করে ভাই? সে তো চিরকালই অন্ধ! শেলি আমার মেয়ে, অতএব আমার অধীন, আর অতএব আমি তার ভালোবাসার মনটিকে ধ্বংস করে দেব, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

তখন ওরা ধন্য ধন্য করেছিল বরুণা লাহিড়ীকে। অন্তত তাঁর সামনে তাকে প্রশস্তির সিঁড়িতে চড়িয়ে স্বর্গে তুলেছিল।

সবাই। সবাই বলেছিল, 'আপনার মতো এমন অদ্ভুত ফরোয়ার্ড মহিলা সংসারে বিরল মিসেস লাহিড়ী!'

সবথেকে বেশি বলেছিল জীবেন সিংহী।

জীবেন সিংহীর ব্যবহারটা ভাবলে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে দিশেহারা হয়ে পড়েন বরুণা। জীবেন ছিল বরুণার সবচেয়ে বড়ো স্তাবক। বরুণার বাড়ির নিত্য অতিথি। বরুণা কথা বললে মুগ্ধ হত, বরুণা হাসলে বিহ্বল হত, জীবেনকে যা-খুশি তাই বলতেন বরুণা, স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, 'সিংহী, তোমার মতন এমন ইডিয়ট আমি দুটো দেখিনি! সারাজীবনটা শুধু একটা মরীচিকার পিছনে ঘুরলে, একটা বিয়ে পর্যন্ত করলে না, সত্যি এ ভারি অন্যায়! নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।'

জীবেন বলত, 'কার জীবন যে কোথায় সার্থক হয়, সে কি বাইরে থেকে বোঝা যায় বেবি দি?'

হ্যাঁ, জীবেন 'বেবিদিই' বলত।

কারণ জীবেন বরুণা লাহিড়ীর বাপেরবাড়ির পাড়ার ছেলে। বয়সে বছর চারেকের ছোটো বরুণার থেকে। তা ছোটো বড়োয় কী এসে যায়? ছোটো বলেই তো প্রশ্রয় আরও বেশি! কিন্তু?

সেই জীবেনই বরুণার ব্যবহৃত ডানলোপিলোর গদি দেওয়া খাটটা কিনে নিয়েছিল জলের দামে, আর—অবশ্য দাম বরুণা নিতে চাননি, দার্শনিক দার্শনিক উদাস গলায় বলেছিলেন, 'তোমার কাছেও দাম নেব জীবেন? আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছেন বলে আমিও তাই হয়ে গেছি ধরছ কেন? ওটা তুমি ব্যবহার কোরো, আমি উপহার দিচ্ছি।'

প্রায় সব কথাই অবশ্য ইংরেজিতে বলেছিলেন বরুণা, বলেও থাকতেন তাই, ভাবার্থটা ওই ধরনের ছিল।

জীবেন সিংহী তার বেশি উদাস গলায় বলেছিল, 'না বেবিদি না, অমনি নেবার অনুরোধ আমায় করবেন না। তাহলে আমার আত্মার কাছ ধিকৃত হব আমি...আপনার এই খাট বিছানা এ আমার ঘরে দেবমূর্তির মতো থাকবে তোলা। ব্যবহার করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু এমনি উপহার নেব না।'

আত্মার কাছে ধিকৃত হবার ভয়ে নামমাত্র মূল্য নিতে বাধ্য করেছিল জীবেন সিংহী বরুণা লাহিড়ীকে।

আর তারপর.....তখনও দিল্লিতে রয়েছেন বরুণা, শুনতে পেলেন সেই খাট গদি মোটা দামে বেচে দিয়েছে জীবেন একটি পাঞ্জাবি ভদ্রলোককে। জীবেনের অত্যধিক সৌভাগ্যে যারা সবচেয়ে বেশি ঈর্ষিত হত, তাদেরই একজন শুনিয়ে গেল কথাটা!

সংসারভাঙা পর্বে বরুণা লাহিড়ীর জ্ঞানচক্ষু অনেকটাই উন্মীলিত হয়েছিল, তবু একরকম সয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জীবেনের ব্যাপারটা যেন সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। জীবেনকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই অসহ্য জ্বালাটা প্রশমিত করবার বাসনায়।

কিছু করবার ক্ষমতা আর না-থাকুক বরুণার, ধিক্কার দেবার ক্ষমতা তো আছে? সেই ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করবেন তিনি। এই দীর্ঘকালের জীবনের যত জ্বালা সব ছড়িয়ে দেবেন। পুড়িয়ে দেবেন তাঁর স্তাবককুলের প্রতিনিধি ওই জীবেনকে।

বসে বসে অস্ত্র শাণিয়েছিলেন বরুণা, কিন্তু জীবেন আসেনি।

বলেছিল, 'শরীর খারাপ যেতে পারছি না।'

বরুণা দিল্লি ছেড়ে চলে আসবার সময় অনেকেরই 'শরীর খারাপ' হয়েছিল। স্টেশনে আসতে পারেনি।...অবশ্য বরুণা তাতে খুশিই হয়েছিলেন! হৃতগৌরব পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের মতো লাহিড়ীর এই অজ্ঞাতবাসের সাক্ষী যত কম থাকে ততই মঙ্গল।

চরম লজ্জার সময় কে চায় সাক্ষী রাখতে?

দিল্লি ছেড়ে চলে আসার কারণটি তো কারও অজ্ঞাত ছিল না। সারা শহরের অভিজাত মহল তো জেনে ফেলেছিল লাহিড়ী সাহেবের ছোটো মেয়ে 'হেয়ার কাটিং সেলুনে'র সেই চুল ছাঁটিয়ে অ্যাংলো ছোকরাটার সঙ্গে পালিয়েছে। এবং শুধু নিজেকেই নিয়ে যায়নি, মায়ের চাবি চুরি করে নিয়ে গেছে মায়ের যাবতীয় অলংকারের সঞ্চয়, নিয়ে গেছে মোটা অঙ্কের নগদ টাকা।

আড়ালে বরুণা লাহিড়ীকে অনেকে 'রত্নপ্রসবিনী' বলছে। বরুণা লাহিড়ী নিজেও কি বলছেন না একান্ত সঙ্গোপনে? এই তো নিজে তিনি কি জীবনকে উপভোগ করেননি? করেছেন, কিন্তু মাত্রা রেখে বুদ্ধিমানের মতো। নিজেকে ঘিরে পতঙ্গদের জ্বলতে দিয়েছেন, নিজের পাখাকে আগুনে ফেলতে যাননি।

অথচ বরুণার ছেলে-মেয়েগুলো? নির্বোধ, নির্বোধ, পয়লা নম্বরের নির্বোধ! ওরা নিজেরাই আগে আগুনে ঝাঁপ দিল। সেই আগুনে মা-বাপের মুখ পোড়াল! কিন্তু এ তো সঙ্গোপনের কথা! দোষারোপ তো সর্বদাই স্বামীর উপর।

লাহিড়ী সাহেবের কড়া মনোভাবের প্রতিক্রিয়াই যে ছেলে-মেয়েদের বিদ্রোহী করে তুলেছে এতে আর সন্দেহ কী? আর সেই বিদ্রোহেই তারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এই কথাই অজস্র সুরে বলেছেন বরুণা। হয়তো কথাটা খুব মিথ্যেও নয়। মা আর বাপ দু-জনের মধ্যে যদি দুটো বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে, সন্তানদের উপর পরবেই তার প্রভাব। হয় তারা খুব বেশি বুদ্ধিমান হবে, নয় তারা বিদ্রোহী আর বিকৃত হবে।

লাহিড়ী দম্পতির ঘরের অঙ্কফল হচ্ছে ওই বিকৃতি।

সাধারণত বিরোধের চেহারাগুলো ছিল এই ধরনের—

মেয়েরা যখন তরুণী হয়ে উঠেছে (তিনটে প্রায় একসঙ্গেই হয়ে উঠেছে), লাহিড়ী সাহেব একদিন বললেন, 'ওরা তো এবার শাড়ি পরলেই পারে।'

বরুণা 'কাচের বাসনভাঙা' হাসি হেসে বলে উঠেছিলেন, 'শাড়ি? ওরা পরবে শাড়ি?'

—কেন, না পরবার কী আছে? শাড়ি পরার বয়েস হয়নি ওদের?

বরুণা আরও হেসে বলে ওঠেন, —মেয়েদের কোন বয়সে কীসের বয়স হয়, সব জানো তুমি?

—সাধারণ বুদ্ধি বলে একটা কথা আছে অবশ্যই?

—আছে। তবে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে অন্তত তোমার মধ্যে সেটা নেই।

—ফ্রক পরলে ওদের দেখতে খারাপ লাগে আমার।

—তোমার ভালো লাগা নিয়ে জগৎ চলবে না!

লাহিড়ী সাহেব মুখে পাইপ ভরে বলেছিলেন, 'তা বটে! তবে আমার মনে হয় শাড়ি পরলে ওদের আরও অনেক 'লাভলি দেখাত।'

—ফ্রকেই যথেষ্ট, বরুণা মুখ টিপে হেসে বলে উঠেছিলেন, 'ওতেই তো তোমার মেয়েদের ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন।'

লাহিড়ী সাহেব স্ত্রীর সেই টেপা হাসির কারুকার্য আঁকা মুখটার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু আর একদিন ওই মৌমাছিদের কথা তুলেই ভুরু কোঁচকালেন।

—ড্রইংরুমে ওরা বসে কে?

বরুণা বললেন, 'আর কে! প্রতিটি সন্ধ্যা যাদের আবির্ভাবে আমাকে ড্রইংরুম ছাড়তে হয়েছে। আমার বন্ধুদের অধিকাংশকেই ব্যালকনিতে নিয়ে বসাতে হচ্ছে!'

—সন্ধ্যায় তোমার মেয়েরা তাহলে বাড়ি থাকে?

বরুণা লাল লাল মুখে বলেছিলেন, 'এটা ওদের প্রতি অপমানজনক কটাক্ষপাত!'

—তা বেশ তো 'পাতটা' যখন হয়েই গেছে, উত্তরটা দেবে আশা করি।

—উত্তর দেবার কী আছে? ওদের ইচ্ছে হলে বেরোবে, ইচ্ছে হলে বাড়িতে থাকবে।

—ইচ্ছেটা ক্রমশই যথেচ্ছাচার হয়ে যাচ্ছে না?

—উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে গেলে অবশ্যই হচ্ছে।

—দ্যাটস রাইট্। ছেলে-মেয়েরা তোমার বিজনেস— বলে আবার একমুঠো টোবাকো বার করে পাইপে ভরতে বসেছিলেন লাহিড়ী।

কিন্তু একথাটাও বরুণা লাহিড়ী অপমানকর মনে করেছিলেন। ক্রুদ্ধমুখে বলেছিলেন, 'কেন, আমার বিজনেস কেন? ওরা একা আমার?'

—লাহিড়ী পদবিটা বাদে, বাকি সবটাই তোমার!

বরুণা ঝলসে উঠে গেছেন। স্বামীকে দেখিয়ে ফ্রিজিডেয়ার খুলে আইসক্রিম বার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন মেয়েদের প্রেমিকদের জন্যে।

এইভাবেই দেয়ালের বালি ঝরছিল, জানলা-দরজা নড়বড় করছিল, মেঝের চটা উঠছিল, তবু দু-জনের কেউই বোধ হয় গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। কিন্তু একদিন ছাত ভেঙে পড়ল হুড়মুড়িয়ে।

তিলে তিলে বিরক্ত বাঘ হঠাৎ খেপে উঠে গর্জন করে উঠল, 'হোয়াই?' চাবুক হাতে নিয়ে পায়চারি করতে লাগল সিঁড়ির সামনে। —কেন? কেন এই স্বেচ্ছাচার সহ্য করব আমি? চাবকে বাড়ি থেকে বার করে দেব, রাস্তার কুকুরের মতো দূর করে দেব।

ব্রোঞ্জের পুতুলের মতো চকচকে আর চাঁচাছোলা মুখে, বহু প্রচেষ্টায় রক্ষিত টান টান গড়নে, আর পাতলা রেশমি শাড়িতে তাঁকেও তরুণীর মতো লাগছিল। কিছু আগেই নিজেকে দেখেছেন বরুণা আর্শিতে আর খানিকটা সাহস অর্জন করে নিয়েছেন।

তাই সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুর্‌মার রেখা টানা বিলোলদৃষ্টি তুলে বলতে পেরেছিলেন, 'আমাকে দুষ্টুমি করে ধরিয়ে, নিজে তো ড্রিঙ্ক করা ছেড়ে দিয়েছিলে, আজ আবার ধরলে বুঝি?'

কিন্তু বিলোল কটাক্ষে কাজ হয়নি।

লাহিড়ী সাহেব চাবুক আস্ফালন করে সামনে থেকে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন মেয়েকে তিনি আজ বুঝিয়ে ছাড়বেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরিণাম কী?

বরুণা দৃঢ় হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'পাড়া জানিয়ে একটা সিন ক্রিয়েট করতে দেব না আমি তোমায়!'

ক্রুদ্ধ বাঘ আবার গর্জন করে উঠেছিল, —পাড়ার কারও কিছু জানতে বাকি আছে?

—তারা জানে আমরা বড়ো হয়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দিই না, তারা জানে আমরা সেকালের চশমা নাকে এঁটে জগৎকে দেখি না, তারা জানে আমরা সভ্য, তাদের সেইসব 'জানা'গুলো তুমি এক মিনিটের অসহিষ্ণুতায় ধূলিসাৎ করে দিতে চাও?

—চাই! লাহিড়ী হাতের চাবুকটা শূন্যে আস্ফালন করে বলেছিলেন, 'চাই! সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত ভুয়ো, সমস্ত ফাঁকিবাজিকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাই এবার!

কিন্তু সে-রাত্রে লাহিড়ী সাহেবের চাওয়া পূরণ হয় না। সে-রাত্রে সোমা ফেরে না। পরদিন সকালে যখন ফেরে, তখন বাড়ি ভরে গেছে লোকে, ডাক্তার বসে আছে। হঠাৎ প্রেসার বেড়ে উঠে স্ট্রোকের মতো হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন লাহিড়ী সাহেব, রাত তিনটেয় ডাক্তারকে ডাক দিতে হয়েছে।

সেই প্রথম ভয়ের শুরু।

পরিচিত ডাক্তার, মিসেস লাহিড়ীর প্রকৃতি তাঁর অচেনা নয়, তাই আড়ালে ডেকে বলেছেন, 'ওঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করবেন না কিছুদিন। বেশ কিছুদিন বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে ওঁর প্রতি।'

বরুণা যখন সময় পেলেন, সোমাকে ডাকলেন, লাহিড়ী সাহেবের আড়ালে। চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'জানো, আজ ওঁর ওই অবস্থার জন্য দায়ী কে?'

সোমার ভঙ্গি অবিকল তার বাপের মতো। লাহিড়ী সাহেবের মতোই তাচ্ছিল্যের একটা সুর প্রচ্ছন্ন রেখে উত্তর দেয় সে, 'দায়ী অবশ্য অনেক কিছুই, আবার হয়তো কিছুই নয়। অসুখ অসুখই, তবে তোমার 'টোন' শুনে মনে হচ্ছে দায়ী আমিই।'

—আলবাৎ! বরুণা তেমনি চাপা তীব্রতায় বলেন, 'দায়ী তুমিই। কাল উনি তোমার জন্যে চাবুক নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন তা জানো?

পাশের ঘরে লাহিড়ী সাহেব ঘুমের ওষুধের প্রভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন, ঘুম যাতে না ভাঙে সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা, তবু সোমা রীতিমতো শব্দ করে হেসে ওঠে। হেসে বলে, 'ইস! তাহলে তো কাল একটা অভূতপূর্ব স্বাদ মিস করেছি!'

—থামো অসভ্য মেয়ে!

জীবনে যা না করেন বরুণা লাহিড়ী, তাই করেন। নেহাত গাঁইয়াদের মতো মেয়েকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। —ভেবেছ কী তুমি? যা খুশি তাই করবে?

—কী আশ্চর্য মা! এটা কী একটা প্রশ্ন? সোমা আবার হাসে, —যাতে খুশি সেটা না-করে, যাতে দুঃখ তাই করতে বসব না কি? আমি কি তোমার বোকা হাবা মেয়ে?

বরুণা মেয়ের এই অগ্রাহ্যের ভঙ্গিতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'তোমার এই অসভ্যতা আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি সোমা, এবার চুপ করো। বলো কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?'

—বাঃ সে তো এসেই বলেছি। ওদের ক্লাবে একটা ফাংশান ছিল, রাত হয়ে গেল অনেক, তখন আর বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না—

—মানে হয় না! মানে হয় না! বেপরোয়া দুঃসাহসী মেয়ে, তুমি আমাদের মুখ ডোবাবে!

সোমা হঠাৎ মা-র খুব কাছে সরে আসে, সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'তোমার মুখ ডোবাবার ক্ষমতা ধরব তুচ্ছ আমি? ব্যাপার কী বলো তো মা? কাল থেকে বুঝি পেটে এক ফোঁটাও পড়েনি? বুক মরুভূমি হয়ে আছে? তাই উলটোপালটা কথা বলছ?'

বরুণার মনে হল যেন লাহিড়ী সাহেবের সুর চুরি করে কথা বলছে এই নির্লজ্জ দুঃসাহসী মেয়েটা! পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠল যেন। তবু চেঁচালেন না, তেমনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'দ্যাখো সোমা, তোমার বাবার হাতের সেই হান্টারটার কথা মনে পড়ছে আমার!'

এবার আর সামান্যতম রেখেঢেকেও হাসেনি সোমা, ঠিক মা-র ভঙ্গিতে হেসে খান খান হয়ে বলেছিল, 'ওমা! তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন স্টেজে দাঁড়িয়ে রয়েছ! কোনো জোরালো ড্রামার কড়া ডায়লগ দেওয়া হয়েছে তোমায়—'

বরুণা এই অসহনীয় আর অভাবনীয় স্পর্ধার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ওই মেয়েটা যে তাঁর সবচেয়ে আদরের সব ছোটো মেয়েটা, তা যেন বুঝতে পারছিলেন না। ও যেন অচেনা কেউ।

তাই ভেবেছিলেন। কারণ নিজেকে কোনোদিন দেখতে পাননি বরুণা। যদি কোনোদিন দেখতেন, হয়তো দেখতে পেতেন এই দুঃসহ স্পর্ধার মূর্তিতে কার ছায়া।

কিন্তু নিজেকে কেই-বা কবে দেখতে পায়! বরুণাও পাননি। তাই সোমাকে দেখে চমকে গেলেন, অবাক হলেন, যেন কোনো অপরিচিত আর ভয়াবহ কাউকে দেখলেন। যেন সাহস হারালেন।

অথবা বুঝলেন একে ধমকে দাবানোর চেষ্টা বৃথা। একদা যেমন বুঝেছিলেন লাহিড়ী সাহেব, আর সেই বোঝার মাশুল দিয়ে চলেছেন জীবনভর। বরুণাকেও মাশুল দিতে হবে। তাই অন্য পথ ধরলেন বরুণা। আবেগের গলায় বললেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি সোমা, তোমার ছেলেমানুষি দেখে। ব্যাপারটাকে যেন কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চাইছ না তুমি। ধরো যদি তোমার ওই ব্যবহারে অসহ্য হয়ে তোমাদের বাবা হার্টফেল করতেন? ভাবতে পারছ সেকথা?

সোমা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলে, 'ভাবতে গেলে অবশ্য খুবই খারাপ লাগবে, কিন্তু ভাববই-বা কেন বলো তো ? 'অসহ্য' বলে কোনো শব্দ কি বাবার ডিকশনারিতে আছে? থাকলে, বাবাকে হার্টফেল করতে নিজের মেয়ের ব্যবহারের জন্যে অপেক্ষা করতে হত না, তাঁর শ্বশুরের মেয়েই যথেষ্ট ছিল।'

—কী? কী বললি বেচাল বেয়াদব মেয়ে! বরুণা সহসা একেবারে গ্রাম্য মেয়েদের মতো কপালে করাঘাত করে বসেছিলেন। বলেছিলেন, 'যা যা, দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে!'

—যাব। সোমা একটা পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'বাবা সচেতন থাকলে এ প্রশ্নটা করে যেতাম, এখন এতকালেও তোমার নার্ভ এত উইক থাকল কী করে বাবা? জীবনভর বেচাল অসভ্যতা তো কম দেখলে না?

সোমা তার কথা রেখেছিল। সোমা চলে গিয়েছিল। শুধু যাবার সময় বরুণার আলমারি থেকে গয়নার বাক্সটা আর একটা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিল।

না-বলে নিয়ে যায়নি অবশ্য। চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল, 'বিয়ের যৌতুকটা নিজেই নিয়ে গেলাম! ওকে চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো, সংসার চালাবার ভার কিছুদিন আমাকেই নিতে হবে!'

রোগশয্যায় শুয়ে এ চিঠি দেখলেন লাহিড়ী সাহেব, তারপর সংসার ভাঙতে শুরু করলেন।

কিন্তু শুধুই কি সংসার? ভাঙছেন না সব কিছু? অভ্যাস, সংস্কার, রুচি, শিক্ষা?...ভাঙছেন না বরুণার প্রাণটাকে আছড়ে আছড়ে?

এখনও তাই করে চলেছেন।

বরুণার মনে হয় খুব একটা চিৎকার করে ওঠেন। করেন না। শুধু বলেন, 'তোমার ন্যাকামির খোলস খোলো। আর সহ্য হচ্ছে না। আর নয়তো ছেড়ে দাও আমায়—'

কিন্তু ছেড়ে দেবার কথা বলারই-বা মুখ কোথায়? জিতু লাহিড়ী তো 'খোলা দরজার' আশ্বাস দিয়ে আসছেন গোড়া থেকেই। আশ্চর্য! তবু বরুণাকে বন্ধ ঘরে এসে ঢুকতে হল। বরুণার মা-দাদা পর্যন্ত বললেন না, ও পাগল হয়েছে তাই গারদে যাচ্ছে, তা বলে তুই কেন যাবি? তুই আমাদের কাছে চলে আয়। বললেন না, এবং বরুণা যখন নিজে থেকে মান খাটো করে কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকবার ইচ্ছে জানিয়েছিলেন, তাঁরা একযোগে উপদেশবর্ষণ করেছিলেন, 'না না, এসময় ওকে একা একা ছেড়ে দেওয়া আদৌ উচিত হবে না তোমার।'

অর্থাৎ?

অর্থাৎ 'পতিব্রতা' সতী কন্যা আমাদের, যাও পতির অনুগমন করো। যে মা-দাদা 'বেবি' বলতে অজ্ঞান হতেন, 'বেবি' একদিন বেড়াতে গিয়ে দু-ঘণ্টা বসে গল্প করলে বিগলিত হতেন, তাঁরা চট করে বদলে গেলেন।

জিতু লাহিড়ীর পাগলামি, বরুণার মা-দাদা-বউদির বরুণার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করেনি, ব্যঙ্গহাসির উদ্রেক করেছে। দাদা বলেছে 'তা একটা কণ্ঠি আর তেলকই-বা বাদ থাকে কেন? ও-দুটো জোগাড় করে নিতে বল-না? সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

বউদি বলেছে, 'দেশের ভিটেয় গিয়েই প্রথম তোমার একটা কাজ করা উচিত ভাই, লাহিড়ী সাহেবের গলায় একটি যজ্ঞসূত্র ঝুলিয়ে দেওয়া। ওই বেশভূষার সঙ্গে ওটা দরকার। সম্পূর্ণতা আসবে।'

বেবি লাহিড়ী বা বরুণা তার উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার বেশভূষাটাই কি সম্পূর্ণতার পক্ষে সম্পূর্ণ নয়?'

বউদি হেসে উঠেছিল, —তা বটে, সীতা কি গান্ধারীর পর্যায়ে উঠলে বাবা তুমি!

সেদিন বরুণার মনে হয়েছিল যুগ যুগ ধরে তো ওইসব পতি অনুগামিনী সতীদের পতিব্রত্যের মহিমাকীর্তন করে আসা হচ্ছে, কিন্তু কে বলতে পারে তাঁরা এমনই নিরুপায় হয়েই পতিব্রতা হয়েছিলেন কি না!

কে জানে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র একথা বলেছিলেন কি না, আমার সঙ্গে অন্ধত্ব গ্রহণ করতে পারো তো ভালো, নচেৎ তোমার দরজা খোলা রইল।

কে জানে, স্বামীর ইচ্ছার শাসনে পীড়িতা সীতা পতিগৃহে পিতৃগৃহে কোথাও সস্নেহ আশ্রয়ের আশ্বাস না পেয়ে অবহেলিত লজ্জার মুখ লুকোতেই বনবাসের আশ্রয় বেছে নিয়েছিলেন কি না। ভাজ যখন বরুণাকে সীতা, গান্ধারীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, এইসব ভেবেছিলেন বরুণা। আর নিজেও বনবাসের পথে পা দিয়েছিলেন।

আজ তাই আর 'ছেড়ে দাও' বলে চেঁচানো হল না, চুপ হয়ে যেতে হল। শুধু সংকল্প করলেন, কিছুতেই স্বামীর ওইসব আত্মীয়দের আত্মীয় বলে গ্রহণ করবেন না।

কিন্তু জিতু লাহিড়ীর ছটফটিয়ে মরা আত্মা আত্মীয় খুঁজছিল।

অবোধ সেই ছটফটানি কি 'আত্মীয়' খুঁজে পাবে বিগতকালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে? মূঢ়তা আর কুসংস্কারের মধ্যে? বিচারবোধহীন প্রাচীনতার মধ্যে?

হয়তো পাবে না, তবু তাই খোঁজাই স্বাভাবিক।

প্রতিক্রিয়ার চেহারা এমনই বিকৃতই হয়। তাই জিতু লাহিড়ী যখন আশ্রয়প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর, তখন সেই 'আশ্রয়'ই আড়ালে হেসে বলে, 'তাই বলো! মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

তাই বলছে তেঁতুলগোড়া। বলছে 'সত্যি, মাথা খারাপ না হলে কেউ সোনামুঠো ঝেড়ে ফেলে ছাইমুঠো কুড়িয়ে নেয়? হিরে পায়ে মাড়িয়ে কাচ নিয়ে আঁচলে বাঁধে? দিল্লির ময়ূরসিংহাসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে এসে তেঁতুলগোড়া গ্রামের ভাঙা ইটের বোঝার মধ্যে বাসা বাঁধে?'

ওইখানেই তো হয়ে গেছে প্রমাণ। তারপর অহরহই প্রমাণিত হচ্ছে। তেঁতুলগোড়া গ্রামের তেরোশো সত্তর সালের প্রথম এবং প্রধান খবরটা তাই প্রধান হয়েই রয়েছে এখনও, নিত্যই নতুনত্বে জোগানদার হয়ে রয়েছে! একে একে দুইয়ে দুইয়ে জনে জনে কৌতূহল চরিতার্থ করতে আসছে, আর নিঃসংশয় হয়ে ফিরে যাচ্ছে। গেছে, একেবারেই বিগড়ে গেছে মাথাটা লোকটার।

একটা কেষ্টবিষ্টু লোক হয়েছিল মানুষটা, রিটায়ার করে দেশে এসে বসছে শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে

আশা আনন্দও কম হয়নি। রিটায়ার করলেও, তাবড়ো তাবড়ো লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম তো ছিল, দু-লাইন একখানা চিঠি লিখে দিলেও একটা বেকার ছেলের চাকরি হয়ে যেতে পারে, একটা লোয়ার ডিভিশনে ঘষটানো লোকের চাকরির উন্নতি হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া দায় অদায়ে গিয়ে দাঁড়ালে.....সকলের আশাভঙ্গ করলেন জিতু লাহিড়ী।

প্রথম আশাভঙ্গ হল হালচাল দেখে। ভাবল কী রে বাবা এমন অবস্থা কেন! তবে কি সন্দেহ হয়েছে দেশটা চোর ডাকাত ঠ্যাঙাড়েয় ভরতি, তাই ভিখিরির হাল করে দেশ বেড়াতে এসেছে?

তারপরই ওই মূল খবরটা ধরা পড়ল। ধরা পড়ে আগ্রহটা গেল। আশা আনন্দ বিস্ময়টাও গেল। রুচি ভক্তি সবই গেল। কৌতূহলটাই রইল শুধু। তা একটা মাথা বিগড়োনো লোকের মাথামুণ্ডুহীন কথা শোনার মজাও কম নয়।

তেঁতুলগোড়া গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এও একটা বৈচিত্র্য। কথা ফুরিয়ে যাওয়া স্তিমিত মানুষগুলোর কথা কইবার একটা বিষয়বস্তু।

গ্রামের যেসব ছেলেরা অন্নের ধান্দায় শহরে চলে গেছে, অথচ প্রাণপাখিটিকে রেখে গেছে, বাড়ি আসে ছুটি পেলেই, তারা এলেই তরঙ্গটা নতুন করে ওঠে।

নির্ষ্কমা অথবা বুড়োরা যেখানে দিনের পর দিন শুধু জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি আর যুবাদের চাল বৃদ্ধি ছাড়া কোনো আলোচ্য খুঁজে পেত না, এখন তারা পথে একে আর একজনকে দেখতে পেলেই জিতু লাহিড়ীর হাস্যকর পাগলামির কথা তোলে।

—কালকে যে মন্টু গিয়েছিল—

গিয়েছিল-র পিছনে ড্যাশ থাকে। যেটা অপর পক্ষে কৌতূহল বৃদ্ধির সহায়ক। অতএব পরবর্তী প্রশ্নটা এই হয়—গিয়েছিল নাকি? তারপর? খুব লেকচার শুনে এল তা?

—তা ছাড়া আর কী! ও কোথায় ভেবে রেখেছিল একটা সুপারিশ-টুপারিশ বাগিয়ে যদি কিছু উন্নতি করে নিতে পারে, তা নয় বেচারিকে বসে বসে শুনতে হল, শহর ছেড়ে চলে এসো, পুরোনো যুগে ফিরে যাও, প্রাচীন ঋষিদের আদর্শ ধরে গ্রামকে আশ্রম করে তোলো, আত্মার উন্নতিসাধন করো—

—আত্মার উন্নতি! হা-হা-হা ! চাকরির উন্নতির বদলে কি না আত্মার! মগজ একেবারে গুবলেট্!

—আচ্ছা এরকম হল কেন বলো তো হে?

—কেন আর? বুঝছ না? একটু রহস্যময় ইঙ্গিতে কথাটা শেষ হয়, —পয়সা ছিল দেদার, বোতল উড়িয়েছে দেদার, তারই প্রতিফল আর কী!

—তাহলে বলছ তাই?

—তবে আবার কী? নইলে লাহিড়ী বংশের সাতপুরুষে কারও মাথাখারাপ ছিল না—

—সেদিন নরেশ তো দু-কথা শুনিয়েই দিয়ে এল।

—তাই নাকি? তাই নাকি?

—হুঁ, ওরা হল ইয়ংম্যান, অসহ্য কথা সইবে কেন? বলে দিয়েছে চোটপাট। 'আপনাদের পক্ষে এখন বৈরাগ্যের বুলি আওড়ানোটা সোজা কাকাবাবু! ভোগ করেছেন আশা মিটিয়ে, এখন গ্রামটাকে ঋষিদের তপোবন বানিয়ে শান্তিতে থাকতে ইচ্ছে করছে। আমাদের তো তা নয়! আমাদের অন্নচিন্তা চমৎকারা।

—তাই নাকি? নরেশের তো বেশ সাহস আছে? আর থাকবে নাই-বা কেন? কে কার চালে বাস করছে? আরও একটু বলতে পারত, সারা জীবনটা শহরের সেরা শহরে কাটিয়ে এখন ষাট বছরে ঠেকে বুঝি আপনার খেয়াল হল—শহরগুলো শুধু পচা নর্দমায় ভরা নরককুণ্ড! আর তার মানুষগুলো বিষাক্ত পঙ্কিল—

—হা-হা-হা, এইসব ও বলে নাকি?'

—তাইতো। গেলেই তো ওই কথা—শহরের নিশ্বাসে কালকেউটের বিষ, যদি বাঁচতে চাও তো পালিয়ে এসো। শয়তানের কাছে আত্মাকে বিক্রি কোরো না, পৃথিবীজোড়া দুর্নীতি আর ব্যাভিচারের দাঁতালো চক্র থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাও চলে এসো আকাশের নীচে, ঘাসের বুকে—

—তোমার তো দেখছি মুখস্থ হয়ে গেছে।

—তা হয়েছে। শুনে শুনে হয়ে গেছে। পাগল জিনিসটা বেশ মজাদার তো!

তা সত্যি, 'পাগল' জিনিসটা বেশ মজাদার!

বিশেষ করে যে-পাগল আঁচড়ায় না কামড়ায় না, শুধু কথা বলে। দার্শনিকের মতো কথা, অধ্যাত্মজ্ঞানীর মতো কথা, বিজ্ঞ বিচক্ষণের মতো কথা, নীতিবাগীশের মতো কথা। এমন পাগলকে নাচিয়ে ওইসব মজাদার কথা শুনতে সবাই চায়। ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, বুড়ো-যুবো, সবাই। পাগলের মধ্যে থেকে কৌতুকরস আহরণ করে নেওয়ার মধ্যে দোষণীয় কিছু দেখে না কেউ।

তেঁতুলগোড়া গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে যদি এমন এক পাগল এসে জুটে থাকে, গ্রামটা কেন করবে না আহরণ সেই কৌতুকরস?

'মানুষ' একটা আসত, ওরা বিনম্রচিত্তের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করত। 'পাগল' এসেছে, কৌতুক করে নেবে।

পরামর্শ করে তাই গেল কয়েক জন একদিন দল বেঁধে।

গেল ছুটির দিনে সকাল বেলা। যেদিন তেঁতুলগোড়ার প্রাণপাখিরা আপন পিঞ্জরে পিঞ্জরে ফিরেছে। সেই পাখিরাই ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসার সময়টাকে একটু পিছিয়ে দিয়ে চলে এল লাহিড়ী বাড়ি হাসি চাপতে চাপতে। ওরা ইতিপূর্বে আসেনি, দু-এক রবিবার বাড়ি এসে শুধু শুনেছে লাহিড়ী বাড়ির নতুন ঘটনা।

একসঙ্গে গুটি ছয়-সাত ভদ্র সন্তানের আবির্ভাবে ভারি খুশি হয়ে উঠলেন জিতু লাহিড়ী! খুব সমাদর করে বসালেন। তারপর বললেন 'বোসো, তোমাদের জন্যে একটু আতিথ্যের আয়োজন করতে বলে আসি।' ভিতরে ঢুকে গেলেন লাহিড়ী।

এরা গলা নামিয়ে বলাবলি করল, 'শুধু চা দেবে, না 'টা'-ও দেবে? কী মনে হয়?'

—কী জানি! অবস্থা তো দেখা যাচ্ছে ভাঁড়ে মা ভবানী!

—তবে আর পাগল বলেছে কেন!

—গিন্নিটি না কি ডাঁটুস আছে।

—থাকলে কী হবে, পাগলার পাল্লায় পড়ে ডাঁট দেখাবার জুত পাচ্ছে কই?

—শুনি নাকি সব কাজ নিজে করে, ঝি রাখতে দেয় না পাগলা।

—আরে দূর, মা বলছিল লুকিয়ে ঝি রেখেছে বাসন মাজতে। চিরটাকাল দিল্লিতে আরাম করে এল—

—আচ্ছা অমন একটা কেষ্টবিষ্টু লোক হঠাৎ পাগলই-বা হল কেন বল তো?

—আরে বাবা তার উত্তুর তো পড়েই আছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে! এই চুপ, আসছে। যাই বলিস চেহারাটা কিন্তু রাজসই! কে বলবে পাগল!

—চুপ! পুরো পাগল তো নয়, বাতিকগ্রস্ত আর কী!

—তুই আগে কথা বলবি, তুই পারিস খুব মজা করতে!

মজা করবার জন্যে ভব্যি হয়ে বসল ওরা।

জিতু লাহিড়ী এসে বসলেন প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে।

বরুণাকে আদেশ দিয়ে এসেছেন, 'গেলাস আষ্টেক বেলের শরবত তৈরি করে ফেলতে, ছেলেরা এসেছে।'

বরুণা বেলের শরবতের মতোই ঠান্ডা চোখে শুধু একবার তাকিয়েছিলেন!

'আহা-হা!'—লাহিড়ী কৌতুকের গলায় বলেছিলেন, 'তাইতো! বস্তুটা বোধ হয় তোমার কাছে একেবারে অজানিত অভাবিত! আসলে কিছু না ওই বেলটাকে জলে গুলে টকটক মিষ্টি মিষ্টিমতো একটা পানীয়ে পরিণত করা, এই আর কী!' বলে চলে এসে বসলেন।

লাহিড়ীদেরই এক দূর জ্ঞাতির ছেলে অনিল প্রথম কথা কইল, 'আপনি আমার কাকা হন না জ্যাঠামশাই হন, তা ঠিক জানি না, আমি হচ্ছি অভয় লাহিড়ীর ছেলে।'

জিতু লাহিড়ী অবশ্য 'অভয় লাহিড়ী' নামধারী কাউকে মনে করতে পারলেন না, বললেন, 'আরে বাবা, ও জ্যাঠা কাকা দুই এক। বাপের ভাই তো। তা বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন, দেখলে চিনতে পারতাম।'

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসা! ভয়ানক যেন কৌতুকের কথা।

ডেঁপো ছেলেটা মুচকি হেসে বলে উঠল, 'বাবাকে সঙ্গে আনতে হলে তো কাকাবাবু আমাকে এই নরদেহ পরিত্যাগ করতে হত—'

জিতু ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'ও মারা গেছেন? তা হলে বাবার নাম উচ্চারণের আগে 'ঈশ্বর' বলা উচিত ছিল তোমার। মহাশয় বলা উচিত ছিল।'

ছোকরা চরম বিনীত ভঙ্গির নকল করে মাথা চুলকে বলে, 'আজ্ঞে কাকাবাবু, সেই কোন কাল থেকে দেশছাড়া হয়ে এক ছোটোলোকের অফিসে ঢুকেছি, উচিত অনুচিত শিক্ষা সহবত আর হল কবে?'

জিতুর ভুরু সোজা হয়। আস্তে বলেন, 'তা হোক, বংশমর্যাদার কথা ভুললে চলবে না। লাহিড়ী বাড়ির ছেলে তুমি। শিক্ষাদীক্ষা আচার-আচরণে যাঁরা এ তল্লাটে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা ছোটোবেলায় আমাদের বাবা জ্যাঠামশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছাড়া বসতে পাইনি।'

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সেই না-পাওয়াটাই যে বালক জিতুর চিত্তে নিমপাতার আস্বাদ এনে দিত, তা আর মনে পড়ে না জিতু লাহিড়ীর। লাহিড়ী বাড়ির 'মর্যাদার' ঠেলাই যে তাঁকে এই তেঁতুলগোড়া গ্রাম ছাড়িয়েছিল, তাও মনে পড়ে না। তবু বংশমর্যাদার কথাই তোলেন।

বড়োদের সামনে দাঁড়ানো ছোটোদের সেই ভীত ত্রস্ত মুখগুলি অতীত থেকে চিত্তপটে ভেসে ওঠে জিতু লাহিড়ীর এবং সেইটাই এখন তাঁর কাছে 'আদর্শ' মনে হয়।

ছোকরা আরও বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'আজ্ঞে আপনারাই চলে গেলেন, গ্রামের মাথা বলতে আর কেউ রইল না, সভ্যতাভব্যতা আর শিখব কোথা থেকে?'

অপর কয়েক জন পরস্পরকে অলক্ষ্য চিমটির দ্বারা উত্তেজিত করছিল, অতএব ভিতরে ভিতরে চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল, লাহিড়ীর চোখে পড়ল। জিজ্ঞাসু হলেন, 'কী হল?'

—আজ্ঞে কিছু না— মুখে তেলালো ভাব আনে ছোকরা, 'ছারপোকা।'

—ছারপোকা! জিতু অবাক হয়ে তাকালেন।

ছোকরা মনে মনে বলে, তাকাচ্ছে দ্যাখ, যেন ছারপোকা কথাটা শোনেনি জীবনে। ওরে আমার সাহেব এলেন রে!....মুখে বলে 'আজ্ঞে হ্যাঁ ছারপোকা, চৌকির খাঁজে খাঁজে থাকে।'

—থাকে তা আমি জানি! জিতু বলেন, 'ছারপোকা শব্দটা শুনে অবাক হইনি বাবা, অবাক হচ্ছি এই

ভেবে এই দীর্ঘকালের পোড়োবাড়িতে ওদের অস্তিত্ব টিঁকে রইল কী করে! কার রক্তপান করে!'

আর কী, এই তো পাগলার পাগলামির ঘরের ঘুলঘুলি দেখা গিয়েছে, পিন চালানো যাক এইখান থেকে।

আর একটা ছেলে বলে ওঠে, 'আজ্ঞে স্যার—'

—স্যার নয় স্যার নয়, কাকাবাবু।

—আচ্ছা তাই। মনে হচ্ছে কী, ওরা হচ্ছে রক্তবীজের ঝাড়, ওদের কি আর খাদ্যের অভাব? এ যুগের বাতাসই ওদের খাদ্য জোগাচ্ছে। এ যুগে মানুষ মানুষের রক্তপান করছে, তাদের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—

জিতু লাহিড়ী সহসা সোজা হয়ে বসেন।

উৎসুক আগ্রহী গলায় বলে ওঠেন, 'এ যুগে মানুষ যে মানুষের রক্তপান করছে, এ তোমরা অনুভব করো?'

—করি বই কী স্যা—কাকাবাবু, চোখ রয়েছে, মন রয়েছে—

জিতু তেমনি গলায় বলেন, 'সে তোমাদের এখনও এই গ্রামের চোখ আর গ্রামের মন রয়েছে বলে বাবা! শহর তোমাদের এখনও নষ্ট করতে পারেনি। নইলে রক্তপানের উল্লাসেই মেতে উঠতে!'

—সে যা বলেছেন কাকাবাবু, নেহাত অন্নদায় তাই পড়ে আছি সেখানে, নইলে কলকাতা কি একটা থাকবার মতো জায়গা?

বক্তা ছেলেটা সম্প্রতি কলকাতায় বাসা নিয়েছে। সামনের মাসেই বউ-ছেলেকে নিয়ে যাবে, কারণ বউ এবং শাশুড়িতে নিত্য ধুন্ধুমার চলছে। সেই বাসা ভাড়ার ইতিহাস এরা সবাই জানে। কিন্তু সেটাই তো মজা। কনুইয়ের গুঁতো প্রবল হয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। জিতু লাহিড়ী ওটা ধরতে পারেন না।

ওঁর চোখ ঠিক এদের ওপরও নেই। হঠাৎই সামনের জানলার বাইরে চোখ ফেলে বাতাসে পাতা ঝিলমিল একটা তেঁতুল গাছের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। ঈষৎ অন্যমনা, ঈষৎ উদাস উদাস।

সেইভাবেই বলেন, 'তাও ঠিক সম্পূর্ণ নয় বাবা, শহর আমাদের দেয়ও অনেক! কিন্তু খাজনা নেয় বড্ড বেশি। সেই খাজনা যোগাতে যোগাতেই নিঃস্ব হয়ে যেতে বসেছি আমরা। সেই নিঃস্বতার দৈন্য ঢাকবার জন্যেই মানুষ ছদ্মবেশ পরছে, রং মাখছে, পালিশ ঘষছে, আর তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাপ উঠছে মাথা চাড়া দিয়ে।...পাপের সাপ, কালকেউটে সাপ।'

ছেলেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'কী বলব কাকাবাবু, আপনার মতো এত চমৎকার করে বলতে আমরা পারি না, কিন্তু ঠিক ওইরকমই মনে হয়। লোভ, দুর্নীতি, অনাচার, অত্যাচার, ঘুষ, কালোবাজার হাজার রকমের সাপ—'

জিতু লাহিড়ী ওদের মুখে বেদনার ছাপ দেখতে পান। জিতু লাহিড়ী আবার সোজা হয়ে বসেন, —এটা যদি তোমরা অনুভব করতে পারো, তবে নগরজীবনের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে চলে এসো-না গ্রামের পবিত্রতায়, গ্রামের অনাড়ম্বর সারল্যে!

ওরা একযোগে পরস্পরকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে-ইচ্ছে তো করেই। কিন্তু ওই যে বললাম অন্নদায়!'

জিতু লাহিড়ী গভীরস্বরে বলেন, 'কিন্তু বাবা অন্ন তো গ্রামেই। গ্রামই তো অন্নদাত্রী পালয়িত্রী! আমাদের আগের পুরুষ পর্যন্ত তো এই গ্রাম থেকেই অন্ন খুঁটে খেয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। অথচ সবাই তাঁরা গরিবও ছিলেন না। কতজন কত দানধ্যান করেছেন, কত জনহিতকর কাজ করেছেন, দোল দুর্গোৎসব পুজোপার্বণ করে[illegible] ক ডেকেছেন খাইয়েছেন—'

কথার মাঝখানে হঠাৎ ভিতর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন বরুণা লাহিড়ী। আট গ্লাস বেলের পানা নিয়ে নয়, খালি হাতে। শাড়িটা টান টান করে কোমরে বাঁধা, চুলগুলো টান করে মাথার পিছন দিকে বাঁধা, ব্রোঞ্জের পুতুলের মতো চকচকে টান টান মুখ।

এসেই বিনা ভূমিকায় বলে ওঠেন, 'খাইয়েছেন! যাদের রক্তপান করে ভরাট হয়ে বসে থেকেছেন তাদেরই ওই বছরে দু-দিন ডেকে এনে উঠোনে বসিয়ে ভিক্ষান্নের ভোজ দিয়েছেন! রক্তপান! রক্তপান শুধু এ যুগই করে না, সব যুগ করে। করে আসছে। হয়তো যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য আর খাদকের সম্পর্ক বদলায়, আর কিছু না! জিতু লাহিড়ী বিরক্তভাবে বলেন, 'তুমি আবার মাঝখান থেকে কী বলছ? তুমি তো গোড়া থেকে সব শোনোনি—'

বরুণা লাহিড়ী স্বামীর দিকে না তাকিয়ে সামনে উপবিষ্টদের দিকে একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, 'শুনেছি বই কী! গোড়া থেকেই শুনেছি। সব শুনেছি, সব দেখেছি।'

ওরা ঈষৎ জড়োসড়ো হয়। এই দৃপ্ত মুখের সামনে উচিতমতো উত্তর দেবে, এত সাহস ওদের নেই।

কবেই-বা ছিল। দিল্লির সমাজের তারাও তো এমনই অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে যেত। অন্যের কথার মাঝখানে কথা বলা তো বরুণার চিরকালের অভ্যাস। তীব্র তীক্ষ্ণ কথা!

জিতু লাহিড়ী একদল মনের মতো শ্রোতা আর একটি মনের মতো প্রসঙ্গ পেয়েছিলেন, আকস্মিক এস বাধায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, এবং সেটা চাপেনও না। গম্ভীরস্বরে বলেন, 'তোমাদের ওই বুলিটা নতুন নয়, শুনেছি ঢের। তবে বুলিটা ধার করা এই যা! ধার করা বলেই শুধু ধারই আছে ভার নেই। যদি অনুভবের হত, হয়তো কিছু কাজ হত! কিন্তু একটা কথা বলি। সেকালের শোষণটাই দেখেছ তোমরা, পোষণটা তো কই দেখতে পাওনি?'

—পাব না কেন?' বরুণা তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেন, 'কোনো কালটাই তো কোনো এককালে শেষ হয় না। সব কালেই থাকে সে অন্য পোশাক পরে। শুধু সেকালে কেন, একালেও শোষণ-পোষণ দুই-ই দেখতে পাচ্ছি। ঝুনঝুনওয়ালা ঠুনঠুনওয়ালাদের পোশাক পরে ঘুরে এসেছেন আমাদের সেই ধর্মজ্ঞানী জমিদাররা। যাঁরা পুকুর প্রতিষ্ঠা করতেন, জলসত্র খুলতেন, বিষয় দেবোত্তর করে দিয়ে ব্রাহ্মণ পুষতেন, তাঁদেরই উত্তরপুরুষ তো এঁরা! এই যাঁরা হাসপাতাল খুলে দিচ্ছেন, স্কুল খুলে দিচ্ছেন, মঠে মন্দিরে মোটা চাঁদা দিচ্ছেন—'

লাহিড়ী দম্পতি কি ভুলে যাচ্ছেন ওঁরা কেবলমাত্র দু-জনে নেই? বুঝতে পাচ্ছেন না, সামনে যে-দলটি বসে আছেন তারা মজা দেখতেই এসেছে?

ভুলেই হয়তো গিয়েছেন, তাই তাদের আরও মজা পাবার সুযোগ দিয়ে তর্কে মাতছেন। অবশ্য তর্কে মাতছেন জিতু লাহিড়ীই।

নইলে বরুণার কথা শেষ হয়ে যেত সব। শেষ হতে দিলেন না জিতু, বলে উঠলেন, 'বড়োলোক চিরকালই মুখোশ পরে কাটায়। বড়োলোকের কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে গৃহস্থলোকের। যারা গরিব, যারা মধ্যবিত্ত, তারা চিরদিনই সৎ, পবিত্র, অনাড়ম্বর। আজ তারা শহরের দিকে ছুটেছে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো। শহরের পঙ্কিল জীবনের স্বাদ পাচ্ছে তারা, আর ভাবছে এই ভালো! এই চমৎকার! এই সর্বোত্তম আধুনিক!... এই সর্বনাশা বুদ্ধিকে যদি বাঁধ দেওয়া না যায়, শহরের পঙ্কিলতা সম্পর্কে অবহিত করিয়ে না দেওয়া যায়, তাহলে কোন পথে ছুটবে ওরা কে জানে!'

'ভালো'! বরুণা বলেন, 'অবহিত করাও বসে বসে! গ্রামে এসে ধর্মপ্রচারকের কাজটা যদি পেয়ে যাও মন্দ কী? যাক, আমি যা বলতে এসেছি বলে যাই, এতগুলি অতিথি সৎকার করতে পারি, এমন কোনো উপকরণ নেই এবাড়িতে।'

বরুণা ঘুরে দাঁড়াল চলে যাবার জন্যে। জিতু লাহিড়ী এই ইচ্ছাকৃত ঔদ্ধত আর ক্রূর বুদ্ধির দিকে তাকিয়ে সহসা নিজেকে সম্পূর্ণ সংবরণ করে ফেলে হেসে উঠে বলেন, 'তুমি ভুল করছ বরুণা এ তোমার দিল্লির সমাজের অতিথি নয় যে, অনেক দিতে না পারলে মান থাকবে না। এরা আমাদের ঘরের ছেলে গ্রামের ছেলে, এদের কাছে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই, তোমার হাতের বেলের পানা এক গ্লাস পেলেই এরা তৃপ্তি পাবে—'

—ওঃ তাই বুঝি? বরুণার ঠোঁটের কোণে ছুরির ধার ঝলসে ওঠে, —বুনো রামনাথের বংশধর এঁরা? কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের তৃপ্তিদায়ক সেই তুচ্ছ বস্তুটায় আবার আমার অক্ষমতা।

ঠিকরে ভিতরে ঢুকে যান বরুণা লাহিড়ী!

জিতু লাহিড়ী গম্ভীর বিষণ্ণকণ্ঠে বলেন, 'আড়ম্বর আর বিলাসিতা মানুষকে কীভাবে ধ্বংস করে, দেখলে তো তার দৃষ্টান্ত? এই গ্রামীণ সরল জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে ওঁর কত বছর লাগবে কে জানে! হয়তো পারবেনই না।'

নীরবে আবার সেই পাতা ঝিলমিল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকেন লাহিড়ী। যারা মজা দেখতে এসেছিল, তারা আর এই হতভম্ব হয়ে বসে থাকার মধ্যে কোনো মজা পায় না, উঠে পড়ে বলে, 'আজ তাহলে আসি কাকা, আবার আসব!'

জিতু মাথা নেড়ে সায় দেন।

ওরা এবাড়ির দেউড়ি পার হয়ে বলে ওঠে, 'দূর, সকালটা খানিক বরবাদ গেল! মজা জমল না! বাবাঃ গিন্নি বটে একখানা!'...বলে ওঠে, 'কেন যে লোকটা রাত দিন কালকেউটের ছায়া দেখে বুঝতে পারছিস? নিজের ঘরেই যে ফণাধরা কেউটে!'

আবার হেসে ওঠে, —আমাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল ভেতর থেকে, বুঝতে পেরেছিস?

—তা আবার পারিনি? কী মর্মভেদী দৃষ্টি, বাপস্!

তারপর সকলেই হা-হা করে হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, 'লাহিড়ীর মাথার গণ্ডগোলের কারণ শুধু মদই নয়, এই ফণাধরা ফণিনীও!'

মাথার গণ্ডগোলটা সম্পর্কেও মতভেদ থাকে না কারুর!

ওরা চলে যেতেই জিতু ভিতরবাড়িতে চলে এলেন। বাড়ির প্রথম দিনের ধূলি ধূসরিত চেহারাটা অবশ্য এখন আর নেই। জিতু লাহিড়ী যতই ইচ্ছে পোষণ করে থাকুন ঝি-চাকর রাখবেন না, সে-ইচ্ছে কার্যকরী হয়নি। বরুণা লাহিড়ী রান্নাবান্না কাজকর্ম কোনো কিছুতেই হাতমাত্র না দিয়ে একটা চৌকি ঝেড়ে নিয়ে তাতে একটা চাদর বিছিয়ে চুপ করে শুয়েছিলেন পুরো তিনটে বেলা। এহেন অচল অবস্থার অবসান করতে লোক রাখা ছাড়া উপায় কী?

জিতু নিজেই চেষ্টা করেছিলেন ঝাড়ামোছা করবার, কিন্তু ওই 'ঝাড়া' এবং 'মোছা'র যে-দুটি প্রধান অস্ত্র ঝাঁটা এবং ন্যাতা, সেই পরম দুর্লভ বস্তু দুটি পেলেন না কোথাও।

দরজার পাশে, চৌকির তলায়, মাচার উপর দেখলেন খোঁজাখুঁজি করে, তারপর হাল ছেড়ে ভাবলেন সরযূ যদি আবার আসে, তাকে জিজ্ঞেস করবেন কোথায় পাওয়া যায় ওই দুর্লভ বস্তু দুটিকে।

হ্যাঁ, তখন সরযূর আবার আসাটা 'যদি'র মধ্যে ছিল। প্রথম দিনটি তো সরযূ এসেই নেমন্তন্ন করে গিয়েছিল, এবং লাহিড়ী সে-নিমন্ত্রণকে অবহেলা করেননি। তবে জোড়ে যেতে পারেননি। যেতে হয়েছিল একলাই। বরুণা লাহিড়ী যাওয়ার প্রস্তাবে শুধু একবার ভুরু কুঁচকে ছিলেন, তারপর দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন।

জিতু লাহিড়ী চলে গেলেন ভুবন লাহিড়ীর বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। যে-বাড়িতে আপাতত পুরুষ বলতে শুধু সরযূর সেই লক্ষ্মীছাড়া ভাইপো দুটো। আর সবই মেয়েমানুষ। যেন প্রমীলার রাজ্য!

জিতু লাহিড়ী কি একটু কুণ্ঠিত হবেন? একটু অস্বস্তিতে পড়বেন?

প্রশ্নের উত্তর এরাই দিল।

সরযূর পিসি, সরযূর মা, আর সরযূ নিজে। জিতু যে এখানে যুগযুগান্তর পরে এসেছেন, জিতুর নাম যে এই তেঁতুলগোড়া থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, সেকথা যেন ভুলেই গেল ওরা। যেন এই দু-চারটে বছর পরে বাড়ি এসেছেন জিতু লাহিড়ী, লাহিড়ী বাড়ির যিনি গৌরব! মৃত কর্তা ভুবন লাহিড়ীর যিনি ভাইপো, এবাড়িতে যাঁর দাবি আছে।

পিসি একেবারে কলকল্লোলে এগিয়ে এলেন এবং নিতান্ত সহজে নিতান্ত অন্তরঙ্গতার সুরে বলে উঠলেন, 'এতদিনে দেশকে মনে পড়ল বাবা? দেশে পদার্পণ করলে তাহলে? এসো, ঘরের ছেলে ঘরে এসে বোসো! এ পুরী অন্ধকার হয়ে গেছে, তবু তুমি যে এসে বন্ধ ভিটের দোর খুললে এই পরম আনন্দের কথা। তা হ্যাঁ বাবা, বউমা এলেন না?'

কে ইনি, কী সম্পর্ক এঁর সঙ্গে, ইতিপূর্বে দেখেছেন কি না, কিছু মনে করতে পারলেন না জিতু লাহিড়ী, শুধু 'বউমা' শব্দটা শুনে অনুমান করলেন পিসি খুড়ি কেউ হবেন।

নীচু হয়ে একটু প্রণামের ভঙ্গি করে বললেন, 'না, তিনি আসতে পারলেন না, কাউকে চেনেন না বলে অনিচ্ছে প্রকাশ করলেন।'

মুখে আসছিল 'তাঁর শরীরটা ভালো নয়,' কারণ ওইটাই সর্বপ্রধান অজুহাত। কিন্তু 'মিথ্যা'-কে আর প্রশ্রয় দেবেন না, সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করবেন, এই সংকল্পে স্থির হলেন, তাই বললেন 'তিনি অনিচ্ছে প্রকাশ করলেন।'

পিসি হায় হায় করে ওঠেন, —ওমা সে কী, চেনার আবার হাত-পা আছে নাকি, দেখা হলেই তো চেনা! দ্যাখো দিকি কাণ্ড! সরযূ তুই যা-না এক বার ছুটে, ডেকে নিয়ে আয়-না!

জিতু লাহিড়ী মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, 'থাক থাক, হবেই পরে চেনাজানা। ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আপনি আমার কে হচ্ছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না!'

পিসির বয়েস পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের কম নয়, তথাপি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী, চটপটেও বিলক্ষণ।

কথা বলতে বলতেই তাড়াতাড়ি একবার তরকারিটাকে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে ছুটে রান্নাঘর ঘুরে এসে বলেন, 'বুঝতে পারছ না বলে লজ্জারও কিছু নেই বাবা, দোষেরও কিছু নেই। বুঝবে আর কোথা থেকে? বাড়ি ছাড়া কি আজকে? তবে আমি বুড়ি ঘাঁটি আগলে পড়ে আছি, আর একে একে সবাইয়ের পারের হিসাব কষছি, তাই আমার সবই চোখের ওপর জ্বলজ্বল করছে। যেদিন বাড়ি থেকে পালালে, কী হইচই পড়ে গেল! বাইরের উঠোনে চৌকি পেতে তখন কর্তারা একসঙ্গে বসে গালগল্প করতেন, তেমনি করছেন, খবর হল জিতুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—ব্যাস কী ছুটোছুটি হাঁটাহাঁটি কাণ্ড। ওবাড়ির বড়োবউদি, মানে তোমার মা তো একেবারে শয্যেধরা হয়ে পড়লেন, সাত দিন মুখে জলবিন্দুটি না, শেষে মন্দিরের ভটচায্যি মশাইকে ডেকে তাঁকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে—

পিসির স্মৃতিশক্তির তারিফ করে সরযূ। বাবাঃ এতকালকার কথা মনেও আছে। বলছে দ্যাখো বুড়ি, যেন এই কাল-পরশুর ঘটনা। হেসে উঠে বলে, 'নাও ঠেলা, পিসি এখন পঞ্চাশ বছর পূর্বের ঘটনাকে টেনে এনে গল্প ফাঁদতে বসল! ও পিসি, ওসব কথা পরে হবে! মানুষটাকে একটু জল দাও, মিষ্টি দাও—'

—থাক থাক। জিতু লাহিড়ী হাত নেড়ে থামান। পঞ্চাশ বছর পূর্বের কাহিনিই যে আজ তাঁর বড্ড প্রয়োজন। জিতু নামক একটা অবোধ উদ্ধত ছেলে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, এইটুকুই জানা ছিল জিতু লাহিড়ীর। ছেলেটা চলে যাবার পর তার উপস্থিতির ঠাঁইটুকুতে কতখানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে-খবর তো জানা নেই!

সেই ছেলেটার মা পুত্রবিচ্ছেদে কাতর হয়ে বিছানা নিয়েছিল? তার উপবাস ভঙ্গ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল?

আশ্চর্য! আশ্চর্য ! সে-খবরটা কেউ কোনোদিন পৌঁছে দেয়নি জিতু লাহিড়ীর কানে? সমস্ত জগতের প্রতি অভিমানাহত, সমস্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিস্পৃহ, জিতু লাহিড়ী তাই মাতৃবিয়োগ সংবাদটাকেও ঔদাসীন্যের সঙ্গে সরিয়ে রেখেছেন!

কত কতদিন আগে সেই ছেলেটার মৃত্যু ঘটেছে, তবু তার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে বুকটা কেমন করে উঠল জিতু লাহিড়ীর। আস্তে বললেন, 'পুরোনো কথাও শুনতে ভালো লাগে! আপনি তাহলে—'

—পিসি পিসি! সরযূ বলে ওঠে, 'ঈশ্বর ভুবন লাহিড়ীর সহোদর বোন তো ইনি—'

জিতু লাহিড়ী স্মৃতির সমুদ্র তোলপাড় করতে থাকেন, ভুবন লাহিড়ীর সহোদরা।

—আপনি কি তাহলে রাঙাপিসিমা?

বলে ওঠেন জিতু লাহিড়ী।

সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন পিসি। —ওমা এই তো সব ঠায় ঠিক মনে রেখেছ বাবা! কথায় বলে রক্তের সম্পর্ক বংশের টান! একি ভোলবার জো আছে? মনে আছে সেই তোমরা ছেলেপুলেরা ওই খিড়কিপুকুরে সাঁতার দিতে আসতে, আর আমি বকাবকি করতাম!

মনে পড়ে! স্থান-কাল-পাত্র মনে পড়িয়ে দিলে অনেক বিস্মৃতিই স্মৃতির জানালায় এসে উঁকি মারে। জিতু লাহিড়ী সামান্য কৌতুকের হাসি হেসে বলেন, 'মনে পড়ছে! বকাবকি তো সাঁতার দেবার জন্যে করতেন না, বকাবকি করতেন আমরা পুকুর পাড়ের একটা জাম গাছ থেকে জাম লুঠতাম বলে।'

—ও বাবা! দুষ্টু ছেলেটার যে সব মনে আছে দেখছি! 'পিসি বিগলিতহাস্যে সায় দেন, —যা দুরন্ত ছিলে বাবা!

জিতু লাহিড়ী মৃদুহাস্যে বলেন, 'আশ্চর্য মানুষের চেহারার কতই-না পরিবর্তন হয়! কী ফর্সা রং ছিল আপনার! কীরকম চমৎকার দেখতে ছিলেন—'

—লাহিড়ী গুষ্টির মধ্যে মন্দটা কে শুনি? সরযূ বলে ওঠে, 'খালি বাড়ির বউরাই তেমন জুতের নয়, কী বলো পিসি?'

সরযূর দুষ্টু হাসি পশ্চাতবর্তিনী একজনের উদ্দেশ্যে ঠিকরে ওঠে।

—এই হল! পিসি বলেন, 'এই এক রোগ মেয়ের! বুড়োবয়স অবধি সারল না। কেন আমার জিতুর বউ কি মন্দ?'

—মেজদার পাশে লাগে না।

—হয়েছে, থাম। যা তো, তুই ডেকে আন গে! বুড়ি পিসির হাতের দুটো ডাল ভাত খাক—

—এই দ্যাখো বুড়োর রোগ। সরযূ হাসে, —শুনলে না এখন থাক!

—তা তো শুনলাম! তা হ্যাঁ বাবা, তোমার বাড়িতে তো আর আজ রান্নাবান্না সম্ভব নয়, বউমার খাওয়ার তাহলে কী হবে?

জিতু লাহিড়ী কথা বলার আগেই সরযূ উত্তর দিয়ে ওঠে, 'কী আবার হবে? সরযূ কি মরেছে? একটা মানুষের ভাত তরকারি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব না?'

তা সেই পৌঁছেই দিয়ে এসেছিল সরযূ, বরুণা লাহিড়ীর জন্যে ভাত-তরকারি বেড়ে। কিন্তু বরুণা ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে তা স্পর্শও করেনি।

জিতু লাহিড়ীই প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন পিসির হাতের রান্নার।

কত যুগযুগান্তর আগে এ ধরনের খাদ্য খেয়েছিলেন জিতু, ভাবতে শুরু করলেন, অবাক হলেন, বিষম খেলেন, এবং শেষপর্যন্ত এই ভেবে আশ্চর্য হলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পূর্ণ অন্য স্বাদে অভ্যস্ত জিভ এসব জিনিস নিল কী করে? শুধু তিনি এই তেঁতুলগোড়ার ছেলে বলে।

প্রথম দিনের ইতিহাস ছিল এই। তারপরও কয়েক দিন ধরে এই একই নাটকের পুনরাভিনয় হতে থাকল। জিতুদের খাওয়ার দায়িত্বটা যেন সরযূরই।

বরুণা পরদিন থেকে অবশ্য আর ভাত ঠেলে রাখেননি। যেন সরযূকে কৃতার্থ করছেন, এইভাবে খেয়েছেন। পরে সরযূ তাঁর ক্ষমতা অনুমান করে একটি বামুনের মেয়েকে রান্নার কাজে ভরতি করে দিয়েছিল। না দিলে খাওয়া জুটত না। বরুণা লাহিড়ী যে রান্না জানেন না তা নয়, গ্যাসের স্টোভে মাংস রান্না করেছেন কতদিন। কিন্তু এখানে ওই কাঠের উনুনে শাকপাতা রান্না করা? অসম্ভব!

এখানে বাস করাটাই তো একটা অসম্ভব ঘটনা। তার উপর এইসব অদ্ভুত কাজ!

যে-দুদিন ঝি জোটেনি, সরযূ এসে অবলীলায় এই বিরাট বাড়িটার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ঝাঁট দিয়ে সাফ করে দিয়ে গেছে, বরুণা বেজার মুখে ঘরে বসে থেকেছেন।

জিতু লাহিড়ী প্রথমটা হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'এটা কী হচ্ছে? এটা কী হচ্ছে?'

সরযূ হেসে উঠে বলেছিল, 'দোষের কিছু না, বাপ-ঠাকুরদার ভিটের জঞ্জাল সাফ করছি!'

জিতু বলেছিলেন, 'তুমি একটি আশ্চর্য মেয়ে! এমন দিক থেকে কথা বললে, বাধা দেওয়ার আর পথ রাখলে না!'

সরযূ আবার হেসেছিল, —'বাধা' আর 'পথ' দুটো যে আলাদা বস্তু মেজদা! অস্বস্তি বোধ করছেন কেন? যাঁর সংসার তিনি ঠিকই ভার নেবেন, তবে এখন হঠাৎ জলের মাছ ডাঙায় পড়েছেন, ভয় খাচ্ছেন। আর আমার তো এই কাজ। লাহিড়ী বাড়ির উঠোন ঝেঁটিয়েই তো জীবন কাটল! যারা গোত্তর পদবির ভাগ দিয়েছিল, তারা তো আর ভাতের ভাগ দিল না জীবনে!...সরুন কিন্তু, বড্ড ধুলো উড়ছে!

দিন দুই পরে বাগদিদের একটা মেয়েকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য।

জিতু লাহিড়ী বলেছিলেন, 'দাসী-রাঁধুনি রেখে সংসার করবার ইচ্ছে আমার ছিল না সরযূ!'

সরযূ অম্লান বদনে জবাব দিয়েছিল, 'তা মানুষের সব ইচ্ছে কি মেটে? মেজোবউদির যে ইচ্ছে ছিল বিলেত যাবার, আপনি নিয়ে এনে ফেললেন এই হতচ্ছারা তেঁতুলগোড়ায়। তবে? পেনসিলকাটা ছুরি দিয়ে গাছ কাটবার বায়না নিলেই-বা চলবে কেন?'

মেয়েটার কথার যুক্তিতে বিস্মিত হয়েছিলেন জিতু লাহিড়ী, আর বেবি লাহিড়ী ভেবেছিলেন, পুরুষ মজানোর বিদ্যেটা শুধু শহুরে মেয়েদেরই একচেটে নয়।

গ্রামের শান্তি আর পবিত্রতা দেখাতে এসেছেন সাহেব বরুণাকে! বিষ!

বিষ ওঠে এদের দেখে! গোড়া থেকেই।

আজও সেই বিষ মুখে নিয়ে বসেছিলেন বরুণা, ছেলেরা চলে গেলে জিতু লাহিড়ী ভিতরবাড়িতে এলেন।

বরুণার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা কী হল?'

বরুণা অবশ্য শুনতে পেলেন না।

জিতু আবার উচ্চারণ করলেন কথাটা।

বরুণা এবার সম্পূর্ণ অবোধের সুরে বললেন, 'কোনটা?'

—এই ছেলেগুলোর সামনে যে-ব্যবহারটা করলে তার কি সত্যিই দরকার ছিল? এটা তো একরকম অসভ্যতা।

বরুণা হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তীব্রকণ্ঠে বলেন, 'আরও কত বেশি অসভ্যতা তুমি করেছিলে সে-জ্ঞান তোমার আছে? তোমার এই 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে' গ্রামের ছেলেদের তুমি বেলের শরবত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করতে চাইছিলে, তাই না? বরুণা লাহিড়ীকে দিয়ে সেই শরবত বানাবার বাসনা হয়েছিল, কেমন? তাতে ওরা তোমাকে কী ভাবছিল জানো? পাগল! বুঝলে? পাগল! অবশ্য ঠিকই বলছিল। তোমার যদি একটুকুও স্বাভাবিক বোধ থাকত, তাহলে টের পেতে ওরা তোমায় নাচিয়ে মজা দেখতে এসেছিল।

—মজা দেখতে এসেছিল!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই! ওরা হাসাহাসি করছিল, ব্যঙ্গ করে ভক্তি দেখাচ্ছিল তোমায় বুঝলে? এই তোমার নিজের সমাজ!

ওই তিক্ত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ওঠেন জিতু লাহিড়ী। বলেন, 'তাতেই-বা ঠকছি কোথায়? একদিন তোমার সমাজ তোমায় নিয়ে মজা দেখেছে, এখন নাহয় আমার সমাজ আমাকে নিয়ে তাই করবে!'

বরুণা তীব্রস্বরে বলেন, 'তর্কে হারলে ফিলজফার বনে যাওয়াই শেষ উপায়! তবে আমি তোমায় এই বলে দিচ্ছি, তোমার সাধের এই গ্রামের সরল গ্রামবাসীরা কেউ তোমার তপোবনের আদর্শের দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই। সবাই ধরে নিয়েছে তুমি পাগল হয়ে গিয়ে দিল্লির বাস উঠিয়ে দিয়ে এখানে এসে পড়েছ। তুমি ভাবছ খড়ম পায়ে চাদর দিয়ে ভারতে ঐতিহ্যের ধারক আর বাহক হয়ে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি, ওরা ভাবছে বদ্ধ একটা পাগল এল রে!'.... বরুণা সর্বাঙ্গে একটা মোচড় দিয়ে বলে ওঠেন, 'আর ভুলও বলে না!'

তা ভুল ঠিক যাই হোক, বলছে তো বটেই। মেয়েমহলেও এই আলোচনা এখন। জিতু লাহিড়ীই বিষয়বস্তু এবছরের।

—উন্মাদ নয়, বদ্ধপাগল! একটা বাতিককে বদ্ধমূল করে আঁকড়ে বসে থাকার নামই বদ্ধপাগল। শুনেছিস তো, বলে কি না মানুষ আবার এক-শো বছর পেছনে ফিরে যাক তবেই শান্তি।

—এক এক পাগলের এক এক ধারা! মনে নেই আমাদের ঠাকুরবাড়ির বড়ো পুরুতের সেই ভাইপোটার কথা? রাত দিন একটা ঘটি নিয়ে জল ভরত আর জল ঢালত, জিজ্ঞেস করলেই বলত, 'মা বসুমতীর মাথা জ্বলে যাচ্ছে, ঠান্ডা করছি—'। মাথা কেন জ্বলছে রে?....না, 'সন্তানদের দাপটে—'। হি-হি এও তেমনি আর কী!

'মানুষ এক-শো বছর পেছনে ফিরে যাবে! এ যেন হাটতলার রাস্তায় হাঁটা। ইচ্ছে হল গেলাম, ইচ্ছে হল ফিরলাম! ভগবান মানুষকে পাঠাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে, তারা জন্মাচ্ছে মরছে, আবার নতুন ঝাঁক আসছে। এই তো ব্যবস্থা, উলটোমুখে হাঁটার আইন আছে?

—আহা, পাগলে কি না বলে!

—কিন্তু অমন মানুষটা কিনা পাগল হয়ে গেল!

—আচ্ছা সত্যিই কি মদ খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়?

—তা পিপে পিপে খেলে হয় বই কী!

—কিন্তু ভজা দুলে যে হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি গেলে, কই—

—আরে বাবা সে হল গিয়ে দিশি, আর এ হল বিলিতি—

—স্মৃতিশক্তিটা একেবারে লোপ পেয়েছে। শুনতে পাই পাঁচ-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে, লোকের কাছে বলে কিনা ছেলে-মেয়ে নেই, একটাও নেই। কখনো ছিল না, হয়ইনি।

—পাঁচটা ছেলে-মেয়ে সেকথা বলল কে? সরযূ বুঝি?

—আবার কে! রাত দিন যে ওবাড়ি ছুটছে! গিন্নি তো অহংকারে মট মট, কথা কইলে উত্তুর দিতে নারাজ, তবু সেধে কথা কয়ে মরে সরযূবালা! ছেলে-মেয়ে কী, কোথায় থাকে, কী বিত্তান্ত, নাম কী তাদের, এইসব প্রশ্নের জ্বালায় রেগেমেগে নাকি বলেছিল, 'মেয়েদের নাম শীলা শেলি সোমা, ছেলেদের নাম জয় আর সঞ্জয়। শুনলে? পাঁচটা-ই হল!

—সরযূটা তবু অত যায় কেন বল তো?

—আর কেন? লাহিড়ী বংশ যে! মেজদা বলে অজ্ঞান একেবারে। ওরই মুখেই সব শুনি, দিল্লিতে নাকি রাজ্যপাট ছিল, সাহেবের মতন থাকত, ছেলে-মেয়েগুলোর সব বিয়ে হয়ে গিয়ে যে-যার আপন আপন পথ দেখল, এদিকে বুড়োও পাগল হয়ে সর্বস্ব বেচে দিয়ে টাকাটা নাকি রামকেষ্ট মিশনে না কোথায় দাতব্য করে দিয়ে ভিখিরির হাল করে দেশে এল!

—এও কি গিন্নি নিজে বলেছে নাকি? অত দেমাক—

—না না, এসব সেই ছোটো লাহিড়ীর শালার বউ গল্প করে বলেছে কলকাতায় অনন্তর বোনের কাছে। মুখে মুখে সাতকান।

—দেশে এলি এলি, রবরবা থাকতে থাকতে একবার আয়? তা নয়, হাড়ির হাল করে এলেন ভিটেয় সন্ধে দিতে।

—সন্ধে তো কতই দেয়। গিন্নি তো তেমনি! সরযূ নাকি তুলসী গাছ নিয়ে পুঁতে দিতে গিয়েছিল, গিন্নি বলেছে, 'দেশে বুঝি আপনাদের ছাগল নেই? এই চারাগাছটা তাদের দিলে তো সদগতি হত।'

—অ্যাঁ বলিস কী! হিন্দুর মেয়ে হয়ে এই কথা বলল? তাহলে পুঁততে দিল না?

—ও বাবা, ও-মেয়ে না পুঁতে ছাড়বে? বলে, 'ছাগলের অভাব কী? তবে নাকি মেজদা বলেছেন একটা তুলসী-গাছ পুঁতে দিও তো সরযূ এবাড়িতে। তাই আদেশপালন করতে এসেছি।

—গিন্নি দেবে উপড়ে।

—দিত, পাগলার ভয়ে পারে না। পাগলা যে আবার সময় সময় খুব মেজাজ করে বলে, 'সব পুরোনো ধারা বজায় রাখা চাই।'

—পুরোনো ধারা! হুঁঃ! আমাদের ঘরের বউ-ঝিই এখন সক্কাল বেলা বাসি কাপড়ে বলে ঢক ঢক করে চা গিলছে!...পুরোনো ধারা বজায় রাখতে এই আমরাই রেখে গেলাম! তবে সরযূর মতন আর কে পারবে? এই তেঁতুলগোড়ায় যেখানে যত বিগ্রহ আছেন, অশ্বত্থতলায় নুড়িটি পর্যন্ত সবাইকে দু-বেলা জল দেওয়া চাই সরযূর।

—করবে না কেন, সংসারজ্বালা তো নেই! ঝিউড়ি মেয়ে। এই দ্যাখো না পথে বেরোলেই তো নেয়ে মরবে, তবু চোদ্দো বার ওবাড়ি ছুটছে হয়তো একটু শকের ঘণ্ট নিয়ে, একটু মোচার ঘণ্ট নিয়ে, হয়তো-বা দুখানা পোস্তর বড়া নিয়ে, কি না মেজদা ভালোবাসেন।

—ওমা! ছিল তো চিরটাকাল সাহেব হয়ে, এসব ভালোবাসতে শিখল কখন?

—আহা এখনই শিখছে। জানো না নতুন বোষ্টম ডবল করে ফোঁটা কাটে?...হিঁদু হয়েছি, বোষ্টম হয়েছি, দিশি রান্না ভালোবাসতেই হবে, এই আর কী?

—গিন্নিটার হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে আর কী! সরযূর অত মেজদা মেজদা করাও নাকি পছন্দ করে না। সেদিন সুষমা গিয়েছিল ওর সঙ্গে, বলল, 'মেজদার জন্যে কুমড়োর ফুল ভাজা নিয়ে এলাম।' শুনে সরযূর দিকে এমন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল গিন্নি যেন ভস্ম করে ফেলবে!

—আ মরণ! বর তো ষাট বছরের বুড়ো!

—তাতে কী! বর বলে কথা! তা ছাড়া এই বয়সেই চেহারাখানা দেখেছিস? যেন যুবরাজ। বাপ-জ্যাঠার মতন চেহারা পেয়েছে।

—তা ওই যে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল, সরযূ কী বলল?

—সুষমা তো বলতে বলতে হেসেই খুন। বলে, সরযূ কিনা বলে উঠল, 'যাই ভাগ্যিস দিনে পঁচিশ বার নেয়ে নেয়ে দেহটা জলের মাছের মতন হয়ে গেছে, তাই আর অগ্নিদগ্ধ হলাম না বউ! নচেৎ ভস্ম হয়ে যেতাম! কুমড়ো ফুল তো আমি তোমায় খেতে বলিনি বাপু, বলেছি আমার দাদাকে!' ঠিকরে ঘরে ঢুকে গেলেন গিন্নি।

—আর যেদিন আমি গিয়েছিলাম প্রথম? সেদিন? ভব্যি করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এলেন দিদি গ্রামে? শেষ অবধি মনে পড়ল?' কি উত্তুর দিয়েছিল মনে আছে তো? বলিনি তোকে? বলেছিল, 'মজা দেখতে এলেন বুঝি? তা আসবেন বোধ হয় মাঝে মাঝে? গাঁয়ে যখন সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, চিড়িয়াখানা নেই! আর এ মজা দেখতে টিকিটও লাগবে না।' বাবা সেই অবধি নাকে-কানে খত দিয়েছি। আর যাচ্ছি না। সরযূর মতন মান-অপমান জ্ঞানহীন কে হবে? কিছু গায়ে বয় না। পাঁকাল মাছ! নইলে ঘরে-সংসারেও তো দেখেছ? বাক্যি যন্ত্রণা কি কম আছে? গ্রাহ্য করে না। বলে চোদ্দো বার বাগদিবাড়িই ছুটছে। কি না ওদের ছেলের জ্বরবিকার।

সরযূ ছিল এখানের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ, জিতু লাহিড়ীর সূত্রে সেটা আরও বেড়ে গেছে। বলতে কী, জিতু লাহিড়ীর অন্তঃপুরের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র ওই সরযূই! তবে সেই সূত্রে যে সরযূ লাহিড়ী গিন্নির নিন্দে করে বেড়ায় তা নয়, সে শুধু রং রসান দিয়ে মজার টিপ্পনি কেটে গল্প করে।

জিতু লাহিড়ী যখন সকাল বেলা স্নান সেরে ধোওয়া ধুতি পরে পূর্বাস্য হয়ে সূর্যপ্রণাম করেন, বরুণা লাহিড়ী যে তখন ঘাড়ের নীচে দুটো বালিশ দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে থাকেন, একথা সরযূই প্রকাশ করে দিয়েছে। বলেছে, 'কী আর বলব, দেখে হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারিনে সেদিন। আমি গিয়েছিলাম গাছের চাঁপা ফুল দিতে। মেজদা বললেন, 'কে পুজো করবে? তোদের বউদি? তা তোকে তো এতদিন বেশ বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছিল। ধারণাটা ভেঙে যাচ্ছে যে? যা দোতলায় উঠে যা, দেখে আয়!'

—উঠল দোতলায়? ওর তো সবেতেই শুচিবাই। ওদের সিঁড়ি ধোয়া নয় বলে ফিরে এসে নাইতে বসবে হয়তো।

—সে আর বলতে! তবু রাত-দিন পাড়ারাজ্য প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। পাতলা ঝরঝরে শরীরটা নিয়ে নিমেষে মাঠঘাট পার হয়ে যায় সরযূ, সাঁঝ সন্ধে মানে না। দুলে বাগদিও মানে না, কারও শক্ত অসুখ শুনলে যাওয়াই চাই তার। শুধু ফেরার সময় খিড়কির পুকুরে একটা ডুব দিয়ে তবে বাড়ি ঢোকে।

বাগদিদের ওই ছেলেটার জ্বর বাড়ায় তদবির তদারক করতে ক-দিন রোজই যাচ্ছিল, আজ হঠাৎ একটা অদ্ভুত অভূতপূর্ব খবর কানে এল। সাপে কামড়ানির মতো খবর।

চমকে উঠে সংবাদদাতার মুখের দিকে বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সরযূ। তারপর প্রবল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'পাগল হলি নাকি?'

অভিযুক্ত ব্যক্তিও দৃঢ়স্বরে জানাল, 'স্বচক্ষে দেখা দিদিমণি!'

—তোদের চোখের কথা বাদ দে নিধে, তোরা তো দিনদুপুরে স্বচক্ষে ভূত দেখিস! যা-নয়-তাই বললেই শুনব আমি?

—আচ্ছা দিদিমণি পেত্যয় নাহয়, এই সন্‌ঝের ঝোঁকে এক বার ভোলার ঘরের আনাচেকানাচে দাঁড়িয়ে দেখবেন?

সরযূ দৃপ্তকণ্ঠে বলে, 'ছোটো মুখে বড়ো কথা কসনে নিধে, আমি যাব সন্ধের আঁধারে ভোলার ঘরের আনাচেকানাচে উঁকি দিতে? গলায় দিতে দড়ি জুটবে না আমার? সাবধান করে দিচ্ছি নিধে তোদের, যা-তা কথা রটিয়ে বেড়াসনে, লাহিড়ী বাড়ির কর্তারা আজ নেই বলে সাপের পাঁচ পা দেখিসনি। যিনি এসেছেন, তিনিও যে-সে মানুষ নয়, সেটা মনে রাখিস! আর লাহিড়ী বাড়ির এই মেয়েকেও মনে রাখিস।'

এহেন চোটপাট কথা যদি সরযূ ছাড়া আর কেউ বলত, নিধুও চোটপাট করত সন্দেহ নেই। কারণ তেঁতুলগোড়া গ্রামের বাহ্যিক চেহারায় যতই এক-শো বছরের ঘুমের প্রলেপ মাখানো থাকুক, আভ্যন্তরিক চেহারায় পরিবর্তন ঘটেছে বই কী।

সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে, 'কথা' নামক বস্তুটা এখন আর কেউ পরিপাক করে নেয় না। সঙ্গে সঙ্গে উচিত জবাব দিয়ে বসে। তা সে বাপ-জ্যাঠাই হোক, আর গুরুপুরুতই হোক, কি রাজা-মহারাজাই হোক। বড়োর সামনে মাথা হেঁট করে অপ্রতিবাদে 'কথা' মেনে নেবে, এ অসম্ভব।

তবু সরযূর সম্পর্কে আলাদা সমীহ রাখে সবাই। ইতর ভদ্র সকলে। সরযূর শাণিত রসনা এবং দৃপ্ত চরিত্রই বোধ করি এর কারণ। সরযূকে কেউ কোনোদিন অপ্রতিভ হতে দেখেনি, ইতস্তত করতে দেখেনি। তা ছাড়া পরোপকার! ওটা একেবারে সরযূর মজ্জায় মজ্জায়। চেষ্টাকৃতও নয়, কর্তব্যবোধেও নয়, লোকের অসুবিধে দেখে চুপ করে থাকা সরযূর কুষ্ঠিতে লেখেনি। গরিব বড়োলোক নেই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নেই, এরা তাই সরযূর নিতান্ত অনুগত। অতএব উচিতজবাব দিয়ে বসল না নিধু। শুধু বিনীত দৃঢ়তায় বলল, 'তবে আর কেমন করে প্রমাণ দেব বলুন দিদিমণি! তবে, নিধে কখনো বাজে কথা রটিয়ে বেড়ায় না। আর কেনই-বা একটা মান্যিমান ঘরের কুচ্ছো করতে যাব? তাতে লাভ কী আমার?'

যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করে সরযূ। সত্যিই তো? লাভ কী এদের? কিন্তু বিশ্বাস করাও তো অসম্ভব!

কী এ? ভাবতে ভাবতে সেই মান্যিমান মানুষটার বাড়ির দরজাতেই এসে দাঁড়াল এক বার। গেট থেকেই দেখা যাচ্ছে, বড়ো ঝুলবারান্দার নীচে দাওয়ায় জলচৌকি পেতে বসে বই পড়ছেন জিতু লাহিড়ী, সামনে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে। প্রদীপের সলতে পাকানোর জন্যে জিতুকে সরযূরই সাহায্য নিতে হয়। বলেছিলেন একদিন, 'তোর বউদিকে ওই ভয়ংকর কাজটা একবার শিখিয়ে দিস তো?'

সরযূ হেসেছিল, হ্যারিকেন না-জ্বেলে প্রদীপ জ্বালবেন দাদা? ঝড় বাতাসকে ঠেকাবেন কী করে?

—যেমন করে আমাদের পিতামহেরা ঠেকিয়েছেন।

—তেনাদের আমলে ঝড়টা কম ছিল মেজদা, হেসে উঠেছিল সরযূ, —এখন যে ঘরে-বাইরে ঝড়! তা যাক, ওটুকুর জন্যে আবার বউদিকে কষ্ট পেতে হবে কেন? সরযূর হাতে কি ঘুণ ধরেছে?

—বাঃ তুই কি বারোমাস করে দিবি নাকি?

—ক্ষয়ে যাব না। একদিন খানিকটা সময় নিয়ে বসলে ছ-মাসের কাজ মিটে যায়। আমি সলতে দিয়ে যাব।

জিতু লাহিড়ী সহাস্যে বলেছিলেন, 'তার মানে মন্ত্রগুপ্তি! বিদ্যেটা অন্যকে শেখাবি না।'

সরযূও সহাস্যে উত্তর দিয়েছিল, 'তা যা বলেন। বিদ্যের মধ্যে তো ওই সলতে পাকানো, ঘর নিকোনো, সুপুরি কাটা, মুড়ি ভাজা, এই! সেটুকুর মহিমা ছাড়ি কেন? তবে বিজলি আলোর চোখে তেলের পিদ্দিম খাটবে তো? বইয়ের ওই খুদে খুদে অক্ষর দেখতে পাবেন?'

লাহিড়ী বলেছিলেন, 'বিজলি আলোয় চোখ ধেঁধেঁ গেছে বলেই তো প্রদীপের কাছে পালিয়ে এসেছি সরযূ! এই প্রদীপের আলোতেই ছোটো ছোটো জিনিস দেখতে পাব।'

আজও দেখল সরযূ, প্রদীপের কাছে এসে বসেছেন জিতু লাহিড়ী।

ভাবল, শুধু কি চোখ ধাঁধানো আলোর কাছ থেকেই পালানো মানুষটার? গৃহলক্ষ্মীটি যা, তাঁর কাছ থেকেও তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। উঃ! হাসতে যেন শেখেনি!

হ্যাঁ ওই কথাই ভাবে সরযূ। মিসেস লাহিড়ীর সেই কাচের গ্লাস ভাঙা শব্দের হাসি দেখবার সৌভাগ্য তো হয়নি তার। তারপর ভাবল, কর্তার ধারেকাছে কি কখনো থাকতে নেই বাপু? এমন কিছু লজ্জাবতী নও। বুঝলাম উনি তোমাকে একেবারে আকাশ থেকে পাতালে টেনে এনেছেন, তবু একলা ঠেলে তো দেয়নি? সীতা যে বনবাসে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে।

তারপর ভুরু কুঁচকে আরও কিছু ভাবল!

এবং একটু ভেবে হাঁক পাড়ল, 'মেজদা আজ বেরোননি?'

জিতু চমকে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন। গেটের ওপরটা ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার। দেখতে পেলেন না। কিন্তু গলাটা তো ভুল হবার নয়, এমন শানানো আর ধারালো গলা কার আছে এখানে?

বলে উঠলেন, 'কে? সরযূ নাকি? এমন সময়ে?'

—হ্যাঁ মেজদা? যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে তাই ভাবলাম এক বার খবরটা নিয়ে যাই।

—আয় আয়। উঠে আসেন জিতু লাহিড়ী।

সরযূ হাঁক পেড়েই বলে, 'না মেজদা, এখন আর বসব না, ঘাটে যাচ্ছি। বউদি কোথায়?'

—আছেন কোথাও!

—বাড়ি নেই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ি আছেন বই কী! তা রাত হয়ে গেছে, এখন ঘাটে?

সরযূ হেসে ওঠে, 'আমার আবার রাত! ভূতের আবার জন্মদিন! বসুন আপনি, পড়াশুনো করুন, যাই।'

চলে গেল সরযূ। আর ভাবতে ভাবতে গেল নিধুটা কোনো গোলমাল করে ফেলেছে।

এক গা জল, ভিজে কাপড় সপসপিয়ে ঢুকে দড়ি থেকে গামছাখানা টেনে মাথা মুছতে মুছতে সরযূ দাওয়ায় মাদুর পেতে গড়িয়ে পড়ে থাকা ভাইপো দুটোকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'এই অকাল কুষ্মাণ্ড বামুনের গোরু দুটো, এমন সময়ে অঙ্গ ঢেলেছিস যে?'

বলা বাহুল্য তারা সাড়া দেয় না। না দেবার কারণ, প্রয়োজন বিবেচনা করে না। পিসির এহেন মধুর সম্ভাষণেই তারা আজন্ম অভ্যস্ত।

কিন্তু সাড়া করে তাদের জননী।

যদিও ছেলেদের এই অসময়ে অঙ্গঢালা তারও খুব প্রীতিকর হয়নি। একটা কাজও ছেলেদের দিয়ে হয় না। ভোর থেকে সারাদিন বাইরে ঘোরে, আর সন্ধেয় ফিরে দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শোয়। তাদের মা যে বাপেরবাড়িতে একটা চিঠি লিখে আজ তিন দিন ধরে খোশামোদ করছে, ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দিতে, সে-সময় হচ্ছে না বাবুদের। এইমাত্র সেই কথা নিয়ে বকাবকি হয়ে গেছে।

তবু ননদের এই মন্তব্যে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে যায় তার। আর সেই দাহেই ছেলে দুটোরই পক্ষ সমর্থন করে বসে।

বলে, 'এবাড়িতে আর কে কোন কাজটা সময়ে করছে ঠাকুরঝি, তাই ওদের দুষছ? ওরাও তো উলটে প্রশ্ন করতে পারে, 'এটাই কি পাড়াবেড়িয়ে ফেরার সময়? না ঘাটে ডুব দেবার সময়?'

—তাই নাকি? জোরে জোরে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলে সরযূ, 'তোমার যে দেখছি সময়-অসময় জ্ঞানটা বেশ জন্মেছে। তবে হিতাহিত জ্ঞানটা জন্মালে আখেরে ভালো হত এই যা! পিসি ছেলেদের দুটো সৎ উপদেশ দিতে এল, জননী গর্ভধারিণী এলেন তার উপর থাবড়া দিতে!'

বউ ব্যাজার গলায় বলে, 'তা পিসি যদি উঠতে-বসতে উপদেশ ঝাড়ে, লাগে বই কী! বলতেই হয় আপনার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!'

—আ-হা মরে যাই, কী মাতৃস্নেহ! ওগো বুদ্ধিমতি, বলি পিসির আচার-আচরণে কি লাহিড়ী বাড়ির ধারা এগোবে-পিছোবে? দোত্যিকুলে পেহ্লাদ তোমার গর্ভের ওই দুটিই যে এখন লাহিড়ী বাড়ির ধ্বজা! ভুবন লাহিড়ীর নামটা রাখতে, মুছতে, ওরাই!'

মাদুরে গড়িয়ে থাকা ছেলে দুটোর মধ্যে একটা ছেলে হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে একথায়। বলে, 'ভুবন লাহিড়ীর নাম নাহয় মুছে যাবে, শ্যাম লাহিড়ীর নামটা তো উজ্জ্বল থাকবে গো পিসি! রেড়ির পিদ্দিম জ্বেলে আলো জ্বালাচ্ছেন যিনি! ওনার ছেলেদের কথা জানো?'

সরযূ ভিজে কাপড়ের আগাটা নিংড়ে জল ঝরাতে ঝরাতে কড়া গলায় বলে, 'উনি বেঁচে থাকতে ওঁর ছেলেদের কথা জানতে যাবার আমার দরকার নেই জগা, কিন্তু পিদ্দিমের কথা বললি কেন? ওতে কী অপরাধ হল?'

অন্ধকার থেকেই কামড় দেয়, —না, অপরাধ আর কী? প্যাঁচাও তো কোটরে বসে থাকে, সে কি অপরাধী? তবে তুমি ওনাকে খুব একজন ভাবো কিনা তাই বলছি! উনিই-বা লাহিড়ী বাড়ির কী মানটা বাড়াচ্ছেন? আমাদের অপেরা পার্টির জন্যে দল বেঁধে চাঁদা চাইতে গেছলাম, নাহক এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে এক ঘড়া উপদেশ গিলিয়ে পাঁচটি টাকা ঠেকালেন। কি না আমি গরিব মানুষ, এর বেশি সামর্থ্য নেই বাবা!—লজ্জায় মাথাটা কাটা গেল বন্ধুদের সামনে!'

সরযূ হেসে উঠে বলে, 'তাই বল, চাঁদা পাসনি বেশ তাই? তা গরিব হয়েই তো এসেছেন উনি, সর্বস্ব দানধ্যান করে এসে—।'

ছেলেটাও হেসে উঠে বলে, 'তা এখন সেই গল্পই রটিয়েছেন, নইলে মান থাকবে কেন? সত্যি কথা বললে তো তেড়ে মারতে আসবে, ওনাদের সর্বস্ব দানধ্যানে যায়নি, গেছে মদে মাংসয়। নচেৎ এখনও ভেক নিয়ে বোষ্টম হয়ে—।'

—জগা! ছোটো মুখে বড়ো কথা কওয়ার অভ্যেসটা কমাবি? তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে সরযূ, 'সাধে আর কুসঙ্গের দোষকীর্তন করে শাস্ত্রে? যত রাজ্যের দুলে বাগদির ছেলে হয়েছে সঙ্গী—'

জগার মা আর একবার ফোঁস করে ওঠে, —দুলে বাগদি তো এখন সব্বারই মাথার মণি হয়েছে গো? নিজেও তো এখন সেখান থেকে এলে? কে না যাচ্ছে সেখানে? শুধু যত দোষ, নন্দঘোষ! ঠিকই তো বলেছে জগা, দানধ্যানই যদি করতে বাসনা ছিল, টাকাগুলো নিয়ে এসে বাপ-পিতামোর দেশে ছড়ালেই হত! দেশটা যে দুঃখী-গরিবের দেশ তা তো আর অজানা ছিল না? সাহেবিয়ানায় যদি অরুচি ধরেছে তো দেশটাকেই জমজমাটি করুন? কর্তাদের আমলের মতন দোল দুর্গোৎসব, অতিথিশালা, জলছত্তর, এসব করলে হত! তা নয় এক বস্তর একাহারে ধর্ম করছেন! এদিকে গিন্নি তো—'

সরযূ ভাজের যুক্তিটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। তবু অন্য নীতিতে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, 'মানুষটা তোমার ভাসুর সেটা মনে রেখো বউ—'

বউ ব্যাজারতম গলায় বলে, 'মনে খুব রেখেছি! নিজে থেকে বলতেও কিছু আসিনি। তুমি আমার ছেলেদের ঠুকতে এলে তাতেই মুখ খুলতে হল! তোমার মতন লতাপাতার সম্পর্ক তো নয়। জঠরে ধরেছি যে!'

—তা বটে! সরযূ হেসে ওঠে, —জঠরজ্বালা বড়ো জ্বালা! যাই বাবা ঠাকুরঘরে মাথাটা একবার ঠুকে আসি, আমারও এদিকে জঠরজ্বালা প্রবল হয়ে উঠেছে। বলে উঠোন পার হয়ে ঠাকুরঘরের উদ্দেশ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সরযূ।

মা চাপা গলায় বলে ওঠে, 'ওদের ইয়েতে তো পিসি একেবারে গদগদ! যা শুনে এলি তা ফাঁস করে দিলি না কেন?'

—করতে গেলে বিশ্বাস করবে? জগা একটা আলিস্যি ভেঙে হাই তুলে বলে, 'বলবে তুই গেঁজেল, তুই মাতাল যাক গে বাবা, আমি ফাঁস না করলেও ফাঁস ঠিকই হবে! ধর্মের কল বাতাসে নড়বে!' বলে পাশ ফিরে ভালো করে শোয় জগা।

তা দেখা যাচ্ছে জগা আর যাই হোক সংসার অভিজ্ঞ। তাই পরদিন সন্ধ্যাতেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ল।

কিন্তু সে তো সন্ধ্যায়। সকালের খবর আলাদা। সকালে সরযূ যখন ঠাকুর দোরে দোরে জল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন চমকে উঠল পথে হঠাৎ জিতু লাহিড়ীকে দেখে।

দীর্ঘ উন্নত দেহ, পায়ে খড়ম, শাদা ধবধবে উত্তরীয়ে গা-টা আবৃত, তবু আবৃত করতে পারেনি। সরযূ থমকে দাঁড়াল। ভাবল এই শিশিরভোরে উনি বেরিয়ে ফিরছেন? না, আমি ভুল দেখছি? আসলে শ্যাম জ্যাঠার আত্মা মূর্তি পরিগ্রহ করে তেঁতুলগোড়ায় এসেছে ঘর-পালানে ছেলেটাকে 'ঘরে' দেখতে! ছেলেবেলায় যখন এমনই অন্ধকার থাকতে শিউলি ফুল কুড়োতে বেরোতাম, শ্যাম জ্যাঠা ঠিক অমনিভাবে বেড়িয়ে ফিরতেন। অমনি দীর্ঘশরীর, অমনি বেশভূষা! অমনি চওড়া কপাল গড়িয়ে গেছে মাথার দিকে।

সরযূ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জিতু লাহিড়ীও সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর শান্ত প্রসন্ন গলায় বললেন, 'কী? সব ঠাকুরদের ঘাড়ে জল ঢালতে বেরিয়েছিস?'

সরযূও শান্ত হাসি হেসে বলে, 'ঘাড় আর আমি পাচ্ছি কোথায়? ভটচায্যির ঘুম ভাঙলে তবে তো সেই বেলা দশটায় 'বাছারা' ঘুম থেকে উঠতে পাবেন? আমি এই মন্দিরের চৌকাঠেই জল ঢেলে বেড়াই।'

জিতু লাহিড়ী গম্ভীর মৃদু হেসে বলেন, 'তাতে তোর মন মানে?'

—তা মানে। সরযূ বলে, 'ঠাকুর তো আর সত্যিই ওদের তালা-চাবির মধ্যে বন্ধ হয়ে মশারির ভেতর পড়ে নেই?'

জিতু লাহিড়ী অবশ্য এই মেয়েটার কথায় অনেকসময়ই চমৎকৃত হন, তবু আজ এই সূর্য না ওঠা ভোরে ওই সদ্যস্নাতা বিধবামূর্তির মধ্যে তিনি যেন একটা পরমবিশ্বাসের দীপ্তি দেখতে পেলেন। অভিভূত হলেন, চমৎকৃত হলেন।

জিতু লাহিড়ী যদি এখান থেকে না পালাতেন, যদি এখানেই থাকতেন, হয়তো জিতু লাহিড়ীর মেয়েরাও এমনই দীপ্তবিশ্বাসের মুখ নিয়ে ঠাকুরতলায় এসে জল দিত। পবিত্রতার ছবি হয়ে ভোরের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তাদের বাবার চোখ-মন সব জুড়িয়ে দিত!

কিন্তু জিতু লাহিড়ী নামের সেই ছেলেটা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এখানকার শান্ত-ছন্দ জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই তার মেয়েরা নরকের মধ্যে জীবনকে আহরণ করতে যায়, আর

তার স্ত্রী নেশার বস্তুর অভাবে দেয়ালে মাথা ঠোকে। সরযূ হাতের কমণ্ডলুটা একটা গাছের ফ্যাঁকড়া ডালে ঝুলিয়ে রেখে আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'দাঁড়ান মেজদা, একটা প্রণাম করি!'

—সে কী কেন? সরযূ ততক্ষণে গড় হয়েছে।

উঠে মাথা তুলে বলে, 'গুরুজনকে প্রণামের আর কেন কী মেজদা! সর্বদাই করা যায়। তবে সত্যি বলতে, আছে এখন একটু কারণ। ওই দূর থেকে আপনি যখন আসছিলেন, হঠাৎ মনে হল শ্যামজ্যাঠামশাই আসছেন বুঝি। ভাবলাম তাঁর আত্মা মূর্তি ধরে দেশ ঘাট দেখতে এলেন নাকি? তাই প্রণাম করতে ইচ্ছে হল!'

সামান্য এই তুলনাটুকুতে হঠাৎ অত বড়ো দীর্ঘদেহ মানুষটার ভিতরে ভূমিকম্পের মতো আলোড়ন উঠল কেন কে জানে? কে জানে কেন চোখ দুটো ভিজে উঠল। গলার স্বরেও সেই কাঁপনকে ঠেকাতে পারলেন না জিতু লাহিড়ী। বললেন, 'সত্যি বলছিস? বাবার মতো দেখতে লাগল আমায়?'

—অবিকল! ছেলেবেলায় ফুল তুলতে বেরোতাম তো অন্ধকার থাকতে, আর দেখতাম ওই দিঘির ওপাড় থেকে বেড়িয়ে ফিরছেন জ্যাঠামশাই, মনে হত রামায়ণ মহাভারতের গল্পের মুনিঋষি কেউ আসছেন—।

—সরযূ! জিতু লাহিড়ী কম্পিত গলায় বলেন, 'অতটুকু বয়সে ওই কথা মনে হত?'

—তা হত বাপু। তবে— সরযূ এবার একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'তবে বাপু হককথা বলব, আমাদের বাবা-জ্যাঠারা ছিলেন যেন দুর্বাসা ঋষি। বিশেষ করে শ্যামজ্যাঠামশাই। দেখলেই হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরত। দূর থেকে ভক্তি জাগত প্রাণে, কাছে আসবার আগেই দে ছুট! কোঁচড়ের ফুল থাকল আর গেল!'

জিতু লাহিড়ীর কণ্ঠের কাঁপন থামে। সহজ গলায় হেসে বলেন, 'তার কারণ কী জানিস সরযূ, ওঁদের চারিধারে যারা ছিল তারা ওঁদের থেকে অনেক নীচুস্তরের। ওঁরা সঙ্গী পেতেন না। তাই ওঁদের ভিতরের দীপ্তি আলো হয়ে যত না ফুটেছে, আগুন হয়ে দাহ ছড়িয়েছে তার বেশি।

সরযূ আস্তে বলে, 'আমার অবিশ্যি বলাটা শোভা পায় না, তবু বলি নীচুদের উঁচুতে টেনে তোলাই তো মানুষের কাজ মেজদা!'

—সে কি সম্ভব সরযূ?

—কেন সম্ভব নয় মেজদা! মানুষেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করে। এই যে আপনি এলেন, এদের থেকে অনেক দূরের মানুষ হয়ে রইলেন, তা না হলে—

জিতু লাহিড়ী ব্যথিত স্বরে বলেন, 'আমি তো দূরের মানুষ হতে আসিনি সরযূ, ওদের কাছাকাছিই তো থাকতে এসেছি। ওদের সকলের মতো গরিব হয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে—'

সরযূ হেসে ওঠে,—ওই ওইখানেই হয়েছে বিপদ। এরা দারিদ্র্য বোঝে, ত্যাগটা তেমন বোঝে না। ভাবে এটা আবার কী! অবস্থাপন্নের কাছে এরা অনেকটা প্রত্যাশা রাখে। আপনি নিজে হবিষ্যান্ন করুন, কৃচ্ছ্রসাধন করুন, সে ভালো, কিন্তু জাঁকজমকটা থাকলেই মঙ্গল ছিল। দেশগ্রামে পিতৃপিতামহদের মতন রবরবা দেখাতেন, দোল দুর্গোৎসব করতেন, অতিথিশালা খুলে দিতেন, গরিবের কন্যেদায়ে সাহায্য করতেন, এরা আপনাকে নিজেদের মানুষ মনে করত!

জিতু লাহিড়ী সংশয়ের স্বরে বলেন, 'তাই কি ঠিক সরযূ!'

—আমার আবার ঠিক-অঠিক জ্ঞান! আপনিও যেমন! যা মনে হয় বললাম। সরযূ নিজেকে নস্যাৎ করে দিয়ে কথাটা শেষ করে—দারিদ্রে যাদের হাড় ভাজা ভাজা, তারা 'দারিদ্রব্রত'র মাহাত্ম্য বুঝবে এ আশা বৃথা! পুজোপার্বণ না-করুন, দেশের মাটিতেই যদি টাকা ছড়াতেন, ভালো। মাটিও তো যুগযুগান্তর ধরে হাঁ করে পড়ে আছে প্রত্যাশা নিয়ে। ওই যে দেখুন-না—

সরযূ আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখায় যেখানে গোরুর গাড়ির চাকা মাটির বুকে গভীর বিদারণ রেখা এঁকে চলেছে বছরের পর বছর। বর্ষায় কাদায় পা বসে যায়, খরায় মাথায় ধুলো ওঠে।

সরযূ আবার বলে, 'এ 'হাঁ' বোজাবার খাদ্য তো শুধু টাকা। বস্তা বস্তা টাকা ঢালতে পারলে তবেই এ হাঁ বুজবে। মানুষ, মাটি সবাই যেখানে হাঁ করে আছে, সেখানে কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শ দাঁড়াতে পারে না মেজদা! ওরা হতাশ হয়ে বলছে, ভেবেছিলাম—দূর ছাই কী গল্প ফাঁদলাম এখন সক্কাল বেলা! পাগল ছাগল সরযূর কথা ধরবেন না। কতদূর বেড়িয়ে এলেন বলুন?'

—সেই প্রায় স্টেশন অবধি!

—স্টেশন অবধি? বলেন কী! শুনি তো দু-খানা গাড়ি ছিল, এত হাঁটতে শিখলেন কখন?

—আমার বিষয়ে এতসব শুনলি কখন বল তো? জিতু লাহিড়ী ধীরে ধীরে বলেন, 'আমি তো কই তোদের এখানের কোনো খবর কখনো—' বলেই থামেন জিতু লাহিড়ী। আরও আস্তে বলেন, 'হ্যাঁ কিছু খবর পেয়েছি। গুণদা সরকার মাঝে মাঝে কিছু কিছু খবর পরিবেশন করত, তা লাহিড়ী সাহেবের ওসব বাজে খবরে কান দেবার অবকাশ ছিল কোথায়?'

সরযূ চকিত হয়ে তাকায়। ওই গভীর অনুতাপের ছবির দিকে তাকায়। আস্তে বলে, 'ভুলে-ঠিকেই তো মানুষ মেজদা! আচ্ছা আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। সক্কাল বেলা আপনাকে দেখে বড়ো ভালো লাগল, তাই খানিক বকবক করলাম! চলি!'

গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটা আবার গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায় সরযূ।

জিতু দাঁড়িয়ে থাকেন। আর হঠাৎ একটা অবাস্তব ছবি কল্পনা করতে থাকেন।.....ভোরের সুষমা গায়ে মেখে, লালপাড় গরদ শাড়ি পরে বেবি লাহিড়ী মন্দিরের দরজায় দরজায় জল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঘাসের আগায় আগায় গাছের পাতায় পাতায় শিশিরের মুক্তো, সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধবাহী বাতাস ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে সমস্ত মালিন্য, সমস্ত ক্লেদ। ছবিটা ফুটল না। ঝাপসা হয়ে গেল।

হেসে উঠলেন জিতু লাহিড়ী নিজ মনে। বেবি লাহিড়ী অন্তত আরও দু-ঘণ্টা পরে ঘুম থেকে উঠবেন। বিশ্রস্ত চুল, বিশ্রস্ত বাস, চোখের কোলে গাঢ় কালি, এমনই একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিছানার কাছে একটা চৌকিতে গত রাত্রের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টটা পড়ে আছে, হয়তো-বা সেটাকে ঘিরে মাছি উড়ছে, সেই চৌকিরই একধারে একটা কেরোসিন স্টোভে চা বানিয়ে নিয়ে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছেন বেবি লাহিড়ী পেয়ালার পর পেয়ালা।

রাঁধুনি মেয়েটা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন করবে কী রান্না হবে, বেবি লাহিড়ী বিরক্তিবিজড়িত গলায় বলবেন, 'যা খুশি করো গে! যা রাঁধবে সবই তো অখাদ্য হবে!'

তারপর আঁচল লুটিয়ে ঘুরে বেড়াবেন এঘর-ওঘর, দেখবেন পুরোনো বাক্স প্যাঁটরাগুলো খুলে খুলে, দেয়ালআলমারিগুলো টেনে টেনে, উইয়ে খাওয়া পুরোনো শাল দোশালা, চেলির শাড়ি, টেনে বার করে সব আছড়ে আছড়ে ফেলবেন মাটিতে। তারপর বলবেন, 'ন্যাস্টি!'

স্নান! সে তো সেই ভাত খাবার সময়। তার আগে নয়।

এমনই বাসি কাপড়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন উঁচু কুলুঙ্গি থেকে লক্ষ্মীর কৌটো পেড়ে বসেছিলেন বরুণা! জিতু লাহিড়ীর মায়ের শাশুড়ির কি দিদিশাশুড়ির হাতে পাতা লক্ষ্মী! তার রুপোর গাছকৌটো, রুপোর প্যাঁচা, বেতের কাঠা!

গাছকৌটোগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, 'ভেরি নাইস্ তো', বলে ঝিয়ের কাছে নামিয়ে দিয়েছিলেন বরুণা, মেজে চকচকে করে দেবার জন্যে। ঝি-টা দেখে হাঁকপাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ মা ইকী কাণ্ড!

এ যে লক্ষ্মীর কৌটো, এ তুমি আমায় মাজতে দেছ সকড়ি বাসনের সঙ্গে!'

পঞ্চাশ বছর এই তেঁতুলগোড়া ছাড়া, তবু জীবনের একেবারে গোড়ায় দেখা বস্তুগুলো কি একেবারে ভুলে যাবার? এ জিনিস চিনতে পেরেছেন বই কী জিতু।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে বলেছিলেন, 'কী রে দুগ্গা?'

—এই দেখুন বাবু, মা কী কাণ্ড করেছে, লক্ষ্মীর কৌটো মাজতে দেছে আমার কাছে ছিষ্টি সকড়ির সঙ্গে। বলে দুগ্গা সভয়ে তাকিয়ে থাকে সেইদিকে।

—বরুণা, এটা কী হচ্ছে? জিজ্ঞেস করেছিলেন জিতু।

বরুণা অগ্রাহ্যভরে উত্তর দিলেন, 'বুঝতে পারছি না হঠাৎ এত চমকাবার কী হল? জিনিসগুলো ময়লা হয়ে গিয়েছিল, সাফ করতে দিয়েছি, এই তো ব্যাপার!'

—জিনিসগুলো কী, তা দেখেছ?

—দেখব না কেন? রুপোর বাসন!

—বাসন? এটা বাসন?

—বাসন নয় কৌটো। মশলা রাখার বা পানের, হবে কিছু! বরুণা ঠোঁট উলটোন, —তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার পায়ের নীচে ভূমিকম্প হচ্ছে!

জিতু লাহিড়ী এই দুঃসাহসিক স্পর্ধার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বলেন, 'মনে হচ্ছে? অনুভব করছ? আশ্চর্য অনুভূতিসম্পন্ন মহিলা তো? এগুলো কী তা জানো! আমার ঠাকুরমার লক্ষ্মীর কৌটো, বুঝলে? লক্ষ্মীর কৌটো! হৃদয়ের সমস্ত নিষ্ঠা আর পবিত্রতা দিয়ে এগুলি রক্ষা করে গেছেন তাঁরা, পুজো করে গেছেন শেষ দিন অবধি। আমার মা, তাঁর শাশুড়ি, তাঁর শাশুড়ি,—অবিচ্ছিন্ন একটা নিষ্ঠার ধারা। সে-ধারা থমকে গিয়ে ওইখানে আশ্রয় নিয়েছিল নতুন ধারার ধারকের অভাবে। তুমি সেই পবিত্রতাকে হত্যা করলে, সেই অক্ষয় সঞ্চয়কে নষ্ট করলে।—ঠিক করেছ, তোমার উপযুক্ত কাজই করেছ। তবে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, ওগুলো হঠাৎ মেজে সাফ করবার বাসনা হল কেন তোমার? বেচে সাফ করে ফেলাই তো তোমার উপযুক্ত কাজ হত। যা করছ! যার জন্যে এই লাহিড়ী বাড়ির কড়িবরগা থেকে চোরাকুঠুরি পর্যন্ত কেবল হাঁটকে বেড়াও।'

বরুণা আরক্তমুখে বলেন, 'কী? কী বললে?'

—যা বললাম সেটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না! তুমি—

—বাবু এগুলান কী হবে? দুর্গা প্রশ্ন করে।

জিতু গম্ভীরহাস্যে বলেন, 'সকড়িতে যখন নেমেছে, মেজে সাফ করে রাখ। লক্ষ্মী পুজো তো কেউ করবে না আর? এখন কেবল অলক্ষ্মীর পুজো!'

বরুণা তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। ঠিকই বটে, ভুল হয়েছিল তাঁর। মায়ায় পড়ে রাখতে গিয়েছিলেন, ওর মধ্যে রুপো বলতে যা-কিছু ছিল সরিয়ে ফেলাই উচিত ছিল। কী কুৎসিত গ্রাম্য সেন্টিমেন্ট! লক্ষ্মী পুজো! তার জন্যে রাগে দঃখে কান্না বেরিয়ে যাচ্ছে সাহেবের।

বরুণা লাহিড়ী যদি সেই লক্ষ্মী পুজোর ঐতিহ্যের ধারক হয়ে ওই কৌটোগুলো নিয়ে ধান কড়ি এইসব সাজিয়ে 'খেলা' করতে বসতেন, তবেই বোধ করি ওই উন্মাদটা দু-হাত তুলে নৃত্য করত।

ছি ছি! এ আর কিছু নয়, ওই হাড়পাজি মেয়েটার প্রভাব! বোন! ভাই! অমন ভাই-বোন ঢের দেখেছেন তিনি! ওইটার মোহে পড়েই, নইলে এত এরকম কক্ষনো হত না! কিছুতেই না। মানসিক একটা ধাক্কা খেয়ে খানিকটা বিকৃতি এসেছিল, এখানের অসহনীয় কষ্টের ধাক্কায় সে-বিকৃতি পালাতে পথ পেত না, যে-দেশের মানুষ সে-দেশে পালিয়ে বাঁচতেন। অন্তত কলকাতায় থাকতেন।

কিন্তু ওই সরযূর ছলাকলা, এখানে একেবারে আটকে ফেলল ওকে। যা অসুবিধে হচ্ছে, বোন এসে

তার বিহিত করে দিচ্ছেন। দু-বেলা এসে হেসে হেসে কাছে ঘেঁসে বসছেন! 'মেজদা, মেজদা, মেজদা!' মদ ছেড়ে বুড়োবয়সে এখন এই 'ধেনোয়' মজছেন?

ওই সরযূটাই তো বরুণাদের আসার পর বলেছিল একদিন, 'এইবার সামনের ভাদ্দরে বউদিকে দিয়ে লক্ষ্মী পুজো শুরু করান মেজদা, ভিটের লক্ষ্মী কতদিন উপোসি হয়ে পড়ে রয়েছেন! সাজসরঞ্জাম সবই রয়েছে, শুধু নতুন ধান বদলে—'

সেদিন অবশ্য হতভাগাটা বলেছিল, 'তোর বউদি করবে লক্ষ্মী পুজো? তা হলেই হয়েছে!'

কিন্তু নির্ঘাত সেদিনের সেই কথাটা ওর মাথার মধ্যে পুঁতে গিয়েছিল। আজ তাই সেই পুজোর আসবাব দেখে ফেন্ট হয়ে পড়ে যেতে বসেছিলেন। বরুণার তো মনে হচ্ছিল 'স্ট্রোক' হবে নাকি! প্রেসার তো অতিরিক্তই ছিল।

না না, না, এইভাবে টিকে থাকতে পারবেন না বরুণা। এ কী জীবন একটা? খোঁয়াড়ের শুয়োরের মতো মাথা গুঁজে পড়ে থাকা, আর যা হোক ছাইপাঁশ দিয়ে পেট ভরানো, তার বাইরে আর কিছু নেই! তার ওপর আর কোনো কিছুর আশা নেই!

মানুষে বাঁচতে পারে এখানে?

বরুণা পালাবেন। যেমন করেই হোক পালাবেন। পালিয়ে গিয়ে বরুণার সেই পাজি মেয়ে তিনটের কাছে গিয়ে বলবেন, 'তোদের কাউকে নিতেই হবে আমার ভার! কেন নিবি না? বিধবা মায়ের ভার মেয়েরা নেবে না তো কে নেবে? মনে কর মা বিধবা হয়েছে।'

এক জনের বাড়ি চেপে থাকা সম্ভব না হয়, তিন মেয়ের সংসারে পালা করে থাকবেন বরুণা।

সে-জীবন যে খুব একখানা গৌরবের, তা বলছেন না বরুণা, তবু সেটা 'জীবন' তো! এমন অচল অবস্থা তো নয়! কবরে পুঁতে যাওয়া ফসিলের মতো বোধশূন্য হয়ে পড়ে থাকা নয়।

তারপর, গিয়ে পড়লে বরুণার বন্ধুরাও কি একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে? বরুণা চলে আসার পর অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে না কি তারা? হয়তো হচ্ছে তাই! বরুণা ফিরে গেলেই আবার নিজের সেই পুরোনো জায়গাটি ফিরে পাবেন।

বরুণার বর্মি জামাইটা তো যথেষ্ট 'গায়ে পড়তে' এসেছিল। তখন যদি বরুণা তাকে এমনভাবে 'এড়িয়ে তাড়িয়ে' না-দিতেন, হয়তো সেইটাই বরুণাকে মাথার মণি করে সংসারে পুষত! আর বরুণাও সেই আসনটি বজায় রাখতে পারতেন। বরুণার ওই বড়ো মেয়েটা তো বোকার ধাড়ি, বোকাকে নিয়ে কে কতদিন সুখে থাকতে পারে? বরুণার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, ক্ষুরধার বাচন, রুচি, পছন্দ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ত জামাইটা।

তখন ওকে অত অগ্রাহ্য না করলেই হত।

চলে গিয়ে ওর ঘরেই প্রথম জায়গা সংগ্রহের চেষ্টা করবেন বরুণা। কৃতকার্য না-হন, সেই লক্ষ্মীছাড়া পাজি সোমাটার কাছে গিয়েই বলতে হবে, আমার গহনাগুলোর দাবিতেই অন্তত আমার থাকার অধিকার আছে তোর সংসারে।

'মা' বলে ভালোবাসত একমাত্র ওই মেয়েটাই। সেটা কি একেবারে ধুয়ে-মুছে যাবে? বিধবার মতো মাকে দেখে মমতা আসবে না?

আর কোথাও যদি জায়গা না জোটে, ঠেলে উঠবেন সেই তাঁর বাপেরবাড়িতে। সুইসাইডের ভয় দেখাবেন, মাকে যাচ্ছেতাই করে শুনিয়ে দেবেন। যে মা-টি তার নিজের স্বামীর হাড় ভাজা ভাজা করেছিলেন আর মেয়েকে স্বামীভক্তি শেখাতে এসেছিলেন।

একখানা চৌকিতে লুটিয়ে শুয়ে পড়ে থাকা ছাড়া সারাদিন বিশেষ কিছুই করেন না বরুণা। তেমনি

শুয়ে শুয়েই ভাবতে লাগলেন, জানি সেই থাকায় সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না, তবু তো সকাল বেলা ট্রে করে চা আসবে সামনে। সাজানো সুন্দর টেবিলে ভাত খেতে বসতে পাবেন, আর সে-ভাতের উপকরণ হিসেবে দু-খণ্ড মাংস, কি একটু মুরগি জুটবে! আর যদি অসহ্য অসম্মান আসে?

সত্যি সুইসাইড করে দিল্লির সমাজে মা-ভাই আর মেয়ে-জামাইদের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে যাবেন। এখানে আর কিছুতেই নয়।—

মরতে ইচ্ছে তো অহরহ করছে। কিন্তু এখানের এই কুৎসিত সমাজে মরতেও ঘৃণা। এখানে কে বুঝবে বরুণা লাহিড়ীর দুরন্ত যন্ত্রণা? আর মরবেনই-বা কোন উপায়ে? জলে ডুবে? কেরোসিনে পুড়ে? গলায় দড়ি দিয়ে?

নিজের এই বীভৎস পরিণতির কথা ভাবতে পারেন না বরুণা, ছটফটিয়ে ওঠেন। ছটফট করেন সন্ধ্যা আসার অপেক্ষায়।

বরুণার সেই লক্ষ্মীর গাছকৌটো দুর্গাকে মাজতে দেওয়ার গল্পটা এবছরের সবচেয়ে রসালো গল্পের আর একটা নতুন সংযোজন হয়েছিল। যে যেখানে ছিল, গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কারণ দুর্গা তো আর সেকথা বলতে কাউকে বাকি রাখেনি।

শুধু যে মহিলাসমাজই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, পুরুষরাও জটলা করেছিলেন জিতু লাহিড়ীর 'মেম স্ত্রী'র এই কল্পনাতীত দুঃসাহসে।

এবাড়ি-ওবাড়ির বুড়ো কর্তারা, যাঁরা এখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারির সুখস্বর্গচ্যুত হয়ে ঘরে এসে বসেছেন, তাঁরাই এই আলোচনায় প্রধান, যাঁরা চিরকাল এ গ্রামে আছেন, তাঁরাও আছেন। সকলের মুখে এক কথা, 'জীবনে কখনো শুনিনি!'

কিন্তু সে তো সেদিন। গতকাল? যার জন্যে সরযূর ভাইপো দার্শনিকভঙ্গিতে বলেছিল, 'ফাঁস আপনিই হয়ে যাবে! ধর্মের কল বাতাসে নড়বে!' আর যে-কথাটা সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরদিন সন্ধ্যায়। সেই খবরটা তেঁতুলগোড়ায় মজাদার অথবা রোমাঞ্চকর হয়ে এসে দেখা দেয়নি। দেখা দিয়েছিল একটা ঘৃণ্য ভয়ের মূর্তিতে!

পুরুষরা বুড়োশিবতলায় জমায়েত হয়েছিলেন, একত্রে ঘোষণা করেছিলেন, 'এ চলবে না, এ চলতে দেওয়া হবে না!'

—এ কী মগের মুলুক পেয়েছে নাকি? লাহিড়ীদের এক দৌহিত্র বংশের বংশধর অনন্ত ভাদুড়ী দৃপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'যা ইচ্ছে করবে? সমাজপতিরা না-থাকুন আমরা তো আছি!'

অনন্তর এক ভগ্নীপতি চিরদিন ঘরজামাই, বয়েসকালে তাঁর নিজেরও গুণের অবধি ছিল না, তিনি এসে আসরে দাঁড়ান, মৃদুহাস্যে বলেন, 'লাহিড়ী বাড়ির লক্ষ্মীর কৌটোর তাহলে এতদিনে সদ্‌গতি হল! ভোলা বাগদির ঘরে গিয়ে উঠল!'

অনন্ত ধমকে ওঠেন, 'তুমি থামো তো বিপিন, এটা হাসি মশকরার কথা নয়। বংশমর্যাদার কথা। লাহিড়ী বাড়ির সঙ্গে রক্তের যোগ আছে আমার, আমি ছেড়ে কথা কইব না। বাইরে বাইরে যা করতিস করতিস, কেউ দেখতে যেত না। ভিটেয় বসে এত অনাচার করবে? সাতপুরুষের বাস্তুদেবতা নেই ও-ভিটেয়? কথায় আছে একের পাপে শতের দণ্ড! এ অনাচার চলতে থাকলে এই তেঁতুলগোড়া গ্রাম উচ্ছন্ন যাবে না?'

শরৎ ঘোষ বলে ওঠেন, 'ভোলাটাও কম হারামজাদা নয়, ওটাকে ডাকিয়ে এনে আগাপাশতলা জুতিয়ে লাট করা হোক!'

—সেকাল আর নেই শরৎ। শ্রীপতি দত্ত বলে ওঠেন, —এখন ছোটোলোকরা আর দাঁড়িয়ে জুতো খায় না, উলটে জুতো মারে। বলবে, 'আমার কী দোষ, উনি যদি—

—ভুবন লাহিড়ীর মেয়েটা সর্বদা ওবাড়ি যাতায়াত করে না? নিবারণ মুখুয্যে বলে, 'ও জানে না এ খবর? গাঁসুদ্ধ সবাইকে তো শাসন করে বেড়ায়—'

—জানে না, টের পায়নি মনে হয়।

—টের পায়নি? শুনছি তো তলে তলে অনেক দিন ধরেই চলছে—

—গোপনে গোপনে চলছিল। এই আমরাও তো গাঁয়ে রয়েছি, আমরাই কি টের পেয়েছি? ও-মেয়ে যে -খান্ডার, টের পেলে লাহিড়ীগিন্নিকে আস্ত রাখত নাকি? গোপনেই থাকত, যদি-না ভোলার বউ ফাঁস করে দিত! সেই 'গাছকৌটো' নিয়ে আহ্লাদ করে দেখাতে গিয়েছিল নিধের বউয়ের কাছে, তাতেই—'

—যাক যা হয়েছে তা হয়েছে, আর হতে দেওয়া হবে না। অনন্ত ভাদুড়ী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'জিতু মামাকে গিয়ে 'কড়কে' দিতে হবে—'

—লাহিড়ী জানে?

—জানে না, এ আবার হয় নাকি!

—আমার তো মনে নেয় না। মাথার গণ্ডগোল থাক যাই থাক, লেকটা দেবচরিত্র। নিষ্ঠাকাষ্ঠা, আচার-বিচার সে যে জেনেশুনে চুপ করে থাকবে, এ মনে হয় না।

—এঁটে উঠতে পারে না। পরিবার তো নয়, যেন শত্রুপক্ষ! শুনতে পাই তো—

আরও অনেক আলোচনার পর শেষ সাব্যস্ত এই হয়, জিতু লাহিড়ীকে জানিয়ে সমঝে দিতে হবে, গ্রামে বসে এসব অনাচার চলবে না।

এই সভারই ধারেকাছে সরযূর ভাইপো জগু ছিল, আর খবরটা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তেঁতুলগোড়ার তেরো-শো সত্তর সালের নতুন খবর জিতু লাহিড়ী যে এতখানি ভয়াবহ আর ক্লেদাক্ত খবরের জোগান দেবেন, একথা কেউ ভাবেনি। তবু গতকালও সরযূ এ খবরটা ঠিক শোনেনি। যেটুকু শুনেছিল নিধু বাগদির মুখে, বিশ্বাস করেনি। বলেছিল, 'ছোটোমুখে বড়ো কথা বলিসনে নিধে!' আর আজ সকালে জিতু লাহিড়ীকে প্রণাম করে বলেছিল, 'অবিকল শ্যামজ্যাঠামশাই!'

জিতু লাহিড়ী যখন বাড়ি ফিরলেন, বরুণা তখনও শুয়ে। এক বার বিতৃষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে তাকালেন, তারপর চলে গেলেন বড়ো দালানে। যেখানে পুবের রোদ এসে পড়েছে আর প্রকাণ্ড দু-খানা হাতাওয়ালা বড়ো একটা আরামকেদারা পড়ে আছে বেতছেঁড়া অবস্থায়।

এই চেয়ারটায় জিতু লাহিড়ীর জ্যাঠামশাই কালী লাহিড়ী বসতেন। জিতুরা তখন এ দালান দিয়ে হাঁটতেন না। চেয়ারটায় বেত নেই, হাতাটার উপর বসলেন জিতু, পুবের জানালার দিকে মুখ করে। সরযূর কথাটা মনে পড়ল। ...'পিতৃ-পিতামহের মতো রবরবা দেখাতেন, দোল, দুর্গোৎসব করতেন, অতিথিশালা খুলে দিতেন, এরা আপনাকে বুঝত। এরা দারিদ্র বোঝে, 'দারিদ্রব্রত' বোঝে না!'

জিতু লাহিড়ী কি তাহলে ভুল করলেন? ভুল করছেন? ওই বেতছেঁড়া চেয়ারটা সেই ভুল দেখে ব্যঙ্গহাসি হাসছে?

জিতু যে সমস্ত পৃথিবীতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গ্রামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে এলেন, এ হয়তো তাঁর পিতা-পিতামহের আত্মার কারসাজি! হয়তো তাঁরা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন, এবাড়িতে আবার

পুজোর বাজনা বাজবে, আবার ঝাড়লণ্ঠনের আলো জ্বলবে, আবার হাজার মানুষের পাত পড়বে, এই আশায়।

হাজার!

তা তিন দিনে হাজারের বেশি বই কম পাত পড়ত না। সপ্তমীতে বাছা বাছা ব্রাহ্মণ সজ্জন, আর বিধবা মহিলারা, অষ্টমীতে গ্রাম ঝেঁটিয়ে, আর নবমীতে কাঙাল গরিব দুলে বাগদি ইতরজন।

নিতান্ত অজ্ঞানশৈশবে গ্রাম ছাড়েননি জিতু। বছর বছর পুজো দেখেছেন। পুজোর সেই বাজনাটা যেন শুনতে পেলেন জিতু। দূর থেকে আসছে যেন। আসছে? না চলে যাচ্ছে। বাজনার স্বরূপটা কী? আবাহনের, না বিসর্জনের? জিতু লাহিড়ীর মনে হল যেন আবাহনের?

ঢাকি-ঢুলিদের সঙ্গে একদল ছেলেও আসছে দুলেপাড়ার দিক থেকে, ধূলিধূসরিত পা, খালি-গা, ছোটো করে ধুতি পরা। ওরা কিন্তু ঢাকি-ঢুলিদের কেউ নয়। লাহিড়ীদের, মৈত্রদের, ভাদুড়ী, চক্রবর্তী, মুখুজ্যেদের। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আসবে, এই গৌরবের আশায় অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দল বেঁধে। ওদের মধ্যে একটা ছেলেকে চিনতে পারেন জিতু। ধবধবে রং, পাতলা লম্বা চেহারা, চুলগুলো ঈষৎ কটা। ও হিতু, শ্যাম লাহিড়ীর বড়ো ছেলে। জিতুর দাদা।

ছেলেবেলা থেকে ও যেন কেমন শান্ত আর অন্যমনস্ক ছিল। জিতুর মতো উদ্ধত, অবিনয়ী, দুরন্ত নয়। জিতু দাদাকে বলত 'ভাবুক!' কিন্তু এই পুজোর সময় দাদাও যেন তার শান্ত চেহারার খোলস ফেলে মেতে উঠত। দিনের পর দিন ঠাকুরদালানে গিয়ে বসে থাকত, ঠাকুর গড়া দেখতে। বাজনাদারদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত, আর বামুনের ছেলের কেন ঢাকে কাঠি ছোঁয়াতে নেই, তাই নিয়ে প্রশ্ন করত সিন্ধু দুলেকে। বাজনাদারদের সর্দার ছিল যে।

ওই ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন জিতু।

আরও একটা ছেলেকে দেখছেন। জিতু নামক ছেলেটার হাত ধরে ছোট্ট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুরদালানের সামনে, ঠাকুরের ঢাকা-খোলা দেখবার আশায়।

বাজনদাররা এসে বাজনা বাজাতে শুরু করলে তবে বাড়ির কর্তা ঠাকুরের ঢাকা খোলেন, যে-ঢাকাটা প্রতিমা গড়া শেষ করার পর কুমোররা দিয়ে যায়। কোরা লালপাড় শাড়ি একখানা, কার্তিক, গণেশের মাথা বরাবর তার কোণগুলো ঝুলে থাকে। এ শাড়ি বাজনদাররা পাবে।

ওই ছোটো ছেলেটা যার নাম 'রিতু' সে ওই কাপড়টা হাতে করে ছুঁড়ে দেবে। এটা তার দাবি। শাড়িটা মাথায় জড়িয়ে ওরা নাচবে, সেই নাচের সঙ্গে রিতুও নাচবে।

জিতু লাহিড়ী কি দিনের বেলা স্বপ্ন দেখছেন? নইলে ওই ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন কেন? ঘরের দেয়ালে যে-গ্রুপ ফটোটা ঝুলে রয়েছে কালের ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে, তার মধ্যে ওরা বেঁচে আছে। জিতু লাহিড়ীর স্মৃতির মধ্যে নেই।

তবু মনে পড়ছে যেন, ঘরপালানে ছেলেটা ঘরের কথা যদি কখনো ভেবেছে তো ওই ছোটো ছেলেটার কথাই ভেবেছে।

তারা আর কেউ নেই। ছোটো-বড়ো কেউ না।

এই লাহিড়ী বংশে এখন শুধু জিতু লাহিড়ী আছেন। যিনি লাহিড়ী বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘকাল অনাচারে অনিয়মে কাটিয়ে এখন আচার নিয়মের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বাঁধতে এসেছেন, জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে।

তবু কি পিতা-পিতামহরা বংশের এই একমাত্র সন্তানের দিকে তৃষিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন? আবার এ ভিটেয় পুজোর বাজনা শুনবেন বলে কান পেতে আছেন? কিন্তু সেই দেবী প্রতিমাকে বরণ করবে কে? বরুণা লাহিড়ী?

জিতু লাহিড়ীর মা-জ্যাঠাইমাকে কি দেখতে পেলেন জিতু লাহিড়ী? গাঢ় বেগুনিরঙা বেনারসী পরা ঘোমটাঢাকা দুটি মূর্তি? ঠাকুর বরণের সময় যাদের হাতের বাজু তাবিজের ঝুমকোগুলো ঝুলত, আর প্রদীপশিখা পড়ে ঝকমক করে উঠত।

সেইসব তাবিজ বাজুবন্ধ কোথায় গেল? আর সেই মস্ত রুপোর বাটিটা? যাতে করে পিটুলি গুলে জিতুর মা সারা বাড়িতে আলপনা দিয়া বেড়াতেন? জিতু কেন সকালের আলোয় স্বপ্ন দেখবেন? কেন ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে পিটুলির লতাপাতা দেখতে পাবেন?

রোদে কি চোখে বিভ্রান্তি এসেছে?

উঠে পড়লেন। আর একবার বরুণার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জেগেছেন বরুণা। যথারীতি এখন কেরোসিন স্টোভটায় চায়ের জল চাপিয়েছেন। চুলগুলো এলোমেলো, শাড়িটা বিশৃঙ্খল, ব্লাউজের বোতামগুলো আধখোলা, কাঁধের আঁচলটা পাশে লুটোচ্ছে। কেরোসিনশিখাটার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন স্থির হয়ে।

বরুণা লাহিড়ীও কি জিতু লাহিড়ীর মতো অতীতের স্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন? যন্ত্রণা বোধ করছেন? কী সেই স্মৃতি? সুন্দর টেবিলে সুন্দর ট্রে-বাহিত জাপানি ফুল কাটা পেয়ালায় সোনালি চা? সেই অতীতকে যদি স্বপ্ন দেখেন বরুণা, সে-দেখা কি খুব একটা অপরাধ?

অন্য দিন হলে হয়তো জিতু লাহিড়ীর ঈষৎ ব্যঙ্গকণ্ঠ ধ্বনিত হত, 'ঘুমটা তোমার এখানে এসে পর্যন্ত বেশ গভীর হচ্ছে, তাই-না বরুণা?'

আজ আর হল না। সরে গেছেন, চোখ সরিয়ে নিলেন।

ভাবলেন, স্নানের আগে সকাল বেলা মেয়েরা কী কুৎসিত!

গেটের সামনে একটা বকুল গাছ আছে, তার তলায় অজস্র ফুল ঝরে পড়ে রয়েছে। দেখে অবাক হবার নয়, তবু যেন ভারি অবাক হলেন জিতু লাহিড়ী। এবাড়িতে কেউ ছিল না, তবু গাছটা ছিল। এমনই অকৃপণ ঔদার্যে ফুল দিয়ে আসছে বছরের পর বছর। তাকিয়ে দেখছে না, কেউ নিল কি নিল না।

এগিয়ে আসছিলেন মুঠোয় করে দুটি তুলে নিতে। গেট ঠেলে ঢুকলেন অনন্ত ভাদুড়ী। বললেন, 'চিনতে পারছেন? আমি অনন্ত আপনার ভাগ্নে। সেই প্রথমদিকে এসেছিলাম—'

জিতু লাহিড়ী শশব্যস্তে 'আসুন আসুন' করলেন, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বড়ো দালানে। অনন্ত বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

—বলুন।

—আমায় আর আপনি বলবেন না। সম্পর্কে আমি ভাগ্নে, আপনি মামা।

—তা হোক। বলুন কী বলবেন?

—সেই তো মুশকিল! কী যে বলব তাই ভাবছি। মানে, আর তো কেউ আসতে চাইল না। আত্মীয় বলে আমাকেই ঠেলে দিল। ভেবেছিলাম সরযূমাসি এখানে আসা-যাওয়া করে, তাকে দিয়েই নাহয় বলাব, যতই হোক অপ্রিয় কথা! তারপর মনের বল করে চলে এলাম। অপ্রিয় হলেও সত্য তো বটেই।

জিতু ঈষৎ অসহিষ্ণুস্বরে বলেন, 'কী বলবেন বলুন-না?'

—হ্যাঁ বলেই ফেলি। মানে কর্তব্যের দায় যখন আমার ঘাড়েই চেপেছে। মানে—বলছি, ইয়ে—আমার মামির কথা। ঘাড় চুলকোতে থাকেন অনন্ত।

জিতু গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমার স্ত্রীর বিষয়ে কিছু বলতে চান?'

আমার স্ত্রী! অনন্ত ভাদুড়ীর 'মামি' নামক মানুষটা তাহলে নিতান্তই বায়বীয়? এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। এই জিতু লাহিড়ীর স্ত্রীর বিষয় আলোচনা করতে হবে। আর সেটা হবে এঁরই সঙ্গে।

অনন্ত ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, মানে সেটাই বক্তব্য। তবে এ দুরূহ কাজটি আমাকেই করতে হচ্ছে, এই বড়ো আক্ষেপের বিষয়! সরযূমাসি বললে—'

জিতু চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ান। দু-হাত জোড় করে বলেন, 'আচ্ছা থাক, এতই যখন দুরূহ কষ্ট বোধ করছেন, আপনাকে আর বলতে হবে না। বরং সরযূকেই পাঠাবেন।'

অনন্তর ফ্যালফেলে দৃষ্টির সামনে থেকে গটগট করে চলে যান জিতু লাহিড়ী। এবছরের খবরে আর একটি খবর যুক্ত হয়।

শ্যাম লাহিড়ীর ছেলে বাপের মতোই উন্নাসিক দুর্বিনীত অহংকারী।

'বাবার মতো' হবার সাধেই কি এই উন্নাসিকতা জিতু লাহিড়ীর? না শিরায় শিরায় প্রবাহিত শোণিত কণিকাগুলি বহু বৎসরের অনাচারেও প্রকৃতি বিসর্জন দেয় না?

সরযূকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন জিতু, সরযূ কিন্তু সারা দিন এল না। বাগদিদের সেই ছেলেটার সারাদিন এখন-তখন যাচ্ছে, দুপুরে ভাত খেতেও আসেনি আজ সরযূ! সেই সকালে ঠাকুরমন্দিরে জলঢালা সেরে সবে বাড়ি ঢুকেছে, পিসি বলে উঠল, 'হরের ছেলেটাকে কাল কীরকম দেখে এসেছিলি রে সরযূ?'

সরযূ তুলসীতলায় জল দিতে দিতে ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাড়াবাড়ি। কেন?'

—এতক্ষণে বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। হরের ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল, 'দিদিমণি, দিদিমণি' করে। অসহ্য হল বাপু, বেশ একটু বকে দিলাম!

—বকে দিলে?'

—আহা বকা মানে কি গালাগালি? বললাম দিদিমণি কি বদ্যি? যে তাই এই ভোর বেলা ছুটে এসেছিস? দিদিমণির পুজোপাঠ নেই? গলায় এক ঘটি জলও তো ঢালবে—

—পুজোপাঠ সেরে, গলায় জল ঢেলে, বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত যম বসে থাকবে ধৈর্য ধরে?

ঘরের ভিতর থেকে কথাটা ছুঁড়ে মারে সরযূ, পুজোর গরদের থানটা ছেড়ে সাদা থান পরতে পরতে।

পিসি বিরক্ত গলায় বলে, 'তা যম যখন যেখানে আসবে, তখন তোমাকেই সেখানে দেখা করতে ছুটতে হবে তারই-বা মানে কী আছে? সত্যিই কি তুই বদ্যি?

—বদ্যি না হই, মানুষ তো বটে।

—দেশে আর তুই ছাড়া মানুষ নেই?

—দেশের কথা জানি না, নিজের কথা জানি। সরযূ গায়ে সুতির সাদা চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে উঠোনে নামে।

পিসি বিদ্রোহের গলায় বলে ওঠে, 'চললি? অমনি পায়ে চাকা বেঁধে চললি? অ হতভাগী মেয়ে, দু-খানা বাতাসা খেয়েও এক ঘটি জল গলায় ঢেলে গেলি না?'

—সাতসকালে গলা মরুভূমি হয়ে যায়নি। বলে ছুট দিয়েছিল সরযূ। সারা দিনে আর ফেরা হয়নি।

ভেবেছিল ছেলেটাকে বোধ করি আজ আর যম ছাড়বে না। তবু যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল বই কী! হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এনেছিল হরি, অক্সিজেন এনেছিল। সন্ধ্যার দিকে মানুষের জয় হল।

অন্তত আজকের মতন হলই মনে হচ্ছে। সন্ধ্যা পার করে হরির বউটাকে প্রবোধ দিয়ে ফেরার পথ ধরল সরযূ।

সরযূ দ্রুতপায়ে এগোতে থাকে। একেই তো হালকা ধরনের শরীর। তাতে সারাদিনের উপোসে আরও হালকা লাগছে।

শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি একটা তিথি, মাঠে পথে আধাজ্যোৎস্নার আভা। সেইটুকু আলোতেই অচ্ছুত বস্তু সম্পর্কে সাবধান হতে হতে দ্রুতপায়ে বাগদিপাড়া থেকে বামুনপাড়ায় এসে যাচ্ছিল সরযূ, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মানে, দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ভূত!

স্রেফ ভূত! সামনে একটা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের তলায়।

গাছের গোড়ার সঙ্গে নিজেকে যতটা সম্ভব লেপটে ছায়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ছায়ার মতো কেন? ভূত তো ছায়াই।

ছায়াদের! ছায়ার মতো গাছের গায়ে লেপটে যাবার চেষ্টা করার দরকার কী তবে? তা ছাড়া ভয় কে কাকে করবে? ভূত মানুষকে? না মানুষে ভূতকে?

এখন অন্তত ভূতই মানুষকে করল। যেই সরযূ তার ডাকসাইটে গলায় হাঁক পাড়ল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে?'

তৎক্ষণাত সে দ্রুত হেঁটে পাশের ধানের খেতের মধ্যে নেমে পড়বার চেষ্টা করল।

কিন্তু সরযূর সঙ্গে হেঁটে পাল্লা দেবে, এমন জোরালো ভূতই-বা কোথায়? পালাচ্ছিস যে? বলি চোর না ভূত?'

বলে সরযূ তিন লাফে এগিয়ে তার পরনের শাড়ির এক অংশ ধরে ফেলল। হ্যাঁ শাড়িই। লালপাড় শাড়ি। অর্থাৎ ভূত নয়, প্রেতিনি। আর নিতান্ত ছায়াময়ীও নয়, কায়াময়ী।

সরযূ মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়ে অস্ফুটে বলে, 'একী?'

প্রেতিনি নীরব।

—এমন সময়ে আপনি এখানে কেন? সরযূ সভয়ে বলে।

হঠাৎ প্রেতকণ্ঠে স্বর ফোটে। তীব্র স্বর, মানুষের ভাষা। —কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নাকি?

—না, বাধ্যর কী আছে? কিন্তু হাতে ও কী? বোতল? বোতল কীসের? সরযূর চিরকালের শানানো কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন স্খলিত হয়ে পড়ে। সে-স্বরে আতঙ্কের তীব্রতা নয়, শিথিলতা।

কিন্তু প্রেতিনি সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। স্পষ্ট মুখোমুখি ধরা পড়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

অপরাধীর মধ্যে সহসা যে-উদ্ধত নির্ভীকতা জন্ম নেয়, সেই নির্ভীকতায় তীব্র ব্যঙ্গহাসির সঙ্গে বলে ওঠে সে, 'বোতল কীসের হয়, কখনো শোনোনি বুঝি? আহা-হা, ইনোসেন্ট গার্ল! শুনবে কীসের বোতল? মদের। বুঝলে? মদের। দেশি মদের। তোমাদের এই পবিত্র দেবস্থানে তো বাগদিপাড়ায় ছাড়া এ বস্তু জোটে না, তাই ডবল পয়সা ঢেলেও চোর সাজতে হয়েছে, কিংবা ভূত! হো-হো-হো, ভূতটাই ঠিক।'

বোতলের মধ্যস্থিত বস্তুর কিছুটা বোধ করি পথেই গলায় ঢালা হয়েছে, হাসিটা তারই প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু সেটা সরযূর কল্পনার জগতের বাইরের। তাই সরযূ নিজস্ব সন্দেহে আস্তে আস্তে বলে, 'বুঝেছি। জোর করে সব ছাড়তে বসলেও এই বিষের নেশাটা ছাড়তে পারছেন না মেজদা। সর্বনেশে জিনিস তো! এক বার ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার হওয়া বড়ো কঠিন। কাল যখন আমায় নিধু বাগদি বলেছিল লাহিড়ীগিন্নির এ পাড়ায় আনাগোনা আছে, তাকে মারতে বাকি রেখেছিলাম। কাজটা ভালো করিনি। কাল মাপ চাইতে হবে। কিন্তু নিজে তোমার এ সাহস করাটা উচিত হয়নি মেজোবউদি, সাপখোপের রাস্তা—'

ভয়, উত্তেজনা, আবেগ, সব কিছুর দাপটে 'আপনি'টা তুমিতে এসে ঠেকে। গলা নামিয়ে কথা শেষ করে সরযূ, —চুপি চুপি কাউকে বলে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেই ভালো হত।

আধাজ্যোৎস্নার ম্লান ছায়ায় সরযূর আহত ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না প্রেতিনির মুখে একটু প্রসন্নতার আভা খেলে গেল।

হাসিটার ভাষা এই—বাঃ এটা তো মন্দ হল না। সন্দেহটা এই খাতে প্রবাহিত হতে পারে আগে তো খেয়াল হয়নি? স্বামীর জন্যে এই পবিত্র বস্তু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছি আমি। কী মজা!

ওর বেশি আর ভাবতে পেরে উঠল না। যাক, তাই ভাবুক। এতেই তো বেশ ঘায়েল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। মেজদাতে বড়ো ভক্তি গজিয়েছিল তো! সত্যভাষণের পুণ্য অর্জন করে আরও বেশি ঘায়েল নাই করলাম। সত্যি কথাটা শুনলে হার্টফেল করে বসতেও পারে।

অতএব অন্য প্রসঙ্গ।

—সাপ বুঝি মানুষ চিনে কামড়ায়? নাকি আগে থেকে টের পায় কার রক্তের কী স্বাদ?

সরযূ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মানুষ, তোমার এসব শক্ত শক্ত কথা বুঝি না মেজোবউদি, তবে সাপ মানুষ চিনে না কামড়ালেও মানুষের তো চেনা পথ অচেনা পথ আছে? আমার যে এ পথের সব জানা।'

পথে এগোতে এগোতেই কথা চলে। বড়ো লাহিড়ী বাড়ির বিরাট দেহটাকে অন্ধকারে দৈত্যের মতো দেখা যাচ্ছে। ওই দৈত্যশরীরটার মধ্যে কোথায় কোন এক কোটরে একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে শক্তিসাধক শ্যাম লাহিড়ীর ঐতিহ্যের বাহক জিতু লাহিড়ী বোধ করি উপনিষদের টীকা উলটে উলটে ঋষিদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির সূত্র খুঁজছেন।

অন্ধকার সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে উঠে ওই দৃশ্য চোখে পড়ামাত্র বরুণা লাহিড়ীর দুর্দান্ত ইচ্ছে জাগবে হাতের বোতলটার ধাক্কায় পুঁথির পাতায় ঝুঁকে পড়া মাথাটা আরও ঝুঁকিয়ে দিতে, পুঁথির পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। কিন্তু দুর্দান্ত সেই বাসনাটাকে সংহত করে নিতে হবে বরুণা লাহিড়ীকে নিঃশব্দে বিড়ালের মতো মৃদু পদক্ষেপে ঢুকে যেতে হবে পাশের কোনো একটা অন্ধকার ঘরে। চুপি চুপি নিঃশব্দে নামিয়ে রাখতে হবে হাতের জিনিসটা। নিশ্বাস নিতে হবে আস্তে আস্তে। যেন বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যেন শুধু এমনই অনেকক্ষণ বেড়িয়েছেন বলেই ফিরে এলেন।

বুকের মধ্যে লোভ দাপাদাপি করবে এই মুহূর্তে বয়ে আনা জিনিসটা গলায় ঢালতে, কিন্তু সে-লোভকে সামলাতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। যেন কিছুই না এইভাবে একটু পরে বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করতে হবে, ওই শয়তানটা কোনো কথা বললে তার উত্তরও দিতে হবে। নাহলে সন্দেহ করবে ও।

কিন্তু ও কি সন্দেহ করে না? বরুণা বুঝতে পারেন না। মনে হয়ে যেন সব বোঝে। তবু না-বোঝার ভান করে।

নইলে সেদিন খপ করে বলে উঠেছিল কেন, 'সেই সাফ করা রুপোর কৌটোগুলো আর দেখতে পাচ্ছিনা কেন বরুণা? আরও সাফ হয়ে গেছে বুঝি?'

বরুণা ওর সব কথার উত্তর দেন না তাই। নইলে বলতে হত কোথায় গেল! অনেক দিন পর্যন্ত কৌটো চারটেয় হাত দেননি বরুণা। টেনে বার করে মাজতে দিতেই জিতু লাহিড়ী যা বিচলিত হয়েছিলেন, ভয় করেছিল। কিন্তু করবেনই-বা কী? টাকা কোথায়?

সংসারে অনেক কাঁসা পেতল তামা আছে বহু বিচিত্র বাসনের মূর্তিতে, কিন্তু সে বিরাট বড়ো বড়ো! তাকে কি লুকিয়ে বার করে নিয়ে যাওয়া যায়?

দুর্গা কিছু কিছু পৌঁছে দিয়েছে প্রথম প্রথম, তা সেও ছোটো ছোটো ঘটিটা বাটিটা পিলসুজটা। বড়ো বড়ো কাঁসি-গামলা, থালা-পরাত-জামবাটি, ঘড়া-পুষ্পপাত্র, বালতি, বোগনো, এসব পাচার করবার সাহস তারও হয়নি। রাজি হয়নি। হ্যাঁ দুর্গাই সন্ধানদাত্রী। দুর্গাই প্রথম বলেছিল, 'সর্বদা ভয়ে কাঁপি মা!

আমার ভাসুর নুকিয়ে নুকিয়ে মদ চোলাইয়ের ব্যাবসা করে, আর 'এ' বলে, য্যাখন হোক ত্যাখন পুলিশে এসে হাতে দড়া দে নে যাবে। মেয়ে-পুরুষ বাছবে না, সবাইকে নে যাবে? আমার কী অপরাধ বলো তো মা? আমারে ধরে নে যাবে কেন?'

বরুণার চোখ জ্বলে উঠেছিল। বরুণা যেন ঘন গভীর অন্ধকার অরণ্যের পথে সহসা বিদ্যুৎশিখার আশ্বাস পেয়েছিলেন। বরুণা দুর্গার কাছাকাছি নেমে এসেছিলেন উঠোনে।

রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'সত্যিকার মদ? সে আবার মানুষে তৈরি করতে পারে নাকি?'

দুর্গা কৃপার হাসি হেসে বলেছিল, 'শোনো কথা! মানুষে করে না তো কি ও-দ্রব্যি 'দানো'তে এসে করে দেয়? মানুষে কী না করে মা? বলে বাগদিপাড়াসুদ্ধ ওতেই মজে আছে।'

অহংকারী মনিবগিন্নির সঙ্গে এই প্রথম এতগুলো কথা বলার সুযোগ পায় দুর্গা।

তারপর বহু কৌশল করে বরুণা কথাটা পেড়েছিলেন।.....

দিল্লিতে থাকতে একসময় ভারি অসুখ করেছিল বরুণার, বাঁচবার কিছু ছিল না। গায়ে-হাতে-পায়ে কোনো শক্তি ছিল না। তখন ডাক্তারে বলেছিল শরীরে শক্তির জন্যে ওই বস্তু একটু একটু খাওয়া দরকার। সে অবিশ্যি ডাক্তারি দোকানের জিনিস, আসল বিলিতি, কিন্তু এখানে সে-জিনিস কোথায়? অথচ এখন আবার বরুণার তেমনি অবস্থা ঘটেছে! হাতে-পায়ে বল নেই, মাথা ঘুরে ঘুরে যায়। অতএব দুর্গা যদি কিছু কিছু সরবরাহ করে!

দুর্গা কি ওই 'ঔষধার্থের' কথাটা বিশ্বাস করেছিল? বোকা বলে কি এতই বোকা? তাদের বাগদিদের ঘরে মেয়ে-পুরুষে কি খায় না ও-বস্তু? তার নিজের ভাসুরের বউ, খায় না বসে বসে?

সে যাক। যাই বুঝুক দুর্গা, প্রথমে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। বলেছিল, 'সে পারব না মা! 'ও' তাহলে মেরে হাড় গুঁড়ো করবে। বড়ো ভাইকে তো কিছু বলতে পারে না, যত শাসন পরিবারের ওপর। কেমন করে তৈরি করে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে গেলে ঠেঙিয়ে পাট করে। ওর ওতে বড়ো বিরাগ। বোষ্টম হয়েছে কিনা! পাঁঠা খায় না, মাছ মুরগি কিছু খায় না, গুগলিটি পর্যন্ত ত্যাগ দিয়েছে। বলে, 'কী করব দাদা বড়ো ভাই, বলতে তো পারিনে কিছু, তবে এ ভিটেয় আর থাকতে ইচ্ছে করে না!'

দুর্গার বর ভোলার ভাই রজনীর, তার সেই ভিটেয় আর থাকতে ইচ্ছে না-করুক, সেই ভিটেখানা দেখবার ইচ্ছে বরুণাকে যে ভূতের মতো পেয়ে বসে। সহস্র বাহু বাড়িয়ে টানতে থাকে সেই অদৃশ্য জগৎ। অতএব অদৃশ্য আর অদৃশ্য থাকে না। দুর্গাকে পথ প্রদর্শিকা করে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই পথের দিকে পা বাড়ান বরুণা লাহিড়ী।

কিন্তু অবিশ্বাসের কী আছে? নেশা আর অবৈধ প্রেম এই দুই ক্রূর মনিব কী-না করিয়ে নিতে পারে মানুষকে দিয়ে?

লাহিড়ী বাড়ির চারটি কাঁসা পিতলের বাসন, কি দু-খানা পুরোনো শাল দোশাল, অথবা উঁচু কুলুঙ্গি থেকে পেড়ে নামানো কটা রুপোর কৌটো যদি সেই হিংস্র মনিব লাহিড়ী বাড়ির গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলিয়ে থাকে বরুণা লাহিড়ীকে দিয়ে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উঁচু কুলুঙ্গি থেকে পেড়ে নামিয়েছেন তো বরুণা আরও বড়ো জিনিস! অনেক বড়ো!

অন্ধকারে লাহিড়ীদের ওই ভগ্নোন্মুখ বিরাট বাড়িখানা যে একটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন মনে পড়িয়ে দিতে চায় বরুণাকে, 'বুঝতে পারছ? বুঝতে পারছ আমি কত বড়ো?'

বরুণা তাই সহজে তাকান না। বরুণা দ্রুত এগিয়ে যান প্রেতিনির পায়ে। আগে আগে দুর্গা খানিক পথ পৌঁছে দিয়ে যেত, এখন আর দরকার হয় না। দুটো মানুষই বরং আরও চোখে পড়তে পারে লোকের। ঝোপঝাড়ের লুকানো পথটা শুধু চিনিয়ে দিয়েছে দুর্গা।

কিন্তু লুকানো কি থাকে? বরুণা জানেন, তবু লুকানো থাকবে না। যতই নিঃশব্দে ঢুকুন তিনি, উপনিষদের পাতা থেকে চোখ না তুলেই জিতু লাহিড়ী গম্ভীরহাস্যে বলে উঠবেন, 'তোমার সন্ধ্যা বেলা বাগানে বেড়ানোটা একটু কমালে ভালো হত না? ক্রমশ ঠান্ডা পড়ছে, পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, সেটা ভুললে চলবে কেন?'

দিনের বেলা হলে, অন্য সময় হলে, নিশ্চয়ই বরুণা লাহিড়ী এই পঞ্চাশ পারের অপমানটা নীরবে হজম করতেন না, কিন্তু সন্ধ্যার এই সময়টা বরুণা লাহিড়ী নিঃশব্দে সব অপমান সহ্য করবেন। ঘরের মধ্যে থেকে সহজে আর বেরোবেন না। হয়তো অনেক রাত্রে রাতের খাওয়া খেতে উঠবেন, হয়তো উঠবেন না। সে-খাওয়ায় আকর্ষণই-বা কী? সরযূ নিয়োজিত সেই বামুনের মেয়েটা বেলা থাকতে রুটি তরকারি করে দোতলার দালানে চাপা দিয়ে রেখে যায়, সেইটা নিজেরা নিয়ে খাওয়া। জিতু লাহিড়ী অম্লানবদনে খান। অধ্যয়ন শেষ হলে উঠে নিজেই নিয়ে খেয়ে নেন। শুধু এক বার অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ডাক দেন, 'খাওয়ার সময় হল মনে হচ্ছে।'

কোনোদিন সাড়া পাওয়া যায় না, কোনোদিন একটা জড়িত কণ্ঠের উত্তর আসে, 'খাব না! খাব কেন? ওইসব ধুলো কয়লা মাটি!'

একটু পরে এই পথ থেকে গিয়েই নিত্য অভিনীত ওই নাটকেরই পুনরাভিনয় হবে। চিরকালের চেনা গণ্ডি থেকে ছিনিয়ে এনে জিতু লাহিড়ী বরুণা লাহিড়ীকে যে-অচেনা পথে এনে ছেড়ে দিয়েছেন, সে-পথের সামনে তো শুধু অন্ধকার! সেই দম আটকানো অন্ধকারের হাত এড়াতেই-না আর এক অন্ধকারের কাছে বেশি করে আশ্রয় নেওয়া। আশ্রয় না নিয়ে উপায়ই-বা কী? রক্তের মধ্যে অশান্ত পিপাসার যন্ত্রণা দিনের পর দিন নিজেকে নিজে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে। হাড়গুলোকে তীক্ষ্ণ দাঁতে চিবিয়েছে।

অসহ্য সেই যন্ত্রণায় দেয়ালে মাথা ঠুকেছেন বরুণা লাহিড়ী, তারপর সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোনোর ছলে পথে বেরিয়ে—

দেউড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সরযূ, আস্তে বলল, 'তোমায় আর একবার বলছি মেজবউদি, স্বামীভক্তি যতবড়ো জিনিসই হোক, তুমি নিজে আর এ লুকোচুরির মধ্যে যেও না। লোক জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জার শেষ থাকবে না। তা ছাড়া কে কী ভাববে কে জানে, মানুষের মতন খল জাত তো আর নেই! এই ধরো যদি আমি না-হয়ে আর কারও চোখে পড়ত, সারা তেঁতুলগোড়া রাষ্ট্র হতে বেশিক্ষণ লাগত না।'

বরুণা লাহিড়ী তীক্ষ্ণ সুরে বলেন, 'এতেই যে বেশিক্ষণ লাগবে তার নিশ্চয়তা কী? শুনতে তো পাই তুমি একটি পাড়ার গেজেট! তুমিই যে বলে বেড়াবে না—'

—তা বটে! বিশ্বাস কী! গাঁইয়া ভূত বই তো না! বলে মৃদু হেসে হনহন করে এগিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায় সরযূ।

বরুণা লাহিড়ী মিনিট খানেক ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিকরে ঘুরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান।

কিছুতেই যেন এই মেয়েটার থেকে উঁচু হওয়া যায় না। কোথায় যে কী হার হয়, নিজেকে অপদস্থ আর পরাজিত মনে হয়!

ওর ওই বিনয়ের ছদ্মবেশের নীচে যেন বরুণার প্রতি অবজ্ঞা আছে! কিন্তু কেন? কীসের অহংকারে? সোনার মতো সোনালি খানিকটা রঙের অহংকারে? না ওই অদ্ভুত কিম্ভূত শুচিতার অহংকারে?

কী দুঃসাহস! এ সাহসের কারণ আর কিছু নয়, বরুণারই স্বামী! জিতু লাহিড়ী যে উঠতে-বসতে ওঁর ওই হঠাৎ পাওয়া আদরের ছোটো বোনের প্রশস্তিপত্র পাঠ করেন! খোলাখুলি সামনাসামনিই করেন।

এই তো সেদিন, পঞ্জিকায় কতকগুলো ব্রতপুজো গেল বলে মহিলাটি পর পর দিন তিনেক উপবাস করে পুজোর প্রসাদ নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য তিন দিন উপবাস করে মানুষ অমন খটখটিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে বরুণার। বাড়ি গিয়ে তো দেখছে না কেউ, বলতে দোষ কী উপবাস! শুনতে যখন গৌরবের! সেই গৌরবের চরণে পুজো তো পড়ল?

জিতু লাহিড়ী সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে বললেন, 'এই শক্তিটা কোথা থেকে আসে বুঝতে পারো বরুণা? না, তুমি বুঝতে পারবে না। তবু এইটুকু অন্তত স্বীকার করতে চেষ্টা কোরো, আমাদের এই হিংসা আর বিদ্বেষ, লোভ আর দুর্নীতি, ক্ষুধা আর প্রবৃত্তিসর্বস্বতায় ভরা পরানুকরণের নেশায় উন্মত্ত দেশটা যে এখনও একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি তার কারণটা—এই! এইরকম এক-একটি মেয়ে! এমন মেয়ে আজও আমাদের দেশে আছে বলেই সমাজ এখনও টিকে আছে। এরা যদি শেষ হয়ে যায়, এই পচা গলা সমাজ খসে পড়ে যাবে, মনুষ্যাকৃতি কতকগুলো প্রাণী জানোয়ারের ঐতিহ্য নিয়ে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

বরুণা অবশ্য এই গদগদ ভাবালুতায় নাক কুঁচকে ছিলেন, আর এর কারণও খুঁজে পেয়েছিলেন।

রূপ আছে যে! আর সংসারে সন্তানে খরচ হয়ে না-যাওয়ায় যৌবন আছে খানিকটা। শুনতে খারাপ হলেও ওইটাই আসল কথা।

'আদর্শ হিন্দু বিধবা-টিধবা' ওসব বাজে বুলি স্রেফ রূপজ মোহ! নইলে ওই মূর্খ মুখরা সভ্যতাজ্ঞানহীন মেয়েটার মধ্যে জগতের যত ভালো বস্তু দেখতে পান জিতু লাহিড়ী? ইনি পান।

উনিও পান। উনিও 'মেজদা' বলতে মূর্ছাহত হন। এ ভক্তিরও আর কোনো অর্থ নেই। বরুণা লাহিড়ী তাঁর মেয়েদের মতো বিদুষী না হলেও ফ্রয়েড পড়েছেন। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা আধাপ্রৌঢ়া মেয়েমানুষের এই গদগদ ভক্তির মানে বোঝেন।

বয়সের তফাত? ফোঃ! বরুণা লাহিড়ীর নিজেরই পঁচিশ বছরের ছেলে একটা চল্লিশ-বেয়াল্লিশের মাগির সঙ্গে ধেই ধেই করে বেড়াচ্ছে না? তার তো কোনো অভাবও ছিল না? আর এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত! আজীবন তৃষ্ণার্ত! অভাবের প্রতিক্রিয়া যে কী, সে তো বরুণা লাহিড়ী নিজেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বাগদিপাড়ায় গিয়ে বেআইনি মদ চোলাইয়ের আড্ডা আবিষ্কার করবার কথা দুঃস্বপ্নেও কখনো ভেবেছেন বরুণা লাহিড়ী? অথচ—

কিন্তু হঠাৎ চমকে সচেতন হলেন বরুণা, কিন্তু ও কেন ওদিকে গিয়েছিল? সরযূ? সন্ধ্যার অন্ধকারে একা?

নিজের ব্যাপারে একটু বিপর্যস্ত বোধ করছিলেন বলে জিজ্ঞেস করতে মনে পড়ল না তখন। নইলে মুখোমুখি একবার জিজ্ঞেস করতে পারলেই বোঝা যেত। আচ্ছা, এ একটা হাতিয়ার রইল বরুণার হাতে। জিতু লাহিড়ী যখন বালবিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্যের মহিমা দেখাতে আসবেন তাঁর 'পতিত' স্ত্রীকে, বরুণা লাহিড়ী বলবেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করো তো সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢেকে পাড়া ছাড়িয়ে কোথায় যান উনি।

যাক, আপাতত তাড়াতাড়ি অন্ধকারের আশ্রয়ে ঢুকে পড়তে না-পারা পর্যন্ত ..... হল না। বিড়ালের মৃদুতা কার্যকরী হল না।

অধ্যয়নরত তাপস মুখ তুলে চাইলেন।

মৃদু গম্ভীরহাস্যে বললেন, 'বেড়াবার জায়গাটা হয়তো ভালোই নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু বেড়ানোটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না বরুণা?'

বরুণা লাহিড়ী বিনা বাক্যে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, এসময় বাদপ্রতিবাদ অসহ্য। কিন্তু যাওয়া হল না,

উঠে এলেন জিতু লাহিড়ী। সামনে দাঁড়িয়ে স্থিরগলায় বললেন, 'দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ কাঁচা কচুর ডাঁটা খায় শুনেছি, কিন্তু খেয়ে বাঁচতে শুনিনি।'

এক বার বোধ হয় কেঁপে উঠলেন বরুণা লাহিড়ী, তারপরই তাঁর ঝুলে পড়া মুখটা সেই আগের মতো পাথর পাথর দেখাল, গলার স্বরে সেই ধাতব শব্দ ধ্বনিত হল, 'বাঁচবার সাধনা করছিল এ ধারণাই-বা হল কেন তোমার?'

—কী জানি কেন! তবে মনে হচ্ছিল বুঝি বাঁচবার আশাতেই! কিন্তু মরার সাধনার তো আরও বহুবিধ পথ আছে, এই পথটাই পছন্দ করে ফেললে কেন বলো তো? শ্যাম লাহিড়ীর পুত্রবধূ পচাই গিলে লিভার পচে মারা গেলেন, গ্রামে এ খবরটা একটু কড়া খবর হয়ে যাবে না?

অসহ্য ক্রোধে মুহূর্তকাল গুম হয়ে থেকে বরুণা লাহিড়ী বলে ওঠেন, 'হলে আর কী করার যাবে? তবে ওর কাছাকাছি পৌঁছয় এমন কড়া খবরের অভাবও তো নেই তোমাদের দেশে। ব্রহ্মচারিণী সরযূবালার বাগদিপাড়ায় অভিসারলীলা—'

—শাট্ আপ! মাত্রাহারা ক্রোধে বিদেশি ভাষা বর্জনের প্রতিজ্ঞা ভুললেন জিতু লাহিড়ী। লাহিড়ী সাহেবের গলায় প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন, 'শাট্ আপ! দ্বিতীয় বার যেন ওরকম ইতর কথা না শুনি।'

—ধমকে চুপ করাতে পারবে না। নিজের চোখে যদি না দেখতাম—

—চুপ! চুপ করো বলছি।

—করব না চুপ! তোমার ওই ভণ্ডামির খোলস খুলে দেব। তোমার বিধবা বোনের কীর্তি চোখ বুজে অস্বীকার করতে পারবে না তুমি!

—বরুণা, সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, থামতে হবে তোমায়।

—থামব না! বরুণা উদ্ধত গলায় বলেন, 'যারা ডুবে ডুবে জল খায়, তারাই বড়ো সতী পুণ্যবতী! তোমার ওই সাধের বোনকে রোজ আমি যেতে দেখি বাগদিপাড়ায়। বুঝলে?....আমি মদ নিতে ছুটি, আর তিনি হয়তো আরও কিছু জোরালো মদের আশায়—।'

—বরুণা! জিতু লাহিড়ী বাঘের মতো গর্জন করে ওঠেন, 'আমাকে তুমি এখনও চেননি! আর বেশি বাড়ালে তোমার বাক্‌শক্তি চিরতরে লোপ করে দিতে পারি আমি, বুঝলে? মনে রেখো!'

বরুণা বসে পড়েন। কারণ বরুণা ভয় খান।

ওই মরিয়া মূর্তিটাকে আর ঘাঁটাতে সাহস পান না। অন্য পথ ধরেন। হয়তো ইচ্ছে করেও ধরেন না। অনেক যন্ত্রণা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্টের উত্তাল ঢেউ তোলপাড় করে তোলে তাঁকে, তাই বসে পড়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, 'তুমি? তুমি এই কথা বললে আমায়? বলতে পারলে? তোমার দু-দিনের পাওয়া বোনের জন্যে?'

জিতু লাহিড়ী বুকে হাত আড় করে পায়চারি করতে করতে বজ্রগর্ভস্বরে বলেন, 'দু-দিনের পাওয়া ভেবেই ভুল করছ বরুণা, লাহিড়ী বাড়ির মেয়ে সরযূ। সে-সম্পর্ক দু-দিনের নয়।'

—তোমাদের লাহিড়ী বাড়ির মেয়েরা কেউ খারাপ হতে পারে না?

—না না না! তেমনি স্বরেই উত্তর দেন জিতু লাহিড়ী।

আর বরুণা সেই কান্নভেজা গলায় অদ্ভুত একটা প্রতিহিংসার উল্লাস আমদানি করেন, —তোমার নিজের মেয়েরা? শীলা, শেলি, সোমা ওদেরকে বোধ হয় লাহিড়ী বংশের বলে ধরছ না? কিন্তু না ধরেই-বা উপায় কী? বেবি লাহিড়ী আর যাই হোক, তার মেয়েরা তার বিবাহিত স্বামীরই!'

জিতু লাহিড়ী হঠাৎ স্ত্রীর খুব কাছে এসে দাঁড়ান। ভয়ংকর একটা চাপাস্বরে বলে ওঠেন, 'বিশ্বাস কী? দলিল তো শুধু তোমার নিজের মুখের কথা? তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তো তোমাদের হাতে মামলার সব

কাগজ তুলে দিয়ে রেখেছেন! কে বলতে পারে ওরা সত্যিই এই তেঁতুলগোড়ার লাহিড়ী বাড়ির কি না। হয়তো নয়, তাই ওদের রক্তে নরকের তৃষ্ণা!'

কী অপমান! কী অপমান!

বরুণা লাহিড়ী ওই অতি ভয়ংকর অতি সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়ের ধাপ পার হয়ে যান। মরিয়া হয়ে ওঠেন।

কী করবে ও? বড়োজোর বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দেবে।

বরুণা নিজেও তো পারেন সে-কাজ করতে! তাই করবেন। নিশ্চয়! তবে আর শেষ প্রতিহিংসা নিয়ে নেবেন না কেন?

কেন বলবেন না! হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠেন, 'ধরে ফেললে? শেষ অবধি ধরেই ফেললে? হায় হায়! এতদিন চেপে রেখেছিলাম খবরটা। ধরেই যখন ফেলেছ...হি-হি-হি, তখন বলি—'

কথাটা কীভাবে শেষ করতেন বরুণা লাহিড়ী কে জানে? আর শেষ করলে তার প্রতিক্রিয়া কী হত কে জানে!

হয়তো ঈশ্বরের অনুগ্রহেই শেষ করা হল না।

ঈশ্বর রক্ষা করলেন। দেউড়ির বাইরে থেকে একটা চাষাড়ে পুরুষগলা আর একটা শানানো মেয়েগলা একসঙ্গে ডেকে উঠল, 'দরজাটা খুলুন! দরজাটা—'

ওই শানানো গলাটি চিনতে ভুল হবার কথা নয়, তারস্বরে আরও ডাকছে সে, 'মেজদা, একটু তাড়াতাড়ি নামুন, বড়ো বিপদ!'

পুরুষগলাটা সাইকেল-রিকশাওয়ালার।

সন্ধ্যা পার হওয়া অন্ধকারে রিকশা গাড়িতে চড়িয়ে কোন বিপদ বয়ে আনল সরযূ, লাহিড়ী বাড়ির দরজায়? বয়ে এনেছে সত্যিই।

কিন্তু বিপদটা সরযূর বয়ে আনবার কথাই নয়। এল শুধু ওই রিকশাওয়ালার ভুলে। অথবা এমন কিছু ভুলও নয়। বড়ো লাহিড়ী বাড়ি তো বহুদিন পোড়ো হয়েছিল, কবে যে তার তালা খোলা হয়েছে 'ডাহুকি' স্টেশনের রিকশাওয়ালা তার কি খবর রাখে? যে তার গাড়িতে এসেছিল, সে বলেছিল 'লাহিড়ী বাড়ি চেনো? নিয়ে চলো।' তাই নিয়ে গিয়েছিল সে ভুবন লাহিড়ী-বাড়ির দরজায়।

সরযূ তখন বাগদিপাড়া থেকে ফিরে স্নান করে এসে সন্ধ্যাপুজোয় বসেছে। খুড়ি, পিসি দু-জনে হাঁক পেড়ে ডাকল, 'অ সরযূ, তোর আহ্নিক শেষ হয়েছে? এই দ্যাখ কী বিপদ!'

ঝিউড়ি মেয়ে সরযূ আজন্মই এ সংসারে পুরুষ অভিভাবকের ধাক্কা ধরে। বিপদ সম্পদ সবেতেই। ইশারায় প্রশ্ন করল সরযূ, 'কী?'

ঠাকুরঘরের প্রদীপের আলোয় সে ইশারা ধরা পড়ল না।

ওঁরা আবার ব্যস্ত ডাক দিলেন, 'দ্যাখ এসে বাইরে। একটা রিকশা এসে কী সব বলছে বাপু! শুনে তো ভয়ে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।'

ইষ্টদেবতাকে তাকে তুলে ফেলে বেরিয়ে আসতে হল। বেরিয়ে এসে একটু জিজ্ঞেসাবাদেই ব্যাপার বুঝে ফেলে সরযূ, রিকশায় চড়ে বসে তার আর এক দেবতাকে তুলে নিল কোলের কাছে। বলল, 'বড়োবাড়ি চল। শ্যাম লাহিড়ীমশায়ের বাড়ি। আস্তে, ঝাঁকুনি দিবি না খবরদার—'

ঝাঁকুনি দেওয়ায় সাবধান করল সরযূ, মেঠো রাস্তার উঁচু-নীচু থেকে। কিন্তু জিতু লাহিড়ীর উঁচু গলার তীব্র ব্যঙ্গের ঝাঁকুনি?

না, তার থেকে রক্ষা করতে পারল না সরযূ আর্ত জীবনটাকে।

অন্ধকারকে কেটে কেটে জিতু লাহিড়ীর উচ্চকণ্ঠ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল, 'কে? কী নাম বলেছে? সোমা লাহিড়ী? লাহিড়ী বাড়িতে ওনামে আবার কে আছে! কেউ নেই, কেউ নেই, না না। ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বাড়ি ভুল হয়েছে।'

সরযূ ব্যস্তকণ্ঠে বলে, 'ভুল হয়নি মেজদা, আমি ভালো করে জিজ্ঞেস করেছি। এখন হিমে ঠান্ডায় আর অবস্থার গতিকে মুখ দিয়ে ওর কথা বেরোচ্ছে না। মেজোবউদিকে বলুন তাড়াতাড়ি একটা আলো ধরে—'

—আলো! হা-হা-হা! বলেছ ভালো সরযূ, তোমার মেজোবৌদি ধরবেন আলো! আলোর সন্ধান কোথায় ওর কাছে? নেই নেই। তিনি এখন অন্ধকারে বসে মৃত্যুর সাধনা করছেন। দু-দুটো ছেলে আর তিন-তিনটে মেয়ের মৃত্যুশোক সামলাতে পারেননি ভদ্রমহিলা—

সরযূ অবাক হয়। তারপর সরযূর খেয়াল হয়। যেন বুঝতে বাকি থাকে না ব্যাপারটা। নিশ্চয় সেই বোতলের প্রতিক্রিয়া।

সরযূ শুনেছে মাতালকে ভয় খেতে নেই, ধমকে দিতে হয়। তাই মনে জোর করে তীব্রস্বরে ধমকে ওঠে, 'কী বকছেন আবোল-তাবোল? এই তো একটু আগে মেয়েটা বলল, আপনার মেয়ে। বোধ হয় ছোটো মেয়ে। এখন আর কথা বলতে পারছে না। এভাবে এসে পড়েছে কেন বুঝতে পারছি না, কিন্তু বোঝাবুঝি পরের কথা, মেয়েকে আগে তাওত করুন...মেজোবউদি, অ মেজোবউদি—'

—মেজোবউদি! হা-হা-হা, ভুল করছ সরযূ, তাঁকে পাবে না। তিনি কি এখন মরোজগতে আছেন? হয়তো এতক্ষণে বেহেস্তেই পৌঁছে গেছেন! কিন্তু আমার বাড়িতে রাস্তার জঞ্জাল তুলতে এসেছ কেন সরযূ? পেলে কোথায়? দূর করে দাও, দূর করে দাও।

—বাবু আমায় ছেড়ে দিন।' রিকশাওয়ালা বিরক্তি জানায়।

জিতু লাহিড়ী বলেন, 'তোমায় তো বাপু ধরে রাখিনি আমি! যেতে পারো। তোমার মালপত্র নিয়ে চলে যেতে পারো।'

—মেজদা! যদি ভুলও হয়ে থাকে, মেয়েটাকে তো এখন আর নিয়ে যাবার উপায় নেই। নইলে আমার ওখানেই নিয়ে চলে যেতাম। আর চলবে না। এমন জানলে কি আমি আমার ওখান থেকে এতটা আনি? ছি ছি! অবস্থাটা দেখুন!...রিকশাওয়ালা, আলোটা একটু ধর তো বাবা, দেখুন উনি ভালো করে।

—আলোর দরকার নেই সরযূ, আলো ধরে দেখবার বস্তু ওটি নয়। আলো না ধরেও বুঝতে পারছি'—কটু বিস্বাদ একটা স্বর যেন সমস্ত পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'কিন্তু তুমি দুঃসাহসী মহিলা, তুমি হঠাৎ লাহিড়ী বাড়ির পরিচয় বানিয়ে এখানে ঠেলে উঠতে চাইছ কেন বলো তো? তুমি মিসেস ডেভিড না? দিল্লির সেই চুলছাঁটাই দোকানের নোংরা ছোকরাটার ওইরকমই কী যেন একটা নাম ছিল যেন। তা কী হল মিস্টার ডেভিডের? গয়না টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? না খেতে পেয়ে খুঁজে খুঁজে এসেছ ভাতের জন্যে?

সরযূ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা আর অস্পষ্ট থাকে না। কিন্তু তাই যদি হয়, যদি কুলে কালি দেওয়া মেয়েই হয়, এই চরমক্ষণে তো তার বিচার করতে বসা চলে না। সন্দেহ নেই, মেজদা ওর অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। পুরুষ মানুষকে আর কীভাবে বোঝানো যাবে? আশ্চর্য! মা মাগি নামছে না কেন? করছে কী ওপরতলায় বসে? মদ কি তিনিও খাচ্ছেন নাকি? দুর্গা দুর্গা! মরুক গে, সরযূ তো আছে।

স্তব্ধতা ঝেড়ে ফেলে দৃঢ়স্বরে বলে, 'আপনি পুরুষ, কী আর বোঝাব? ওর অবস্থা শোচনীয়। এমন অবস্থায় কুকুরটা বেড়ালটাকেও মানুষ ঠাঁই দেয়, সেই ভেবেই না হয়—'

—রিকশাওয়ালা! স্নায়ু ছিঁড়ে পড়া একটা তীব্র যন্ত্রণার আর্তনাদ শূন্যে আছড়ে পড়ে, —ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমায়। স্টেশনে—

রিকশাওয়ালার দায় পড়েনি। ভালো এক আরোহী জুটেছে তার! চড়িয়ে পর্যন্ত যেন ভয় করছিল গাড়ির মধ্যেই বুঝি মরে যাবে। যদি-বা জ্যান্ত নিয়ে এনে ফেলে, এখন এ কী ঝামেলা!

—ছেড়ে দিন বাবু আমায়, বলে আর একবার হামলা করে ওঠে সে, আর এইসময় বরুণা লাহিড়ী এসে দাঁড়ান, নিঃশব্দে অন্ধকারে।

প্রথমে গ্রাহ্য করেননি। তখন সেই ভয়ংকর মুহূর্তকে কে ঠেলে দিল দেখতে এসেছিলেন।

দেখলেন সেই সরযূ, দেখে হাড় জ্বলে গিয়েছিল। রাতদুপুরে বিপদ নিয়ে ছুটে আসবার জায়গা এটাই নির্বাচিত হল কেন, সেটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে গলাটাকে বাড়িয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। 'চুলোয় যাক', বলে বোতলটা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। লিভার পচিয়ে মরে লাহিড়ীদের ওপর উচিত প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে ভেবে তীব্র একটা উল্লাস অনুভব করছিলেন যেন। নীচের তলার বাদপ্রতিবাদে কর্ণপাত করেননি। কেউ একটা কিছু তর্ক করছে। করুক গে! হঠাৎ চমকে উঠলেন। সমস্ত স্নায়ুগুলোর ওপর দিয়ে যেন তীক্ষ্ণ একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল! যুগযুগান্তর পার থেকে কোনো মায়াহরিণ কি ওই গলার ছলনা করল?

ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে এলেন। ওদের পিছনে থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে বোধ করি রিকশাওয়ালাটাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন,'দাঁড়াও, চলে যেয়ো না। আমিও যাব।

—তুমি যাবে? জিতু লাহিড়ী হা-হা করে হেসে ওঠেন, —কোথায় যাবে? তোমার সেই ছোটো জামাইয়ের বাড়ি? কিন্তু সে তো তোমার মেয়েকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—মেজদা! সরযূ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মেয়েটার জীবন-মরণ সমস্যা, আর এখনও তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে নাটক করতে বসলে! স্পষ্ট করে না বলে তো বোঝাতে পারলাম না দেখছি, মেয়েটা যে প্রসব বেদনায় ছটফট করছে। দরজা আগলে রেখে দু-দুটো কেষ্টর জীবকে মারবে নাকি? কুকাজ যদি করে থাকে তো সে তোমাদেরই সুশিক্ষার অভাবে। নিম পুঁতলে নিম গাছই হয়, আম গাছ হয় না। সরো, দোর ছাড়ো, এ আমারও জ্যাঠা-দাদার বাড়ি। এবাড়ির একখানা ঘর দখল করবার দাবি অবিশ্যিই আছে আমার। তোমরা না ছোঁও আমি একাই নিয়ে যাচ্ছি, সে-শক্তি রেখেছে ভগবান।'

—সরযূ! বরুণা লাহিড়ীর পাথুরে মুখটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে, আর গলাটা নিতান্ত বুড়ির মতোই কাঁপা কাঁপা ভাঙা ভাঙা শোনায়, —সরযূ, ডাক্তার!

কোথা থেকে যেন একটা বালিশ এনে অচৈতন্য মেয়েটার মাথার তলায় গুঁজে দিয়ে সরযূ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ডাক্তার! ডাক্তার এখন স্বপ্নকথা মেজোবউদি, ডাক্তার আছে ডাহুকিতে। সকাল না হলে—'

—না নেই! সরযূ ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ গভীর একটা অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, 'কোথা থেকে থাকবে? গাঁয়ে কি মানুষ আছে? যেই কেউ এতটুকু মানুষ হয়ে ওঠে, তক্ষুনি তো সে দেশ ভিটেকে ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দিয়ে শহরে ছোটে। সেখানে এক ছটাক জায়গার মধ্যে তিনটে সংসার মাথা গুঁজে থাকবে, তবু দেশে এসে বাস করবে না, কারণ দেশে কলের জল নেই, বিজলির আলো নেই, রোগে ডাক্তার নেই, মরণ-বাঁচনে ওষুধ নেই! কিন্তু, কেন নেই? তার কি প্রতিকার নেই? একথা কেউ কোনোদিন ভেবে দেখে? শহরে সুখ, তাই মশা-মাছির মতো দল বেঁধে সবাই শহরেই ছুটেছে। তার থেকে সুখগুলোকে চেষ্টা করে গাঁয়ে নিয়ে আয় না কেন সবাই মিলে! তা করবে না! নাক উলটে বলবে, ছি

ছি এখানে আবার মানুষ থাকে? ডাক্তারের স্বপ্ন ছাড়ো মেজোবউ, নিজেরাই যা পারা যায় করি। হাত-পা তো হিম হয়ে গেছে মেয়ের, হ্যারিকেনেই কাপড় তাতিয়ে তাতিয়ে সেঁক দাও দিকি একটু।...আর মেজদা! একটু হাসির মতো শোনায় সরযূর গলাটা, —তোমাদের ওই বোতলের ছাইভস্ম দু-চার ফোঁটা দিয়ে দ্যাখো দিকি, যদি চাঙ্গা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে গরলই অমৃত!'

কিন্তু অমৃত প্রয়োগেরও কাল আছে বই কী। সে-কাল যদি উত্তীর্ণ হয়ে থাকে, সে-রসায়ণ আর কোনো কাজ দেবে?

তবু সামন্যতম একটু কাজ হয়তো হয়েছিল! হয়তো তারই জোরে তেঁতুলগোড়া গ্রামের বড়ো লাহিড়ী বাড়ির নীচের তলায় একটা ভাঙা ঘরে শুয়ে সোমা ডেভিড তার শেষ বক্তব্যটুকু বলে নিতে পেরেছিল। অথবা তাও নয় নিববার আগে প্রদীপ না কী বলে, হয়তো তাই!

কারণটা যাই হোক, অচৈতন্য সোমা ডেভিড সেই মুহূর্তের চৈতন্যে,পৃথিবীর বাতাসে সদ্য শিউরে ওঠা এক অসহায় আত্মার তীব্র ক্রন্দন শুনতে পেয়েছিল। সেই কান্নার মধ্যেই নিজের কথা বলে নিয়েছিল সে, 'জানতাম তাড়িয়ে দেবে, তবু তোমাদের কাছেই আসতে ইচ্ছে হয়েছিল। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্ট, তবু মরতে পারিনি। ওকে তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম, এবার মরে বাঁচব।'

বরুণা লাহিড়ী সমস্ত সভ্যতা ভুলে সমস্ত অহংকার ভুলে নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ের মতো ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, —মরবার জন্যে তুই আমার কাছে এলি সোমা—

সোমার মুখটায় বুঝি একটু হাসির আভাস ফুটেছিল। থেমে থেমে বলেছিল, 'মরে তো অনেক দিন আগেই গিয়েছি মা, শুধু কোনো একদিন তোমাদের মেয়ে ছিলাম, এইটুকুর জোরে প্রার্থনা করছি, ওকে একেবারে ডাস্টবিনে ফেলে দিও না, একটু আশ্রয় দিও। ও অন্যায়ের নয়, অবৈধ নয়।'

ডাক্তার এসেছিল।

রাত্রের সেই সাইকেল-রিকশাতেই ডাহুকিতে চলে গিয়েছিলেন জিতু লাহিড়ী। যে-মেয়ের জন্য একদা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন,'রাস্তায় পড়ে মরতে হবে, কবরে দেওয়ার খরচও জুটবে না'—আর এই ক্ষণকাল আগেও যাকে বাড়ির দরজা থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তার জন্যে দশগুণ ফি দিয়ে রাত্রেই এনেছিলেন ডাক্তার, কিন্তু তখন আর ডাক্তারের দরকার ছিল না।

তখন বরুণা লাহিড়ী উন্মত্তের মতো একটা প্রাণহীন বুকের উপর পড়ে কাঁদছিলেন। আর সরযূ শান্ত চেষ্টায় একটা প্রাণ-কণিকাকে চেপে ধরে কান্না ভোলাচ্ছিল, বোধশক্তিহীন যে-অন্ধ ক্রন্দন শুধু পৃথিবীর রূঢ় স্পর্শেই উদ্দাম হয়ে ওঠে।

তেরো-শো সত্তর সালটা তেঁতুলগোড়ার একটা খবরের বছর। একই বছরের মধ্যে এতগুলো জমকালো জমকালো খবর তেঁতুলগোড়ার সারা জীবনেও বোধ হয় ঘটেনি।

বছরের প্রথম আর প্রধান খবরটা ম্লান হয়ে গেল বছরের মাঝখানের ওই নতুন খবরটায়। যে শুনল সেই স্তম্ভিত হয়ে গালে হাত দিল। কেউ কেউ বিশ্বাস করল না। তবে চোখে দেখলে আর অবিশ্বাসের পথ কোথায়। নিজের চোখে দেখতে এল সবাই একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, দল বেঁধেও।

কিন্তু এ খবরে বিস্ময় আর আনন্দ নয়। বিস্ময় আর আক্ষেপ। সত্যি এর থেকে আক্ষেপের বিষয় আর কী আছে? সমস্ত বয়েসকালটা পার করে এসে বুড়োবয়সে এই মতিচ্ছন্ন হল সরযূর!

চিরদিনের শুচিশুদ্ধ নির্মল পবিত্র মানুষটা পারলই-বা কী করে এই নোংরার মধ্যে নামতে?

ওর হাতে অবিশ্যি আর কেউ কখনো খাবে না। খুড়ি পিসি মরলে সরযূই হেঁসেলের ভার নিতে

বাধ্য হবে, সরযূর ভাজের সে-আশায় ছাই পড়ল, কিন্তু ও নিজেই-বা খাচ্ছে কী করে? চান করলেই কি শুদ্ধ হল? জাত যাওয়া অশুচিতা স্নানে শুদ্ধ হয় না, এ জ্ঞান নিতান্ত মূর্খেরও থাকে।

সরযূর হিতৈষীরা অনেক বুঝিয়েছিল ওকে, কিন্তু কাজ হল না। মতিচ্ছন্ন হয়েছে তবু স্বভাবটি ঠিক আছে। পরের কথায় কখনোই সরযূ হেলে দোলে না, পরের উপদেশ কানে নেয় না। এখনও নিল না।

জিতু লাহিড়ীর একটা ট্যাঁস ফিরিঙ্গির সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া কুলটা মেয়ের ঘৃণ্য নোংরা বাচ্চাটাকে নিয়ে মত্ত হয়ে রইল।

তাই কি বাচ্চাটা ছেলে? যে ভবিষ্যতে কখনো কোনো কাজে লাগবে? মেয়ে একটা! কালে ভবিষ্যতে আবার সে-মেয়ে মায়ের মতোই হয়ে উঠবে! তা ছাড়া আর কী হবে? কিন্তু যাতে না মায়ের মতো হয়, তার জন্যই তো সরযূর কাছে দেওয়া।

বরুণা লাহিড়ী যে সরযূর হাত ধরে বলেছিলেন, টের পেয়েছি আমার মানুষ করার মধ্যে কোথাও একটা ভয়ানক ভুল আছে। হয়তো সেই ভুল আবার করব। আমি নেব না, তুমি ওর ভার নাও।'

হ্যাঁ, তেমন আশ্চর্য ঘটনাই ঘটেছিল। সরযূর হাত ধরেছিলেন বরুণা লাহিড়ী। আরও আগেই ধরেছিলেন। সেই সেদিন প্রথম।

যে-দিন 'সোমা' নামের একটা দলিত বিধ্বস্ত কাঞ্চন ফুল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ ছিটকে এসে পড়ে, ভোরের বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল! বরুণা লাহিড়ী সরযূর হাত চেপে ধরেছিলেন।

বলেছিলেন, 'সরযূ তুমি মহৎ, তুমি পুণ্যবতী, তুমি পরোপকারী, জীবনে আর একটা পুণ্য কাজ করো তুমি, আমাকে ওর সঙ্গে যেতে দাও। ওকে আগুনে দাও, কবরে দাও, যা তোমাদের ধর্মে হয় করো। শুধু ওর কাছে আমায় একটু জায়গা নিতে দাও।'

সরযূ সে-হাতের উপর হাত রেখে বলেছিল, 'তা বললে চলবে কেন মেজোবউদি! ও যে তোমার কাছে ওর জিনিস গচ্ছিত রাখতে মরণপণ করে ছুটে এসেছিল। এমন পণ না করলে হয়তো এমন করে বেঘোরে মরতে হত না ওকে। সেই গচ্ছিত বস্তুর ভার ফেলে রেখে পালাবে তুমি?'

—তোমার দাদা আছেন সরযূ, তুমি আছ, আমায় যেতে দাও।'

একেবারে সাধারণের মতো, গরিব-দুঃখী ভিখিরি মেয়েদের মতো করে কেঁদেছিলেন বরুণা লাহিড়ী, আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না। জিতু লাহিড়ী চেয়ে দেখে আস্তে কাছে সরে এসেছিলেন।

জিতু লাহিড়ীর চিরনিঃসঙ্গ কঠিন আবরণে ঢাকা প্রাণটা কি এই শোক-বিবশ মাতৃহৃদয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এল? জিতু লাহিড়ীর আত্মা কি চিরদিন এই হৃদয়কেই চেয়েছিল? আর না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শুধু আঘাত হেনেছিল? এতদিনে সে-আত্মা শান্ত হল? তাই সে-আত্মা ওই যন্ত্রণাজর্জরিত হৃদয়ের উপর গভীর একটি মমতার স্পর্শ রাখল? নইলে সহসা অমন শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেলেন কী করে বরুণা লাহিড়ী?

জিতু লাহিড়ী যখন কাছে সরে এসে ওঁর পিঠে আলতো একটু হাত রেখে বললেন, 'তবু পারতেই যে হবে বেবি, নইলে প্রায়শ্চিত্ত হবে কেন?' তখন তো সে-হাত ঠেলে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল বরুণার পক্ষে! কিন্তু ঠেলেননি। শুধু সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

জিতু লাহিড়ী আরও আস্তে বলেছিলেন, 'চোখ মোছো বেবি, তাকিয়ে দ্যাখো কত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার সোমাকে, আমার সোমাকে, আমাদের সোমাকে! দ্যাখো কত আলো আকাশ ঢেলে দিয়েছে ওর ওপর, কত ফুল দিয়েছে সরযূ। ওর সব ভুল ওই ফুলে ঢেকে গেছে।'

বরুণা কি এই গভীর মমতার স্পর্শের মধ্যে 'পারা'র মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন? সারাজীবন যে-বস্তু পাননি বরুণা, যার অভাবে এলোমেলো করেছেন জীবনকে, সেই বস্তু কি পেলেন এই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে? চরম এক ক্ষতির বিনিময়ে এল পরম এক ঐশ্বর্য?

এই গভীর নিবিড় মমতার স্পর্শ কবে পেয়েছেন বরুণা?

অথবা এমন করে ঠিক চাওয়ার মুহূর্তও আসেনি, তাই পাননি। কোথায় কখন চলে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব, কোথায় কখন চলে ভাঙা-গড়ার খেলা, কে বলতে পারে? বরুণা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বরুণা শান্ত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর সবচেয়ে আদরের সবচেয়ে ছোটো মেয়ের নিথর শান্ত মুখের দিকে।

তারপর একসময় বলেছিলেন, 'সরযূ, বাচ্চাটাকে দ্যাখো। বোধ হয় দুধ খাবে।' আর তারও ক-দিন পরে বলেছিলেন, 'তুমিই ওর ভার নাও সরযূ!'

আশ্চর্য! নিষ্ঠাবতী বিধবাকে এ অনুরোধ করার সাহসও তো হয়েছিল বরুণা লাহিড়ীর।

তা সরযূ রাগও তো করেনি। একটুখানি হেসেছিল বরং। বলেছিল, শুধু আমার মতো হলেই তো চলবে না মেজোবউদি, তা হলে তো নাতনিটা জগতের ওঁচা হয়ে থাকবে। তোমাদেরটাও চাই। শুধু কোনটা কতটুকু চাই, সেটাই বিচার করা দরকার। আমার মুখে শোভা পায় না, তবু বলি সন্তান মানুষ করা তোমার গিয়ে রান্নারই মতো। মশলাগুলো শুধু তো ঢেলে দিলেই চলবে না, পরিমাণ পরিমিতে জ্ঞান নিয়ে ঢাললে তবে না? একেলে-সেকেলে দুই-কালের দিদিমার হাতে গড়া মেয়ে যেন একটা মেয়ের মতো মেয়ে হয়, তাই চেষ্টা করতে হবে।

—না সরযূ, আমি হাত দেব না। আমার ভুলের হাত ঠেকাব না। আমার ছোঁওয়ায় শুধু ধ্বংসই আছে, বলেছিলেন বরুণা।

সরযূ একটু হেসে বলেছিল, 'তোমরা কত লেখাপড়া জান, তোমাদের কথার আর কী উত্তর দেব? তবু অভয় দাও তাই বলি, ভুল আর ঠিক, এই তো ভগবানের লীলা, আদি অন্তকাল তো মানুষে-ভগবানে এই লীলাই চলছে। মানুষ পৃথিবীর মাথায় চড়ে বসে অহংকারে মত্ত হয়ে অন্ধকারে ছোটে, ঠিক-ভুল দেখে না, ভগবান তখন সেই ভুলের খাজনা চায়। বলে, তোকে জ্ঞান দিয়েছি, বুদ্ধি দিয়েছি, বিচার দিয়েছি, বিবেক দিয়েছি, তবু এই কাজ? ভোগ তবে! ভুগে মর! দিশেহারা হয়ে তখন মানুষ ঠিক পথের সন্ধান করে মরে। এই লীলা! মানুষ যদি নির্ভুল হয়ে বসে থাকবে, ভগবানের কী কাজটা থাকবে বলো? স্রেফ বেকার হয়ে যাবে তো? নইলে দ্যাখো, মেজদা জ্ঞানী বিদ্বান মানুষ, এক ভুলের যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে আর এক কী মস্ত ভুল নিয়ে পড়লেন! যেকালে মানুষ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এক করে বেড়াচ্ছে, সেকালে উনি খড়ম আর গোরুর গাড়ি ভজতে বসলেন। যে-বাঘকে চিরদিন মাংস খাইয়ে এসেছেন, তাকে হঠাৎ বললেন, 'তুই দুধ খা।' এ কি কোনো কাজের কথা? সেকালটাই ভালো ছিল বলে পিছু হেঁটে সেকালে ফিরে যেতে চাইলে পাগলামিই হয়। সেই 'ভালোটা যে কী, সেইটাই বরং ভেবে দেখে তাকে নিয়ে এসো একালে!'

—তা কি হয় সরযূ?

—হবে না কেন মেজোবউদি? তোমরা লেখাপড়া জানা মানুষ, তোমরা চেষ্টা করবে যাতে সেটা হয়। একালের সঙ্গে যাতে তার ভাব হয়। তোমরাই যদি ভেসে যাবে, মুখ্যুরা কার দেখে শিখবে?

কিন্তু লেখাপড়া না জানলেই কি মুখ্যু হয়? লেখাপড়া শিখলেই পণ্ডিত? কেষ্টবিষ্টু জিতু লাহিড়ী তবে গোবর গঙ্গাজল ছড়ানো, আর নুড়ি-পাথরে মাথা ঠুকে বেড়ানো, মুখ্য সরযূর পরামর্শ তুলে নিলেন কেন? তেঁতুলগোড়া থেকে আবার কেন ত্যাগ করে আসা রাজধানীর দেশে পা বাড়ালেন? যেখানে জীবনে আর যাব না বলেছিলেন?

না, সরযূ রূপসি বলে সরযূর কথা গ্রহণ করেছেন জিতু লাহিড়ী, একথা এখন আর বরুণা লাহিড়ীও বলেন না। বরং বলেন, 'ঠিক কথাই তো বলেছে সরযূ!' সরযূ বলেছিল, বড্ড যে ঠেকি মেজদা, তাই

ওই ঠিক কথা মাথায় আসে। তুমি তোমার টাকার পাহাড় ত্যাগ করে এসে এখানে ন্যাকড়া গায়ে দিয়ে বেড়াবে, এর মধ্যে কোনো মহিমা নেই। ঐশ্বর্য হল ভগবানের দান, তাকে ত্যাগই-বা করবে কেন? কাজে লাগাতে হয়। তেঁতুলগোড়ার ধুলোটা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো তো! দেখি এক বার চোখ মেলে! ছেলেবেলা থেকে এই হতভাগা দেশটা ছাড়া আর তো কিছু দেখিনি, তাই এইটা নিয়েই জল্পনাকল্পনা করেছি চিরকাল। ভাবতাম কী জানো? আমার যদি অনেক টাকা থাকত, সব আগে তেঁতুলগোড়ার এই মাঠময়দান কেটে কালো চকচকে পিচের রাস্তা বানিয়ে দিতাম।'

জিতু লাহিড়ী বলে উঠেছিলেন, 'ওই কালো চকচকে রাস্তা ধরেই যত চকচকে পাপের কালি এসে জমা হয় সরযূ! আসে যন্ত্রণা বীভৎসতা, লোভ, অনাচার—'

সরযূ হেসে উঠে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিল,'তেমনি আসে ওষুধ ডাক্তার, বই-ইস্কুল, আসে সুবিধে সাহস! পাছে পাপবস্তু আসে বলে পথ বন্ধ করে রাখাটা তো পাপদৃশ্য দেখতে হবে ভেবে চোখবন্ধ করে রাখার সামিল। রাস্তাটা করো আগে, তারপর ভেবো কী আসতে দেবে, আর কী আসতে দেবে না।—আমাদের তেঁতুলগোড়ার শ্মশানে যাবার রাস্তাটা দেখেছ? কাউকে বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে শ্মশানযাত্রীরাও যে কী করে সেই পথের পথিক না হয়ে ফিরে আসে তাই ভাবি। আমার তো নিজের ছেলে নেই, ভাবি আমায় যাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে, কত শাপমন্যি দিতে দিতে যাবে তারা! রাস্তার যদি একটু উন্নতিসাধন করতে পারো মেজদা, তবে আমিও মরে গালাগাল খাই না, তোমারও পয়সাটা সার্থক হয়!

বাক্যবাগীশ সরযূ কথার কথাই বলেছিল। স্বপ্নেও ভাবেনি তার কথায় কান দিতে বসবেন তার থেকে বিশ বছরের বড়ো দাদা জিতু লাহিড়ী! কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনে নিথর হয়ে বসে থাকল সরযূ, জিতু লাহিড়ী দিল্লি গেছেন, ফিরছেন টাকা আর এঞ্জিনিয়ার নিয়ে, রাস্তা বানিয়ে দেবেন পিতৃপুরুষের গ্রামের। অনেক টাকা আগে বিলিয়েছিলেন, কিন্তু লাইফ ইন্সিওরের মোটা টাকাটা ছিল খাতায়-কলমে। সেই টাকা নিয়ে আসছেন।

—হ্যাঁ, ওই টাকাটা, ওই লাইফ ইনসিওরের টাকাটা তখন হাতের মুঠোয় এসে পড়েনি বলে হাত থেকে মুঠো মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেননি। বলেছিলেন বরুণা, 'যখন সংসার ভাঙার খেলায় মাতলেন, টাকাগুলোকে যেন একটা অশুচি অস্পৃশ্য জিনিসের মতো দেখেছেন।' বলেছেন, 'পাপ আসে ওই টাকার ঘাড়ে চেপে।' বলেছেন, 'যারা শয়তান, যারা ভণ্ড, তারাই বানিয়েছে 'টাকা লক্ষ্মী'। আসলে টাকাই পাপ, টাকাই অলক্ষ্মী!' এ মানুষের কাছে কোন কথা দাঁড়াবে বল?'

—মনটা বিগড়ে গিয়েছিল আর কী! সরযূ নিশ্বাস ফেলেছিল, 'সন্তান নেই, জানি না সে কী বস্তু, তবু আন্দাজে তো বুঝতে পারি, কতটা দাগা লেগেছিল! অবিশ্যি তোমাকে একথা বলা শোভা পায় না, মায়ের প্রাণ আরও কত ফেটেছে! তবু কী করবে, ভগবানের কাছে সদাই প্রার্থনা, যে যেখানে আছে সুখে থাক, শান্তিতে থাক! কার দোষ কার ভুল, এ তর্কে লাভ তো আর কিছু নেই!

বরুণা এই বিশ্বাস আর ক্ষমার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন, আর ভেবেছেন, একথা আমরা বললেও পারতাম হয়তো! কিন্তু পারিনি। বলেছি, 'কষ্টে পড়বি, টের পাবি, রাস্তায় পড়ে মরবি।'

জিতু লাহিড়ীও দিল্লি যাবার প্রাক্কালে বলেছিলেন, 'লাভ আর লোকসানের হিসেব-নিকেশ করতে বসাই ভুল বেবি! মনে করতে চেষ্টা করছি—শুধু তুমি আর আমি দু-জনে যখন সংসার শুরু করেছিলাম, সেই আমরাই যেন আছি শুধু। অতীত আমাদের জীবনের উপর পাথরের মতো চেপে নেই। 'মুক্তি'কে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি!'

'মুক্তি'! সোমার মেয়ে! তাকে নিয়েই তিনটে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ।

সরযূর বিধবা খুড়ি বলেছিলেন, 'এবাড়িতে ওই নরক তুললে তো চলবে না সরযূ—'

সরযূ অম্লানবদনে বলেছিল, 'বাড়ির পাটা-দলিলখানা খুলে দ্যাখো তো খুড়ি, কার বাপের নাম আছে তাতে?'

খুড়ি ক্রুদ্ধ গলায় বলেছিলেন, 'তুই আমার বাপ তুললি?'

—তুমিই তোলালে— সরযূ বলেছিল, 'কথা কইবার সময় বুঝে সমঝে বলতে হয়।'

বিধবা ভাজ বলেছিল, 'আমার ছেলে দুটি তো বাড়ির মালিক, না কি তাও উড়িয়ে দেবে?'

সরযূ বলেছিল, 'ঠাকুরদা জীবিত থাকতে বাপ গেলে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হয় না বউ, জিজ্ঞেস করো আইন জানা পুরুষদের।'

—ওই আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালটার জন্যে সবাইয়ের সঙ্গে বিরোধ করবে তুমি?

—সবাই যদি তাই চায়, উপায় কী? কেষ্টর জীবনটাকে যখন নিয়েছি, তখন লড়তে হবে বই কী তার জন্যে!

তাই লড়েছে সরযূ। লড়ছে। দুটো লাহিড়ী বাড়িকে এক করে মেয়েটাকে নাচাচ্ছে। আর ক্রমশ সবাই এলে যাচ্ছে।

হয়তো এই নিয়ম পৃথিবীর। যেকোনো অসহনীয়কেই জোরের সঙ্গে চালালে, চালিয়ে চললে, একদিন সেটাই সহনীয় হয়ে আসে, সহজ হয়ে আসে! এমনি করেই আসে নতুন যুগ, নতুন সমাজ।

যে প্রথমটায় জোর করে, তার নিন্দে রটে। সে-নিন্দেয় কান না দিয়ে খাল কাটলেই কাটা খাল দিয়ে আসে নতুনের জোয়ার।

ক্রমশ নাইতে যাবার সময় পিসি এসে মেয়েটাকে কোলে করেন, খুড়ি কাছে এসে বলেন, 'রূপ পেয়েছে দ্যাখো মেয়েটা, যেন ফোটা ফুল! একে তো লাহিড়ী বংশের ছাঁট, তাতে আবার সাহেবের রক্ত গায়ে!'—বলে 'জাত জন্ম আর রইল না ঠাকুরঝি, হামা দিতে শিখে ইস্তক কী-না ছুঁচ্ছে মেয়েটা!'

—শিশু নারায়ণ! বলে পিসি বোধ করি নিজের অনাচারের প্রমাণের পথে কাঁটা দেন।

নরকের কীট 'মুক্তি' এখন 'নারায়ণের' পর্যায়ে পড়েছে। সরযূকে এঁটে উঠবে কে? সরযূ বলে, 'আমি যখন পুষ্যি নিয়েছি, আমার জাতে রাখতে হবে ওকে, ব্যাস।'

ভাজ বলে, 'রাখলেই কি আর 'জাত' হয়ে যায়?'

—যাওয়ালেই যায়! মানুষের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। জাত কেউ গায়ে লিখে নিয়ে আসে না।

সরযূর এই চোটপাটটা এবছরের একটা বিশেষ খবর। মেয়ে একটা পুষে ফেলেছিস, বেশ করেছিস, কিন্তু তাকে নিয়ে এত চোটপাট কীসের?

কীসের? এ প্রশ্ন মুখোমুখি কেউ করে না! এদিকে 'মুক্তি' হামা দিয়ে সর্বস্ব ছুঁয়ে বেড়ায়। ভাজ বলে, 'ওই মেয়েই যখন সব ছুঁচ্ছে, ঠাকুরঝির আর ভাত রাঁধতে বাধাটা কী?'

সরযূ বলে, 'বাধা হচ্ছে সময়ের অভাব। তিন-তিনটে মেয়েমানুষ রয়েছ তোমরা, ভাত রাঁধা এত কষ্টকর হচ্ছে কেন?'

—একটা তো আশি বছরের বুড়ো।

—ওই আশিতেই তো ভেলকি খেলাচ্ছে! তোমরা তার নখের কোণেও লাগো না!

বলে আর ঘাটে ডুব দিয়ে এসে বলে, 'ও পিসি, ভাত পাথরটা তাড়াতাড়ি দাও গো, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে! বুড়োবয়সে একটা দামাল মেয়ে বওয়া কি সোজা গো?'

তেঁতুলগোড়ার খবরের বছর তেরো শো সত্তর সালের শেষ খবর গাড়ি গাড়ি পাথরকুচি আসছে, আসছে চুন-সুরকি-বালি। রাস্তা হবে, হাসপাতাল হবে। সরকারের স্নেহদৃষ্টিও হয়তো আনিয়ে নিতে পারবেন, অনেক দিন সরকারের উঁচু চেয়ারে বসে থাকা জিতু লাহিড়ী।

গ্রামের বেকার ছেলেরা আশা করছে, এই রাস্তার রাস্তা ধরে যদি তাদের কোনো সুরাহা হয়। কাজ হলেই কাজ আছে।

তবু—প্রতিকূলতা কি আর আসছে না? নিশ্চয় আসবে।

খুব আসবে। কেউই সহজে নিজের জমির এককোণ ছাড়বে না, কেউই নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে বালি পাথরের গাড়ি নিয়ে যেতে দিতে চাইবে না, কেউ 'রাজি আছি' বলে সইস্বাক্ষর দিতে চাইবে না।

তবু হবেও। প্রতিকূলতাই তো শক্তির জোগানদার। একজনও যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এক-শো জন রুখতে পারবে না।

তেরো-শো একাত্তরটা এখনও অলক্ষ্যে আছে। কে জানে পৃথিবী কোন মোড় নেবে! কে জানে, থাকবে কি যাবে। কোথায় নাকি যুদ্ধ বাধছে। কে জানে খবরটা সত্যি কি না। তবে এখানে কেউ বলছে শুধু রাস্তা হবে, কেউ বলছে শুধু রাস্তা নয়, হাসপাতালও হবে। কেউ কেউ বলছে মেয়ে-ইস্কুল নাকি হবে।

না-হবে কেন? হওয়াই তো উচিত।

শহরের এত কাছাকাছি বাস করেও তেঁতুলগোড়া গ্রাম এক-শো বছরের চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে?

সরযূ তো ইতিমধ্যেই মেয়েটাকে কোলে করে পাড়াবেড়াতে শুরু করেছে। আর জোর দিয়ে দিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, আমার খুকুসোনা এই তেঁতুলগোড়ায় বসেই ইংরিজি ইস্কুলে পড়বে। তেঁতুলগোড়ায় তখন রেলস্টেশন হবে। কু-ঝিক ঝিক দেখবে খুকু তার পাড়া থেকে।

তবে সরযূ, তোমার সেই পুণ্যিপুকুর? হরির চরণ? তোমার পুষ্যিমেয়ে করবে না সেসব? তাও করবে। করতে বাধা কী? সরযূ বলে, 'ভগবান তো মানুষকে দু-দিকে দুটো হাত দিয়েছে, একটা জিনিস ফেলে না দিলে আর অন্য একটা ধরতে পারবে না?

অবিশ্যি কথার ভট্‌চায সরযূর কথায় কে আর অত কান দেয়?

তবে গ্রামে মেয়েদের জন্যে একটা ইংরিজি স্কুল হবে, এই আশায় মেয়েগুলো আর মেয়েদের মা-গুলো কম্পিত পুলকিতচিত্তে দিন গুনছে। বুড়োরাও হয়তো খুব অরাজি নয়। দেখছে তো, গোমুখ্যু মেয়েগুলোকে নিয়ে বিয়ের বাজারে কী কষ্ট এ যুগে!

তবু কোনো নতুনকেই অপ্রতিবাদে পথ ছেড়ে দেওয়া বুড়োদের কুষ্ঠিতে লেখে না। কোনো যুগের কোনো দেশের কোনো বুড়োরই না। তারা বলতে থাকে, 'হবে আর কী! বোঝাই যাচ্ছে মেয়েগুলো ধিঙ্গি অবতার হয়ে উঠবে!' বলে, তেরো-শো সত্তরেও একথা বলে।

তবু নতুন আসে। কোথাও বন্যার বেগে, কোথাও নববধূর মৃদুতায়। যারা প্রবল প্রতিবাদ জানায় তারাই সহজে মেনে নেয়।

এই-ই চিরন্তন লীলা!

সভ্যতার জ্বালায় জর্জরিত পৃথিবী ছটফটিয়ে উঠে হঠাৎ একসময় ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের শীতলতায় শান্তি খোঁজে, আবার একসময় সেই ছায়ার অন্ধকার গ্রাস করে বসে অনেক শুভ, অনেক সুখ। সেই অন্ধকারই তখন আবার আলোর পিপাসায় ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে যায় সামনের পথে। কিন্তু এগিয়ে কি সত্যিই যায় পৃথিবী? পৃথিবীর চলার পথটা কি দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পথ? নাকি সে শুধু একটা বৃত্তরেখাকে ঘিরে ঘিরে দৌড়োয় আর ভাবে এগোচ্ছি?

হয়তো তাই। এগিয়ে যাবার জন্যে দীর্ঘ অজানা অন্তহীন পথ থাকলে পৃথিবী নতুন কিছু পেত হয়তো। কিন্তু কোথায় সেই নতুন? গড়া আর ভাঙা, সভ্যতা আর যন্ত্রণা, আর অন্তহীন অশান্ত পিপাসা, এই চেনা মহলের পথ দিয়ে দিয়েই পৃথিবীর অন্তহীন পাক খেয়ে চলা!

জিতু লাহিড়ী আবার এখন বিশ্রামের নিভৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন কাজের কঠিন মাটিতে, সুষুপ্তির অন্ধকার থেকে আলোর আহ্বানে। রোদে দাঁড়িয়ে জলে ভিজে মিস্ত্রি খাটাচ্ছেন, কন্ট্রাক্টারের লোককে ধমক দিচ্ছেন, ছুটোছুটি করছেন।

রাস্তা হচ্ছে তেঁতুলগোড়ায়। ডাহুকি থেকে টানা চলে আসবে তেঁতুলগোড়ার বুড়ো অশ্বত্থের গোড়া অবধি। সরকারি আশ্বাস আছে পরে ওই রাস্তা কালো চকচকে পিচে মোড়া হয়ে যাবে, যেখান দিয়ে বাস যাবে, মোটর যাবে অনায়াসে আরামে। আর যেখান দিয়ে আসবে ডাক্তার, আসবে ওষুধ, আসবে সুবিধে আর সভ্যতা!

কিন্তু আর কিছু কি আসবে না? কালো চকচকে মসৃণদেহী পাপ?

হয়তো আসবে। দরজা খুলে দিতে হবে বই কী সবাইকে। আসতে দিতে হবে। শুধু সতর্ক প্রহরা দেওয়া দরকার, পাপ কোথাও বাসা বাঁধছে কি না! ভুলের মধ্যে, অসাবধানতার মধ্যে, অন্ধ স্নেহের মধ্যে, অশুভবুদ্ধির মধ্যে!

খবরের বছর তেঁতুলগোড়ার আগামী খবরটা আরও নাকি জোরালো। নাকি বড়ো লাহিড়ী বাড়িটার ভোল বদলে যাচ্ছে, প্রসূতিসদন হয়ে যাবে বাড়িটা। ঠাকুরদালানটাকে আউটডোর বানিয়ে ডাক্তার বসবে। এই তেঁতুলগোড়ার কোনো মেয়েও যদি ভুল করে বসে, তার জন্যে খোলা থাকবে সদনের দরজা। সামনের বছরেই ওটা করে তোলবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বরুণা লাহিড়ী, ছুটোছুটি করছেন কলকাতা আর গ্রাম! পাগল হয়ে উঠেছেন কাজের নেশায়। শুধু সন্ধ্যাটি থাকে তাঁর নিজস্ব!

সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে যান বরুণা, একা চলে যান গ্রাম প্রান্তে সেই পরিচিত পথ ধরে বরুণা লাহিড়ী, অনেক সন্ধ্যা বিলীন হয়েছে যে-মাঠে আর মাঠের পথে।

ভোলা নিধু দুগ্গাদের পাড়া পার হয়ে এগিয়ে যান একেবারে গ্রামের সীমান্তরেখায়। যেখানে 'সোমা ডেভিড' ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট একটু কবরের কৌটোয়।

বড়ো লাহিড়ী বাড়ির বউ বরুণা লাহিড়ী সেই কবরের উপর রেখে আসেন এক মুঠো ফুল! হয়তো বকুল, হয়তো শিউলি, হয়তো বেল, মল্লিক, চাঁপা।

তেঁতুলগোড়ার লোক কিন্তু এর জন্যে 'পতিত' করেনি বরুণা লাহিড়ীকে। বরং ওকথা উঠলে গলা নামিয়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'আশ্চর্য! প্রতিদিন, পারে কী করে?' কিন্তু আশ্চর্যর কী আছে? সরযূ পারে না প্রতিদিন গ্রামসুদ্ধ বিগ্রহের দরজায় জল ঢালতে?

শুক্তি সাগর

শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস

শুক্তি সাগর

—আপনারা নিশ্চয় বলবেন গল্পটা আজগুবি! বলবেন, তিরিশ বছরের নায়িকা আর তেরো বছরের নায়ক? এতটা চমক আপনিও আর নাই দিলেন অমুক মিত্তিরের মতো। বলবেন, আপনাদের—অর্থাৎ এইসব আপনাদের গিয়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব সাহিত্যিকদের তো দেখছি, ভেতরের বস্তু ফুরিয়ে গেছে, তাই বিষয়বস্তুর চটক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যাতে বাজারটা থাকে।...কিন্তু মশাই, বাজার আপনাদের সহজে ফুরোবে না, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত কাগজওলারা আপনাদের নাম ভাঙিয়ে বিজ্ঞাপন জোটাতে পারবে, ততক্ষণ আপনাদেরও অন্ন জুটবে। তা সে যত ভুসিমালই চালিয়ে যান। অতএব এইসব বাজে চমক দিয়ে আমাদের গেরস্তর বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা আর নাই খেলেন।

বলবেন, বা বলতে পারেন আপনারা। কেননা, আমাদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ জমা আছে আপনাদের মনে। কেন আছে তার কারণও যে না জানি তা নয়। কারণ হচ্ছে, যে-আদর্শের ছবি আপনারা চান, বা যে-আশার গান, সে-ছবি, সে-গান আমরা দিতে পারছি না।

কিন্তু পারছি না যে, তারও একটা কারণ আছে বই কী। জীবন আর সমাজ, এই তো সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্যের তো কেবলমাত্র অতীত গৌরবের ইতিহাস, অথবা ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ছবি হবার সাধ্য নেই। ওকে যা হবার তা হতেই হবে। যা হয়, তা দেখাতেই হবে। কাজেই—

কিন্তু তবু এ গল্পের পক্ষে একটা খবর জানাবার আছে। গল্পটা এ যুগের নয়—এই উদ্ভ্রান্ত আর বিশৃঙ্খল সমাজের যুগের। এ হচ্ছে সেই যুগের, যে-যুগে গৃহস্থের বউরা মাথায় কাপড় দিত, আর চট করে পরপুরুষের সামনে বেরোত না।

এত বড়ো একটি গৌরচন্দ্রিকা করে তবে গল্প শুরু করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সংবরণ চৌধুরী। 'সংবরণ' নামটা ওঁর ছদ্মনাম। পদবিটাও। কিন্তু ওটাই এখন আসলে দাঁড়িয়েছে। মা-বাপের দেওয়া নাম-পদবিটা কেবল অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার হয়।

জনা কয়েক ভক্ত ঘিরে বসেছিল প্রবীণ সাহিত্যিক সংবরণ চৌধুরীকে। না, তরুণ সাহিত্যিককুল নয়। এ যুগে আর নবীনেরা প্রবীণের দরজায় প্রত্যাশার পাত্র নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় না। উভয়পক্ষেই প্রেরণার অভাব। বসেছিল তরুণ ভক্তপাঠক কিছু। সংবরণকে ধরেছিল ওরা। মুখে গল্প বলার জন্যে।

—লিখে লিখে তো অনেক শোনালেন, আপনার মুখ থেকে একটা গল্প শুনতে চাই।' বলেছিল ওরা সংবরণকে নিজেদের কোর্টে পেয়ে। তা কোর্টেই পাওয়া। মফস্সলে সভা করতে গেলে, কেবলমাত্র 'সভা'র কাজ শেষ করে তো আর কর্তব্য শেষ করা যায় না। অনুরোধ-উপরোধ, আবেদন, ভক্তি নিবেদনের চাপে আরও দু-একটা 'সভা'র ভার নিতে হয়, সে-দেশের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলি দেখে যেতে হয়, হয়তো-বা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে নেমন্তন্নও খেতে হয়। এসব মেটবার পর আবার ট্রেনের সময়ের প্রশ্ন থাকে। কাজেই অকারণেই হয়তো থেকে যেতে হয় এক-আধবেলা। সেই 'বেলা'-গুলোই ওদের কোর্টে পাওয়া।

এটা ওদের ক্লাবের লাইব্রেরি ঘর। সন্ধ্যা বেলায় নিয়ে এসেছে ওরা সংবরণকে। অন্য কোনো ফাংশন নয়, শুধু গল্প শুনবে।

ঘরের আলো খুব জোরালো নয়, একটু মফস্সলি মিটমিটে। ইলেকট্রিক সরবরাহ নাকি যথেষ্ট নয়, সে-অভিযোগ এসেই শুনতে হয়েছে সংবরণকে। তবু ভালোই লাগছিল সংবরণ চৌধুরীর।

এই একটু ম্লানছায়া ঘর, এই চারিদিকের পুরোনো বই পুরোনো বই গন্ধের সঙ্গে, একসঙ্গে একমুঠো জ্বেলে-দেওয়া ধূপের গন্ধ আর সংবরণকে দেওয়া ফুলের মালার গন্ধ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সংবরণকে।

তবু ওই স্পষ্ট আর কড়া গৌরচন্দ্রিকাটি করলেন সংবরণ। হয়তো এটা সকালের সভার প্রতিক্রিয়া। সেখানের যিনি সভাপতি ছিলেন, স্থানীয় একজন হোমরাচোমরা, তিনি তাঁর ভাষণে আধুনিক সাহিত্যের মুণ্ডপাত করে, প্রধান অতিথি সংবরণ চৌধুরীকে প্রায় সরাসরি আক্রমণ করে বসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিকরাও এখন নিজেদের মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকছেন,...আদর্শ ত্যাগ করে দেহবাদী সাহিত্য রচনা করছেন, জাতিকে নীতিভ্রষ্ট করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সভাপতির ভাষণের পর আর কোনো বাদ-প্রতিবাদ শিষ্টাচারসম্মত নয়, তাই চুপ করেই ছিলেন সংবরণ। অথবা চুপ থেকেছিলেন বাদ-প্রতিবাদ তাঁর স্বভাব নয় বলেই, শুধু সভাভঙ্গের পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভদ্রলোকটি কে?'

পরিচয়দাতা আনন্দোজ্জ্বলমুখে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আজ্ঞে স্যার, এখানের আই.জি.সি। ভারি সাহিত্যরসিক লোক—'

আই.জি.সি কী হওয়া সম্ভব সেটা নির্ধারণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সংবরণ বললেন, 'লেখেন-টেখেন?'

—আজ্ঞে লিখলে ভালোই লিখতে পারতেন। কিন্তু সময় কোথা? তবে সাহিত্যের ব্যাপারে উনি সর্বদা অগ্রণী। চাঁদাটাদায় তো—যাকে বলে মানে মুক্তহস্ত।

ওঁকে সাহিত্যসভার সভাপতি করার রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছিল সংবরণের কাছে। এবং বোধ করি সেই তিক্ততাটা সম্পূর্ণ পরিপাক করে উঠতে পারেননি। তাই এখন ওদের গল্প বলতে বসে সম্পূর্ণ অবান্তর এই গৌরচন্দ্রিকাটা করে ফেললেন। অথচ এটা আশ্চর্য!

সংবরণ চৌধুরী খুবই আত্মস্থ পুরুষ। কাগজে তাঁকে গালাগাল দিলেও বিচলিত হন না, স্বর্গে তুললেও বিগলিত হন না। কিন্তু কখন যে মানুষের মনের কোন ঘরের জানলা খুলে পড়ে, কোন ঘরের দরজায় টোকা পড়ে!

ওরা কিন্তু ওসব শুনতে চায় না। স্রেফ গল্প চায়।

সংবরণ তাকিয়ে দেখলেন, দু-একটি মেয়েও এসে বসল। কলেজের ছাত্রী অথবা কোনো 'সম্মিলিত তরুণ সংঘের সদস্যা। এই মফস্সল শহরেও এই সন্ধ্যাপার-হওয়া সময়ে ওরা অকুণ্ঠ ভঙ্গিতে এতগুলো ছেলের সঙ্গে এসে বসল। ভাবলেন সংবরণ।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন, ওই আই.জি.সি আর ভি.আই.পি-রা কি সমাজের চেহারা বদল দেখতে পায় না? অনায়াসে উদাত্তকণ্ঠে ভাষণ দেয়, 'আদর্শবাদ উঠে গেছে, দেহবাদই এখন সাহিত্যের আশ্রয়। মাতৃস্নেহের মধ্যে আর এ যুগের সাহিত্যিকরা বিষয়বস্তু খুঁজে পান না, বয়স-নির্বিচারে সব ভালোবাস-কেই তথাকথিত প্রেম বা প্রণয়ে পরিণত করেন।'

উচ্চপদের গৌরবে ওঁদের কণ্ঠও উচ্চ।

—স্যার, রাত হয়ে যাচ্ছে—

সংবরণ বললেন, 'ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম?'

—ইয়ে, বলছিলেন, তিরিশ বছরের নায়িকা আর তেরো বছরের নায়ক—

—ও হ্যাঁ! সেই কথাই বলছি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে কী যে হয় আর কী যে না-হয়! লিখলে তোমরা—তুমিই বলছি, ছেলেমানুষ তোমরা—লেখকদের ফাঁসির হুকুম দেবে, কিন্তু জগতে এসব ঘটে।

সব যুগে, সব কালে। এটাও ঘটেছিল, এ যুগে নয়। যখন বউরা মাথায় কাপড় দিত! বানানো গল্প নয়, আমার নিজের চোখে দেখা।

তাই ওদের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে ওই তেরো বছরের ছেলেটাকে নিত্যদিন ছোটাতেই হয় তিরিশ বছরের দরজায়। উপায় নেই আমার।

সে-দরজা খোলাই থাকে। তিরিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকে সে-দরজায়।

আপনমনে গুনগুন করে, 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি। চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজলপরা জোড়া আঁখি।'

গাইতে গাইতে গুনগুনানি ঝংকার হয়ে ওঠে, 'আমার চুল বাঁধা হয় না, আমার গা ধোয়া হয় না, আরও হয় না কত কী!...তবু কদমতলায় চেয়ে থাকি—'

কিন্তু যে-মুহূর্তে মোড়ের মাথায় একটি ডোরাকাটা শার্টের ডোরা ঝলসে ওঠে, ওর মুখের চেহারা বদলে যায়। মধুরা তখন প্রখরা হয়ে ওঠে। যদিও বুকে থাকে আঠারো বছরের আবেগ, আর মুখে-চোখে থাকে পনেরোর লাবণ্য, কিন্তু কণ্ঠ তীব্র ঝংকার দেয়, 'এতক্ষণে সময় হল বাবুর? আয় শিগগির। সারা দুপুর ধরে চিংড়ির কাটলেট বানালাম তোর জন্যে, জুড়িয়ে একেবারে গুবলেট হয়ে গেল!...দেরি কেন?'

তেরো বছর আরক্তমুখে বলে, 'ক্লাসের পর আটকে রেখেছিল—'

—তাই নাকি? কেন?

—পড়া তৈরি হয়নি বলে—

—এই সেরেছে! আমার নামে দোষ দেয়নি তো?

—কেন? তোমার নামে কেন?

—তাতে কী, দিলেই পারে। হয়তো বলবে রায় গিন্নি আদর খাইয়ে খাইয়ে মিত্তিরদের ছেলেটাকে স্রেফ বাঁদর করে তুলছে—

—রায় গিন্নি বলবে তোমায়! গিন্নি, যাঃ!' তেরো বছর হেসে ওঠে।

ও বলে, 'বলবে না? গিন্নি নই আমি?

—দূর!

—তা না-বলুক। পড়ালেখা খারাপ করিস না বাপু। তাহলে আর মুখ থাকবে না আমার। তুই খুব একটা দিগগজ হবি, এই আমার ইচ্ছে।

—ভাবি তো—

—আচ্ছা এরপর ভাবিস। এখন খাবি আয় দিকি। আয় আয়, শিগগির আয়।

মুখরা নায়িকা, মুখচোরা নায়ক, তাই নায়িকার কাজ অনেক বেশি। হাত ধরে টেনে এনে বাড়িতে ভরে ফেলতে হয়, কাকের বাসা চুলগুলোকে টেনে টেনে আঁচড়ে দিতে হয়, নয়তো-বা ঘাড়ে-গলায় পাউডারও দিয়ে দিতে হয় গরমে গলদঘর্ম ছেলেটাকে। স্কুল থেকে অনেকটা তো আসতে হয় রোদ্দুরে!

তেরো বছর বারে বারে লজ্জায় লাল হয়। হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারবে কেন? একটি পুষ্ট যুবতীর পুরো জোরের সঙ্গে...তা ছাড়া গায়ের জোরই তো সবটা নয়? মনের জোর কোথায়?

তিরিশ বছর হি-হি করে হেসে বলে, 'হাত ছাড়িয়ে পালাবি ভেবেছিস? কার কবলে পড়েছিস জানিস? এ পুলিশ না-মরা অবধি আর তোর ছাড়ান নেই। ছাড়ব কেন? এমন একটি পছন্দসই মনের মানুষ কি ভাগ্যে সহজে জোটে!'

এরা কিছুক্ষণ উশখুশ করছিল। একজন বলে উঠল, 'স্যার, ওদের নাম?'

—নাম!

—আজ্ঞে, ওই নায়ক-নায়িকার—

—ও হো-হো! নাম কিছু একটা বলা হয়নি বুঝি? তা, নাম চাই, কেমন? আচ্ছা ধরো, ছেলেটার নাম সাগর। সাগরময়। আর ওর নাম,...ওর নাম শুক্তি। কিন্তু ওকে আর নাম ধরে ডাকছে কে? বাড়ির বউকে, বা স্বামীরা স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকার চলন বিশেষ ছিল না তখন।

স্বামী 'এই', 'ইয়ে', 'শুনছ', 'তুমি' এইসব দিয়েই কাজ চালাত। ননদ বলত 'বউ'।

হ্যাঁ, ঘরে বিধবা ননদ আছে। মান্যে বয়সে দু-দিকেই বড়ো।

সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলত, 'তোমার নাহয় ন্যাকরা করার সাধ মিটছে, কিন্তু পরের ছেলের কাঁচা মাথাটা যে চিবিয়ে খাওয়া হচ্ছে বউ। ওইটুকু ছেলের সঙ্গে আবার ওসব কী ঠাট্টা?'

বউ চোখ কপালে তুলে, গালে হাত দিয়ে বলে, 'ঠাট্টা কী গো ঠাকুরঝি? এ যে একেবারে জলজ্যান্ত সত্যি কথা! পতি পরমগুরু তো দুটো মন্তর পড়লেই মেলে, মনের মানুষ কি সহজে মেলে? বড়ো দুর্লভ বস্তু।'

—গলায় দড়ি তোমার! বলে উঠে যায় ননদ।

শুক্তি হাসে মুক্তোর মতো দাঁত ঝিকমিকিয়ে। যে-হাসিতে সাগর মোহিতমুগ্ধ।

বরও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। বলে, 'বাঁজা মেয়েমানুষদের পরের ছেলে নিয়ে মাতামাতি দেখেছি বটে, কিন্তু সে কি ওই অত বড়ো একটা ধাড়ি ছেলে? কেন, পাড়ায় বাচ্ছা ছেলে নেই কারুর?'

শুক্তি রহস্যভরা চোখ তুলে বলে, 'একটা বোতলে দুধ-খাওয়া কাঁথায়-শোওয়া ছেলের জন্যে মরে যাচ্ছি আমি, একথা কে বলল তোমায়?'

—জানি না! তাহলে ওকে নিয়ে এত মত্ত হবারই-বা কী আছে? যতসব পাগলামি! বেশ বিরক্ত হয়েই বলে।

বাহুল্য কেউ ভালোবাসে না। আতিশয্য কেউ পছন্দ করে না।

কিন্তু শুক্তির যেন সব কিছুতেই আতিশয্য। বাতুলতায়, বাচালতায়, চোপায়, স্পষ্ট কথায়, আর তামাশায়।

তাই স্বামীর অভিযোগে কাজল না-পরা কাজল চোখো বিদ্যুৎ হেনে বলে, 'তা পরের ছেলেদের নিয়েই তো আমাদের মেয়েদের কারবার। শুধু মত্ত কেন, উন্মত্তও যে হয়ে উঠতে হয় মাঝে মাঝে। না-হওয়াই বরং অপরাধ—'

বর আরও বিরক্ত হয়ে বলে, 'থামো, যতসব ইয়ে। আমার মতে এ হচ্ছে একরকম মনোবিকার। নিজে তুমি তামাশা বলে চালাবে ভাবছ, কিন্তু ফ্রয়েড পড়লে—'

শুক্তি সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। চোখে আর বিদ্যুৎ হানে না।

সহজ গলায় বলে, 'সবাই তোমরা এক ভুল করো কেন জানি না। আমি তো কোনোদিনই "তামাশা" বলে ভাবি না।'

বলে। তবুও সবাই সেই কথাই বলে। যার সঙ্গে 'ছেলে' পাতাবার বয়েস, তার সঙ্গে কোনো কিছু সম্পর্ক না-পাতিয়ে রাখার মানেই হচ্ছে—

রঙ্গরসের সুবিধে। কিন্তু দেওর নয়, নাতি নয়—এত কীসের ঠাট্টা-তামাশা, রঙ্গরস?

যেন সম্পর্ক একটা খাড়া করতে পারলে সংসারের লোক বাঁচত। পরের ছেলেকে যদি কাছে টানতে ইচ্ছে হয় তো সম্পর্ক পাতা বাবা একটা। এত রং-তামাশার সাধ থাকে, 'নাতি' পাতা। নিদেনপক্ষে

দেওর। তবু যা হোক মনকে মানিয়ে নেওয়া যায়। তা নয় 'কিছু নয়।' এ কী? 'কিছু নয়' আবার একটা ডাক?

সম্পর্কের সূত্র আবিষ্কার করতে না-পারলে লোকে ধরবার খুঁটি পায় না।

ওই তো—

ওই ননদেরই তো এক বালবিধবা খুড়শাশুড়ি, বরাবর তাঁর এক ভাগ্নের ঘরের নাতিকে 'বর' বলে সম্বোধন করতেন। সেই সম্বোধনের সূত্রে যা বেহেড ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেন রসিকা মানুষটি যে, তাতে শুধু বর কেন বর্বরেরও কান লাল হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু কই, সেটা তো এমন দৃষ্টিকটু লাগত না? বরং ওই 'বর বর' করে খ্যাপানো নিয়ে সবাই মজা উপভোগ করত। এমনকী সেই 'বর' পাতানোর কৌতুকের দাবিতে ননদের খুড়শাশুড়ি বুড়ো বয়েস পর্যন্ত সেই নাতিটার ওপরই বিশেষ দখলত্তি করে এসেছেন। তাঁর যা কিছু কাজকর্মের দায়িত্ব যেন তারই। সামান্য যা পুঁজিপাটা, তাকে খাটিয়ে সুদে বাড়াতে, আর সুদের টাকা ব্যাঙ্কে পোস্টঅফিসে জমা দিতে, জগতের আর কাউকে বিশ্বাস করতেন না ভদ্রমহিলা।

ছেলেটাও যেন অলিখিত চুক্তিতে মেনে নিয়েছিল, ওঁর দায় আমার। কোথাও নিয়ে যেতে-আসতে, কিছু কিনে দিতে—

তা, সেই ঠাট্টাতামাশা, আর ওই দায়দায়িত্ব দেওয়া-নেওয়া কটু না-ঠেকে স্বাভাবিক মনে হত, নাতি-ঠাকুমা বলে একটা সম্পর্ক ছিল বলেই না?

সম্পর্কহীন ভালোবাসা সংসারী লোক বরদাস্ত করতে পারে না। তাই না ভালোবাসার রকমফের আশ্রয়ের জন্যে আমাদের সমাজে এমন বহু সম্পর্কের মালা গাঁথা, বহু রসের বিকিকিনির ছাড়পত্র।

যে-সমাজে পরপুরুষের সামনে বেরোনো দোষ, সেখানে এ ছাড়পত্র না থাকলে?

কিন্তু এ কে? এ কী?

এর সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায়? একদিকে পাড়ার একটা ভাড়াটে বাড়ির ছেলে, নেহাৎ মুখচোরা ছোটোখাটো গড়ন সাগর, আর অপর দিকে মিলিটারি ডাক্তার জগদীশ রায়ের বিদুষী পূর্ণযৌবনা পত্নী শুক্তি।

কীসে আর কীসে! হাতি আর ইঁদুর!

টেনে বুনেও সম্পর্ক আনা যায় না। জাতেও এক নয়।

তবু শুক্তি বেলা তিনটে থেকে রাস্তার দিকের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, চারটের সময় সাগর নামক ওই ছেলেটা স্কুল থেকে আসবে বলে।

আরও দু-চারটে ছেলে সঙ্গে থাকে।

তারা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হি-হি করে হাসে, 'ওই দ্যাখ, তোর "কিছু নয়" দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক দিন ঠিক থাকবে। যা, এখন গরম গরম চপ-কাটলেট, নরম নরম পিঠে-পায়েস খেগে যা। বেশ আছিস বাবা, আমাদের ভাগ্যে এরকম একটা "কিছু নয়" জোটে না! বাড়ি গিয়ে এখন রুটি আর আলুচচ্চড়ি খেতে হবে।'

স্কুলটা গেরস্তালি, ছেলেগুলো গেরস্তর, সাগরই শুধু অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার বার্তা জেনেছে।

কিন্তু মুখচোরা বেচারা ওদের ঠাট্টায় লজ্জা পায়। ঘাড় হেঁট করে ওদের ছায়ায় ছায়ায় তাড়াতাড়ি এই দরজার সামনেটা পার হয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় না।

হবার জো কী?

একজোড়া সন্ধানী চোখ ঠিক বুঝতে পারে গতিবিধিটা মতলবি। খপ করে এগিয়ে আসে, একটা হাত ধরে ফেলে বলে, 'পালাচ্ছিস যে বড়ো?'

ছেলেগুলো হেসে ওঠে।

শুক্তিও হেসে হেসে বলে, 'দ্যাখ তো দ্যাখ তো, ক-টা মাথা আছে ওর একটা ঘাড়ে? দু-চারটে বেশি না-থাকলে এত সাহস হয়?'

ওরা ঠেলাঠেলি করতে করতে চলে যায় সাগরকেও একটু ঠেলে দিয়ে। সাগর লাল লাল মুখে ঢুকেই পড়ে। বলে, 'ওদের সামনে অমন হাত ধরো কেন? ওরা হাসে।' আগে 'আপনি' বলত, শুক্তি চড় মেরে 'আপনি' ছাড়িয়েছে। তাই 'তুমি' দিয়েই বলে সাগর।

কিন্তু ওর অভিযোগে লজ্জার লেশ নেই শুক্তির। বলে, 'ওমা! শোনো কথা! লোকের সামনে হাত ধরব না? আড়ালে আবডালে ধরব তাই চাস না কি?'

'ধ্যাৎ' বলে বইগুলো রাখে ও।

কোনো কোনো দিন আবার 'মাথা'র কথাটা অন্যভাবেও বলে শুক্তি। ছেলেগুলোকে হাতের ইশারায় থামিয়ে বলে, 'দাঁড়া-দাঁড়া দেখি সবসুদ্ধ ক-টা মাথা। পাঁচ ছয় সাত! হয়ে যাবে। কুলিয়ে যাবে। 'পার হেড দু-খানা করে। ইয়া ইয়া মাংসর চুপ বানিয়েছি। আয় আয়, ঢুকে পড়।'

কিন্তু ওরা কেউ ঢুকে পড়ে না।

হি-হি করে হাসতে হাসতে পালায়। ঢুকে পড়তে হয় তাকেই, যার হাতটা আটকানো আছে একখানি কুসুমকোমল বজ্রমুষ্টির মধ্যে।

শুক্তি বলে 'তোর বন্ধুগুলো অমন অসভ্য কেন রে? ডাকলাম এল না।'

সাগর বলে, 'বন্ধু আবার কী! শুধু তো এক ক্লাসে পড়ে।'

—বাঁচলাম বাবা, বন্ধু নয়। আমি ভয়ে মরি, আমার বুঝি ভাগ কমে যায়। কিন্তু যা-ই বলিস, ছোঁড়াগুলো বোকারাম! বাড়ি গিয়ে গরম গরম চপগুলোর কথা ভেবে নির্ঘাৎ নিশ্বাস পড়বে।

হ্যাঁ, এইরকমই কথা।

তেরো বছরের নায়কের সঙ্গে আর কোন কথাই-বা হবে! তবে মুখচোরাটারও মুখ খোলে এক-এক দিন। বিষয়বস্তু হয়তো কোনো স্যারের কথা, হয়তো স্কুলের মাঠের খেলার কথা, হয়তো বাড়িতে ওর জ্যাঠামশাইয়ের প্রবল দাপটের কথা। কিন্তু উজ্জ্বল বাকবিস্তার আর উজ্জ্বল মুখের গুণে সে যেন মস্ত কথা হয়ে দাঁড়ায়।

শুক্তিও হাসি হাসি মুখে শোনে, মাঝে মাঝে টীকাটীপ্পনী দেয় চোখ বড়ো বড়ো করে, সারা বিকেলটা কোথা দিয়ে কেটে যায়।

বিধবা ননদ বার কতক ঘোরাঘুরি করে যায় ঘরের সামনে দিয়ে, তারপর একসময় ডেকে বলে 'কী গো বউ, এদিকটা একটু দেখবে? আমার তো 'পাঠে' যাবার সময় হয়ে এল।' শুক্তি অবিচলিত থেকে বলে 'পাঠে যেতে তো তোমার এখনও দু-ঘণ্টা দেরি ঠাকুরঝি।'

কথাটা সত্যি, তাই ঠাকুরঝি ঠিকরে চলে যায় আর বেশ জোর গলায় স্বগতোক্তি করে যায়, 'গাল টিপলে দুধ বেরোয় একটা ছোঁড়ার সঙ্গে বুড়ো মাগির কী যে এত গল্প বুঝি না।'

শুক্তিও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করে, 'ঠাকুর আছে, চাকর আছে, একটা গিন্নীবান্নি মানুষ আছে, তবু যে দুটো মানুষের সংসারে এত কী কাজ বয়ে যায় তাও বুঝি না'

সাগর কিন্তু তারপর এক মিনিটও স্বস্তিতে নেই। উঠে পড়তে চায়।

শুক্তি হাত চেপে ধরে। প্রায় ধমকে বলে, 'না এখুনি উঠবি না। তাহলে হার হবে আমার।'

তবু উঠতে হয় একসময়। পড়ন্ত বেলায়। সন্ধে হব হব মুখে।

আস্তে আস্তে চোরের মতো পা টিপে টিপে বাড়ি ঢোকে।

বলা বাহুল্য, বাড়ির লোকের এটা পছন্দ হবার কথা নয়, হয়ও না। কিন্তু সরাসরি বারণ করাও চলে না। কারণ, শুক্তি পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী। সে যে এই নিতান্ত অধম একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটাকে এত 'পেয়ার' করে সেটা তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়! তা ছাড়া শুক্তির বয়েস? সাগরের বয়েস?

বিরক্তি প্রকাশের সোজা পথটা কোথায়? অথচ মনের মধ্যে যে-মন, সেখানে রীতিমতো বিরক্তি আসে, একটু যেন অপমানবোধ।

রোজ রোজ খেয়ে আসবে কেন বড়োমানুষদের বাড়ি? রাগ করেন ঠাকুমা।

মা অপ্রতিভভাবে বলেন, 'কী করব! ভালোবাসে, ছেলেপুলে নেই, ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। প্রাণ হু-হু করে—'

জেঠিমা বলেন, 'তা এত যদি তো মাঝে মাঝে বস্তির ছেলেদের ডেকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করুক-না। তাতে বরং পরকালের কাজ হবে, পরের ছেলের মাথাটা খাওয়া হবে না।'

—মাথা খাওয়া আবার কী? মা অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

জেঠিমা ঠোঁট উলটে বলেন, 'নয়ই-বা কী? বুড়ো একটা মাগির সঙ্গে ফস্টিনস্টি, রঙ্গরস, ডাক্তারের বউটা তো বেহায়ার রাজা।'

—এত কথা তোমায় কে বললে দিদি? মা বলেন।

জেঠি বলেন, 'বলতে ওর নিজের ননদই বলেছে। পাঠবাড়িতে দেখা তো হয় রোজ। তা, এতই যদি ভালোবাসা তো পুষ্যি নে-না বাবা। ওই কোঠা-বালাখানা বিষয়সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হোক তোমার ছেলে, তা নয়। শুনে ঘেন্নায় মরি, মা নয়, দিদি নয়, কী না 'বন্ধু'! এখন তুমি বুঝছ না ছোটোবউ, ছেলের গোঁফ গজাক, তখন বুঝবে।'

ছেলে সম্পর্কে এ হেন ইশারাময় ভবিষ্যদ্‌বাণী মায়ের কাছে প্রীতিকর নয়, ছোটোবউও প্রীত হন না। অথচ ঝগড়া করবারও মুখ নেই। 'পরাজয়' তাঁর নিজের ঘরে। অতএব আড়ালে তাকেই গঞ্জনা দেন।

অন্য কথা বলা যায় না, লেখাপড়ার ক্ষতির কথাই তোলেন, বড়োমানুষের বাড়ি রাজভোগ খেয়ে অভ্যাস খারাপের কথা তোলেন। ওসব আদর যে পোষা পাখি অথবা পোষা কুকুর-বেড়ালের সমগোত্র, একথা বুঝিয়ে ছেলের চৈতন্য-সম্পাদন করতে চেষ্টিত হন।

সাগর মুখ নীচু করে বসে থাকে। চোখ দিয়ে জল পড়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর যাবে না।

কিন্তু আর কোথা দিয়ে যাবে তবে? আর যে রাস্তা নেই।

কিন্তু রাস্তা থাকলেই কি সব সমস্যার সমাধান হত?

স্কুলের ছুটির দিনে তবে ওবাড়িতে মহোৎসব কেন?

সকাল থেকে গোঁফ না-গজানো একটা ছেলের প্রাণেই-বা অমন করে অভিসারের সুর বাজে কেন?

মিলিটারি ডাক্তার অতিষ্ঠ বোধ করেন।

না-করবেন কেন?

ওই ডোরাকাটা শার্ট-পরা লাল লাল মুখ একটা বাচ্ছা ছেলের আবির্ভাবে তাঁর স্ত্রীর মুখে যে-অলৌকিক আলো ফুটে ওঠে, সে তো তাঁর চোখ এড়ায় না।

যা অসম্ভব, যা অবিশ্বাস্য, সে-সন্দেহ ব্যক্ত করলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছু হবেন না, সেই কটু সন্দেহটাই তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ছেলেটাকে দেখলেই ইচ্ছে হয় চাবুক মেরে বের করে দেন।

না, ওই তেরো বছরের ছেলেটা তখন অত সব বুঝত না। কিন্তু চিরদিন তো সে তেরো বছরের রইল না। অতীতের সেই দিনগুলো আর দুর্বোধ্য ঘটনাগুলো, সমস্ত দুর্বোধ্যতা হারিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চোখে।

কিন্তু তখন বুঝতে পারত না।

মিলিটারি ডাক্তারের রক্তচক্ষু আর রূঢ় কণ্ঠস্বরকে সে 'মিলিটারি' বলেই গণ্য করত। তার সামনে পড়ে গেলে সহজে আর ঘাড় তুলতে পারত না।

শুক্তি বলত, 'তুমি তো বাপু ডাক্তার মানুষ, এই ছেলেটার রোগ সারিয়ে দিতে পারো? এই ঘাড় গোঁজা রোগ? এ রোগের ওষুধ আছে তোমাদের শাস্ত্রে?'

ডাক্তার স্ত্রীর দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলতেন, 'আছে।'

—তবে করো-না চিকিৎসা! হেসে গড়াত শুক্তি।

ডাক্তার এই নিরতিশয় স্পর্ধার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'উচিত ওষুধ প্রয়োগের একটা স্টেজ থাকে, সে-স্টেজ এলে করব চিকিৎসা।'

শুক্তি বলত, 'কথাবার্তাগুলো যেন রহস্যজনক ঠেকছে রে "কিছু নয়"! ঘাড় গোঁজা রোগের ওষুধটা ঘাড়ে ধাক্কা নয় তো?'

মিলিটারি ডাক্তার মিলিটারি রেগে উঠে চলে যেতেন ঘর থেকে।

সাগর ভয়ে ভয়ে বলত, 'উনি অত রাগী, তবু ওঁকে অত রাগাও কেন?'

শুক্তি মুখ টিপে হাসত। বলত, 'কেন? রাগীকে রাগানোতেই তো মজা। বাঘকে খেপিয়েই তো সুখ।'

সাগর এই 'মজা'র, এই সুখের মর্মগ্রহণ করতে পারত না। ভয়ে বুক টিপ টিপ করত তার। তবে সুখের বিষয়; এই লোকটা কলকাতায় থাকত না বেশি দিন। মানে, থাকতে পেত না। প্রায়ই চলে যেতে হত তাকে বাইরে। এক মাস, দেড় মাস, তিন-চার মাস।

সেই সময়গুলিই সাগরের কিছুটা নিশ্চিন্ততার সময়। ওই ননদের ঘোরাফেরা ছাড়া বাড়িতে আর অস্বস্তির কিছু নেই।

অবিশ্যি মনের অস্বস্তি। সে তো সঙ্গের সাথি।

অথচ সেই অস্বস্তিই দুর্বার বেগে এক প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে। তা ছাড়া অভিমানের ভয়ও আছে। দুরন্ত অভিমান শুক্তির।

একদিন না-গেলে পরদিন ঢুকতে বুক কাঁপে। নিশ্চয় জানে প্রথমটা কথা কইবে না শুক্তি, তারপর গম্ভীর মুখে খাবারটা এনে বসিয়ে দিয়ে একটি-আধটি কথা। তারপর সাগর খাবারে হাত না-দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে, হঠাৎ তেড়ে উঠে একেবারে যাচ্ছেতাই বকুনি।

তারপর আবার সাগরের অভিমান ভাঙানো।

ঠিক সমান বয়সের নায়িকার মতোই এই রাগ আর অনুরাগ। অবিশ্বাস্য হলেও অসত্য নয়। কিন্তু ওদিকে রাগ চড়ছে গার্জেনদের।

বকুনি লাঞ্ছনা গালমন্দ ধিক্কার কিছুতেই তো ওই উৎকট নেশা ছাড়ানো যাচ্ছে না ছেলের। সেই স্কুল থেকে ফিরতে দেরি, সেই ছুটির দিনে টুপ করে বেরিয়ে যাওয়া, সেই গেরস্তর একটা কাজ করতে বেরোলে ওবাড়ির জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়া।

ছেলেটা এত পেটুক! এত লোভী!

জ্যাঠামশাই চটি চটপটিয়ে ফুঁসে বেড়ান। রাগে তাঁর গায়ের রোমগুলো যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

বলেন, 'গেরস্তঘরের ছেলে, গেরস্তালি খাওয়া মুখে রোচে না! ভালো ভালো খাবার জন্যে

বড়োলোকের বাড়ি মোসাহেবি করতে যায়। ছি ছি! লোকে বলবে, বাপ নেই জ্যাঠা ভালো করে খেতে দেয় না। কী বলব, ছোটোবউমা মনে কষ্ট পাবে তাই, নইলে হ্যাংলা পাজি ছেলেটাকে চাবকে হাড় একদিকে মাস একদিকে করে ছাড়তাম।'

সাগর বাড়ি না থাকলেও, এইসব টের পেত! খবর সাপ্লায়ার ছিল তার ছোটো বোন ঝুমি। সে বলত, 'তা, জেঠিমা জ্যাঠাবাবুকে বলল, তুমি যেমন সরল তাই ভাবছ ভালো ভালো খাবার জন্যে। তা নয় গো নয়। ও ছেলে আরও অনেক পেকেছে, ডেঁপোর শিরোমণি হয়েছে। ওইরকম ভিজে বেড়ালের মতো থাকে তাই। লেখাপড়া তো চুলোর দোরে যাচ্ছে।'

সাগরের ইচ্ছে করত ঝুমিকে জিজ্ঞেস করে—উত্তরে জ্যাঠাবাবু কী বললেন, কিন্তু পারত না। লজ্জায় বাধত, আত্মসম্মানে বাধত। তাই রাগ দেখিয়ে বলত, 'যা যা পালা। বাড়িতে যে যা বলছে, সব মুখস্ত করে রেখেছে বাঁদরি! পড়ার সময় কেবল বকবক!'

বলাবাহুল্য পিঠোপিঠি বোন ঝুমিও ছেড়ে কথা কইত না। সেও রেগে লাল হয়ে উঠে বলত, 'বেশ বেশ বলব না। বয়ে গেছে আমার বলতে। বাড়িসুদ্ধু লোক তোকে নিন্দে করে, তাই বলতে আসি। বলুক সবাই যার যা ইচ্ছে। মা কেঁদে কেঁদে মরুক। তুমি বাবুসাহেব বড়েলোকের বাড়ি গিয়ে আদর খাও।'

সাগরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত।

হয়তো ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিত ঝুমির গালে, হয়তো হাতের বইয়ের শক্ত মলাটের কোণটা ঠুকে দিত, নয়তো-বা চুলের গোছাটা ধরে মোক্ষম একটা টান দিয়ে বলত, 'চুপ কর বলছি পাজি মেয়ে! এতটুকু মেয়ে পাকার ধাড়ি হয়েছে।'

ঝুমিও সতেজে উত্তর দিত, 'হব না কেন? তোমারই বোন তো! নিজেও তুমি কম পাকা নও বুঝলে? জানতে তো আর বাকি নেই কারুর।'

সাগরের আর মেজাজের ঠিক থাকত না, ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে ঘর থেকে বার করে দিত ঝুমিকে। সংসারে এই একটা মাত্রই তো জায়গা যেখানে সাগরের পদমর্যাদা বেশি। যেখানে রাগ ফলানো চলে।

জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে-মেয়েদের ওপর শাসনকর্তার ভূমিকা নেওয়া যায় না, জেঠিমা তাহলে আস্ত রাখবেন না। কাজে কাজেই নিজের বোন ঝুমি। মেরে আবার চোখে জল আসত, আহা বেচারা তার ভালোর জন্যেই বলতে এসেছিল, কিন্তু এমন বিশ্রী করে বলে।

আশ্চর্য! বাড়ির প্রত্যেকটি লোক যেন সাগরের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। মা অবশ্য ঠিক ওরকম নয়। কিন্তু মা-র যা ভঙ্গি সেটা আরও কষ্টকর, মা চোখের জল ফেলেন।

জ্যাঠা-জেঠি যাতে অসন্তুষ্ট হন, তা কেন করিস তুই? কী দরকার বড়োলোকের সঙ্গে মেশামিশিতে? ও তোকে গরিব বলে দয়া করে, কিন্তু খোকা, গরিব হলেই যে লোভী হতে হবে তার মানে নেই। তুই-ই আমার ভরসা, তুই যদি....

এইসব কথা মা-র।

কী অসহ্য সেই কথাগুলো!

ইচ্ছে করত চেঁচিয়ে বলে ওঠে, কী আমি করেছি বলতে পারো? এত বলার মতো কী করেছি? আমি কি তাদের বাড়ি গিয়ে চেয়ে চেয়ে খেয়ে আসি, না কি তাদের জুতো ঝাড়ি? দয়া করেন উনি আমায়? এই তোমাদের ধারণা? হায়! যদি দেখাতে পারতাম!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনটা কখন যেন হালকা হয়ে যেত, বরং হাসিই আসত। দয়া? কে কাকে দয়া করে! গিয়ে যদি দ্যাখো তো বুঝতে পারো! সাগরই দয়া করে খেয়ে আর যত্ন নিয়ে কৃতার্থ করে অত বড়ো মানুষটাকে।

বাড়িতে নিজের অকিঞ্চিৎকর পোস্টটা যেন এক-এক সময় গভীর বেদনাময় একটা বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিত সাগরকে। অবাক হয়ে ভাবত ও, এই তো আমি! যতক্ষণ বাড়িতে থাকি, হয় কাজ করি নয় বকুনি খাই। তা ছাড়া কিছু না। দু-পয়সার পাঁচফোড়ন দরকার হলেও তো সেই 'সাগর যা দোকানে।' সারা সকাল দোকানে যা আর দোকানে যা! পড়বার সময়ই হয় না।

ভাগ্যিস ওই দোকান বাজারের রাস্তাটা 'কিছু নয়'-এর বাড়ির সামনে দিয়ে নয়। হলে কী লজ্জাই করত। সাগর ভাবতে চেষ্টা করত, 'কিছু নয়' জানলা দিয়ে দেখছে সকাল থেকে সাত বার সাগর হাঁটাহাঁটি করছে চার পয়সার পান হাতে, দু-আনার দইয়ের ভাঁড় হাতে, কেরোসিনের বোতল হাতে, একপো গুড়ের বাটি হাতে!

ছি ছি!

ভাবাই যায় না।

কী অদ্ভুত! কী করে এমন হয়! এক জায়গায় যার অগাধ মূল্য, অন্য এক জায়গায় সে এত মূল্যহীন!

সাগরের ব্যাপারটা যে সকলের মতো নয়, সে তো বুঝতেই পারছে সাগর, কিন্তু কেন? কী গুণে সাগরকে 'কিছু নয়' অত ভালোবাসে?

জানে না, নিজের কী গুণ আছে সাগর জানে না, বুঝতে পারে না। আর এও বুঝতে পারে না বাড়ির সকলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কী করে করা সম্ভব? কী করে সম্ভব 'কিছু নয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা।

অথচ এঁরা তাই চান। কারণ? কারণ নির্ণয় করেছে সাগর। কারণ সবাই যেমন-তেমন করে আছে, আর বাড়ির একটা মূল্যহীন সদস্য অন্য এক ঠাঁই গিয়ে রাজকীয় আদর পাচ্ছে, এ অসহ্য।

অতএব রাতদিন 'ওবাড়ি' নিয়ে খোঁটা!

কিন্তু কী করে ওবাড়ি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে সাগর? সাগর একটা মানুষ তো? না কি জানোয়ার?

জানোয়ারেই কি পারে এমন অপরিসীম স্নেহকে তুচ্ছ করতে? নিজেদের বাড়ির লোকগুলোকে ভারি নীচ আর নোংরা মনে হত সাগরের।

কিন্তু শুধুই কি নিজেদের বাড়ির?

ওবাড়ির সব্বাই কি 'কিছু নয়'-এর মতো হৃদয়ভরা মমতা নিয়ে আর প্রাণভরা আকুলতার জোর নিয়ে পথে চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে?

নাঃ।

ওবাড়ির অন্য সব চোখের আর এক দৃষ্টি, আর এক ভাষা। সে-ভাষা পরুষ কঠিন, নিষ্ঠুর ব্যঙ্গময়, ক্রূর কুটিল, সে-দৃষ্টি তীব্র, জ্বলন্ত, কড়া।

'কিছু নয়'-এর সেই ননদ না কে, তার চোখে রূঢ়তার চরম অভিব্যক্তি। যেন সুযোগ পেলেই বলে উঠবে, তুই কে রে হতভাগা ছোঁড়া? যা বেরো, খবরদার আর আসবিনে।

ওদের বাড়ির চাকর ঠাকুরগুলোর দৃষ্টি কী প্রখর! সাগরের এই সম্পর্কের দাবিহীন দাবি দেখে সাগরের জন্য খাটতে হচ্ছে দেখে তারা রেগে আগুন হয়। আর ওবাড়ির কর্তা? তাঁর চোখ দিয়ে শুধু অগ্নিকণা ঝরে। সেই অগ্নি-ঝরা চোখ নিয়ে কিন্তু হাসেন তিনি। তীব্র কুৎসিত একটা হাসি। হাসি মেশানো কথা, 'এই যে সুবল সখা এসে গেছেন! চন্দ্র-সূর্যের নিয়ম! ইউনিভার্সাল ট্রুথ! না কি কষ্ট করে আর আসতে হয়নি, স্কুল পালিয়ে সারাদিন এখানেই তোয়াজে কাটছিল'!

তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠতে ইচ্ছে হত সাগরের। কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস ওর সামনে কিছুতেই মুখ দিয়ে কথা বেরোত না। শুধু অপমানে চোখে জল আসত।

মিলিটারি আবার বলে উঠত, 'ও, তাহলে তাই! শাস্ত্রেই আছে মৌনং সম্মতি লক্ষণম। তা যাক, ডান হাতের কাজটি মিটেছে তো? বাড়ির কর্ত্রীর আশ মিটিয়ে?'

তবু—তবু কথা বলতে পারত না সাগর। বলতে পারত না আমি কি তোমাদের বাড়িতে শুধু খেতেই আসি? আবার মাথা ঠান্ডা হলে ভাবত, তা আসি না সত্যি, কিন্তু কেনই-বা আসি? এই লজ্জা, এই অপমান সব সয়ে?

উত্তর পেত না।

কেবলমাত্র 'কিছু নয়'-এর আকুলতা, শুধু তো এই? কিন্তু এখানে না-আসার জন্যে মা-ও তো কম আকুলতা করে না। তবে? মা বেশি আপনার, না 'কিছু নয়' বেশি আপনার? নিজের মনকে বিস্তার করে করে দেখবার অভ্যাস সেই বয়েস থেকেই হয়েছিল সাগরের।

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পাবার ক্ষমতা হয়নি।

তাই 'মিলিটারি' ডাক্তারের ওই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর কটু মন্তব্যের আঘাতে ঘাড়গুঁজে চলে যাবার সময় যতই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুক আর আসব না, পরদিন ঠিকই এসে হাজির হত। হয়তো অঙ্ক কষে লোকটার অনুপস্থিতির সময়টা হিসেব করে। চুপি চুপি পা টিপে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ও সেই একই সমস্যা। ঠিক বেরোনোর মুহূর্তে কেউ যেন না দেখতে পায়। স্কুল থেকে ফেরার পথে আসা নিয়ে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তাই সময় বদলানো।

শুক্তির কাছে এই দু-বাড়ির বিমুখ চিত্তের বাধার কথা প্রকাশ না করলেও বুঝতে শুক্তি ঠিকই পারত। আর হেসে হেসে বলত, 'তোর হয়েছে শাঁখের করাত, কি বল? না এলে আমি আস্ত রাখি না, এলে ওরা খোঁচা মারে। তাই না?'

সাগর প্রতিবাদের চেষ্টা করত, খোঁচা আবার কী? কেউ তো কিছু বলে না।

শুক্তি ফের হাসত, আহা কিছু যে বলে না, সেটাই তো খোঁচা মারা। বললে তো বলাই হল, হয়ে গেল। এবাড়ির ডাক্তারবাবু তো ইঞ্জেকশনের ছুঁচ নিয়ে ঘোরে, সুবিধা পেলেই টুক করে বিঁধিয়ে—

সাগর অবাক হয়ে বলত, 'ইঞ্জেকশন, ছুঁচ, কী বলছ পাগলের মতো।'

শুক্তি হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলত, 'পাগলের মতো, তাই না? সত্যি আমি কি তাহলে পাগলই হয়ে যাচ্ছি?'

—আঃ, কী যা-তা সব বলো, ভয় করে।

—ভয় করে? আমি পাগল হয়ে গেলে তোর ভয় করে?

—বাঃ! তা করবে না?

—করবে! তাই করাই উচিত, কি বলিস? শুক্তি হঠাৎ কেমন হতাশ হতাশ গলায় বলত, 'কিন্তু ডাক্তারবাবুর ভয় করে না।'

—ডাক্তারবাবুকে তোমার ভয় করে না?

বোকা সাগর এই এক চরম বোকামির প্রশ্ন করে বসেছিল একদিন। বড়ো হয়ে-যাওয়া সাগর যার জন্যে সেই বাচ্চা অবোধ সরল ছেলেটাকে মনে মনে করুণা করেছে।

কিন্তু তখন বড়ো হয়ে যায়নি।

তখন প্রশ্ন করে ফেলেছিল।

কিন্তু শুক্তি হেসে ওঠেনি, রাগও করেনি। শুধু বলেছিল, 'ভয় করলে চলবে কেন বল? ভয় করলে তো আরোই পেয়ে বসবে।'

সাগর ভাবত, এবাড়িতে ওই ডাক্তারটা আর তার বোনটা যদি না থাকত!

তা সাগরের ঠাকুর নৈবেদ্য খেলেন একদিন। বাড়ি ফিরল খুব একটা উৎফুল্ল মন নিয়ে। অপ্রত্যাশিত এক শুভ খবর, 'মিলিটারি' নাকি তিন বছরের জন্যে মেসোপটেমিয়ায় যাচ্ছে। পল্টনের খবরদারির ভার নিয়ে। অতএব—

নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল সাগর।

যদিও খবরটা দেবার সময় শুক্তিকে যেন একটু মনমরা মনমরা দেখাচ্ছিল। এক-আধ মাসের জন্য যখন যায়, তখনকার মতো উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল না। তবু সাগরের প্রাণে স্রেফ মহাসমুদ্রের হাওয়া।

বাবাঃ, তিন-তিনটে বছর ওই লাল চোখ আর রূঢ় ভারী গলার থেকে তফাতে থাকতে পাবে। সেই আনন্দের আভাস চোখে-মুখে নিয়ে বাড়ি ঢুকল সাগর। আর পড়ল কিনা একেবারে জ্যাঠার সামনে!

কোনো কথা না-বলেই তিনি আগেই গোটা দু-তিন গাঁট্টা মারলেন মাথায়। তারপর ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'কী, বাড়ির কথা মনে পড়ল? দেখছি, তোর জেঠি যা বলে মিথ্যে নয়। বখেই যাচ্ছ তুমি হতভাগা ছেলে। স্কুল থেকে কী চিঠি এসেছে? বল বল, রাস্কেল পাজি!'

স্কুল থেকে চিঠি! কী চিঠি! কখন এল, কে আনল!

জানে না তো সাগর। জানে না, কিন্তু অবাক হল না। উত্তর পেয়ে গেল।

জ্যাঠামশাইয়ের ছোটো ছেলে অজয় ওই স্কুলে পড়ে। অতএব চিঠিটা তার দ্বারা বাহিত হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই।

বুকের রক্ত হিম করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল সাগর, মাথায় হাতটা বুলোবার সাহস হল না। সাগরের মা রান্নাঘর থেকে তীব্র ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'বটঠাকুরকে বলো দিদি, হতভাগা ছেলেকে আজ এমন মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে দিন, যাতে ভবিষ্যতে আর না কোনোদিন—'

তা, গাঁট্টার ওপর আর গেলেন না জ্যাঠামশাই, শুধু চড়াগলায় বলে গেলেন, 'মাস্টার লিখেছে হাফ-ইয়ারলিতে ফেল করেছ, পড়ায় একদম মনোযোগ নেই, কোনোদিন টাস্ক করে নিয়ে যাও না, এখন চেষ্টা না করলে ক্লাস প্রমোশনের আশা নেই। শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? তোমার বাবা, বুঝলে তোমার বাবা, যে সাতসকালে মরে গিয়ে আমার বুকে বাঁশ ডলে দিয়ে গেছে, সে প্রত্যেক বছর ক্লাসে ফার্স্ট হত। এনট্রান্সে সেকেন্ড হয়েছিল যে। আর তুমি তার গুণধর পুত্র, এই বয়সে একটা বদ মেয়েলোকের কবলে পড়ে—' হঠাৎ কথা থামিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন জ্যাঠামশাই।

আর সাগরের চারদিকে সমস্ত পৃথিবীটা লাট্টুর মতো ঘুরতে লাগল বনবন করে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন সংবরণ চৌধুরী। বললেন, 'গল্পটা একটু মন্থরগতিতে ধরা হয়ে গেছে। রাত হয়ে যাচ্ছে। থাক এই পর্যন্ত।'

ওরা চমকে উঠে 'সে কী, 'সে কী করে উঠল! শেষটা কই? গল্পের শেষ?'

সংবরণ একটু হেসে বললেন, 'গল্পের শেষ? সে তো দেখছি অনেক দূর।

এ গল্প ফাঁদা ঠিক হয়নি। যাক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই—মানুষের মন এত বিচিত্র যে, সাহিত্যে এ হয় না, ও অসম্ভব বলে কোনো কথা নেই। শুনতে অসম্ভব অথচ দেখতে স্বাভাবিক এরকম ঘটনা নিয়তই ঘটছে। আর মনের সেই বিচিত্র গতি নিয়েই তো সাহিত্যিকের কারবার।'

—তবু স্যার, শেষ না করলে....

হঠাৎ পিছনের সেই মেয়ে দুটোর একটা মেয়ে চটুল গলায় বলে উঠল, 'আধকপালে ধরবে।'

সংবরণ একটু হেসে বললেন, 'পোড়া কপালে আধকপালে ধরলেই-বা কী?'

—না না, ছাড়ব না।

সংবরণ এবার তাকিয়ে দেখলেন পরিবেশটার দিকে। ধূপগুলো অনেকক্ষণ পুড়ে গেছে, ধূপদানির নীচে তার ভস্মকণিকাগুলো ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। রাত্রি হয়ে যাওয়ার জন্যে আলোটা আরও মিটমিটিয়ে এসেছে, আর শ্রোতাদের মুখে রসাভাসের আভাস মাত্র নেই।

না, এ গল্পের মধ্যে ওরা প্রবিষ্ট হতে পারেনি। অন্তত এখনও পর্যন্ত পারেনি, তাই শেষটার জন্যে উদগ্রীব হচ্ছে।

হঠাৎ এ গল্প শুরু করলেন কেন সংবরণ চৌধুরী? নিজেও জানেন না, নেহাৎ দৈবাৎই। অথবা হয়তো এ গল্প কোনোদিন কাউকে বলবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। লিখে নয়, মুখে। আজকে—এই নিজের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে একটা ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে, কতকগুলো আগ্রহী শ্রোতা দেখে সেই ইচ্ছেটা রূপ নিতে চাইল। কিন্তু কোথায় শেষ করবেন এ গল্পকে? কোথায় দাঁড়ি টানবেন?

—আচ্ছা বলছি। সংবরণ চৌধুরী ফুলের মালাটাকে তুলে নিয়ে এক বার দু-হাতে লোফালুফি করে আবার বলতে শুরু করলেন। —সেদিনের সেই লাঞ্ছনার পর সাগর প্রতিজ্ঞা করল আর কোনোদিন ওবাড়ি যাবে না। জীবনে না। সাগরকে সবাই পেটুক ভাবছে, কী হ্যাংলা ভাবছে বলে নয়, স্কুলের চিঠি এসেছে বলেও নয়, শুক্তির নামে যেসব খারাপ খারাপ কথা বলছে এরা, সেইজন্যে।

সাগরের জন্যে 'কিছু নয়'-এর এত নিন্দে! ওই ডাক্তারটা যে সবসময় 'কিছু নয়কে' বাঁকা বাঁকা আর কড়া কড়া কথা বলে তার কারণও যে সাগর, সেও সাগর বুঝতে পারছে আজকাল। আর অশরীরী একটা ভয় যেন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু স্কুলে যাওয়া বন্ধ না-করলে তো ওবাড়ি যাওয়া বন্ধ হয় না! কোন পথ দিয়ে যাবে-আসবে? পেটব্যথা, একদিনের অসুখ, জ্বরটা প্রমাণসাপেক্ষ। তাহলে? আর কী অসুখ আছে যা ধরাছোঁয়া যায় না?

পরদিন থেকে হঠাৎ পায়ে এক দুর্দান্ত ব্যথা হল সাগরের। হাঁটতে পারে না। দাঁড়ালে কনকন ঝনঝন করে।

পায়ে একটু ব্যথায় ডাক্তার আসবে, এমন বড়োলোকের বাড়ি নয়, বড়োজোর গরমজলের ফোমেন্ট কি চুন-হলুদ। কোথায় কখন পড়ে গিয়ে পা মচকেছে, বলেনি এই ভেবে বকাবকি করে সবাই।

মা বলে, 'ভালোই হয়েছে। দু-দিন তবু আড্ডা বন্ধ হয়েছে।'

সাগর শুয়ে থাকে। ভয়ানক একটা যন্ত্রণা বোধ করে।

পায়ে নয় মাথায় কী কোথায় যেন। 'কিছু নয়' কী ভাবছে! 'কিছু নয়' কী মনে করছে!

কিন্তু ক-টা দিন? ক-দিন কেটেছিল সেই অবস্থায়? বোধ হয় চার। হয়তো পাঁচ।

তারপরই ঘটল এক অঘটন।

পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে কেষ্টবিষ্টুর স্ত্রী এলেন পাড়ার এই দীনহীনদের বাড়িতে। সাগর ঘরে শুয়েছিল।

হঠাৎ ঝুমি ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে আর ফিসফিসিয়ে বলল, 'এই শুনছিস, সে এসেছে।'

সাগরের বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল। কোনো কিছু না-ভেবেই উঠল। হয়তো ওর বলার ভঙ্গিতেই। তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

বোন ঠেলা মেরে বলল, 'কিছু বললি না যে?'

—কী বলব?

—বলবি তো রাম গঙ্গা কিছু? হি-হি-হি.....

সাগর সাহসে বুক বেঁধে বলল, কে এসেছে?'

—ওমা! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা! ডাক্তারবাবুর বউ এসেছে। যে তোকে খুব ভালোবাসে, খাওয়ায় ভালো ভালো। যার জন্যে এত কথা। তুই পায়ে ব্যথার জন্যে যেতে পারিস না বলে, খবর নিতে এসেছে।

—কী বলছে?

—কী জানি! মা-র সঙ্গে কথা বলছে। যাই বাবা, দেখি গে।

বলে পালায় সে।

আর সাগর কাঠ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু কী বলছে শুক্তি তা কি জিজ্ঞেস করে জানতে হবে? শুক্তির মাজা চাঁছা অথচ সুরেলা গলা কি জানিয়ে দিচ্ছে না সে-বার্তা?

সাগরের মাথার মধ্যে ঝন ঝন করে বাজছে সেই স্বর।

—বললাম তো, ঠিক বুঝেছি। আমার মনই বলেছে নিশ্চয় অসুখ করেছে ছেলেটার। তা নইলে জানে তো সে, আমি কীরকম হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি ওর জন্যে! খাবার তৈরি করতে ভালোবাসি, ঘরে খাবার লোক নেই। কত ছেলে বাড়ির সামনে দিয়ে যায়, ডাকলে যদি একটা আসে। হি-হি করে হেসে পালায়। আপনার ছেলেটিই মাসিমা যা একটু সরল! তা, পায়ের ব্যথা সারলে পাঠিয়ে দেবেন মাসিমা।

সাগর তার মা-র গলা শুনতে পায়। বিগলিত গদগদ স্বর।

—তা দেব। দেব বই কী! আপনি এত ভালোবাসেন—

আপনি! আমাকে আপনি বলছেন? তার মানেই বলছেন, আমি যেন আর না আসি।

—ওমা, সে কী! জেঠিমার গলা। —গরিবের বাড়ি তোমার পায়ের ধুলো পড়েছে—

—নাঃ। বসতে আর দিলেন না দেখছি। ছেলেবেলা থেকে মা-মরা, আপনাকে দেখে মনে হল এবার বুঝি ভগবান মাতৃস্নেহ জুটিয়ে দিলেন। তা দেখছি কপালে নেই।

সাগর আশ্চর্য হল। জেঠিমাকে দেখে কারও মনে মাতৃস্নেহ পাবার আশা উদয় হতে পারে, এটা তাজ্জব।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সাগর সেই সুরেলা গলার ঝংকার শুনতে পেল। মা-র সঙ্গে, ছোটো ওই বোনটার সঙ্গে।

ওখান থেকেই চলে যাবে তাহলে?

তবে আর সাগরকে দেখতে আসার দরকার কী?

ভয়ানক একটা অভিমানে চোখে জল এল সাগরের। আর ঠিক সেইসময় দরজার বাইরে সেই ঝংকার ধ্বনিত হল, —ওমা, একেবারে শয্যাগত অবস্থা! কার বাড়িতে হাঁড়ি খেয়েছিস? কে ভেঙেছে ঠ্যাং? সাগরের মাথার মধ্যের সেই শব্দটা যেন সমস্ত পৃথিবী ব্যেপে বাজতে লাগল ঝম ঝম ঝম! গায়ের চাদরটা গলা অবধি টেনে দিয়ে হঠাৎ গভীর ঘুমে সে অচেতন হয়ে পড়ল। ঘরে যা যা কথা হল কিছু শুনতে পেল না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সাগর? সাত দিন সাত রাত?

ঘুম ভাঙল কখন? ঘেমে গলদঘর্ম হয়ে? না, মায়ের ডাকে?

চাদরটা ঠেলে আস্তে উঠে বসল সাগর।

মা বললেন, 'অসময়ে এমন ঘুমিয়ে পড়লি যে! বাবাঃ, একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম! মানুষটা এল,

সাতশো ডাক ডাকলাম, তুই একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য! সন্ধেরাত্তিরে এত ঘুম তো কখনো ঘুমোস না!'

সাগর কথা বলতে পারল না, হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকল।

আর মা বলে যেতে লাগলেন, 'দূর থেকে মানুষ চেনা যায় না। বড়োমানুষ বলে বরং কত ইয়েই করেছি। বাবা, কী চমৎকার মানুষ! যেমন রাজেন্দ্রাণীর মতো চেহারা, তেমন মিষ্টি স্বভাব। তোর জেঠির মতো মানুষও স্বীকার পেল যে, হ্যাঁ, সাগর অমনি ছেদ্দা করে না।...তুই যাসনি বলে মান খুইয়ে ছুটে এসেছে। নইলে আমাদের মতন বাড়িতে ওদের মতো লোকের পায়ের ধুলো! অজয়কে ঝুমিকে ধরে ধরে কী আদর করা, রাশিকৃত খাবার, খেলনা—বাবা অমন ঘরে এটা ছেলে নেই! সাধে কি আর বলে, 'কান কাঁদে সোনা রে—সোনা কাঁদে কান রে—'

সাগরের সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সাগরের বুকের মধ্যে সমুদ্র তোলপাড় করতে থাকে।

তারপর ঝুমি আসে। সে বলে, 'তুই অমন মিছিমিছি ঘুমুলি যে দাদা?'

সাগর হঠাৎ চড়ে উঠে রুক্ষ গলায় বলে, 'মিছিমিছি মানে?'

—মিছিমিছি না? সেই তো তক্ষুনি কথা বলছিলি।

—আমার মাথাব্যথা করছিল না?

—মাথাব্যথা? তা কী জানি ছাই! ভাবলাম মটকা মেরে পড়ে আছিস।

তারপর ঝুমির মুখে শুনতে পায় সাগর, ডাক্তারবাবুর বউ ঝুমিকে ইয়া বড়ো একটা 'ডল' দিয়ে গেছেন। অজয়কে এতবড়ো ফুটবল। বাড়ির জন্যে মিষ্টি। আরও শুনল, তিনি নাকি রান্নাঘরে মা-জেঠিমার কাছে খুরসি পিঁড়িতে বসে চেয়ে চেয়ে চা আর বড়া-ভাজা খেয়ে গেছেন। বলে গেছেন, এমন আনন্দ নাকি জীবনে পাননি তিনি। এবার থেকে নাকি কেবল এসে আদর খেয়ে যাবেন।

শুনতে শুনতে কেন কে জানে ভয়ানক একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে সাগর। মনে হয়, 'কিছু নয়' যেন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

প্রতিজ্ঞা করে, কক্ষনো না, আর কক্ষনো যাব না ওবাড়ি। অথচ দেখা হলে কী কথা বলে রাগ প্রকাশ করবে তার রিহার্সাল দেয় মনে মনে।

—না, এ গল্প এখন শেষ হবার নয়।

সংবরণ চৌধুরী সত্যিই সহসা সভাভঙ্গ করলেন। বললেন, 'আধকপালেই রয়েছে এবার কপালে। একঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে, আর না।'

সত্যি বলতে, এ গল্প কারুর মনেই তেমন রেখাপাত করতে পারছিল না। নায়ক-নায়িকার বয়সের তারতম্য তাদের 'ভালোলাগা'র দরজায় যেন একখানা পাথর চাপিয়ে রেখেছিল। আর, সকলেই ভাবছিল, এত পুঙ্খানুপুঙ্খয় যাবার কী ছিল সংবরণের? বর্ণনার স্রোতটা একটু সংবরণ করলেই তো পারতেন!

ভাবছিল, গল্প লেখার ক্ষমতা আর গল্প বলার ক্ষমতা এক নয়। ও দুইয়ের টেকনিক আলাদা। সংবরণ চৌধুরী এত অপূর্ব গল্প লেখেন, কিন্তু গল্প বলতে গিয়ে ফেলিওর হলেন।

তবু ওরা 'দেখানো আগ্রহে' বলল, 'গল্পটা লিখে কোনো পত্রিকায় দেবেন তো স্যার?'

স্যার বললেন, 'দূর!'

—আমাদের কিন্তু মনে অস্বস্তি হয়ে রইল শেষটার জন্যে। ভাবছি, এ গল্পের কী শেষ হতে পারে?

সংবরণ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'তোমরাই বলো তো কী শেষ হতে পারে? কী হওয়া উচিত?'

—বুঝতে পারছি না স্যার! মানে, দু-জনের বয়েস.....

সংবরণ হঠাৎ ও-প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করে বলে উঠলেন, 'তোমাদের এখানকার ফার্স্ট ট্রেন ক-টায়?'

—ফার্স্ট ট্রেন? ফার্স্ট ট্রেনের কথা কেন, কাল তো থাকবেন আপনি.....

সংবরণ বললেন, 'কথা দিতে পারছি না। হয়তো চলেও যেতে পারি।'

ওঁকে মোটরে উঠিয়ে দিয়ে এরা বলল, 'দূর, জমাতে পারল না।'

বলল, 'এমন এক গল্প ফাঁদল যে শেষই করতে পারল না।'

—না ভেবেচিন্তে খুব একটা স্টান্ট দিয়ে শুরু করে উপসংহার খুঁজে পেল না, মাঝে থেকে আমাদের সন্ধেটা উপসংহার করে গেল।

—আচ্ছা, উপসংহার কী হত বল দেখি?

—কিছু না। কাঁচকলা। শেষ কিছু হবার নেই বলেই অমন কায়দা করে উঠে গেল। গল্প তেমন জমাতে পারলে রাত বারোটা অবধি সবাইকে বসিয়ে রাখতে পারত।

—গল্প শেষ না-করতে পেরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এ বাবা আমরা তাই, কলকাতার ছেলে হলে.....

ক্রমশ সংবরণ চৌধুরী 'অপরাধী'র খাতায় উঠলেন। ওঁর অক্ষমতাটা অপরিসীম অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ল প্রায়।

একী! মফস্বলের ছেলে পেয়ে তাদের এইভাবে ঠকালেন উনি!

সেই চটুল মেয়েটা হি-হি করে হেসে বলে উঠল, 'লেখকদের শুনতে পাই অনেকেরই একটু-আধটু পানাসক্তি আছে, নইলে মুড আসে না। ওনারও হয়তো 'টাইম' এসে গেছল, তাই অমন চঞ্চল হয়ে উঠে সরে পড়লেন।'

গতকাল যে রাত নটা অবধি 'সভা' আর সাড়ে দশটা অবধি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল, এবং সংবরণ চৌধুরী বেলা পাঁচটা থেকে পুরোপুরি অনুষ্ঠানটা গলাধঃকরণ করেছিলেন, সে আর মনে পড়ল না কারুর। পান-দোষ নিয়ে মজাদার আলোচনা চালাতে লাগল। ওই ডেঁপো মেয়েটা কোথা থেকে যে 'লেখক'দের সম্পর্কে এই মনোরম তথ্যটি সংগ্রহ করেছে, তা কেউ জিজ্ঞেস করল না। প্রতিবাদও করল না।

তা, এইরকমই হয়। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে হঠাৎ অশ্রদ্ধা করবার সুযোগ পেলে এমনই অন্ধই হয়ে ওঠে লোকে। ওটা মনুষ্যধর্ম।

সংবরণ চৌধুরী যদি এ আলোচনা শুনতে পেতেন ক্ষুব্ধ হতেন, হয়তো, বিস্মিত হতেন না। আকাশ থেকে পড়তেন না। সংবরণ চৌধুরী মনস্তত্ত্বের সন্ধানী। তাই-না এত নামডাক সংবরণের।

কিন্তু আজকে নিজের মনস্তত্ত্বের হদিশ পেলেন না সংবরণ চৌধুরী।

ভেবে পেলেন না হঠাৎ সাগরের গল্পটা ওদের কাছে বলতে বসলেন কেন? এটা যে ছোটো গল্প নয়, বলবার মতো গল্পও নয়, এ কি উনি জানতেন না।

গল্পকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন; কিন্তু গল্প ওঁকে ছাড়তে চাইছে না—সেই বালক নায়ক যেন তাড়া করে ফিরছে সংবরণ চৌধুরীকে।

বহুকাল থেকেই তো মাঝে মাঝেই সেই সাগর ওঁকে বলেছে, 'এত গল্প লিখছ, আমার গল্পটা লেখ-না একদিন?' আমল দেননি সংবরণ।

আজ সাগর ওঁকে ধাক্কা দিচ্ছে।

আশ্চর্য! এটা হচ্ছে কেন? সংবরণ কি তবে এতদিন পরে আজ সাগরের অনুরোধ রাখতে কলম ধরবেন?

এখানে কলেজ-হোস্টেলের নবনির্মিত ভবনের একপ্রান্তের একটি ঘরে থাকতে দিয়েছে এরা

সংবরণকে। কম্পাউন্ডের অপর প্রান্তে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোয়ার্টার্স থেকে আদর-আপ্যায়ন সরবরাহ করা হচ্ছে। হোস্টেলে এখনও ছাত্রদের পদার্পণ হয়নি। ছুটির পরে হবে বুঝি।

টানা লম্বা বারান্দাটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত যেন একটা বিরাট শূন্যতার ছবির মতো প্রসারিত হয়ে আছে, যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু উন্মুক্ত প্রান্তর। ওই প্রান্তরের ওপারে নাকি নদী আছে। দেখা যাচ্ছে না, শুধু আকাশ আর মাঠের মোহনাটায় একটা গাঢ় অন্ধকার রেখা টেনে দিয়েছে।

হু-হু করে বাতাস এসে ধাক্কা দিচ্ছে বারান্দার কোলের ঘরগুলোর বন্ধ দরজা-জানলায়, আবার ফিরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন সংবরণ। সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ জানলায় তাকিয়ে অবাক হলেন। ভাবলেন একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার পিছিয়ে আসছে, এর মানে কী? কী ওটা? জোনাকি?

তারপর বুঝলেন। সিগারেটের আগুন।

ঘুমন্ত স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'লেখক মানুষরা রাত্তিরে ঘুমোয় না, না কি গো'? উত্তর পেলেন না। আশাও করেননি। শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সংবরণ শুয়ে পড়লেন না।

দেখলেন সাগরের হাত থেকে কিছুতেই আজ নিস্তার নেই তাঁর। এর আগে গল্পের চরিত্র কখনো এমনভাবে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে টেবিলে বসায়নি। নিজে টেবিলে বসে তিনি তাদের পেড়েছেন।

আত্মস্থ আর স্থিরস্বভাব লেখক সংবরণ চৌধুরী।

আজ এই প্রকাণ্ড নির্জন বাড়ি, এই যতদূর চোখ যায় খোলা মাঠ আর বিশাল আকাশ সব যেন তাঁকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আর কোথা থেকে যেন শুক্তি আর সাগর তাদের করুণ চোখ মেলে সংবরণের দিকে তাকাচ্ছে।

সাগরকে শুক্তি প্রথম দেখেছিল কবে? কোনখানে? খেলার মাঠে? স্কুলের খেলার মাঠে?

হ্যাঁ, স্কুলের খেলার মাঠে। শুক্তির এক বোনপো না ভাগ্নে পড়ত সাগরদের স্কুলে। তাদের স্পোর্টসের দিন শুক্তি গিয়েছিল শখ করে দেখতে।

শুক্তির বিধবা ননদ বলেছিল, 'মেয়েমানুষ যে ইস্কুলে খেলা দেখতে যায়, সাতজন্মে শুনিনি এমন কথা।'

শুক্তি বলেছিল, 'খেলতে তো আর যাচ্ছি না বাপু, দেখলে কি আর আমি দেহ বদলে পুরুষ হয়ে যাব?'

সাগরের কাছে পরে হেসে হেসে গল্প করেছে শুক্তি, 'ভাগ্যিস গিয়েছিলাম? তা নইলে তুই হেন গুণনিধি হয়তো চিরদিনই আমার চোখের বাইরেই থেকে যেত।'...বলত, 'আহা, গুণনিধির কী মূর্তি তখন। মুখটা জবা ফুলের মতো, সর্বাঙ্গে ঘাম দরদর, জিলিপি কামড়ে ছুটে আসছেন দুশো গজ! দেখেই ইচ্ছে হল ছোঁড়াটাকে জলের কলের তলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিই।'

—ইস্! তাই বই কী? সাগর বলেছিল, 'আমায় দেখে তোমার "ছোঁড়া" মনে হয়েছিল।

—ওমা! তা না তো কী একটি মহিলা মনে হবে?

কিন্তু—

সংবরণ ভাবলেন,..... 'ওদের কাছে আমি সাগরকে কোনখানে এনে দাঁড় করিয়েছিলাম? ওই লাইব্রেরির ছেলেদের?'

ঠিক মনে করতে পারলেন না।

শুধু মনে পড়ল, কবে থেকে যেন শুক্তি হরদম আসতে লাগল সাগরদের বাড়ি। নেমন্তন্ন করে নিয়ে

গিয়ে খাওয়াতে লাগল সাগরের জ্যাঠামশাইয়ের তিন-চারটে ছেলেমেয়েকে, ফল আর মিষ্টি দিয়ে যেতে লাগল যখন-তখন কর্তা-গিন্নির নাম করে। আর সাগরকে কেবল বলতে লাগল, দ্যাখ 'কিছু নয়' লেখাপড়ায় ভালো হতে হবে। তা নইলে মুখ থাকবে না আমার। তুই করলি ফেল, আর দোষ হল আমার।'

সাগর রাগ করে বলত, 'আর এখন কে দোষ দেবে তোমায়? যা খাওয়াতে শুরু করেছ! অত ঘুষ খেলে কি আর কেউ দোষ খুঁজে পায়?'

শুক্তি তার সেই ঝরনার মতো হাসি হাসতে থাকত। বলত, 'আহা, ঘুষ বলছিস কেন বাপু? তোর আপনার লোকেদের খাওয়াতে ইচ্ছে হতে পারে না আমার?'

সাগর বলত, 'অন্তত জেঠিমাকে নয়।'

তারপর কবে যেন একদিন শুক্তি খবর দিল, তার একজন কে আত্মীয়দের ছেলে বি. এ. পাস করে বেরিয়েছে, স্কুলে মাস্টারি করবে, হাত পাকাবার জন্যে টিউশনি খুঁজছে। আর প্রস্তাব করল সাগরের জন্য। যদি.....এই তো সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে, একটু সাহায্য পেলে—

সাগরের মা-র চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। বলেছিল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ মা অবস্থা। ভাসুর যা করছেন তাইতেই তো মরমে মরে আছি।

শুক্তি গালে হাত দিয়েছিল—ওমা, সে কি মাইনে নেবে? না না, মাইনে চায় না সে, একটা লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছেলে চায় শুধু—'

সাগরের মা-ও গালে হাত দিয়েছিলেন সেই অদেখা গ্র্যাজুয়েটের চাহিদার খবরে, —অমনোযোগী ছেলে চায়?

—তবে না তো কী? সেটাই তো ট্রেনিং। ভালো ছেলেকে পড়ালে আর শিক্ষা হল কী? পড়ায় অমনোযোগী অন্যমনস্ক ছেলেকে বশে আনতে শিখলে তবে-না ভালো মাস্টার!

সাগরের মা ভাবলেন, ঈশ্বর স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে সেই সদ্য বি. এ. পাসের মূর্তি ধরে।

জ্যাঠামশাই-জেঠিমাও প্রথমে শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেননি। শুক্তির ওইসব বাকচাতুরি বিশ্বাস জন্মিয়ে ছাড়ল তাঁদের।

কিন্তু সাগরদের বাড়িতে জায়গা কোথায়? যেখানে সাগরদের মতো একটি আশ্রিত জীব প্রাইভেট টিউটর নিয়ে বসতে পারে? জায়গা নেই। তা ছাড়া গোলমালের অন্ত নেই। অতএব অন্য ব্যবস্থা খুঁজতে হয়। শক্ত হয় না খোঁজা।

শুক্তিদের বাড়িটাই তো পড়ে রয়েছে অগাধ শূন্যতা নিয়ে। ছেলে-মেয়ে তো নেই-ই, বাড়ির কর্তাও তো সেই মেসোপটেমিয়ায়। তাঁর ফিরতে ফিরতে পরীক্ষা দেওয়াই হয়ে যাবে সাগরের। তা ছাড়া, মাস্টার শুক্তির বোনপো না কে যেন, ওবাড়িটা তার পক্ষেও আরামের।

ব্যবস্থা হয়ে যায়। সাগর ওবাড়ি গিয়ে মাস্টারের কাছে পড়ে। সাগরের মা শুক্তিকে আশীর্বাদ করেন, 'জন্ম-এয়োস্ত্রী হও মা। পাকা চুলে সিঁদুর পরো।'

সাগরের জেঠিমা চুপি চুপি সাগরের জ্যাঠামশাইকে বলেন, 'মুখে বললেই পাপ, কিন্তু জেনো এ সমস্তই সাগরকে কাছে টানবার চেষ্টা।'

সাগরের জ্যাঠামশাই বিব্রত হয়ে বলেন, 'তা, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ছেলের মতো ভালোবাসে ছেলেটাকে—'

বিব্রত হওয়ার কারণ আছে।

মেয়েটা তাকেও 'জ্যাঠামশাই' করে প্রায় হাত করে ফেলেছে। উনি নাকি ঠিক শুক্তির মরে-যাওয়া পিসেমশাইয়ের মতন দেখতে। আর পিসেমশাইকে নাকি শুক্তি একগাদা ভালোবাসত।

জেঠিমারও চুপি চুপি ছাড়া চেঁচিয়ে বলার উপায় নেই। কারণ সম্প্রতি পুজোর সময় লাল ভোমরাপাড় গরদ দিয়েছে তাঁকে শুক্তি। নিতে আপত্তি করায় মুখ শুকিয়ে বলেছে, 'মা নেই, শাশুড়ি নেই, গুরুজন বলতে ওই এক বিধবা ননদ। ইচ্ছে হলে একখানা লালপাড় শাড়ি দেবার লোক পাই না জেঠিমা—'

তা, শুক্তির সেই ইচ্ছেপূরণের খাতে জ্যাঠাইমার উচ্চস্বরকে ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য শুধু তাই নয়, আরও একটা লোকসান হয়েছে তাঁর—একটি বান্ধবী হারাতে হয়েছে। পাঠবাড়ির যাত্রাসঙ্গিনী!

শুক্তির ননদ আর তেমন করে মন খুলে কথা বলেন না। সেই যবে থেকে শুক্তির ওবাড়িতে 'ঢল নেমেছে'। শুক্তির ওবাড়িতে যাতায়াতে প্রাণ খুলে শুক্তির নিন্দে করবার সাহস তাঁর গেছে।

তবে আর কোন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাণ খুলবেন?

শুধু পাঠবাড়িতে শোনা তত্ত্বকথা নিয়ে?

শুধু ভগবদপ্রেম নিয়ে?

মানুষ বই তো দেবী নন তিনি।

অতএব জেঠিমার কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেছে।

সেই খাদে-নামা গলায় তিনি বলেন, 'থামো তুমি! ছেলের মতন! এক বারও বাবা-বাছা বলতে শুনেছ? ভাই পর্যন্ত বলে না! নইলে—ধর্মছেলে, ধর্মভাই দেখিনি কখনো? এই তো আমারই মাসিকে তো দেখেছি। শরৎদা! মাসির ধর্মছেলে তো। গুষ্টিসুদ্ধু সবাই আমরা দাদা বলেছি তাঁকে। মাসিমাও 'শরৎ' বলে মরে যেতেন একেবারে। জীবনভর টেনেছেন তাঁকে, তাঁর সব দায়-দৈব, বিয়েথাওয়ায় দেখেছেন, অথচ নিজে যে বাঁজা তা নয়। ছেলে-মেয়ে সবই ছিল। তারা একটু-আধটু হিংসে করলে বলতেন, 'ওরে বাবারে, শরৎ হল আমার সকলের আগে।'

—ধর্মভাইও দেখেছি আমার গঙ্গাজলের, আজীবন সেই ধর্মভাই ওকে দেখেছে। নইলে কোথায় ভেসে যেত গঙ্গাজল। ষোলো বছরে বিধবা, ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে পড়েছিল, সেই ভাইও গেল। তা, সে ভাইয়ের মৃত্যু শয্যাতেই ও যখন ডাক ছেড়ে কাঁদছিল 'ও দাদা, আমায় কে দেখবে বলে, ওই সে ভাইয়ের বন্ধু না কে বলল, 'ভেবো না, আমি রইলাম তোমার দাদার জায়গায়।'

তা সেই 'দাদা দাদা' সার হয়েছিল গঙ্গাজলের।

এসব হল আলাদা।

আর ডাক্তারের বউয়ের ধরন আলাদা। এক বার বাবা বলে না; এক বার দাদা বলে না। এ হচ্ছে আর একপ্রকার আসক্তি, বুঝলে? সেকালে যেমন নবাব-বাদশারা পাকাচুল বুড়ো হয়েও সুন্দরী ছুঁড়ি দেখলে লোভে মরত—'

এসব কথা সাগরের কাছে সরবরাহ করত জ্যাঠতুতো বোন টুনি। হি-হি করে হেসে হেসে মরত, আর বলত, 'সব শুনি বুঝলি, সমস্ত! কিন্তু এমন মটকা মেরে পড়ে থাকি, মা ভাবে ঘুমোচ্ছি। অত গজগজ করলে ঘুম আসে?'

তারপর হঠাৎ হয়তো বলে বসত, 'আচ্ছা দাদা, আসক্তি মানে কী?'

আসক্তি মানেটা যে কী, সেকথা বোঝাবার ক্ষমতা হয়তো তখন ছিল না সাগরের। কিন্তু আসক্তি যে কী, তা তো হাড়ে হাড়ে বুঝত। যেখানে আর জীবনেও যাবে না বলে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিজ্ঞা করেছে, সেখানে রোজ না-গিয়ে পারছে না, এর চাইতে অদ্ভুত আর কী আছে?

অথচ প্রতিজ্ঞা না-করেও পারত না।

প্রতিক্ষণই যেন একটা অপরাধবোধের ভারে চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। টুনির আর ঝুমির মুখনিঃসৃত সংবাদ, প্রত্যেকের মুখের একটু ব্যাঙ্গাত্মক বাচন, শুক্তির ননদের সশ্লেষ উক্তি, আর সর্বোপরি শুক্তির বেপরোয়া চালচলন তাকে যেন বিভ্রান্ত করে তুলত।

পড়া শেষ করে ফিরে যাচ্ছে, মাস্টার উঠে পড়েছেন, শুক্তি বলে উঠত, 'ওহে মাস্টার, খেয়ে যেতে হবে আজ।'

সে না না করত, বিব্রত হত, অস্বস্তি পেত, শুক্তি জবরদস্তির জোরে ধরে রাখত। আর তার সঙ্গে নিশ্চিত নিয়মে বলত, 'সাগর তুইও। তোর বাড়িতে খবর পাঠিয়েছি।'

সাগরের মাথা জোরে নড়ে উঠত। আর শুক্তি হেসে গড়িয়ে পড়ত, —আহা-হা, কী সুন্দর! খোকাবাবু! জট নড়ে তেঁতুল পড়ে!'

থাকতেই হত। খেতেই হত। যা সব অভিনব রান্না রাঁধত রান্নাবাতিক মেয়েমানুষ শুক্তি!

কিন্তু তারপর?

আড়াল-আবডাল থেকে ননদের মন্তব্য শুনতে হত, 'ভাইটা আমার কোথায় গিয়ে পড়ে আছে, কী খাচ্ছে তার ঠিক নেই, একটা পরের ছেলে নিয়ে সোহাগ! তাকে সোনার সামগ্রী খাওয়ানো! আদিখ্যেতার শেষ নেই!'

আবার বাড়ি গিয়ে শুনতে হত জেঠির অভিযোগ—সেই যদি খাওয়াবেই তো একটু আগে বললেই হত। গেরস্তর ভাত-তরকারিটা ফেলা যেত না।

হরদমই এইসব। 'কিছু নয়'-এর ওপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যেত তার।

সত্যিই তো এত কী!

বলে ফেলল একদিন।

তখন টেস্ট দিয়েছে সাগর। স্কুলে আর যেতে হয় না। মাস্টারমশাই সপ্তাহে চার দিনের ডিউটি বদলে প্রতিদিন করে নিয়েছে।

সাগর বলল, 'প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার কাছে আর খাব না।'

—কী বললি? কী বললি শুনি? ঝলসে উঠল শুক্তি।

—সাগর বলা কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল। বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে করল।

শুক্তির মুখটা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। ইলেক্ট্রিকের সুইচ নিভিয়ে দিলে হঠাৎ ঘরটার যেমন চেহারা হয়ে যায়, তেমনি মুখের চেহারা হয়ে গেল শুক্তির। বলল, 'কেন রে?'

—কেন আবার? এমনি!

—এমনি বলে কোনো কথা হয় জগতে? কারণ একটা থাকবেই। বল কী হয়েছে?

সাগর বলল, 'বললাম তো এমনি। ভালো লাগে না—

—ভালো লাগে না তোর আমার হাতে খেতে?

—লাগে না-ই তো!

নিষ্ঠুর হবে প্রতিজ্ঞা করেছে সাগর। সে প্রতিজ্ঞা শিথিল করবে না। তাই আবার বলল, 'লাগে না-ই তো!'

শুক্তি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

—তোমার খালি খাওয়ানো—

—ব্যাস! বলেছি তো—আচ্ছা।

তারপর ক-দিন কেমন একরকম নির্লিপ্ত হয়ে থাকল শুক্তি।

সাগর আসে; মাস্টারমশাই আসেন। পঠনপাঠন চলে, শুক্তির দেখা পাওয়া যায় না। তা, সেও তো আর এক বিরাট অস্বস্তি। সেও তো বুকের ওপর পাষাণভার। চলে আসার সময় কীরকম যেন অপমান অপমান লাগে।

অনেকগুলো দিন কেটেছে সেইরকম দুঃখে অপমানে, বুঝি-বা ভয়ে। অথচ ঠিক সেই সময়ই পড়ার চাপ বেশি।

হঠাৎ মেঘ ভেঙে বর্ষা নামল।

মাস্টার আসবার একটু আগেই গিয়েছিল সেদিন সাগর। হঠাৎ শুক্তি একখানা আর্শি এনে ওর মুখের সামনে ধরল।

সাগর চমকে গিয়েছিল। বলে উঠেছিল, 'কী?'

সাগর সেই আর্শি-ধরা হাতটা ধরে ফেলেছিল।

শুক্তি আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'খুব তো তেজ দেখালি। তোমার হাতে খেতে ঘেন্না করে, জীবনে আর তোমার হাতে খাব না, হেন তেন, চেহারাখানা কী খোলতাই হয়েছে দেখেছিস?'

সাগর তখন তেরো বছরের নেই, ষোলোয় পড়ো-পড়ো।

বেশ কিছু কথা শিখেছে তখন সাগর। তাই বলেছিল, 'তোমার হাতে খেতে ঘেন্না করে একথা বলেছি যদি বলো, সে তো বানিয়ে বলছ। খাওয়াটা ছাড়া তোমার আর কোনো আদর নেই সেই কথাই বলেছিলাম।'

হঠাৎ শুক্তির মুখটা অদ্ভুতরকম বদলে গিয়েছিল।

সাগরের চোখ দিয়ে সেই মুখ যেন দেখতে পাচ্ছেন সংবরণ চৌধুরী।

অদ্ভুত এক আলো জ্বলে-ওঠা রহস্য-হাসি আঁকা মুখ। চোখের দৃষ্টি যেন কত কী কথা বলছে।

মুখে শুধু বলেছিল, 'তা তোকে আর কী করে আদর করব বল?'

সাগর হঠাৎ ভয় খেয়ে গিয়েছিল।

তার ষোলো বছরের মর্যাদা ভূমিসাৎ করে, 'দেরি হচ্ছে, মাস্টারমশাই এলেন না' বলে তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

তারপর সাগর উদয়াস্ত পড়া শুরু করল। দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই সন্ধে নেই, শুধু পড়া।

অজয় বলে, 'ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হবি ভেবেছিস বুঝি?'

ঝুমি বলে, 'ফার্স্ট হলে খাওয়াবি তো দাদা?'

জ্যাঠামশাই আস্তে বলেন 'আমি জানতাম, আমি জানতাম! ওর বাবা—'

জেঠিমা বলেন, 'তবু ভালো যে মায়াবিনীর আকর্ষণটা একটু কেটেছে।'

মা বলে, 'স্বর্গ থেকে তিনি দেখবেন সাগর! আমার আর কী আছে বল, ওঁর আশীর্বাদই আমার আশীর্বাদ।'

শুক্তি প্রাণপণে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

শুক্তি ওদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে না। শুধু মাস্টারের কাছে জেনে নেয় ও কী করছে-না-করছে।

কিন্তু মায়বিনীর আকর্ষণ কি যাবার? পাকে-চক্রে আবার পাক পড়ে।

পরীক্ষার দিন মা, জেঠিমা, জ্যাঠামশাই সবাইকে প্রণাম সারা হয়েছে, কপালে দধি-চন্দনের টিপ, হঠাৎ মা বলে উঠলেন, 'ওবাড়িতে ডাক্তারের বউকে একটা প্রণাম করে যাওয়া উচিত তোর সাগর! বলতে গেলে ওর ইয়েতেই সব, নইলে আমাদের কী সাধ্যি ছিল বল মাস্টার রাখবার। নিশ্চিন্তি হয়ে

একটু পড়তে জায়গা দেবারও ক্ষমতা ছিল না।' কথাটা এতই অকাট্য যে, কেউই প্রতিবাদ করতে পারল না।

কিন্তু সাগরের মাথায় বজ্রপাত। প্রণাম! 'কিছু নয়' কে?

প্রণাম নেবে সে? অদ্ভুতভাবে ব্যঙ্গহাসি হেসে উঠবে না?

না বাবা! সে পারা যাবে না।

অগত্যাই অন্য পথ ধরে। বলে, 'দেরি হয়ে যাবে।'

মা বলে, 'না না, অনেক সময় আছে এখনও। এ যদি না করিস সাগর, বুঝব তুই মহা অকৃতজ্ঞ।'

অতএব যেতে হল সাগরকে।

দেখল সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি। সেই তার চিরদিনের জায়গায়। সদরের গেটের কাছে। সাগরকে দেখে নড়ল না, কথা বলল না।

সাগর বিমূঢ়ভাবে একটু হেসে বলল, 'পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি—'

শুক্তি ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই বলবি তবে জানব?'

—তা নয়, মানে—

—মানে বোঝাবার কিছু নেই। আমি বুঝে নিয়েছি।

—কী বুঝেছ?

—যা বোঝবার! কিন্তু হঠাৎ এলি যে? তুই তো আর আমায় ভালোবাসিস না।

সাগর দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল, 'তা কী করে বাসব! মিথ্যে কথার রাজা তুমি।'

—মিথ্যে কথার রাজা?

—নয়তো কী? মাস্টার আমায় অমনি পড়াত? সে তোমার বোনপো? আমার মতন একটা গবেট ছাত্তর চাইছিল সে বিনি পয়সায় পড়াবে বলে? এসব সত্যি কথা?

শুক্তি হঠাৎ আগের মতো হেসে উঠে বলে 'মোটেই না! সব মিথ্যে! একটা কিন্তু মিথ্যে নয়। ছাত্তরটা গবেট—'

—ইস! দ্যাখো! পড়তাম না তাই সেবার—

—পড়তিস না, না আমি পড়তে দিতাম না? বলে মুখ টিপে কৌতুকের হাসি হাসল শুক্তি।...ক্ষণে ক্ষণে মুখের রং বদলায় ওর।

ক্ষণে ক্ষণে হাসির রকম বদলায়। তাই আবার শান্ত কোমল হাসল।

—কিন্তু দাঁড়িয়ে দেরি করিস না, সময় হয়ে গেছে। বলেছিলাম আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দেবে, তা তোর মা বললেন বন্ধুদের কাছে লজ্জা পাবে।

—হ্যাঁ তাই তো! যা ঠাট্টা করে ওরা!

—ঠাট্টা করে?

—করে না? চিরদিন করে।

—তুই কী বলিস?

—বলব আবার কি? আচ্ছা— বলেই হঠাৎ আবার সেই একটু বিমূঢ় হাসি হেসে বলে, 'মা বলে দিয়েছিলেন—'

—কী রে? কী বলেছেন মা?

—বললেন? বললেন তোমায় প্রণাম করে যেতে—

—প্রণাম? আমায় প্রণাম? ঢেউ দিয়ে হেসে উঠল শুক্তি, আর হঠাৎই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তাহলে কর।'

—না, যাঃ! বলে পালাল সাগর।...প্রণাম করেনি।

ডাক্তারের বউকে প্রণাম করেনি সাগর। শুধু গুরুজনদের করেছিল।

আর বোধ করি তারই জোরে তরে গিয়েছিল। রীতিমতই তরেছিল।

স্ট্যান্ড করেছিল ম্যাট্রিকে।...সংবরণ কলম রাখলেন।

সিগারেট ধরালেন একটা। অনেকক্ষণ ধরে উড়িয়ে দিলেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তারপর আবার কলম তুলে লিখলেন, 'সেই হল কাল সাগরের।

ভালো করে পাস করার জন্যে জ্যাঠামশাই একটি ঘড়ি উপহার দিলেন সাগরকে। নিকেল-প্লেট পকেট ঘড়ি। যে-ধরনের জিনিস হয়তো জ্যাঠামশাইদের যৌবনকালে ফ্যাশনের বলে গণ্য হত।

বলা বাহুল্য, ঘড়িটা পছন্দের যোগ্য নয়।

তবু জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহ-উপহার। আহ্লাদে চোখে জল এল সাগরের।

প্রণাম করল জ্যাঠামশাইকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে টুনি বলে উঠল, 'ইঃ, ভারি জিনিসই দিলে বাবা তুমি! দাদার ওই উনি যা একখানা হাতঘড়ি দিয়েছেন দাদাকে! সোনার ব্রেসলেটের মতো। হাতঘড়িকে রিস্টওয়াচ বলে বাবা?'

পাথর হয়ে গিয়েছিল সাগর। পাথর হয়ে গিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই।

ঘরের মধ্যে থেকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন সাগরের মা।

তারপর জ্যাঠামশাই হাত বাড়িয়ে ছিলেন সাগরের দিকে। কালো অন্ধকার মুখে বলছিলেন, 'দাও, ওটা দিয়ে দাও তাহলে।'

সাগরের ইচ্ছে হচ্ছিল জ্যাঠামশাই বলে চিৎকার করে ডেকে ওঠে। পারেনি। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়নি।

জ্যাঠামশাই আরও গম্ভীর আর মৃদুস্বরে বলেছিলেন, 'দাও।' এখনও দোকানে ফেরত দিলে পঁচিশটা টাকা পাওয়া যাবে। দশজোড়া ধুতি হবে আমার। সারা বছরের সংস্থান।'

অনেক দিন পর্যন্ত ভেবেছিল সাগর, কী করে তখন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়নি কেন?

যায়নি। হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের হাতে।

জ্যাঠামশাই রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বার দুই পায়চারি করে ধরা ধরা গলায় বলেছিলেন, 'আমি শাসন করলে নিন্দে হবে ছোটোবউমা, তুমি ভাববে ভাত দিচ্ছেন তাই, হয়তো ভাববে ছেলে আমার বিবাগিই হয়ে যাবে। কিন্তু এইটি মনে রেখো একজামিনে ফার্স্ট হওয়াটাই সব নয়। ছেলেকে শিক্ষা দিতে হলে—'

ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই। কথা শেষ করেননি।

ছোটোবউমার হুঁশ হয়েছিল বোধ হয় কড়ার তরকারি পুড়ে যাওয়ার গন্ধে।

না, মাকে লুকোয়নি সাগর।

বরং মা-ই লুকিয়েছিলেন আর সকলের কাছ থেকে। সাগর এসেছিল বটে দুরুদুরু বুক নিয়ে। তবু তখনও ঠিক বুঝতে পারেনি জিনিসটা অত দামি। এনে মাকে দেখিয়েছিল, বলেছিল, 'এই দ্যাখো মা কাণ্ড! আমি কিছুতেই নেব না, অথচ ছাড়বেও না—'

মা শঙ্কিত চোখে চুপ করবার ইশারা করেছিলেন। তারপর চট করে নিজের বাক্সয় তুলে ফেলে বলেছিলেন, 'কারুকে দেখাসনে সাগর, কারুকে না। তোর জ্যাঠামশাই তোকে ঘড়ি দেবেন বলে ঠিক করেছেন—'

জ্যাঠামশাই! স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিল সাগর।

মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, বলেছিলেন সেদিন, তোর বাবার নাম করে বলেছিলেন, অমুক যখন স্কলারশিপ পেল, বাবা ঘড়ি কিনে দিলেন তাকে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন। ওর বাপ নেই, তবু গরিব জ্যাঠা আছে। ঘড়ি একটা দেব আমি ওকে। এই সোনার ঘড়ি দেখলে বড়ো দুঃখ পাবেন।'

তা, সেই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা গেল না তাঁকে। টুনি যে কোন ফাঁকে সেই দৃশ্য অবলোকন করেছিল, এবং সেই কথোপকথন গলাধঃকরণ করেছিল, ঈশ্বর জানেন। আর ঈশ্বর জানেন ন্যাকা সেজে কেন বলে দিয়েছিল অমন করে।

হয়তো এই মজাদার খবরটা অজয়কে বলেছিল, হয়তো বদমাইস অজয়টা ওকে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার পরামর্শ দিয়েছিল। বুঝল না, মজাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছোল।

মরমে মরে গেছেন জ্যাঠামশাই, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

আর সাগরের মা-র সমস্ত সদিচ্ছা একটা কদর্য রূপ নিয়ে সংসারের সামনে মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে লাগল।

ঘড়িটা বার করতে হল তাঁকে।

আর মা-ছেলের 'ষড়' নিয়ে ন ভূত ন ভবিষ্যতি করলেন জেঠিমা। এ সন্দেহও প্রকাশ করলেন, তলে তলে এইরকম আরও কত কীই দেয় বড়োলোকের গিন্নি। হয়তো টাকাই দেয় গোছা গোছা। তাই ছোটোবউয়ের 'ওদের বউ', 'ওদের বউ' করে মুখে লাল পড়ে, আর তাই ছোটোবউ,—হ্যাঁ, স্পষ্টই বলেছিলেন জেঠিমা,—তাই ছোটোবউ ওই মায়াবিনীর কবলে কচি বাচ্ছা ছেলেটাকে নির্বিবাদে ধরে দিয়েছে। কে জানে ওই রঙ্গিণী ছেলেটার কাঁচা মাথাটা খেয়ে শেষ করছে কি না। 'ডাইনের কোলে পো সমর্পণ' আর কাকে বলে?

এও বলেছিলেন, 'ডাক্তার যেমন ভ্যাবাগঙ্গা, ওই চৌনেভৌনে বউকে কখনো এমন করে একা রেখে যেতে আছে? সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়, চোখে চোখে রাখতে হয়।'

সব কথার মানে তখন বুঝতে পারেনি সাগর। পরে বুঝতে পেরেছিল, অনেক দিন পরে।

সে-রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন মা সাগরকে ডাকলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'মনে দুঃখ করিস না বাবা, আমার একটা হুকুম তোকে মানতে হবে।'

সাগর পরে বুঝেছিল ইচ্ছে করেই 'হুকুম' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন মা।

সাগর শঙ্কিত চোখে তাকিয়েছিল।

মা দেখতে পাননি। ঘর অন্ধকার ছিল।

তবু বুঝতে পেরেছিলেন মা। বলেছিলেন, 'বুঝছি তোর খুব কষ্ট হবে, লজ্জা পাবি, ভালোবেসে ভালো মনে দিয়েছে সে, কিন্তু সবদিক ভেবেই বলছি, ঘড়িটা কাল ফিরিয়ে দিয়ে আসবি।'

ফিরিয়ে! ঘড়িটা! সাপে-কামড়ানো রুগির মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সাগর।

বলেছিল 'মা!'

মা বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছি সাগর! তবু এ তোকে করতেই হবে। সংসারের লোক বড়ো নোংরা।'

সাগর অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, 'কী বলব?'

মা বলেছিলেন, 'বলবি আপনার জিনিস আমি মাথায় করে নিয়েছি, কিন্তু মা বলেছেন এ আমার হাতে মানাবে না। আমার নাম করিস।'

অনেকক্ষণ জেগে বসেছিল সাগর।

মা বলেছিলেন, 'শুয়ে পড়। ভগবানের নাম কর।'

তারপর আরও অনেকক্ষণ পর মা বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন সাগর জেগে আছে, সেই ভেবেই বলেছিলেন, 'তা, তুই ওকে মাসি-পিসি কি দিদি-বউদি কিছু বলিস না কেন? শুধু 'এ' 'ও' 'তা' করে কথা কয়ে সুবিধেও তো নেই।'

সাগর একথার উত্তর দেয়নি, ঘুমের ভান করে পড়েছিল।

সাগরের তখন সেই অনেক দিন আগের কথা মনে পড়েছিল। যেদিন সেই বারো বছরের সাগর বলেছিল, 'আপনাকে দিদি বলব না, বউদি বলব?

না, মাসি পিসি বলবার কথা ভাবেনি সাগর, এই সম্বোধন দুটোই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল তার।

কিন্তু শুক্তি উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল 'কিছু নয়' বলবি। সেকথাটা মনে পড়ল। তারপর ভাবল ঘড়িটা ফিরিয়ে দেওয়ার চাইতে অনেক সহজ ফেলে দেওয়া। ফেলেই দেবে সে।

কথাটা যত বার ভাবতে চেষ্টা করল তত বারই বুকের মধ্যেটা হু-হু করে উঠল সাগরের।

ফেলে দেবে! ঘড়িটা হেদোর জলে ফেলে দেবে!

জগতে এর চাইতে মর্মান্তিক কথা আর কী থাকতে পারে?

জীবনে প্রথম পাওয়া উপহার!

আর কী অপূর্ব উপহার!

সাগরের এতাবৎ কালের মতো যা কিছু সঞ্চিত সম্পদ এ উপহার তার মাঝখানে যেন কোহিনুর-হিরে। মাটির ঢেলার রাজ্যে সাগর-ছেঁচা মণি! শ্রেষ্ঠ মূল্যবান বস্তুর যত কিছু উপমা এ পর্যন্ত শুনেছে বা পড়েছে সাগর, সব কিছু মনের মধ্যে ডুকরে ডুকরে উঠছিল।

সাগরের জীবনে যে-জিনিস স্বপ্নের কল্পনাতেও ছিল না, সে-জিনিস হাতের মধ্যে পেয়েছিল সাগর, আজ তাকে হাতে করে জলে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

বাঁধভাঙা নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ঝরে পড়ে টপটপিয়ে। অনেকক্ষণ লাগে সেই উচ্ছ্বসিত আবেগ সামলাতে।

ঘড়িটা মা-র কাছ থেকে নিতে গিয়েও ঠোঁট কাঁপল, গলা বুজে এল। হয়তো-বা মারও তাই এল। মা-ও ভালো করে কথা বলতে পারলেন না, বাক্স খুলে আস্তে তুলে দিলেন ছেলের হাতে।

হাতে নিয়েই সাগর ছুটে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পা যেন পাথর হয়ে বাদ সাধল। মা বোধ হয় বুঝলেন, আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমার আশীর্বাদের কোনো মূল্য নেই বাবা, সে আমি জানি, তবে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি তোকে যেন অনেক অনেক বড়ো করেন, যেন এমন জিনিস নিজে তুই একশোটা কিনতে পারিস—'

মায়ের এ সান্ত্বনায় মন বিগলিত না হয়ে কেন কে জানে হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাগরের। ভাঙা ভাঙা তীব্র গলায় বলে উঠল, 'ভগবান ছাই করবে, কচু করবে। জিনিসের জন্যেই যেন মরে যাচ্ছি আমি—'

তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

গেল শুক্তির কাছে নয়, হেদোর দিকে।

'জিনিসের জন্যে নয়' সেকথাটা মিথ্যেও নয় কিন্তু। প্রথমটায় অবিশ্যি জলে ফেলে দেবার সংকল্পে 'জিনিসটা' বলেই প্রাণটা ফেটে যাচ্ছিল, তারপর আর এক দিক থেকে উঠেছে আলোড়ন।

'কিছু নয়' যখন বলবে কই ঘড়িটা হাতে পরলি না? তখন কী বলবে সাগর? এক দিন-দু-দিন এটা-ওটা বলে চালানো যায় কিন্তু কোনোদিনই যখন আর ঘড়িটা চোখে দেখতে পাবে না 'কিছু নয়?'

কী ভাববে?

কী ভাববে?

হয়তো ভাববে হারিয়ে ফেলেছে। কী লজ্জা! কী দুঃখ! 'কিছু নয়'-এর দেওয়া উপহারটা হাতে না-পরেই হারিয়ে ফেলল সাগর, এ ভেবে 'কিছু নয়'-এর কী মনের অবস্থা হবে?

সাগর কি তখন তবে বলবে চুরি গেছে!

সেটাই কি শুনতে সুন্দর?

বাড়ির আর কোনো জিনিস চুরি গেল না, গেল ওইটাই। তার মানে সাগর ঘড়িটা যেখানে-সেখানে ফেলে রেখেছিল। তার মানে সাগর জিনিসটার মূল্যই বোঝেনি। না-বা টাকার, না-বা ভালোবাসার।

তবু হঠাৎ শুক্তির ওপরেই ভীষণ রাগ হতে লাগল সাগরের।

কেন!

কেন এত বেশি দামি জিনিস দিয়ে ঘটা দেখাতে গেল 'কিছু নয়?' সাগর কী-বা মানুষ, কী-বা তার অবস্থা, তাকে একখানা-দুখানা গল্পের বই দিলেও তো যথেষ্ঠ হত। নাম লেখা বই দুটো বরং যত্ন করে তুলে রাখতে পেত সাগর, এমন করে জলে ফেলে দিতে হত না।

জলে ফেলে দেবার কথা যত বারই ভাবে, জল উপচে আসে চোখে। তারপর হেদোর ধারের কাছে এগিয়ে আসে।...

বিকেলের আলো তখন শেষ হয়ে যায়নি, সারা পার্কটা জুড়ে লোক। কেউ বসে কেউ শুয়ে, কেউ আধ শুয়ে, যারা সাঁতার শেখবার তারা তা শিখছে, ছোটোরা খেলা করছে, ঘুগনিওলা আর কুলপিওলা ঘোরাঘুরি করছে, মোটের ওপর সমস্ত জায়গাটা জুড়েই একটা জীবন চাঞ্চল্যের লীলা।

সাগর ভাবল, এত লোক আহ্লাদে ভাসছে, শুধু আমিই এসেছি প্রাণটাকে ছিঁড়ে উপড়ে বিসর্জন দিতে!

তারপর ভাবল, এত লোকের সামনে ফেলা চলবে না। তা হলে লোকে হইহই করে উঠবে। হয়তো ওই যারা সাঁতার দিচ্ছে, তারা কুড়িয়ে লুটে নিয়ে আসবে। কার জিনিস কার জিনিস করে একটু রব তুলে কেউ একজন নিজের পকেটস্থ করবে। যার জিনিস, সে তার জ্বালা জ্বালা করা চোখটা নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে।

নাঃ, এত লোকের মাঝখানে নয়। চলে যাক ওরা।

ওই একেবারে সামনে ওই কলেজের ছেলের দলেরা। চলে যাক সাঁতারুরা।

বসে রইল সাগর। যেন আচ্ছন্নের মতো বসে রইল।

ক্রমশ হালকা হয়ে এল ভিড়, সাঁতারের ছেলেরা উঠে পড়ল। ঘুগনিওলারা চলে গেল, কুলপিওলারা ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি বন্ধ করে এক-একটা জায়গায় হাঁড়ি নিয়ে গুছিয়ে বসল।

সাগর তখন সংকল্পে বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াল।...

ঘড়ি হাতে ছেলেটাকে হেদোর ধারে দেখতে পেলেন সংবরণ। আর দেখে একটু করুণ হাসি হাসলেন। দেখলেন কিনা, শেষপর্যন্ত ছেলেটা পারল না প্রাণ ধরে ফেলতে।

দেখলেন, বার বার কেস খুলে সে ঘড়িটাকে দেখছে আবার বন্ধ করছে। ম্লান থেকে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত পকেটে নিয়ে ফিরে গেল।

সংবরণ আর একবার সিগারেট ধরালেন। দেখতে লাগলেন বলির পাঁঠার মতোই সেই চিরপরিচিত গেটওয়ালা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সাগর। বাড়িটায় আজ যেন একটু চাঞ্চল্য।

ঠিক কী তা বুঝতে পারল না। তবু মনে হল। হয়তো দোতলার সমস্ত জানলাগুলো খোলা হয়েছে

বলে, হয়তো চাকর ঠাকুর দুটোর বার দুই ব্যস্তভাবে বাড়ি থেকে বেরোনো দেখে, হয়তো বাড়ির সামনে দুখানা গাড়ি দাঁড়ানো দেখে।

এ চাঞ্চল্য কীসের? অসুখ করল না তো 'কিছু নয়'-এর? ইতস্তত করে ঢুকে পড়ে চলে যাচ্ছিল সোজা ভিতরে, হঠাৎ একটা ঝি দেখতে পেয়ে আকর্ণ হাসি হেসে বলল, 'আজ আর গপ্পো হবে না, বাবু এসেছেন।'

বাবু এসেছেন!

সাগরের মনে হল সারা পৃথিবী দুলে উঠল যেন। বাবু এসেছেন! কই, সাগর তো একবর্ণও শোনেনি আসার কথা। গতকালও তো এসেছিল। 'কিছু নয়' তাহলে ইচ্ছে করেই গোপন করেছে সাগরের কাছে। সাগরকে অপ্রস্তুতে ফেলে মজা দেখবার জন্যে। নইলে কাল যখন বিদায় নিয়েছে, শুক্তি তো যথানিয়মেই গেট অবধি এসেছে, আর যথারীতিই ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছে, 'আসছিস তো কাল?'

তাই বলে শুক্তি।

এখন আর রাস্তা থেকে হিড়হিড় করে টেনে আনতে হয় না সাগরকে হাত চেপে ধরে, এখন তো এমনিই আসে সাগর।

চারাগাছগুলো যেমন ঝড়-জল-বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতির শতরকম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও নিজেকে ঠিক বাড়িয়ে নেয়, মনে হয় ভেঙে গেল বুঝি তবু ভাঙে না শুক্তির কাছে তার আসা-যাওয়াটা ঠিক ওইভাবেই বজায় থেকে গেছে। সংসারের প্রতিকূলতায় অজস্র বার 'আর না আসবার' যে-প্রতিজ্ঞা করেছে, অজস্র বারই সে-প্রতিজ্ঞা চূর্ণ হয়েছে।

দু-দিন, চার-দিন, খুব জোর সাত দিন। সেটাই শেষ সীমা।

হয় শুক্তি গিয়ে হানা দিয়েছে, নয় সাগরই যেন পথ চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এইভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে নেহাৎই প্রতিবেশীর খবরটা নিতে যাচ্ছি ভঙ্গিতে ঢুকে পড়েছে।

তারপর প্রথমটা খানিকটা অভিমানের ঝড়, অবশেষে খুশির বন্যা।

আবার নতুন জোয়ারে নিত্য হাজিরা।

আবার বিদায়কালে 'আসছিস তো কাল'-এর প্রতিশ্রুতি। আসে, কোথা দিয়ে কেটে যায় সময়।

পরীক্ষার পর এই তিনটে মাস তো জলের মতো কেটেছে। একটা দাবা কিনে ফেলেছিল শুক্তি, সেই দাবার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল সাগরকে।

সাগর বলত, 'কাকে বলে ঘোড়া, কাকে বলে নৌকো তাই জানতাম না, আর এখন সকাল থেকে মনে হয় কখন খেলতে যাব। এমন নেশা ধরিয়ে দিয়েছ তুমি!'

শুক্তি ওর সেই ঈষৎ বিস্ফারিত বড়ো বড়ো চোখদুটো তুলে যেমন তাকায় তেমনি তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'কী আর করা? আমার নেশাটা তো ধরাতে পারলাম না, তাই তাস-দাবা—'

এসব ঠাট্টা এখন সাগরের গা-সহা হয়ে গেছে। তাই বলে, 'তাসের থেকে দাবা অনেক ভালো।'

হ্যাঁ, তাসের আড্ডাও বসে মাঝে মাঝে।

সাগর থাকে, অজয় আর ঝুমি আসে, শুক্তি তো আছেই। খুব যে একটা উঁচুদরের খেলা হয় না, তা বলাই বাহুল্য। হয়তো টোয়েনটি নাইন, হয়তো ব্রে। কিন্তু তাস কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি, চেঁচামেচি, পরস্পরকে জোচ্চোর বলে গাল—এগুলো তো পুরোমাত্রায় হয়।

বিধবা ননদ দরজায় এসে বলেন, 'আমার ভাইয়ের যে দু-দুখানা চিঠি এসে গেল বউ, একটা জবাব দিয়েছিলে?'

শুক্তি হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'জবাব? তোমার ভাইকে? আহা, সে আইন যদি থাকত গো আমাদের দেশে! কবে জবাব দিয়ে বসতাম।'

ননদ মুখ বাঁকিয়ে বলে যেত, 'শিং ভেঙে বাছুরের দলে! গলায় দড়ি! এক ফোঁটা এক ফোঁটা ছেলে-মেয়েগুলো যেন সমবয়সি ইয়ার।'

বলা বাহুল্য, স্বগতোক্তিগুলো বেশ সশব্দেই হত।

ঝুমি হয়তো বলে উঠত, 'আপনার ননদ কী রাগী, বাবাঃ!'

অজয় বলে উঠত, 'এমন বিচ্ছিরি কথা!'

শুক্তি বলত, 'তা বাপু, কথাগুলো বিচ্ছিরি হলেও সত্যি। সত্যিই তো, আমার কি তোদের সঙ্গে খেলার বয়েস? কিন্তু কী করব, ঠাকুরঝির সখীদের সঙ্গে 'গ্রাবু' খেলবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। ডাকে মাঝে মাঝে। আমি বলি ঘুম পেয়েছে, বলি একটা বই পড়ছি, ভারি মন লেগে গেছে।... শুনে হেসে উঠত এরা।

আর শুক্তি খুব একটা চিন্তিত মুখ করে বলত, 'আচ্ছা, তোরাই বল দিকি আমার কেন বয়েস বাড়ে না? নিজেকে সত্যিই তোদের সমবয়সি মনে হয় কেন?'

আচ্ছা, অজয় আর ঝুমি, সাগরের কাছাকাছি বয়সি যে-দুটো, তারাও তো কম যত্ন-আদর-প্রশ্রয় পায় না শুক্তির কাছে? ভাবত সাগর।

তবু ওরা অমন কুটিলতা করে কেন? বাড়িতে শুক্তির নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হতে দেখলে তাতে ফোড়ন কেটে ইন্ধন জোগায় কেন? সাগরের ওপর আক্রোশ-আক্রোশ ভাব কেন?

সাগর ভাবত। সংবরণ ভাবছেন না।

সংবরণ জানেন এমনই হয়। ওদের পাওনাটা যে ফাউমাত্র, সাগরের প্রাপ্যের প্রসাদকণিকা, এ ওরা বুঝে ফেলেছে। প্রখর বুদ্ধির জোরে নয়, সহজাত বুদ্ধির জোরে। তাই অমন নিমকহারামি। তাই ঝুমির ওই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার চাতুরি, ন্যাকামির ছল করে। এ একপ্রকার নিরীহ হিংস্রতা।

আর ঝুমির সেই নিরীহ হিংস্রতাই আজ সাগরকে হাঁড়িকাঠের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। ঝুমি যদি ঘড়ির কথা না বলত.....!

বাবু এসেছেন! বাবু এসেছেন!

যেন একটা অর্থহীন শব্দ সাগরের মাথার মধ্যে পাক দিতে থাকে। সেই বড়ো একজোড়া গোঁফ আর একজোড়া রক্তচক্ষু সংবলিত মুখ, সাগরের স্মৃতিপট থেকে যেন মুছেই গিয়েছিল।

সে-মুখ যে সহসা এমন করে দেখতে হবে দুঃস্বপ্নেও তা জানা ছিল না সাগরের। ওই মুখ দেখলে শুধু যে ভয়ই হয় তা নয়, নিজেকে যেন চোর মনে হয়। কেন হয় কে জানে! তবু হয়।

অথচ 'কিছু নয়' এই বিশ্বাসঘাতকতা করল সাগরের সঙ্গে!

চোখ ফেটে জল এল সাগরের।

আর ঠিক এইসময় সেই স্মৃতিপট থেকে মুছে-যাওয়া মুখখানা একেবারে সাগরের মুখের সামনে এসে একটা বিশ্রী হাসি হেসে উঠল।

তুমি কে হে? আমার স্ত্রীর সেই 'বাছুর-প্রেমিক'টি না? সেইরকমই মনে হচ্ছে যেন! তা, দিব্যি চেহারাখানা তো বাগিয়েছ দেখছি! আর সেই 'গো-বৎস গো-বৎস' ভাবটি দেখছি না, বেশ ষাঁড়িয়ে উঠেছ মনে হচ্ছে।

অসভ্য কথা, অসভ্য ভঙ্গি। তবে সাগরের কানের মধ্যে শুধু একটা প্রবল করতালধ্বনি ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট হয়ে ঢোকেনি।

ডাক্তার হেসে ওঠেন। হা-হা করা হাসি।

সাগরের মনে হয়, এর চাইতে কুৎসিত ভঙ্গির হাসি আর কুশ্রী লোক বোধ করি আর কখনো দেখেনি সাগর। অথচ ডাক্তার যাকে বলে সুপুরুষ। লম্বা-চওড়া জাঁদরেল গড়ন, লালচে ফর্সা রং, মাথার চুল কালো চকচকে, মুখের গড়ন হিসেব করলে নিখুঁৎ।

—তা, কই? তোমার বান্ধবীটি কোথায়? দেখা হয়নি বুঝি এখনও? কই রে কে আছিস, তোদের মাকে ডেকে দে—

সাগরের মুখ দিয়ে কথা বোরোবার কথা নয়। তবু বোধ করি মরিয়া হয়েই বলে ফেলেছিল সাগর, 'না না থাক। আমি যাই।'

আবার সেই হাসির ঝড়ের সামনে পড়তে হল সাগরকে।

—কেন? কেন হে প্রেমিক? আমায় দেখে ভয় খেলে নাকি? গুলি করব ভাবছ? ফাইট? নো নো! ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ করব কী? থেকে যাও, থেকে যাও। একমুঠো নিরিমিষ্যি প্রেমের সঙ্গে, এক বাটি মুরগির মাংস খেয়ে যাও। বাড়ির কর্তার অনারে আজ তোফা রান্নাবান্না হচ্ছে বাড়িতে।

মরিয়া সাগর বলে ওঠে, 'আমি খেতে আসিনি।'

—ও আই সি! তাই নাকি? এই শুনছ...হা-হা-হা!

তারপর ঠিক কী হয়েছিল মনে পড়ে না সাগরের। শুধু মনে পড়ে ভয়ানক একটা উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিল ওবাড়ি থেকে।

ঘড়িটা ফেলে দিয়ে এসেছিল ওবাড়ির টেবিলে।

এই জায়গাটা সংবরণকে বলতে পারেনি সাগর। সংবরণ তাঁর সৃষ্টিশক্তির জোরে আর সাহিত্যিকের দৃষ্টিক্ষমতায় গড়ে ফেলেছিলেন জায়গাটা।

কলম কামড়ে ভেবে নিলেন সেই গড়নটা।

ডাক্তারের সেই প্রবল হাস্যরোলেই বোধ করি শুক্তি এসে পড়েছিল, আর ডাক্তারের দিকে একটা অসহায় ভর্ৎসনার দৃষ্টি মেলে বলে উঠেছিল, 'কী হচ্ছে? ছেলেমানুষটার পিছনে আবার লাগতে এলে কেন?'

—ছেলেমানুষ! ও হো-হো, মনে ছিল না। তা, তোমার ওই নামাবলিঢাকা মদের বোতলটি তো আর নামাবলির অন্তরালে থাকতে চাইছে না গো! এ তো দিব্যি একখানি নবকার্তিক হয়ে উঠেছে। দেখে আমারই প্রেম করতে ইচ্ছে করছে।

—আঃ, তুমি থামবে?

—থামব! থামবার হুকুম হচ্ছে? থেমেই তো ছিলাম গো। থেমেই তো আছি। তোমাকে যত ইচ্ছে এগিয়ে যেতে দিয়েছি। কিন্তু মাত্রাটা বড্ড বেশি ছাড়িয়ে যাচ্ছে না মিসেস? দূরে থাকি বলে কি আর খবর পাই না?

সাগরের মনে হয়েছিল লোকটার কথাবার্তা যেন থিয়েটারের সাজা মাতালের মতো। সম্প্রতিই একদিন ওদের পাড়ায় রক্ষেকালী পুজো উপলক্ষ্য করে পাড়ার ড্রামাটিক ক্লাব 'প্রফুল্ল' নাটক করেছিল। তাতে—

হঠাৎ বরফের ছুরির মতো একটা ঠান্ডা ছুরি যেন সাগরের অনুভূতির মধ্যে এসে ঢুকল। দেখতে পেল শুক্তি ডাক্তারের দিকে পাথরের চোখের মতো নিষ্পলক চোখ তুলে প্রশ্ন করছে, 'কী কী খবর পেয়েছ তুমি?'

সেই আগা-ছুঁচলো গোঁফ দুটো যেন খাড়া হয়ে উঠল। আর সেই গোঁফের নীচে একটু হাসি ঝলসে

[illegible], আরে, ভুল কেন? সে কি আর আমি লিস্ট করে রেখেছি? না, তার জন্যে দফায় দফায় আইনপ্রয়োগ করছি?'

—করবে না কেন? করো! বলতেই হবে তোমায় কী কী শুনেছ আমার নামে?

—এই দ্যাখো, তুমি খেপে যাচ্ছ। রাখো রাখো রাগ রাখো। তোমার এই পোষ্যটিকে অফার করছিলাম একটু মুরগির মাংস খেয়ে যাও—

শুক্তি তীব্রস্বরে বলে উঠেছিল, 'সাগর, তুই বাড়ি যা।'

—কী আশ্চর্য! বাড়ি যাবে কী? আমি বাড়ির কর্তা, আমি নেমতন্ন করছি—।

শুক্তি শান্ত গলায় বলে, 'ও মুরগির মাংস খায় না।'

—খায় না! বলো কী গো? তবে কীসের মাংস খায়? মানুষের? এই বয়সেই—

—সাগর! কী শুনছিস হাঁ করে? উঠে যা বেহায়া কোথাকার! এত অপমানেও লজ্জা নেই! আর যদি কোনোদিন ঢুকিস এবাড়িতে—'

অসহ্য বিস্ময়ে চোখ ফেটে জল আসে সাগরের। এতক্ষণ ডাক্তারের মাতলামির মধ্যে বিতৃষ্ণাকর ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি সে।

কিন্তু একী? 'কিছু নয়'-এর নিজের এই অপমান করা! তাও ডাক্তারটার সামনে?

বুঝতে দেরি হয় না সাগরের, স্বামীর সামনে সুয়ো হবার জন্যেই শুক্তির এই অভাবনীয় ব্যবহার।

তাহলে! সাগর কেউ নয়! সাগরের মনটা মন নয়!

যখন নিজের ইচ্ছে ছিল, সুবিধে ছিল, তখন সাগরকে আদর দেখানো হয়েছে। সেই আদরের মান রাখতে বাড়িতে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি সাগরকে। কই, এক দিনের জন্যে তো সাগর নিজের গা বাঁচাবার জন্যে 'কিছু নয়'কে কিছু বলেনি। কারুর কাছে বলেনি, অত আদর যত্ন আমার ভালো লাগে না, কী করব বাধ্য হয়েই—

না, শুক্তির মনে কষ্ট হতে পারে, এমন ব্যবহার কখনো করেনি সাগর। সাগরের ফেল হওয়ায় শুক্তির নিন্দে হয়েছিল বলে, দিন-রাত ভুলে পড়েছে সে। অনিচ্ছুক মনকে মেরে মেরে বইয়ের পাতায় বসিয়েছে। তারপর অবশ্য নিজেরই নেশা লেগে গিয়েছিল পড়ার। যার জন্যে—

হ্যাঁ, যার জন্যে কম যন্ত্রণা সইল না সাগর!

ভালো করে পাস না করলে তো আর এই ঘড়ির যন্ত্রণা পোহাতে হত না। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কি জীবনে আর মুখ তুলে কথা বলতে পারবে সে? জ্যাঠামশাই কি জীবনে আর কখনো কোনো জিনিস উপহার দিতে আসবেন সাগরকে?

যে-দুর্লভ সম্পদ সাগরের কল্পনার স্বর্গকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, সেই সম্পদ হারাতে হয়েছে সাগরকে শুক্তির জেদে আর আবদারে। জ্যাঠামশাইয়ের সেই ঘড়ি ফেরত-চাওয়া হাতটা সাগরের সারাজীবনের চেতনার মর্মমূলে লেগে থাকবে না?

তবু 'কিছু নয়'কে সে মনে মনে দোষ দিতে পারেনি। বরং মায়ের অনুরোধে ঘড়িটা ফেরত দিতে এসেও হেদোয় চলে গিয়েছিল ফেলে দিতে। 'কিছু নয়'কে মনোকষ্ট থেকে বাঁচাতেই এমন অনাসৃষ্টি কল্পনা মাথায় এসেছিল তার। আর, 'কিছু নয়' কিনা তাকে বিনা দোষে এইভাবে—

চোখের জল মুছলে ধরা পড়া। তাই মোছে না।

গালের ওপরে গড়িয়ে পড়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ গলায় বলে, 'ঢুকতে আমি চাইও না। তুমিই সেধে সেধে—। আর আসব না। এইটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম—'

ঘড়িটা প্রায় আছড়ে টেবিলে রেখে দিয়ে চলে এসেছিল সাগর।

আর, এই প্রথম তার মনে হয়েছিল, সে ছেলেমানুষ বলে, বোকা বলে, শুক্তি তাকে নাচিয়ে মজা পায়, আসলে বড়োলোকের ভালোবাসা সব বাজে—বিচ্ছিরি

কী করে যে কেটেছিল সেই সন্ধ্যাটা, সে কেবল সাগরের ভগবানই জানেন।

মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, ঘড়িটা ফেরত দেওয়ায় খুব মনক্ষুণ্ণ হল বোধ হয় শুক্তি?'

সাগর বলেছিল, 'আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না, মাথা ধরেছে।'

তারপর কি আর দেখা হয়েছিল সাগরের শুক্তির সঙ্গে?

ওইখানটা যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। দেখা হওয়াটা ওই জঘন্য দিনটার আগে না পরে? পরে? পরেই।

আগে তো কত অজস্র বার, হয়তো-বা কত সহস্র বার দেখা হয়েছে। সে-দেখায় তো শুধু একপক্ষের বেপরোয়া জবরদস্তি, আর অপর পক্ষের নিরুপায় আত্মসমর্পণ। ওই দিনের আগে শুক্তি অমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল কবে?

না, আগে নয় পরে। ক-দিন পরে মনে করতে পারেনি সাগর। তবে শুক্তির সেই আসাটা মনে আছে।

উদ্ভ্রান্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল যেমন-তেমন শাড়ি পরা।

ছুটে এসেছে এবাড়িতে।

—মাসিমা, সাগর আছে?

—আছে তো। কেন কী হয়েছে?

—মাসিমা, এইমাত্র খবর পেলাম আমার ছেলেবেলার এক সই মরো-মরো, এক্ষুনি না গেলে শেষ দেখাটা হবে না। সাগর যদি একটু নিয়ে যায় উনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন—

উদ্ভ্রান্ত, কিন্তু আটঘাট বেঁধে কথা।

মাসিমা, অর্থাৎ জেঠিমা, প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁ গা বাছা, তা সে-জায়গা কত দূরে? সাগর চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো?'

—পারবে পারবে, আমি চিনিয়ে দেব। একা চাকরের সঙ্গে যেতে ভরসা পাচ্ছি না—

জেঠিমা ডেকে দিয়েছিল। সাগরকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

নিতান্ত গোঁজ হয়েই ঘোড়ার গাড়ির মাথায় উঠতে যাচ্ছিল সাগর, শুক্তি হাত চেপে ধরল। বলল, 'আমার এই দুঃসময়ে তুই আর জ্বালাসনে কিছু নয়।'

শুক্তির নির্দেশে অনেকক্ষণ গাড়ি চলার পর, শুক্তি একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'এইখানে।'

সাগর অবাক হয়ে বলে, 'এটা তোমার বাপেরবাড়ি, না?'

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন করা সম্ভব হয়েছিল সাগরের পক্ষে। শুক্তির বাপেরবাড়িটা চেনা ছিল তার। একদা চিনতে হয়েছিল।

মিলিটারি ডাক্তার তখন কলকাতায় নেই। শুক্তির দাদার অসুখ করেছে, শুক্তি ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কিছু নয়, শোন আমার সঙ্গে চল এক জায়গায়।'

—যাব! কোথায় যাব! বিমূঢ় প্রশ্ন করেছিল সাগর।

শুক্তির যদি মন ভালো থাকত, নিশ্চয় শুক্তি হেসে বলত, 'চল বিলেত যাই। নয়তো, হয়তো-বা বলত চল গোলকপুরীটা একবার ঘুরে আসি।'...কিন্তু এখন মন খারাপ, তাই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চল-না,

গাড়িতে উঠে বলছি। একা ড্রাইভারের সঙ্গে যাচ্ছি দেখলেই তো, আমার বরের দিদি 'হাঁ-হাঁ' করে উঠবে।'

সাগর তখন আর তেরো বছরেরটি নয়। দুটো বছর পার করে এসেছে তখন। মুখচোরা মুখে কথা ফোটে মাঝে মাঝে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'তোমার বরের দিদি তো আমার সঙ্গে যেতে দেখলেও হাঁ-হাঁ করে উঠবেন।'

ঝপ করে মুখের রং বদলে গিয়েছিল শুক্তির, সেই বদলানো রং মুখে বলেছিল, 'সেকথা বুঝতে পারিস তুই?'

সাগর বলেছিল 'বুঝতে আবার পারব না কেন? দেখতেই তো পাই।'

—দেখতে পাস? এসব দেখতে পাস তুই?

শুক্তির কণ্ঠে আর এক ধরনের ব্যাকুলতা। সে-ব্যাকুলতা ভাইয়ের অসুখের দুশ্চিন্তার নয়।

সাগর অবশ্য একটুও অবাক হয়নি, কারণ শুক্তির এই ব্যাকুল ভাবটা তার বড়ো বেশি পরিচিত। মাঝে মাঝে অকারণেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে শুক্তি।

অতএব নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'না পাবার কী আছে? চোখ থাকলেই দেখা যায়!'

অবিরত একজন মহিলার সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের ফলে কি সাগরের কথার ধরন মেয়েলি হয়ে গিয়েছিল? মেয়েলি না-হোক, একটু বয়েসওয়ালা পুরুষের মতো? সাগরের বয়সের ছেলেরা কি ঠিক এ ভাষায় কথা বলে?

হয়তো বলে, হয়তো বলে না।

সাগর বলে।

সাগরের কথার উত্তরে কিন্তু শুক্তি ছেলেমানুষে পরিণত হল। ঘাড় দুলিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, 'চোখ থাকলে অবিশ্যিই দেখা যায়, জগতের অনেক বস্তুই দেখা যায়, কিন্তু চোখ কি আছে তোর?'

—চোখ নেই? চোখ নেই আমার?

—না না নেই। মোটেই নেই। থাকলে কি আর.... বলেই সুর পালটে নিয়েছিল শুক্তি। বলেছিল, 'থাক গে মরুক গে। তোর চোখ আছে কি নেই, তাতে আমার কী? বেল পাকলে কাকের লাভ? তুই আমার সঙ্গে যাবি কি না বল।'

—যাব না কেন? যেতে তো ভালোই লাগে। বেশ মোটর গাড়ি চড়া হয়। কিন্তু—

—শুধু মোটর গাড়ি চড়া হয় বলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে তোর ভালো লাগে?

—বাঃ তা কেন? সাগর ঢোক গিলে বলে, 'কত জায়গাও তো দেখা হয়। সেই সে-দিন তুমি আর তোমার ওই ননদ যেখানে নিয়ে গেলে? কী চমৎকার জায়গা! বাড়ি ফিরে যখন ঝুমিদের কাছে গল্প করলাম, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তপস্যার জায়গা পঞ্চবটি দেখেছি, ওরা তো বিশ্বাসই করে না। অজিতটা আবার এত বোকা, বলে কী, 'তপস্যার জায়গা তো সব হিমালয়ে। তুই অমনি দেখে এলি! এত বাজে চাল মারিস না। তা ছাড়া—'

থেমে গিয়েছিল সাগর।

শুক্তি নির্বেদ প্রকাশ করেছিল, 'থামলি কেন' প্রশ্নে।

তারপর বলে ফেলেছিল সাগর, 'ওরা তোমার নিন্দে করে।'

ভেবেছিল 'কিছু নয়' বুঝি চমকে উঠবে, শিউরে উঠবে, রেগে উঠবে। কিন্তু সেসব কিছু হল না। কিছু নয় মৃদু হেসে বলল, 'তা তো করবেই। বোধ হয় বলে, 'কী বেহায়া, কী বাচাল!' তাই না?'

সাগর এই হাস্যোদ্ভাসিত মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিল। যাতে রাগবার কথা, তাতে হাসি

কেন! তারই যে ওদের ওইসব অসভ্য কথায় রাগে হাত-পা কাঁপে! কম রাগ করেছিল একদিন! ঝুমিকে 'ঠাঁই ঠাঁই' করে চড় কসিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বেহায়া উনি? না তোরা? গিয়ে গিয়ে খেয়ে আসতে পারিস তো বেশ! এখন আবার নিন্দে করা হচ্ছে।'

অজিত বলেছিল, 'খাই বলে দোষ দেখব না? তোর মতন হ্যাংলা নাকি?'

সেদিন রাগের চোটে মনে হয়েছিল সাগরের, বলে দেবে 'কিছু নয়' কে! বলবে ওই নেমকহারামদের সঙ্গে আর খেলো না তুমি, খেতেও দিয়ো না।

কিন্তু বলতে পারেনি।

শুক্তির মনে কষ্ট হবে বলেই পারেনি।

কিন্তু আজ দেখল কষ্টের বালাইমাত্র নেই 'কিছু নয়'-এর। দিব্যি হাসছে।

কথার শেষ করল এবার।

বলল, 'ওইসব ভালো ভালো জায়গা দেখা হয়, ভালো লাগবে না?'

তা বটে!

শুক্তি নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'আজ অবিশ্যি ভালোটালো কোনো জায়গায় নয়। আমার বাপেরবাড়ি যাব। দাদার অসুখ—।'

সাগর ম্লান মুখে বলেছিল, 'তোমার বাপেরবাড়ি? সেখানে গেলে কী বলবে তারা?

—কী আবার বলবে? শোনো কথা!

—বাঃ তারা কি আমায় চেনে?

—চেনে না, চিনবে।

—আমার লজ্জা করে।

—লজ্জা করে!

দপ করে জ্বলে উঠেছিল শুক্তি, 'বেটাছেলের এত লজ্জা কীসের রে? আমি মেয়েমানুষ লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে বসে আছি, আর উনি বাবু ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে বেড়াবেন লজ্জা করে বলে! নে নে চল! তোর লজ্জা আমি ভাঙছি।'

হিড়হিড় করে টেনে গাড়িতে তুলেছিল সাগরকে।

সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল সাগরের এই বাড়িটার দরজায় এসে।

সেদিন শুক্তির বউদি সাগরকে দেখে বলে উঠেছিলেন, 'তোমার এই বাহনটিকে যেন নতুন দেখছি ঠাকুরঝি? কবে থেকে রাখা—'

সাগর চমকে উঠেছিল।

কথা শেষ না হলেও মানে বুঝতে দেরি হয়নি তার। উনি তাহলে সাগরকে চাকর ভেবেছেন?

নিজের ডোরাকাটা শার্ট আর লালচে ফর্সা ধুতিখানার দিকে তাকিয়েছিল সাগর, সরমে মরে গিয়েছিল।

কিন্তু শুক্তি ততক্ষণে হইচই করে উঠেছে।

—সত্যি বউদি, কী করে জানলে বলো তো এটি আমার বাহন? বাহনই। সর্বত্র আমায় বহন করে নিয়ে বেড়াবে, এই ওর সঙ্গে অলিখিত চুক্তি। কী রে 'কিছু নয়', তাই না?

বলাবাহুল্য সাগর নির্বাক।

ভাজ বলেন, 'ওমা! এটি কি সেই ছেলেটি নাকি?'

—সেই ছেলেটি!

শুক্তি ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিল, 'কোন ছেলেটিকে মনে করছ বউদি?'

—আরে বাবা সেই যে তোমাদের পাড়ার কোন ভাড়াটেদের ছেলেকে তুমি পুষ্যি না কী নিয়েছ। তা সে কি এই এতটুকু ছেলে নাকি!...বাবাঃ তোমার ননদ সেদিন কত কীই বলল। সে একেবারে মশা মারতে কামান!

প্রথমটা এইসব কথায় বড়ো খারাপ লেগেছিল সাগরের, তারপর ভালোই লেগেছিল। গ্রামোফোন বেজেছিল ওদের বাড়িতে, শুক্তির দাদা ভালো করে কথা বলেছিলেন।

সেই সেদিন বাড়ি চিনেছিল।

আজ তাই সহজেই বলে উঠল, 'এটা তো তোমার বাপেরবাড়ি?'

—তাইতো। এরা সবাই কাশী গেছে, শুধু ঝি আছে—

—তা, সেই যার অসুখ করেছে—

শুক্তি ওকে টেনে এনে নীচের একটা ঘরে হাতল-ভাঙা একখানা চেয়ারে বসিয়ে বলে, 'অসুখ তো আমারই করেছে, আমিই তো মরো-মরো। হয়তো আজ-কালই মরতে পারি। তোর সঙ্গে শেষ দেখা করব বলে—'

সাগর দাঁড়িয়ে ওঠে। বিরক্ত স্বরে বলে, 'ছেড়ে দাও আমায়। বুঝেছি, সব তোমার মিথ্যে কথা—'

শুক্তি ওর দিকে অদ্ভুত অসামান্য একটা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, 'বুঝে ফেলেছিস তুইও বুঝে ফেলেছিস আমার সব মিথ্যে কথা? তোরা এত সহজে সব ধরে ফেলিস কী করে বল দিকি?'

ওই দৃষ্টির সামনে সাগর কেমন একরকম হয়ে গেল।

আস্তে আবার চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'বললে কেন বন্ধুর অসুখ?'

শুক্তির সেই ক্ষণপরিবর্তনশীল মুখে সহজ হাসি নামল।

বলল, 'বুঝতে পারছিস না, একটু চালাকি করে তোকে আমার বাপেরবাড়ি বেড়াতে নিয়ে এলাম। দাদা-বউদি বলেছিল, আমরা কাশী যাচ্ছি, বাড়িটা এক-আধ বার দেখো—। তাই—'

—তা, সেকথা বললেই পারতে?

—আহা, সেকথা বললে কি তোর জেঠি অমন এককথায় ছেড়ে দিত। সাত-সতেরো কথা বলত না? তা, বলি সেদিন তো খুব রাগ দেখিয়ে ঘড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এলি, দেখে মনে হল মস্ত লায়েক হয়ে গেছিস। তা বেশ, লায়েকের মতো একটা কাজ কর-না?

সাগর ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী? কী কাজ?'

শুক্তি মুখ টিপে হেসে বলে, 'আমায় নিয়ে পালিয়ে চল।'

—কী?

—আমায় নিয়ে পালিয়ে চল।

—আঃ! সাগর আবার উঠে পড়ে।

আচমকা ওইরকম ছলনা করে বাড়ি থেকে প্রায় উড়িয়ে এনে, নির্জন একটা বাড়িতে বসিয়ে এমন অদ্ভুত পরিহাস করার অর্থ খুঁজে পায় না সাগর। ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে ওর। মনে হয়, ভয়ানক কটা বিপদ যেন গ্রাস করতে আসছে ওকে।

—যত সব অসভ্য ঠাট্টা! বলে ওঠে সাগর মুখটা সিঁদুরবর্ণ করে।

—ঠাট্টা ভাবলি তুই—

শুক্তি যেন হতাশ হয়ে পড়েছে, তাই বসে পড়ে। নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি ভাবলাম, বললে বুঝি তে স্বর্গ পাবি। বেশ বড়োসড়ো মনে হচ্ছিল কিনা তোকে সেদিন। ভুল ভুল। শরতের মেঘ গর্জায়

পর্যায়, না! কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, আমি ঠাট্টা করছিলাম না। কী বোকামি! ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই যে কোনোদিন ভাবতে পারবি না তুই, এ খেয়াল হয়নি। চল, বাড়ি চল।'

—তোমাদের বাড়ি?

—নাঃ! আমাদের বাড়ি আর যেতে বলব কোন মুখে? তোকে তো ঢুকতেই বারণ করেছি।

সাগর অপ্রতিভভাবে বলে, 'তার জন্যে নয়।'

—তার জন্যে নয়?

—না। তোমার ওই বরকে আমার ভালো লাগে না।

—এই সেরেছে! ভালো লাগে না? আমার এত ভালো লাগে, আর তোর লাগে না? শুক্তি হাসতে থাকে। বেদম হাসি। হাসির ধমকে চোখ দিয়ে জল পড়ে যায়। অনেকক্ষণ লাগে সেই ঝোঁক কাটাতে।

বলে, 'চল, তোদের বাড়িতেই চল। বাড়ি গিয়ে বলবি যার অসুখ করেছিল, সে মারা গেছে।'

গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে শুক্তি বাইরের দিকে চেয়ে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আচ্ছা সাগর, তোর কখনো কোনোসময় খুব ছোটো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না?'

সাগর হঠাৎ একথায় চমকে ওঠে।

তারপর বলে, 'ছোটো হতে! পাগল নাকি আমি যে, ছোটো হতে ইচ্ছে করবে? আমি তো দিন গুণি কবে বড়ো হব বলে—'

শুক্তি বলে 'আমার কিন্তু ছোটো হতে ইচ্ছে করে। খুব ছোটো। ফ্রক পরে রাস্তায় খেলে বেড়ানোর মতো ছোটো।'

—তোমার সবই অদ্ভুত!

—আমার সবই অদ্ভুত তাই না? তা হবে। কিন্তু শত ইচ্ছেতেও মানুষ কিছু করতে পারে না, দেখেছিস মজা?

সাগর অবশ্য এর মধ্যে কোনো মজা খুঁজে পায় না। কথাটার ঠিক মানেও পায় না।

বাড়ির দরজায় নেমে শুক্তি ওর দিকে ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'মনে আছে তো? বলবি যার অসুখ করেছিল সে মারা গেছে।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সংবরণ চৌধুরী।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন।

শুক্তির কথার শেষটা বহুযুগের ওপার থেকে যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বার করে দিল তাঁকে।

মারা গেছে! মারা গেছে!

বহুদিন আগের পরিচিত একটা পাড়ার, পাড়াসুদ্ধ সমস্ত লোক যেন সেই শব্দটা উচ্চারণ করতে লাগল। 'মারা গেছে...মারা গেছে...।'

কী করে?

বিষ খেয়ে।

বিষ কোথায় পেল?

দূর! এ আবার একটা কথা নাকি? আদি অনন্তকাল ধরেই তো মানুষ বিষ খায়। কোথায় পায়?

কিন্তু কেন? অত সুখ, অত ঐশ্বর্য!...

কাল নাকি কোন এক ছোটোবেলাকার সইয়ের মারা যাওয়া দেখে এসেছে।

সই!

ছোটোবেলাকার?

তাইতে এত এমন—

বলা যায় না, মানুষের মন, আচমকা কখন যে কী হয়। অসুখ; দেখতে গিয়েছিল, গিয়ে দেখতে পেল না।

তা বাপু যাই বলো, এটা কোনো কাজের কথা নয়। মনে হয় ভেতরে কোনো ব্যাপার আছে।

মিত্তিরদের ছেলেটাকে নিয়ে ডাক্তার নাকি রাগারাগি করেছিল—

আরে ধ্যাৎ! সেটা একটা কথা নাকি? ছেলেটার বয়েসটা ভেবেছ? রাগারাগি করছিল দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি দিয়েছে বলে। যতই নিজের ছেলেপুলে না থাক, পাড়ার ছেলেকে অত টাকা দিয়ে—

এসমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছিল সাগর। খুব জ্বরের মধ্যে কানে এসেছিল। হ্যাঁ জ্বর, সত্যিকারেরই জ্বর। যার জন্যে নতুন কলেজে ভরতি হতে দু-মাস দেরি হয়ে গিয়েছিল তার।

এক হাজার বোলতা যখন 'মারা গেছে' 'মারা গেছে' রব তুলে সাগরের মাথার মধ্যে হুল ফুটিয়েছিল, তখন হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল সাগর।

পড়ে নাকি মাথায় লেগেছিল। সেই তাড়সে জ্বর।

না, সাগর মারা গেল না।

শুধু ক-টা দিন শুয়ে থাকল বিছানায়। শুধু সেই ক-দিন অবিরাম শুনতে লাগল 'বিষ, বিষ!'

আলো-জ্বলা ঘরে ভোরটা ধরা পড়ে না চট করে। ধরা পড়ল আতিথেয়তার উৎকট আগ্রহে। সংবরণের জন্যে বেড-টি নিয়ে এসেছে ওদের চাকর। সে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'বাবু তো দেখি সারারাত ঘুমান নাই। সাধে কি আর লোকে আপনাগো ফুলের মালা পরায়ে ধেই ধেই কইরা নাচে! রাতভর লিখল্যান?'

সংবরণ শুধু হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নেন। তারপর বলেন, 'দ্যাখো আমি এই পাঁচটা পঁয়ত্রিশের গাড়িতে চলে যাচ্ছি, তোমার বাবুদের আর ডাকাডাকি করে তুলে কাজ নেই। জাগলে বোলো, আমি চলে গেছি। আজ আর খাবারদাবার ব্যবস্থা কোরো না।'

লোকটা হাঁ করে বলে, 'চলে যাবান? কন কী? আজই তো রাতে থেটারের পালা। আসল দিনেই—'

সংবরণ হাসেন একটু।

'থেটারের' পালাটাই যে আসল, এটা আর সংবরণ চৌধুরীর অবিদিত নেই। যেখানে আর যে-কারণে সভা আয়োজিত হোক, তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণটাই শুধু এদের নয়, সকলের কাছে আসল। বক্তৃতারূপ অসংস্কৃতিগুলো একটা অবান্তর প্রথাপালনের চিহ্নমাত্র। জানেন সংবরণ। তবু আসতে হয়। নিজের অনেক কাজের ক্ষতি করে এদের ডাকে সাড়া দিতে হয় সভার শোভাবর্ধন করতে। এগুলো মেনে নিতে হয়, হয়েছে।

তাই ঈষৎ হাসলেন সংবরণ।

বললেন, 'পালা আমরা অনেক শুনি বাপু। আমার আজ কাজ আছে।'

সুটকেসের মধ্যে টুকিটাকি সব ভরে নিয়ে বলেন, 'আর শোনো, ওই যা বললাম তোমার বাবুকে আর ডাকাডাকি করে কাজ নেই এত ভোরে, জাগলে বোলো কোনো বিশেষ দরকার পড়ায়—'

কিন্তু সংবরণ পাগল হতে পারেন, বুড়ো চাকরটা তো পাগল নয়! সে জাগাবে না তার বাবুকে কে? বাবু উঠে দেখবেন কলকাতার বাবু নিশ্চিহ্ন? সংবরণ যখন হোস্টেলের কম্পাউন্ড পার হচ্ছেন, দেখলেন ওঁরা দুই স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে আসছেন ওঁদের কোয়ার্টার্স থেকে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী বেশি কিছু বললেন না, শুধু বড়ো বড়ো ছোখ তুলে বললেন, 'এইভাবে হতাশ করলেন আমাদের?'

স্বামী প্রবল হইহই করে ওঠেন।

বলেন, 'কী হল? আপনি আজ পালাচ্ছেন যে! কাল আশ্বাস দিলেন—'

সংবরণ সপ্রতিভভাবে বলেন, 'মানে, ব্যাপার হচ্ছে হঠাৎ একটা কাজ মনে পড়ে যাওয়ায়—'

—একটা দিনে আর কী এসে যেত আপনার?

—আপনাদেরই-বা.....সংবরণ হাসেন, —একটা দিনে কী এসে যাবে?

—বড় ভালো লেগেছিল, আপনাকে এই দু-দিন নিজস্ব করে পেয়ে।'

সংবরণ মৃদু হেসে বলেন, 'যাক, আপনি তবু স্বীকার করলেন নিজস্ব করে পেয়েছিলেন আমায়। আমার কিন্তু ভারি বদনাম আছে মিশতে পারি না বলে। আচ্ছা চলি—' ছোট্ট সুটকেসটা হাতে এগোতে থাকেন সংবরণ।

স্টেশন এত কাছে যে, গাড়ির কথা ওঠে না। আর সদ্য নিদ্রাভঙ্গের অবস্থা নিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট দম্পতিরও কথা ওঠে না পৌঁছে দেবার।

উনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও ওঁরা দু-জন দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। অলসভাবে ওঁর কথাই আলোচনা করেন।

কর্তা বলেন, 'হঠাৎ কী হল বলো দেখি?'

—কী জানি। কেমন যেন রহস্য লাগছে। তুমি জানো না, কাল রাত্রে দেখেছি, সারারাত বারান্দায় পায়চারি করছেন।

—তাই নাকি? দেখেছিলে বুঝি?

—সিগারেটের অগ্নিকণাই দেখিয়ে দিয়েছিল। ঘুম আসছিল না বোধ হয়—

—তা অন্য জায়গায় এলে অনেকের ঘুম আসে না।

—কাল কিন্তু 'আই. জি. সি.' ওঁকে সরাসরি অ্যাটাক করেছিলেন, অনেকেই অস্বস্তিবোধ করছিল। উনি হয়তো তাইতেই—

—আরে না না। তারপর তো দিব্যি হাসলেন, গল্প করলেন, খেলেন। কোনো বৈলক্ষণ্য দেখলাম না।

—আহা, সে কি আর উনি জানতে দেবেন? বুদ্ধিমান লোকেরা তা দেয় না।

—যাই বলো, ওঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়াটার কোনো হদিস খুঁজে পাচ্ছি না।

—তার মানেই হদিস নেই। সম্পূর্ণ মুডের ব্যাপার! তা ছাড়া ব্যাচিলার বুড়োরা একটু খামখেয়ালি উলটোপালটা হয়েই থাকে।

—ব্যাচিলার নাকি?

—হায় কপাল! তাও জানো না? ওয়াই. এম. সি. এ-তে থাকেন, খান-দান, আর বই লেখেন।

—যাক, এতক্ষণে হদিস পেলাম। তা, তোমার তো সব লেখকদের ঠিকুজি-কুলুজি মুখস্থ, ভদ্রলোকের আসল নামটা কী?

—বারীন মিত্তির না কী যেন!

—পিকিউলিয়ার! একেবারে পদবিটদবি সমেত নাম পালটানো! ছদ্মনাম তো অন্যরকম হয়, যেমন বনফুল, যাযাবর—ইয়ে—

—যাক, অনেক কষ্টে দুটো নাম তবু মনে এনেছ। পদবিসুদ্ধু ছদ্মনামিও অনেক আছে—

—সাধে আর বলি? সাহিত্যিক, কবি, ছবি-আঁকিয়ে এরা সব এক-একটি জীব! নইলে কোনো কিচ্ছু না, সারারাত জেগে পায়চারি করে ভোররাত্তিরে বলে উঠলেন, মশাই চললাম। তাও যদি বা তরুণ বয়েস হত তো বলতাম যে—

—কী বলতে? থামলে কেন? কী বলতে শুনি?

—বলতাম, তোমায় দেখে বাণাহত হয়ে পালিয়ে গেল—

—তার মানে?

—মানে একটু যেন কেমন কেমন—

—যত সব অসভ্যতা!

—কিন্তু কিছু যদি মনে না করো তো বলি। দু-দিন ধরেই দেখছি তোমার মুখের দিকে বার বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করছিলেন, মনে হচ্ছিল পুরোনো চেনা, মনে করতে চেষ্টা করছেন।

—আহা! কই, তখন তো বললে না? দেখে নিতাম সেই হারানো দৃষ্টি। আসল কথা, তোমরা পুরুষরা হিংসুটের অবতার। তোমাদের স্ত্রীর দিকে কেউ এক বার তাকালেই অমনি সে-তাকানোর অর্থ আবিষ্কার করতে বসো। দৃষ্টিনিক্ষেপকারীর বয়সের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করো না।

—বয়েস? হা-হা-হা, হাসালে তুমি। প্রেমের আবার বয়েস আছে নাকি?

—বয়েস নেই?

—নো নো! বয়েসটা বেঁধে রেখেছে লোকে শুধু লোকলজ্জার খাতিরে। নইলে বৃদ্ধ বাদশারা তরুণী বেগম গ্রহণ করতেন না।

—থামো! সেটা বুঝি প্রেম? প্রেমের নামে কলঙ্ক দিয়ো না।

—আচ্ছা উলটো দিক থেকে দ্যাখো তবে—তোমাদের চিরকলঙ্কিনী চিরপ্রেমিকা রাধিকা তো দিব্যি একটি বিবাহিতা মহিলা। আর বয়েসও হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণ? 'নওল কিশোরে'র বাংলা কী?

—হয়েছে, সক্কাল বেলা আর তোমায় প্রেমতত্ত্ব আওড়াতে হবে না। সংবরণ চৌধুরী মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম, আজ নিজে দু-একটা রাঁধব।

—দ্যাখো, হয়তো হঠাৎ কোনো প্লট মাথায় এসেছে, গিয়েই লিখতে বসবেন। তার মানে, তোমাদেরই ভবিষ্যতের খোরাক! হা-হা-হা!

অত ব্যস্ত হয়ে এসে স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল সংবরণকে। প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে লাগলেন।

ঘুমন্ত নির্জন ফুলগাছে সাজানো আর মেহেদির বেড়ায় ঘেরা ছবির মতো সুন্দর স্টেশন, সদ্যভোরের অলৌকিক আলো আর অপূর্ব মিষ্টি হাওয়ায় যেন পরির দেশের আবেশ এনে দিচ্ছে।

যেদিন এসে নেমেছিলেন সংবরণ, সেদিন সময়টা ছিল চড়া রোদে ঝকঝকে, আর অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের দল অতিবিনয়ের কণ্ঠ আর অতিসেবার হাত নিয়ে উপস্থিত ছিল। কোনোদিকে তাকিয়ে দেখেননি। আজ সবদিকটা দেখতে পাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে হঠাৎ ভারি আশ্চর্য লাগল সংবরণের।

ভাবলেন এমন করে চলে এলাম কেন আমি? কেন হঠাৎ নিজের ওপর কন্ট্রোল হারালাম?

[illegible] মুখ আই. জি. সি-র কয়েকটা মন্তব্যে উত্তেজিত হয়েই কি আমি—? না কি অদ্ভুত সুন্দর দুটি [illegible] যেন বহুকালের যবনিকা ঠেলে কে দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত দুষ্টুমিমাখা চোখ মেলে সংবরণকে [illegible] দেখাচ্ছিল, সংবরণ সেই চোখের জাদুতে আবিষ্ট হয়ে ভুলে গেলেন বর্তমান কালটাকে। হারিয়ে [illegible] নিজেকে, হারিয়ে গেলেন অতীতের মধ্যে।

[illegible] কিছু নয়।

[illegible]।

[illegible] তোলপাড় করে তুলেছে সারাদিন ধরে। ঘুমন্ত সাগরে তুলেছে তরঙ্গ। তাই

হঠাৎ সন্ধ্যায় ওই ক-টা ছেলে-মেয়ের আসরে সাগরের গল্পটা শুরু করে বসলেন সংবরণ।

লেখক সংবরণ চৌধুরী ক্রমশ নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন, তাই ভাবতে পারছেন সাগরের ঋণ শোধ করতে হবে, সাগরের উপর এতকাল যে-অবহেলা করে এসেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আর শুক্তি?

সমুদ্রমন্থনের বিষের ভাগটাই শুধু তার ভাগ্যে? তাকে কেউ জানবে না? কেউ বুঝবে না?

শুধু ভাববে বড়োলোকের বউয়ের খামখেয়াল?

ভাববে বরের উপর মান-অভিমান?

বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে যে বহু বৈচিত্র্য থাকে, থাকে বহু বর্ণকৌশল একথা কিছুতেই কেউ বুঝতে চাইবে না? প্রত্যেকটা মানুষ কেন নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা নয়, তাই নিয়ে সমালোচনা করবে? বিরক্ত হবে?

ট্রেন এসে গিয়েছিল।

ফার্স্টক্লাস একখানা কামরায় উঠে বসলেন সংবরণ চৌধুরী। চলন্ত গাড়িতে লেখবার জন্যে বৃথা চেষ্টা করলেন না, জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে শুধু ধারাবাহিকতাটাকে অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলেন।

বিষ! বিষ! বিষ!

ভয়ংকর ওই শব্দের হাতুড়িটা একেবারে চৈতন্যের গভীর মূলে একটা প্রচণ্ড ঘা দিয়েই যেন সব অন্ধকার করে দিয়েছিল। সেই গাঢ় অন্ধকারের জমাট দেয়াল ভেদ করে আস্তে আস্তে আলোর আভাস দেখা দেয়, অসাড়চিত্ত চেতনার স্তরে উঠে আসে; একটা অন্তহীন বিস্ময় আর অপরিসীম অভিমান বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে এক অজানা জগতের দিকে।

কেন? কেন? কেন?

এই তীব্র প্রশ্নের ছুরি কুরে কুরে খেতে থাকে স্তব্ধ নিস্পন্দ একখানা কিশোর দেহের মধ্যে অবস্থিত সদ্যোন্মেষিত মনকে।

বালি-খসা বহুবিধ দাগে কলঙ্কিত ময়লা দেওয়াল, জরাজীর্ণ আধময়লা বিছানা, মাথার কাছে একটা কেরোসিন, কাঠের টুলের ওপর পল-কাটা মোটা কাচের গ্লাসে একটু কাগজ চাপা দেওয়া আধগ্লাস দুধ-বার্লি, ছোটো একটা পাথরবাটিতে গোটা কয়েক শুকিয়ে-ওঠা পানিফল, অথবা করাটে কোঁকড়ানো একটা ন্যাসপাতি!

চোখ খুললেই এই দৃশ্য।

কে তবে চাইবে চোখ খুলতে?

তবু চোখ খুলতে হয়।

শীর্ণ মাতৃমুখ অশ্রুসজল দুটি চোখ মেলে আস্তে আস্তে ডাকে, 'খোকা, খোকা, সাগর! বাবা আমার, চোখ খোল, খা একটু।'

ফল নয়, শুধু সেই দুধ-বার্লিটা!

বিকৃত মুখে সেটা গলায় ঢেলে রোগী আবার পাশ ফিরে শোয়। যেন মৌনব্রত নিয়েছে।

কিন্তু মৌনব্রত নেব বললেই কি নেওয়া যায়? নিতে পাওয়া যায়? যায় না। জগত এত দয়ালু নয় যে বলবে, 'আহা থাক গে ওর পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে তো পড়েই থাক! কথা বলতে মন নেই তো না-বলুক কথা।'

বলবে না তা জগত সংসার।

সে অবিরত তোমাকে খোঁচাবে, কী হয়েছে? কী হয়েছিল?

মা-ও সেই প্রশ্নই করেন, 'কী হয়েছিল সাগর, বল কী হয়েছিল?'

কিচ্ছু হয়নি?

কে বিশ্বাস করবে সেকথা? অত বড়ো একটা ঘটনা কি অকারণে ঘটে?

তাই মা কাছে এসে বসলেই ভয় করে সাগরের। জানে মা তার কঙ্কালসার দেহখানায় খানিকক্ষণ হাত বোলাবেন, দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, তারপর বলবেন, 'তোকে টেনেহিঁচড়ে বার করে নিয়ে তো গেল, তারপর কী হল বল দেখি? কোথায় গেল? কী করল সেখানে? কারা ছিল সে-বাড়িতে? কাদেরই-বা বাড়ি? যার অসুখ দেখতে গিয়েছিল তার খবর কী দেখলি?'

ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন।

প্রতিটি অবসর মুহূর্তে।

মা যেন ডুবুরি নামিয়ে সমুদ্রের তলার রহস্যটা ভেদ করে নিতে চান। যেন সাগরের সমস্ত মুহূর্তগুলো টোকা দিয়ে দিয়ে দেখতে চান কোন মুহূর্তটা দুর্বল খিন্ন। যেন তেমনি কোনো একটা দুর্বল অসতর্ক মুহূর্ত পেয়ে গেলেই কাজ মিটে যায় মা-র।

কিন্তু সাগর কেন তা মিটতে দেবে?

সাগর কি মৃত্যুর কাছে বিশ্বাসঘাতক হবে?

বলে দেবে, কোথায় গিয়েছিলাম জানো? ওর বাপেরবাড়িতে—

না, সেকথা কিছুতেই বলা যায় না। অন্তত সাগর পারবে না।

সাগরকে তাই কথা বানাতে হয়।

বলতেই হয় 'কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। কলকাতার সব রাস্তা কি আমি চিনি?'

—তবু?

—তবু বলে কিছু নেই। অজানা জায়গা অজানাই থাকে।

—কীরকম দেখতে বাড়িটা?

মা ক্রমশ সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু সমস্ত পৃথিবী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও কি সাগর বলবে কোথায় গিয়েছিল সেদিন? শুক্তির বাপেরবাড়ির পুরোনো চাকরটাই মন্ত্রগুপ্তি করে রেখেছে, তো সাগর!

অবশ্য তার মন্ত্রগুপ্তির কারণ আছে। প্রতিক্ষণ, প্রতিনিয়ত যে সে পুলিশের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে।

তবু আছে তো মুখে তালাচাবি দিয়ে?

সাগর পারবে না তা?

পুলিশের ভয়ের ঊর্ধ্বে কি কিছু নেই?

তাই সাগর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বলে, 'বাড়ি আবার কীরকম দেখতে? বাড়ির মতো।'

—সব বাড়ি কি সমান? এই তোদের বাড়িটাও বাড়ি, ওদের বাড়িটাও বাড়ি!

—ওদের অর্থে অবশ্য শুক্তিদের।

হঠাৎ মাকে কুৎসিত শ্মশানচারিণীর মতো মনে হয় সাগরের। মা-র ওই জল ভরা-ভরা চোখের নীচে যেন কী এক ক্রূরতার আগুন, ওই করুণ করুণ শীর্ণ মুখের অন্তরালে এক ক্রোধাতুরা হিংস্র নারী—যেন মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত ধাওয়া করে কাউকে শাস্তি দিতে চায়। যেন চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে এনে নিষ্ঠুর কঠোর প্রশ্ন করতে চায় 'কেন কেন কেন তুই আমার ছেলেটাকে—?'

ওই হিংস্রতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না সাগর। পাশ ফিরে শোয়।

কিন্তু মা হার মানতে রাজি নয়।

শিখিয়ে পড়িয়ে একসময় মেয়েটাকে পাঠান।

ঝুমি সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে এসে কাছে বসে।

—উনি তারপর তোকে কী বললেন রে দাদা? যখন তুই ওঁর সঙ্গে গাড়িতে উঠলি?

সাগর ধড়মড় করে উঠে বসে।

তীব্র স্বরে বলে, 'তোরা আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দিবি?'

রোগা শরীর সহসা উত্তেজনায় ঘেমে ভিজে কেঁপে একসা হয়। তবু সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চায়। আর কানে এসে বাজে, 'কেন মিথ্যে ওর কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছ ছোটোবউ? দেখছ না তোমার ওই ছেলেটি ভাঙবে তবু মচকাবে না। আমি বরাবর বলিনি ছেলেটি তোমার বয়সে খোকা, ভেতরে খোকা নয়।' এ গলা জ্যাঠাইমার।

শুনতে পায় জ্যাঠামশাইয়ের ভারী ভারী বিরক্ত কণ্ঠ, 'পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে আমার। সবাইয়ের এক প্রশ্ন আপনার ভাইপোকে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিলেন উনি আগের দিন! কী হয়েছিল সেখানে? অথচ ভাইপোর মুখ থেকে একটা ওয়ার্ড বার করতে পারা গেল না।'

বুড়ি ঠাকুমার ভাঙা-ভাঙা গলায় আক্ষেপও শোনা যায় মাঝে মাঝে। বাতের ব্যথায় ঘর ছেড়ে বেরোতে পারেন না তিনি, ঘর থেকেই চ্যাঁচান, 'তোমরা কেউ আমার কথা কানে নিচ্ছ না বউমা, কিন্তু এই তোমাদের বলে দিচ্ছি সেই সর্বনাশীর 'দৃষ্টি' লেগেছে ওর ওপর! নইলে জ্বর নয় জ্বারি নয়, ছেলে বিছানা থেকে উঠতে পারে না, পড়ে পড়ে কঙ্কালসার হচ্ছে? একবার যদি কেউ ওতোরপাড়ার 'যোগিনী মা-র' কাছে যেত তো একটা রামকবচ দিতেন—'

কিন্তু কে শুনছে তাঁর কথা? কে যাচ্ছে উত্তরপাড়া?

সাগরের মা-র প্রাণটা হয়তো ছুটে যায়, কিন্তু শুধু প্রাণের ক্ষমতা কতটুকু? অতএব যোগিনী মা-র রামকবচ সাগরের অঙ্গে ওঠে না।

আচ্ছা উঠতে চাইলেই কি উঠত? উঠতে পেত? সাগর ধারণ করত সেই কবচ অপঘাতে মরা অপদেবতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে?

যে-সাগর মায়ের নির্দেশে ঘড়ি ফেরত দিতে গিয়েছিল, সেই সাগর কি আছে?

বয়সের সাগর?

এক রাত্রির মধ্যে অনেকগুলো বছর পার হয়ে আসেনি কি সে?

আচ্ছা সাগর যে অবোধ ছিল, অজ্ঞান ছিল, ছেলেমানুষ ছিল, সেটাই কি অস্বাভাবিক নয়? অস্বাভাবিক বলেই একরাত্রির মধ্যে বয়েস বেড়ে গেল না কি ওর?

ও যদি অজিতের মতো স্বাভাবিক হত তাহলে?

অজিতের তো বয়েস বাড়বার জন্যে ভয়ানক একটা কিছু ঘটেনি? অজিত তো এই ছোটো গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আছে। হ্যাঁ তাই আছে, তবু অজিত যখন-তখন সাগরের ঘরে এসে হানা দেয়।

মুখটাকে কুৎসিত হাসিতে পাকা পাকা করে বলে, 'নেব্বাবা বিরহে যে একেবারে শয্যে নিলি! খুব দেখালি বটে যা হোক! উঠছে আর মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ছে! হি-হি-হি! ইস্কুলের ছেলেরা শুনে হি-হি মাষ্টাররাসুদ্ধ হি-হি.....জিজ্ঞেস করছিল, 'ব্যাপারটা কী হে অজিত?' হি-হি-হি, ...মাস্টারদের তো বলতে পারিনে শোক লেগেছে সাগরের! তাই হি-হি হি..... বললাম কী, স্যার ঠাকুমা বলছে অপদেবতায় ভর করেছে সাগরকে। পাড়ায় একজনা বিষ খেয়ে মোলো তো? হি-হি.....মাস্টারদের কী কৌতূহল,

কেন বিষ খেল, মেয়েছেলেটার বাড়িতে কে আছে, সাগরের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক—'হি-হি-হি, ...ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, সম্পর্ক কী তা জানি না স্যার, তবে সাগর যা করছে, বউ মরার বেশি। হি-হি-হি..... বললাম না। শুধু বললাম সম্পর্ক কিছু না স্যার। সাগরকে একটু সুনজরে দেখতেন।'

সাগরের যদি তখন দেহে শক্তি থাকত, সাগর কি উঠে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে অজিতের নাকটা থেঁতো করে দিত? ভেঙে গুঁড়ো করে দিত ওর ওই সাতজন্মে ভালো করে না-মাজা হলদে হলদে দাঁতগুলো?

কী করত কে জানে।

প্রমাণ হল না কিছু।

শক্তি ছিল না তখন সাগরের। তাই সমস্ত প্রচণ্ডতাকে ভিতরে সংহত করতে হল। আর তাই করতে করতেই ক্রমশ বড়ো হয়ে যেতে লাগল সাগর। বড়ো হয়ে উঠলে অবোধ ছেলেটার চোখের সামনে থেকে যেন একটা অন্ধকারের যবনিকা গুটিয়ে যেতে লাগল আস্তে আস্তে।

মানুষ কেন এমন?

এই ভাবতে ভাবতে মানুষের হৃদয়গহ্বরের সমস্ত তত্ত্ব যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে।

গাড়ি ছুটছিল।

এবং যথানিয়মে মনে হচ্ছিল পথটাই ছুটছে। ছুটছে গাছপালা, মাঠ, পুকুর। সংবরণ চৌধুরী ভাবছিলেন ছেলেবেলা থেকে এই একই রহস্য! জানি আমি ছুটছি, তবু মনে হচ্ছে আমি অচল বসে আছি ওরাই দ্রুত দৌড়োচ্ছে।

আচ্ছা কবে আমি প্রথম রেলগাড়ি চড়েছিলাম?

সংবরণ কি ভুলে গেছেন?

প্রথম রেলগাড়ি চড়ার স্মৃতি কি কেউ ভোলে?

হতভাগ্য শিশুদের শৈশবস্মৃতি কী লজ্জাকর, কী গভীর দৈন্যে নিষ্করুণ!

কিন্তু সংবরণ চৌধুরীর শৈশবটাও অমন মুখচুন করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সংবরণ কি সার্থক সাহিত্যিকের মতো তাঁর গল্পের নায়ক সাগরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন?

সাগরকে কোথায় যেন ছেড়ে এসেছিলেন?

ভাবতে লাগলেন সংবরণ।

ঠিক মনে পড়ল না।

চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল।

পড়ন্ত বিকেলের আলো গায়ে-মুখে মেখে একটা ছেলে হেদোর ধারে বসে আছে। রুগ্ন চেহারা, শুকনো মুখ, মাথার চুলগুলো কুচি কুচি করে ছাঁটা। রক্তশূন্য হাত-পাগুলো এই পড়ন্ত রোদে যেন আরও হলদে দেখাচ্ছিল।

ছেলেটা কি কিছু ভাবছিল?

ভগবান জানেন সেকথা।

তবে মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না কিছু ভাবছে। শূন্যদৃষ্টি মেলে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়েই ছিল শুধু।

যে-আকাশ দেখে কবি লিখেছিলেন—

'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।'

আশ্চর্য অনুভূতি!

আশ্চর্য উপমা।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বাঘের থাবার মতো একটা থাবা রাখল সাগরের কাঠির মতো সরু কণ্ঠার হাড়টার উপর।

চমকে ফিরে তাকাল সাগর, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হিম হয়ে গেল।

বুঝল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এ থাবার কবল থেকে বেঁচে ফেরা সম্ভব হবে না সাগরের পক্ষে। কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চিত মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শের মধ্যে কাটাল সাগর, মায়ের কথাটা মনে পড়ল এক বার, তারপর সহসাই ভিতর থেকে শক্ত হয়ে উঠল।

মরে তো মরবে, কী এসে যাবে তাতে পৃথিবীর। মা দু-দিন কাঁদবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনো মৃত্যুরই সাধ্য নেই পৃথিবীকে থামিয়ে রাখতে পারে, সংসারকে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

সাগরের যখন বাবা মারা গিয়েছিল, সাগর তখন নিতান্তই বালক, তবু স্পষ্ট মনে আছে সাগরের। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে, বাবা মারা যাবার পরদিনই সাগরের মা বিশ্রী সাদা শক্ত খড়খড়ে একটা কাপড়ের টুকরো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ভাত রান্না করতে বসেছেন। তাও রান্নাঘরের মধ্যে লোকের চোখের আড়ালে নয়। দালানের একধারে সবাইয়ের সামনে বিশ্রী একটা ইটের উনুনে কাঠ জ্বেলে জ্বেলে।

সেই কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছিল সাগরের, জল পড়ছিল গরম আগুন আগুন। রান্নাঘরের উনুনটাও কি বাবার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে! ভেবেছিল সাগর। আর ভেবেছিল, কাল যখন মা পাগলের মতো মাথা ঠুকে ঠুকে মাটিতে পড়ে কাঁদছিল, তখন কি সাগর ভাবেনি জীবনে মা আর ওই মাটিটা, থেকে উঠবে না!

অতএব মা-র জন্যে ভাবনার খুব বেশি কিছু নেই।

ঝুমি?

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও সকলের কথা। ওদের ছেড়ে যেতে হবে এইজন্যে তিলমাত্রও দুঃখ নেই সাগরের।

ক্ষতির মধ্যে সাগরের কলেজে পড়াটা হবে না, স্কলারশিপটা পাওয়া হবে না। না-হোক। চুলোয় যাক সব। মরতে কোনো দুঃখ নেই সাগরের। বরং মরতে পেলেই বেঁচে যায়।

অতএব এক ঝটকায় থাবামুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ানো যায়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র স্বরে বলা যায়, কী? কী বলছেন?

বাঘের থাবার মালিকের সেই লালচে মুখটা যেন একটু তামাটে হয়ে গেছে, ফুলো ফুলো নাকটা যেন একটু কুঁচকে গেছে।

কেন?

কী ক্ষতি হয়েছে ওর? কতটা লোকসান? কিছু না, কিছু না, স্রেফ থানা-পুলিশের ঝামেলা। সাগর শুনেছে পুলিশ এসেছিল সেদিন ওর বাড়িতে। মিলিটারি বলেও ছেড়ে কথা কয়নি।

—কী! কী বলছেন?

এই প্রশ্নে ও বোধ করি একটু চকিত হল। বোধ করি এই তীব্রতাটা ওর ধারণায় ছিল না। একটু যেন অবাক হল, তারপরে, মুহূর্ত পরেই কটু কুৎসিত একটা হাসির সঙ্গে বলে উঠল, 'বলব আর কী! বলবার আছেই-বা কী? হতভাগ্য প্রেমিকের বিরহবেদনা দেখছিলাম দূরে দাঁড়িয়ে।'

সাগর ছিটকে খানিকটা সরে গিয়ে বলে ওঠে, 'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না।'

—কথা বলতে আসব না? তাই নাকি? কিন্তু তোমার সঙ্গেই যে এখন আমার কথা বলার দরকার হে। 'মিলিটারি' তেমনি বিশ্রী আর খানিকটা হেসে বলে ওঠে, 'তা ছাড়া তুমিই তো এখন আমার ভরসা! বউ মরে গেলে বউয়ের লাভারই সবচেয়ে নিকট জন? কি বলো হে তাই না? তবু তো বউয়ের সঙ্গের, বউয়ের অঙ্গের, বউয়ের প্রেমরঙ্গের আস্বাদ কিছুটা পাওয়া যায়।'

—আপনি চলে যান!

—আরে ব্যাস! এ যে দেখছি ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয়ে উঠেছে। চেহারাটা তো বানিয়ে তুলেছ পচা পোকার মতো। কীসে হল? শোকে, না রোগে?

—আপনার কোনো কথার আমি উত্তর দেব না।

—উত্তর দেবে না? বলো কী হে প্রতিদ্বন্দ্বী? তোমার কাছে যে প্রশ্ন ছিল গোটাকতক।

—উত্তর দেব না! আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না করে।

—ঘেন্না! একেবারে ঘেন্না? কথাটথাগুলো বড্ড বেশি কড়া হয়ে যাচ্ছে না ছোকরা? নেহাৎ তুমি আমার প্রেয়সীর 'লাভার' তাই এমন বেচাল বোলচাল দিয়েও এ যাত্রা তরে গেলে। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করলে—

—তরতে আমি চাই না। যা পারেন করুন-না। কী করবেন, মারবেন? মেরে ফেলবেন? ফেলুন! তাতে কিছু ক্ষতি হবে না আমার!

এই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেলেন সংবরণ, ওই রোগা হ্যাংলা, হলদে পোকার মতো দেখতে হয়ে-যাওয়া ছেলেটা তার কুণ্ঠিত ত্রস্ত ভয় ভয় ভাবটা ত্যাগ করে হঠাৎ এমন দৃপ্ত হয়ে উঠল কী করে? কে দিল এই সাহস?

ভাবলেন। তারপর ঈষৎ কৌতুক বোধ করলেন।

ভাবলেন, একেই বোধ করি 'মরিয়া' বলে! ওই লোকটাকে চিরদিনই এমনই ঘেন্না করেছে সাগর। চিরদিনই ইচ্ছে হয়েছে ওর মুখের ওপর যা তা করে শুনিয়ে দিতে, ধিক্কারে জর্জরিত করে দিতে, কিন্তু পারেনি। কখনো পারেনি। অবচেতনে টের পেয়েছে সে-ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যন্ত্রণা পাবে আর একটা মানুষ।

হ্যাঁ, শুধু সেই মানুষটার মুখ চেয়েই ওই বদমাইস লোকটাকে এতদিন ভয় করে এসেছে সাগর। নিজের জন্যে নয়।

কিন্তু আর এখন কীসের ভয়?

আর কার মুখ চাইবার আছে?

দিক-না ও সাগরের গলা টিপে। টিপে টিপে মেরে ফেলুক। ফেলে দিক এই হেদোর জলে। কোনো দুঃখ নেই সাগরের। আছে শুধু আনন্দ। তারপর তো পুলিশ আসবে। ধরে নিয়ে যাবে ওকে থানায়। বিচার হবে খুনের!

আর খুনের শাস্তি যে কী, তা ভালো করেই জানে সাগর।

লোকটার ফাঁসি হবে ভেবে ভয়ানক একটা উল্লাস অনুভব করল সাগর।

মৃত্যুদণ্ড! হ্যাঁ, উচিত শাস্তি।

জজ যদি মৃত্যুদণ্ড দিতে ইতস্তত করে, মরে-যাওয়া সাগর প্রেতলোক থেকে দৈববাণী করবে, স্যার, ও শুধু একটাই খুন করেনি, দু-দুটো খুন করেছে।

মিলিটারি ডাক্তার কিন্তু আর রেগে উঠল না। হঠাৎ ভয়ানক একটা শব্দে হা-হা করে হেসে উঠল। দমকে দমকে হাসি।

তারপর ভুরুটা ঊর্ধ্বে তুলে বলল, 'বটে নাকি? এত দূর? মরে গেলেও ক্ষতি হবে না? এ যে সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস অবস্থা হে। কেঁচো কেন্নোর মধ্যে এমন গভীর প্রেম! তাজ্জব লাগিয়ে দিচ্ছ যে! এই বয়সে এত পাকা হয়ে উঠেছ কী করে বলো দিকি? ঘুড়ি উড়িয়ে আর ডাংগুলি খেলে বেড়াবার তো বয়েস। সেই বয়সে একটা রেসপেক্টেবল ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রেম, তার শোকে মৃত্যুইচ্ছা, এসব আসছে কোথা থেকে?'

সাগরের ইচ্ছে হয় ওই লোকটাকে ঠেলে জলে ফেলে দেয়। কিন্তু সেই অসম্ভব ইচ্ছের আর মূল্য কী?

অতএব দাঁতে ঠোঁট চেপে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিলিটারি ডাক্তার আবার তেমনি ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, 'তা জগতে সবই সম্ভব। একটা রেসপেক্টেবল ভদ্রমহিলাই যদি তোমার মতো একটা গুবরে পোকাকে "মনের মানুষ" বলে ভাবতে পারে, তোমার আর দোষ কী? মাথা ঘুরে গেছে। তা যাক গে, ক্ষমাই করে ফেলছি তোমাকে। তোমার মতো নিকৃষ্ট জীবকে—'

সাগর ঝট করে ঠিকরে ওঠে, ঝলসে ওঠে, —ক্ষমা? ক্ষমা করতে এসেছেন আমাকে? আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো আপনি! কে চায় আপনার মতো নিকৃষ্ট লোকের ক্ষমা। বলছি তো যদি সাহস থাকে তো মেরে ফেলুন আমাকে! তা সাহস থাকলে তো! ফাঁসি যাবার ভয় আছে যে। তাই ক্ষমা করতে এসেছেন!

সাগর কি নিজেই নিজের বীরত্বে মুগ্ধ হচ্ছে? তাই ক্রমশই সেই মুগ্ধতায় মোহগ্রস্ত হচ্ছে, নেশাচ্ছন্ন হচ্ছে? নইলে নিজে সাগর কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে ওই লোকটার মুখের ওপর এভাবে কথা বলবে? বলতে পারবে?

'কিছু নয়' কি ওই আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে? সে কি তার পাজি বরটার অপমান দেখে মুখ টিপে হাসছে? না কি ভুরু কুঁচকে ভারী ভারী মুখে বলে উঠতে চাইছে, 'সাগর! কী অসভ্যতা হচ্ছে?'

না, কক্ষনো না।

কক্ষনো 'কিছু নয়' ওই লোকটার অপমানে বিচলিত হচ্ছে না। আর ভুরুও কোঁচকাচ্ছে না! ওসব তো ছিল তার সংসারের লোককে দেখবার জন্যে। এখন আর দেখবার প্রশ্ন কোথায়? এখন তো সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় চলা। তবে আর মুখ টিপে হাসবে না কেন 'কিছু নয়!' কেন সেই চাপা হাসি হাসি মুখে বলে উঠবে না 'সাবাস! সাবাস দিচ্ছি তোকে সাগর, খুব বলেছিস, বেশ বলেছিস!'

সাগর চমকে উঠল। চমকে উঠল নিজের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনে।

শুক্তি নয় শুক্তির সেই পাজি বরটাই বলছে, 'বাঃ! বাঃ! সাবাস! বেশ বলেছ, খুব বলেছ। হুঁ, যেমন মিনমিনে নেংটি ইঁদুরটি ভাবতাম, তেমন তা নয় দেখছি। তাহলে তোমার মতে ক্ষমা করতে না চেয়ে ক্ষমা চাওয়াটাই উচিত ছিল আমার? মন্দ নয়। তবে নাহয় সেটাই চাওয়া যাক হে গিনিপিগ! এই অভাগা পত্নীহারা প্রবঞ্চিত স্বামীকে নাহয় ক্ষমাই করে ফ্যালো তুমি। অনেক দিন পরে বাড়িতে আজ তোফা মুরগি রান্না হচ্ছে দেখে এসেছি, চলো একটেবিলে বসা যাক।'

সাগর বেপরোয়া। সাগর নিশ্চিত।

সাগর টের পেয়েছে মরে যাওয়া 'কিছু নয়' আকাশ থেকে সব দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে। আর ওর ওই বদমাইস বরটার দুর্দশায় হেসে কুটি কুটি হচ্ছে।

অতএব সাগর চালিয়ে যাবে। যতক্ষণ-না ওই লোকটা, ওই বদমেজাজি গোঁয়ার লোকটা সাগরকে মেরে ফেলবে, ততক্ষণ চালিয়ে যাবে সাগর। তাই সাগরও ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে ওঠে, 'কেন? গুলি করে মারবার সাহস নেই, তাই খাদ্যে বিষ মিশিয়ে? যা আপনার নিজের বউকে—'

—ব্যাস! ব্যাস! মিলিটারি ডাক্তার ভরাট ভরাট গলায় বলে ওঠেন, 'পাড়ায় যা রাষ্ট্র হয়েছে তুমিও সেটাই সত্যি বলে ধরে নিয়ো না। বিষ সে নিজেই খেয়েছিল, আমি খাওয়াইনি। বুঝলে হে আরশোলা। আমি যদি ঘটনাকে নিজের হাতে নিতাম তাহলে অনেক আগেই সব কিছু ফিনিস হয়ে যেত। গুলিতেই হত। কিন্তু সত্যিই তো আর একটা ব্যাঙাচিকে আমার 'রাইভ্যাল' ভাবতে পারি না? আমার একটা প্রেস্টিজ আছে তো? তা ছাড়া ব্যাপার কী জানো? সেই নোংরা যাচ্ছেতাই মহিলাটিকে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম তাকে আমি স্রেফ অবহেলা করি! সে উচ্ছন্ন গেল কি চুলোয় গেল তাতে কিছু এসে যায় না আমার। বুঝলে? বুঝতে পারছ? প্রেম বোঝো, প্রেমতত্ত্বই কি আর না-বোঝো?'

সাগর বুঝতে পারেনি, কিন্তু সংবরণ বুঝতে পারছেন লোকটা মদ খেয়েছে, প্রাণভরে মদ খেয়েছে। তাই অমন বেসামাল কথাবার্তা।

সাগর বোঝেনি। সাগর একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। লোকটাকে এত বেশি কথা বলতে সে কোনোদিন দেখেনি। বউ মরে কি আরও পাজি হয়ে গেল লোকটা? না কি একটু 'পাগল পাগল?'

—কী হল চুপচাপ হয়ে গেলে যে? তাহলে মৌনং সম্মতি লক্ষণম? এক প্লেট মুরগির ঝোল চলবে?

—আপনার বাড়িতে খেতে যাব? আমি? বলতে লজ্জা করছে না আপনার?

—লজ্জা? বলো কী হে? হা-হা-হা! লজ্জা করবে আমার? বলি কথাটা বলতে লজ্জা হওয়া তো তোমারই উচিত ছিল। আমার বাড়িতে, কী বলে, তোমার গিয়ে খাওয়া-দাওয়া তো বেশ রামরাজত্ব করেই চলত দেখেছি।

সাগর সহসা মাথার মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণা বোধ করে। সাগর সহসা অসহায়তা অনুভব করে। এতক্ষণ ধরে যে-জোর নিয়ে লোকটাকে কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছিল সেই জোরটাকে আর খুঁজে পায় না।

আর—

আর সঙ্গে সঙ্গে 'কিছু নয়'-এর ওপর একটা তীব্র অভিমানে সমস্ত মনটা আলোড়িত হয়ে ওঠে।

কেন, কেন 'কিছু নয়' সাগরকে ধরে ধরে রাজ্যের জিনিস গেলাত। ওই খাওয়ার জন্যেই তো নিজের বাড়িতে প্রতিনিয়ত হেয় হয়েছে সাগর, আর আজ আবার তার হাজারগুণ হেয় হতে হল। এই লোকটা, এই লোকটা তো জানে সাগর তার বাড়িতে খেত। তার পয়সাতেই খেত! সাগর যে-মাস্টারের সাহায্যে ভালো করে পাস করল, সে-মাস্টারের খরচ জুগিয়েছে 'কিছু নয়' কার পয়সায়? ওই পাপ ঘড়িটা, শনি-রাহু-শয়তান ঘড়িটা কার পয়সায় কিনেছিল 'কিছু নয়'? সব তো এই পাজিটার পয়সা।

তবে?

তবে কেন সাগরকে সেইসব নিতে খেতে এত সাধ্যসাধনা করেছে 'কিছু নয়?' স্রেফ সাগরকে হেয় করে রাখতে ছাড়া আর কী! এই লোকটা আজ সাগরের মুখের ওপর খাওয়ার খোঁটা দিতে পারল, কার দোষে সেটা?

সাগরকে নীরব হয়ে যেতে হল ওর ব্যঙ্গ হাসিতে, ওর বিদ্রূপ বাক্যে।

এতক্ষণ পরে চোখে জল এল সাগরের। আকাশের দিকেও চাইতে ইচ্ছে হল না তার। তাকিয়ে রইল জলের দিকে।

মিলিটারি ডাক্তারও একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল, তারপর কেমন যেন ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'তা মাঝখানের মূল বস্তুটাই যখন রইল না, তখন আর তোমার সঙ্গে আমার মেলামেশায় আটকটা কী বলো?

—মেলামেশা!

সাগরের কণ্ঠে আবার তীব্রতা আসে!

মিলিটারি মৃদু হেসে বলে, 'আ-হা, নাহয় মেলামেশা না হল। কিন্তু শত্রুপক্ষ ভাববার কারণটাও তো নেই আর? তবে? তবে আর আমার দু-একটা কথার জবাব দিতে তোমার আপত্তি কী?

সাগরের মতো বয়সের ছেলের পক্ষে গলার সুরে যতটা তাচ্ছিল্য হানা সম্ভব, তা হেনে সাগর বলে, 'আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করতে চান, আমি তার উত্তর দেব না।

—জানো? আমি কী প্রশ্ন করব তা তুমি জানো? বলো কী হে! তুমি যে ক্রমশই তাজ্জব করছ আমাকে। বলো তো আমার প্রশ্ন কী?

সাগর যেন এবার এই লোকটার ওপর প্রভুত্ব করছে, যেন এই লোকটাকে খেলাতে পাচ্ছে, তাই সাগর চলে যাচ্ছে না এর সঙ্গ ত্যাগ করে। সাগরের জীবনে এ এক নতুন আস্বাদ। নিজের এই নতুন রূপে নিজেই বিহ্বল হচ্ছে সাগর।

নিজের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে যেন।

সেই অসহায়তাটা আর অনুভব করছে না সাগর। তাই সাগর ওর কথার জবাব দিচ্ছে—প্রশ্ন আবার কী? সেদিন কী হয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল সে তোমার সঙ্গে, শেষ কী কথা হয়েছিল, এইসব তো! জানি। কিন্তু উত্তর আমি দেব না।'

—হুঁ! একখানি জিনিয়াস! এখন যেন ধীরে ধীরে অনুমান করতে পারছি ভদ্রমহিলা কেন এত পেয়ার করতেন। কিন্তু উত্তরটা দেবে না কেন বলো দিকি?

—দেব না! আমার ইচ্ছে নেই।

—আর আমি যদি বলি বাড়ি থেকে সরে পড়ে দু-জনে একটু নোংরা আমোদ করতে গিয়েছিলে? বেশ ইয়ংম্যানটি তো হয়ে উঠেছ—

হঠাৎ থেমে পড়তে হয় মিলিটারি ডাক্তারকে।

সাগর তার বাহুর একটা অংশ কামড়ে ধরেছে।

সংবরণ দেখতে পাচ্ছেন, হিংস্র জন্তুর মতো দেখাচ্ছে সেই নিতান্ত দুর্বল রোগা ছেলেটাকে। চোখ দুটো জ্বলছে ধক ধক করে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে পাতলা জিরজিরে বুকটা ওঠা পড়া করছে তার।

কিন্তু মিলিটারি ডাক্তারের মুখটাও তো হিংস্র হয়ে ওঠার কথা! তা হল না কেন? কামড় খেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল কেন তার দীর্ঘোন্নত শরীরের উপরে অবস্থিত সেই দীর্ঘনাসা দৃপ্ত মুখটা?

কারণ বোঝা না যাক দেখা তো যাচ্ছে।

মুখটা বাস্তবিকই প্রসন্ন দেখাচ্ছে ডাক্তারের।

কণ্ঠে কৌতুকের আভাস।

—থাক! থাক! এ 'মাসলে' দাঁত বসাতে গেলে তোমার ওই পোকায়-খাওয়া দাঁতগুলো 'পটপট' করে ভেঙে যাবে হে খোকা। বেশ তো দোষের যদি কিছু না থাকে, বলতে তোমার আপত্তি কী? অন্ধকারে হাতড়ে মরে মরে প্রাণটা যে গেল আমার।

সাগর অবশ্য এক বার কামড় দিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। হাঁপাচ্ছিল সরে এসে। এবার বিদ্রূপহাস্যে বলে ওঠে, 'প্রাণ? আপনার প্রাণটা গেল? ও-প্রাণ যাবার নয়।'

ডাক্তার হাতের ওপরকার সেই কামড়ানো জামার কোঁচকানোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'ব্যাপারটা কী বলো তো হে! সব বুঝে ফেলেছ? তুমি যে ক্রমশই আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলছ হে। আমার সেই মৃতা স্ত্রীর মতো আমিও তোমার প্রেমে পড়ে যাব নাকি শেষপর্যন্ত। নাঃ, বাস্তবিকই তোমার দৃঢ়তায় মোহিত হচ্ছি আমি। কিন্তু ব্যাপারটা জানা আমার বড়ো দরকার ছিল হে। তুমি বড়ো নিষ্ঠুরতা করছ। মরতেই যখন রাজি তুমি, তখন আর ভয়টা কী দেখাব! কিছু টাকা চাও? চাও তো চলো। একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার! হাজারটা টাকা পেলে তাই থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতে বালক। বৃথা জেদটা ছাড়লেই ওটা পেয়ে যাও।'

হাজার টাকা!

কেমন না-জানি দেখতে সেটা। সত্যিই হয়তো বাকি জীবনটা তাই দিয়েই সামলে নেওয়া যাবে। হয়তো সেই টাকাটা দিয়ে একটা ব্যাবসা ফাঁদলে, রাজার মতো বড়োলোক হয়ে যাবে সাগর!

মুহূর্তকালের জন্য এই ধাক্কাটা যেন মগজের মধ্যে একটা তোলপাড় কাণ্ড ঘটাল, কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যই। পরমুহূর্তেই সাগর শুনতে পেল সাগরের গলা বলছে, 'আপনার টাকা গঙ্গায় ফেলে দিন গে যান। কেউ ছোঁবে না আপনার টাকা।'

আশ্চর্য!

সংবরণ যেন সাগরের কাহিনিটি সব স্পষ্ট চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছেন। কী করে পাচ্ছেন? সেসব কোন জন্মের শোনা কাহিনি! সাহিত্যিক বলেই কি সংবরণ-চৌধুরীর এই অন্তর্দৃষ্টি?

তা হয়তো সেই অন্তর্দৃষ্টির বশেই দেখতে পাচ্ছেন সংবরণ দুঁদে লোকটার মুখটা যেন ঝুলে পড়ল। ঘাড়টা নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে বলল সে, 'কিন্তু তোমাকে কিছু দেবার ছিল আমার। টাকা নয়, ছেঁড়া কাগজ। তোমার সুইট হার্ট যে লিখত গো বসে বসে খাতা ভরতি করে করে। মরবার আগে খাতাগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি করে সারা ঘরে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল। গুটিয়ে প্যাকেট করে তুলে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম দেখব কী রহস্য লুকানো আছে তার মধ্যে। পারলাম না। ধৈর্য হল না। ছেঁড়া পাতা জুড়ে জুড়ে পাঠোদ্ধার করবার ধৈর্য হল না। আর কাকেই-বা দেখাতে যাব বলো? কে বলতে পারে ঝাঁপির ভিতর কেউটে বসে আছে কি না! একমাত্র তোমাকেই..... 'কথার মাঝখানে পকেট থেকে ছোটো ফ্লাস্ক বার করে গলায় ঢেলে নেয় ডাক্তার। আর দেখে হেসে ওঠেন সংবরণ, বোকা সাগরটা শিউরে উঠে বলছে, 'মদ খান আপনি?'

প্রচণ্ড একটা হাসির শব্দে আশপাশের লোকগুলো সচকিত হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে সাগরও সচকিত হয়ে দেখল শেষ বিকেলের আলো কখন বিদায় নিয়েছে, গ্যাসের আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে মই ঘাড়ে করা লোকগুলো। এখানে-ওখানে কিছু লোক বসে।...জটলা করে কয়েক জন, একা একা কেউ। মিলিটারি ডাক্তারের হাসিতে তারা চমকে উঠেছে মনে হচ্ছে।

—কী বললে? মদ খাই! বলো কী হে! এ খবরটুকুও জানতে না এতকাল? তোমার বান্ধবী তবে কী ছাই গল্প করত তোমার সঙ্গে? মদ খাই তাই-না টিকে আছি পৃথিবীতে। বিনা মদে যারা এই পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে আমি তাদের ঘৃণা করি বুঝলে? ঘৃণা করি।

আবার পকেটে হাত দেয় ডাক্তার, আরও খানিকটা গলায় ঢালে। তারপর সহসাই একেবারে চুপ করে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে। মুখটা বুকের সঙ্গে ঠেকে আসে, পা দুটো ঘাসের ওপর ঘসতে ঘসতে বিজবিজ করে কী যেন বলে। অথবা কিছুই বলে না, শুধু নিশ্বাসের শব্দটাই—

এই থেমে-যাওয়া মূর্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে সাগর। এতক্ষণে বুঝি টের পায় সাগর, লোকটা মদ খেয়েই অত কথা বলছিল। ভিতরের কথা, গোপন কথা।

কিন্তু সাগর তো মদ খায়নি। সাগর তবে এ কী করে বসল? অধৈর্য হয়ে অসহিষ্ণু হয়ে হারিয়ে ফেলল হাতে আসা রাজৈশ্বর্য! সেই ছেঁড়া খাতাগুলো তো সাগরকেই দেখাতে চেয়েছিল লোকটা। দেখাবে বলেই খাওয়ার ছুতো করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছিল।...ওর বলার ধরন খারাপ তাই—

জীবনে আর কি কোনোদিন এ সুযোগ আসবে? আর কি কখনো ও বলবে, 'আর কাকে দেখাতে যাব বলো? এক তোমাকেই—'

হঠাৎ লোকটার ওপর ঘৃণা বিদ্বেষ আর রাগের তীব্রতাটা যেন অনেকখানি কমে যায় সাগরের। মনে হয় ওর মধ্যেও বুঝি কেবলমাত্র পেজোমোই নেই, কিছু দুঃখও আছে। গভীর দুঃখ। হয়তো সব লোকের সঙ্গে মেলে না, নিজের ধরনে আছে।

আছে। থাকে।

সকলের মধ্যেই কিছু-না-কিছু গভীরতা থাকে, দুঃখ থাকে, থাকে সূক্ষ্ম অনুভূতি। যাকে নিতান্ত স্থূল মনে হয়, নিষ্ঠুর মনে হয়, তার মধ্যেও থাকতে পারে বিষণ্ণ বেদনা। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে সেটা।

নইলে সাগর কি জানত সাগরের জ্যাঠামাইয়ের মধ্যে তেমন একটা বস্তু আছে? মাঝে মাঝে কটু কঠোর মন্তব্য আর বেশিরভাগ গম্ভীর নীরবতা, এই তো চেহারা জ্যাঠামশাইয়ের। ঘড়ির ব্যাপারে প্রথম একদিন চমক লেগেছিল, আর একদিন লাগল সে-চমক।

জ্যাঠামশাইদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল তখন সাগর। সাগর একটু রোজগার করতে শেখামাত্রই সাগরের মা পাগল করে তুলেছিল সাগরকে আলাদা হবার জন্যে। ঝুমির তখন বিয়ে হয়ে গেছে; শুধু মা আর ছেলে।

মা বলত, 'একবেলা একমুঠো তো খাই, তোর সংসারে গিয়ে তাও বরং আমি ছেড়ে দেব সাগর, তুই আমায় এক বারের জন্যে অন্তত এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যা। এই নরকের বাইরে গিয়ে যেন মরণনিশ্বাসটা ফেলতে পাই আমি।'

সাগর ভেবেছিল, এটা স্বার্থপরতা হবে। এতদিন এখানে থেকে, গোটা পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে-না-করতেই অহংকার দেখিয়ে চলে যাওয়াটা বড্ড বেশি দৃষ্টিকটুও হবে।

কিন্তু মা-র জেদেই শেষপর্যন্ত অন্য পাড়ায় একখানা ঘর যোগাড় করতে হয়েছিল সাগরকে।

হ্যাঁ, অন্য পাড়াতেই, মা বলেছিল তাই।

বলেছিল, 'একেবারে অন্য পাড়ায়। যাতে বাজার-দোকান করতেও পথে-ঘাটে এদের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায় তোর।'

বলেছিল, 'অন্নঋণ মস্তঋণ তা মানি। কিন্তু সাগর, মাতৃঋণও কম ঋণ নয়। সেই ঋণটা তুই আগে শুধে ফ্যাল বাবা, এরপরে আর সময় পাবি না। অন্যঋণ শুধিস তারপর। ভগবান তোকে রাজা করুন, তুই তোর জ্যাঠার নাতির সংসার পর্যন্ত পুষিস ভবিষ্যতে। শোধ হবে না তাতে?'

নিরুপায় হয়েই সেই পঞ্চাশটি টাকার থেকেই তেরো টাকা দিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করতে হয়েছিল

সাগরকে। আর নিরুপায় হয়েই একদিন একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে মাকে আর মা-র বিয়ের সময়ের সম্পত্তি রংচটা তোরঙ্গা আর ডালা ভাঙা ক্যাশবাক্সটা নিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়েছিল।

বাড়ির কেউ সেদিন কথা বলেনি সাগরের সঙ্গে। 'এক গেলাস জল খেয়ে যাও' একথাটুকুও বলেনি। মা-ছেলেতে অমনি মুখে বেরিয়ে এসেছিল এতকালের বাসাটা থেকে।

জ্যাঠামশাইকে দেখতে পায়নি বেরোবার সময়। বাড়িতেই ছিলেন না তিনি তখন। সাগরের মা বেরোবার সময় বড়ো জায়ের পায়ের ধুলো নিতে গিয়েছিলেন, জা এই দুঃসহ স্পর্ধার দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎবেগে পা-টা সরিয়ে নিয়েছিলেন।

গাড়িতে উঠে মা বলেছিল, 'দেখলি তো সাগর? তোর জেঠির ব্যবহার দেখলি? আর তোর জ্যাঠারও দ্যাখ। ভাসুর গুরুজন, বলা আমার শোভা পায় না। কিন্তু না বলেও পারছি না। জানতেন তো আজ আমরা জন্মেরশোধ বিদেয় হচ্ছি। আজও কি মানুষের দাবার আড্ডায় না-গেলে চলছিল না? মন নেই প্রাণ নেই এবাড়ির কারুর, বুঝলি?

কিন্তু সাগর জেনেছিল আছে, অন্তত জ্যাঠামশাইয়ের মধ্যে আছে। অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন সাগর। সেদিনও বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল সেই নোটের গোছাটা হাতে করে।

হ্যাঁ, তখনকার মনে সেটাই 'গোছা'। দেখেছিল তো দুশোখানি টাকা। সংবরণ চৌধুরীর কাছে হয়তো সংখ্যাটা নিতান্ত তুচ্ছ। দুটো ছোটো গল্প লিখলেই ও-টাকাটা এসে যায়, কিন্তু সাগরের কাছে তো ওই দুশো অগাধ সমুদ্র।

সেই সমুদ্রের মধ্যে যেন তলিয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে।

জ্যাঠামশাই চলে যাবার পর শুধু সামনের রাস্তাটাই নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই ফাঁকা—শূন্য লাগল।

কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোথায়! কবে!

হ্যাঁ, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরে। ক-দিন পরে। বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়েছিলেন সাগরের বাসায়। কেমন যেন হাসির মতো করে বলেছিলেন, 'বেশ করেছিস, ভালো করেছিস। মায়ের দুঃখ দূর করাই তো সন্তানের কাজ। অনেক দুঃখে ছিলেন ছোটোবউমা, অনেক অপমান লাঞ্ছনার মধ্যে।'

জ্যাঠামশাইয়ের শীর্ণ-পেশী মুখটা আরও টান টান দেখাচ্ছিল, আর জ্যাঠামশাইয়ের ঠোঁটটা যেন কাঁপছিল।

সাগর হতভম্ব হয়ে তাকিয়েছিল সেই দিকে। সাগরের মা রান্নার চালা থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিল। গলায় আঁচলটা জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিল।

ঠোঁটটা আরও কাঁপছিল জ্যাঠামশাইয়ের।

কথা বলতে সময় লেগেছিল।

আর যখন বলেছিলেন, এদের দুই মা-ছেলের মনে হয়েছিল, ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটছে, না স্বপ্ন দেখছে তারা?

ওই দু-শোটি টাকা আস্তে আস্তে সন্তর্পণে পকেট থেকে বার করেছিলেন জ্যাঠামশাই, বাড়িয়ে ধরেছিলেন সাগরের মা-র দিকে, 'এটা ধরো ছোটোবউমা।'

একগলা ঘোমটার মধ্যে ডুবে থাকা ছোটোবউমা নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাত বাড়ায়নি।

কে জানে লজ্জায় না আকস্মিকতার বিমূঢ়তায়।

জ্যাঠামশাই একটুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে আস্তে নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'ছোটোবউমার বোধ হয় বুড়োটাকে বিশ্বাস করতে বাধছে। বাধাই স্বাভাবিক, কিন্তু এইটুকু জেনে রেখো বউমা, মানুষ

অবস্থার দাস। যাক, তুই-ই ধর সাগর। ভালো করে তুলে রাখিস। তোর বিয়ের সময় বউকে আশীর্বাদ করতে একখানি ভালোমতো গহনা গড়াব বলে, দুটি-চারটি করে পয়সা জমিয়েছিলাম, ঝুমির বিয়েতে পর্যন্ত বার করিনি। আজ পর্যন্ত প্রকাশও করিনি একথা। তা তোর বিয়ের সময়—জ্যাঠামশাই একটু হাসলেন। বললেন, 'কোথায় থাকব ভগবানই জানেন। ইহলোকে কী পরলোকে, তুই-ই গড়িয়ে মায়ের হাতে দিয়ে দিস—'

--জ্যাঠামশাই!

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিল সাগর।

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, 'থাক থাক ও নিয়ে আর কথায় কাজ নেই। কারুর জানারও দরকার নেই, বুঝলি!'

এই 'কারু'টা যে কে, বুঝতে দেরি হয়নি সাগরের, আর হয়তো মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, জ্যাঠামশাই থামালেন। বললেন, 'তুই যা ভাবছিস বুঝেছি। কিন্তু আসল কথাটা কী জানিস? ভয় মানুষকে নয়, ভয় অশান্তিকে, ভয় কেলেঙ্কারিকে। যাক সুখে থাকিস, ভালো থাকিস, মাকে শান্তিতে রাখিস এই প্রার্থনা। জানি তা তুই রাখবি। দুশ্চিন্তা অজিতের মা-র ভবিষ্যৎ ভেবে। হতভাগাটা আজ দু-দিন বাড়ি আসেনি। কোথায় যে খুঁজতে যাব?'

মরমে মরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সাহস করে বলতে পারেনি, 'আমি খুঁজতে যাব জ্যাঠামশাই?'

ওবাড়ি থেকে চলে এসে সেকথা বলার দাবি বুঝি হারিয়েছে সাগর।

সেদিন জ্যাঠামশাই সম্পর্কে একটা নতুন দরজা খুলে গিয়েছিল সাগরের।

কিন্তু শুধুই কি জ্যাঠামশাইয়ের সম্পর্কে?

সাগরের মা-র সম্পর্কে নয়?

মাকে কি সেদিন বড়ো বেশি স্বার্থপর মনে হয়নি সাগরের? মনে হয়নি নীচমনা? তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিল পরে আবার ওই কথাটা না-বললে চলত না মা-র?

কে জানে চলত কি না।

তবে বলেছিল সাগরের মা, টাকাগুলো বাক্সয় তুলে রাখতে রাখতে।

—ভাসুর গুরুজন, বলা আমার উচিত নয়। তবে এও বলি বাবা, এত টাকা হঠাৎ কোথায় পেলেন উনি? আর কষ্ট করে জমানো টাকা যে উনি দান খয়রাত করতে শুরু করছেন, এও বিশ্বাসের যুগ্যি নয়। আমার মন নিচ্ছে এ টাকা তোর বাপের ছিল। এতদিন সরিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ বোধ হয় একটু চৈতন্য হয়েছে।

শুনে ভারি বিরক্তি এসেছিল সাগরের, সেদিন মাকে নিতান্ত ছোটোমন মানুষ মনে হয়েছিল।

তারপর থেকে এযাবৎ দেখে এসেছে সাগর, মানুষের সম্পর্কে যেখানে যত ধারণা ছিল সবই বদলে যাচ্ছে।

জ্যাঠামশাই একটা মস্ত কথা বলে গেলেন, মানুষ অবস্থার দাস।

মিলিটারি ডাক্তারেরও হয়তো অবস্থা অনুকূল হলে ওরকম অবস্থা হত না।

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে ইন করেছে। সংবরণ মুখ বাড়িয়ে দেখলেন।

কলকাতার কাছাকাছি এসে গেছেন।

নেমে একটু পায়চারি করলেন।

একটা সিগারেট ধরালেন; মনে হল একটু চা খেয়ে নিলেও হত। কিন্তু যতক্ষণে উৎসাহ প্রকাশ করে চা-ওলাকে ডাকতে গেলেন, ততক্ষণে ট্রেন নড়ে উঠেছে।

লাফিয়ে উঠে পড়লেন সংবরণ।

বয়স প্রৌঢ় হলেও এসব এখনও পারেন।

ট্রেনে চড়তেই সেই অনেকক্ষণ আগের প্রশ্নটা মনে এল। জীবনে কবে প্রথম রেলগাড়িতে চড়েছিলেন সংবরণ? কোথায় গিয়েছিলেন?

মনে আছে প্রথম রেলগাড়ি চড়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। গিয়েছিলেন কাটোয়ায়।

হঠাৎ হেসে উঠলেন সংবরণ চৌধুরী।

কী হল তাঁর?

সাগরের জীবনকাহিনি ভাবতে ভাবতে বারে বারে নিজেকে সাগরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন কেন? তিনি অবস্থাপন্ন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত, দেশজোড়া নাম তাঁর, লোকে তাঁকে একটু নিজেদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে কত আকুতিই জানায়! সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি সংবরণ চৌধুরীকে শুধু ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে কেন, প্লেনে চড়িয়েও নিয়ে যেতে চায় লোকে।

সংবরণ কেন সাগরের মতো দীন দুঃখী হতে যাবেন?

সতেরো বছর বয়সে প্রথম রেলগাড়ি চড়েছিল সাগর। ভয়ানক একটা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে কোথায় পালাই কোথায় পালাই করে ক্লাশের একটা বন্ধুর দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল ক-দিনের জন্যে।

সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছে তখন সাগর। নতুন পাওয়া বন্ধু!

সাগর অবশ্য বলত, 'একটা পরিচয় দিতে হয় তাই বন্ধু বলা! নইলে বন্ধুটন্ধু নেই আমার। আলাপী লোক, চেনা লোক। এই পর্যন্ত।'

তবু সেই নতুন আলাপীকেই যেচে বলেছিল সাগর, 'সামনের গুডফ্রাইডের ছুটিতে তুমি কোথায় যেন বেড়াতে যাবে বলেছিলে?

—বেড়াতে?

ও হেসে উঠেছিল।

—বেড়াতে কী? বাড়ি যাব। কাটোয়ায়। হোস্টেলে পড়ে থাকি, দু-একদিন ছুটি হলেও প্রাণ পালাই পালাই করে। তোমার মতন তো না—

কিন্তু ও কি জানত সাগরেরও প্রাণ ছুটে পালাতে চাইছে এই শহর থেকে। অত অস্থিরতা না এলে সাগর কখনোই মান খুইয়ে সহপাঠিকে বলে বসতে পারত না—'তা আমারও তোমার দেশটায় এক বার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে। বাংলাদেশের পাড়াগাঁ দেখিনি কখনো।

যেন বাংলাদেশের বাইরের সব কিছু দেখেছে সাগর।

আপত্তি?

ছেলেটা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল।

আপত্তি? বলো কী? কী খুশি যে হব তাহলে! আমার মা-বাবা সবাই খুশি হবেন। তোমার মতো এমন একটি স্কলারশিপ পাওয়া ভালো ছেলে—

সাগর থামিয়ে দিয়েছিল। তবু কথা দিয়েছিল যাবে বলে।

তখনও তো সাগর সেই তাদের পুরানো বাড়িতে। তখনও প্রতিটি ব্যাপারে শ্লেষ আর খোঁটা।

জেঠিমা চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, 'বন্ধুর সঙ্গে একলা রেলে চড়ে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে! তুমি যে অবাক করলে ছোটোবউ? সাধে বলি চিরকেলে পাকা পক্কান্ন ছেলে? নইলে তোমার ওই মিনমিনে ছেলেরই-বা আদি অন্তকাল এত বন্ধু জোটে কী করে? কই আমার অজিতকে তো কেউ

কোনোদিন বলে না 'আমার দেশে বেড়াতে চলো।' ভগবান জানেন কেমনধারা বন্ধু, কোথায় নিয়ে যেতে চায়। এই বয়সে এত লায়েক করে তুললে ছেলেকে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে ছোটোবউ।'

ছোটোবউ বলেছিল, 'অত ভাববার কী আছে দিদি? সে ভালো ঘরের ছেলে, বড়োলোকের ছেলে। সেখানে তাদের বাড়িঘর, বাগান, পুকুর পাঁচটার সংসার। তিনটে দিন সেখানে গিয়ে থাকলে, ক্ষয়ে যাবে না সাগর।'

—ক্ষয়ে সাগর যাবে না, যাবে নিজেদের মানমর্যাদা। এই বয়সেই বড়োলোকের ছেলের মোসাহেবি করতে শিখছেন ছেলে, তাতে অগৌরব বই গৌরব নেই। তা ছেলে তো তোমার চিরকালই বড়োলোকের 'পা-চাটা।

সাগরের মা এ ইঙ্গিত বোঝে, কিন্তু ছেলেকে গিয়ে নিষেধ করতেও পারে না। দেখেছে তো সেই অসুখের পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে সাগর। সম্প্রতি যেন আরও বেড়েছে।

দু-দিন যদি বেড়িয়ে আসে তো আসুক। শোনা যাচ্ছে ওই বউ-মরা ডাক্তারটা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বিদেশে কোথায় চলে যাচ্ছে। দিদিটাকে তো আগেই ভাগিয়েছে। শূন্য বাড়ি 'হাঁ-হাঁ' করছিল। তার ওপর অপঘাতে মরা বউয়ের 'দৃষ্টি'। টিকতে পারল না। যাক, সাগরের মা-র পক্ষে শাপে বর হচ্ছে। বাড়ির মালিক বদলালে, দৃশ্য পরিবর্তন হলে, সাগরের ওপর থেকেও সে-দৃষ্টি যাবে। নইলে এই যে বছর ঘুরতে চলল, ছেলের মন তো ঘুরছে না।

সাগরের অনুপস্থিতিতে ডাক্তারটা বিদেয় হোক, এই চেয়েছিল সাগরের মা। ভেবেছিল ঠেলা গাড়ি বোঝাই দিয়ে যখন জিনিসপত্র বার করে নিয়ে যাবে, দেখে সাগরের পুরানো শোক আবার নতুন করে উথলে উঠবে। দেখেছে তো সেইসব খাট-বিছানা চেয়ার-টেবিল আর্শি-আলমারি।

সাগরের মা প্রার্থনা করেছিল।

আর ভেবেছিল জীবনে এই প্রথম ভগবান আমার একটা প্রার্থনা কান পেতে শুনেছেন। কিন্তু সাগরের মা জানত না, সাগর ডাক্তারের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দিনক্ষণ শুনেই চেষ্টা করে পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছিল দু-দিনের জন্যে।

শুনেছিল সাগর।

শুনেই হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ওবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নীচে, থামের গায়ে ঠেশ দিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে বাড়ির সামনে পরিচিত গাড়িটা থেমেছিল। উর্দিপরা চাকর ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা ধরেছিল। সাহেবের ফেরার সময় তার অনেক কর্তব্য, অনেক কাজ।

কিন্তু সেদিন সাহেব তাকে 'তাড়া' দিয়েছিল, 'যা যা পালা, ধরতে হবে না। ঠিক আছি, তোর চাইতে ঠিক। নিজের পায়ে হেঁটে যাব। যা ভাগ!'

চাকরটা অগত্যা গাড়ির মধ্যে সাহেবের কিছু জিনিস আছে কি না তল্লাসে লেগেছিল। আর সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল, —নটবরের মতো দাঁড়িয়ে কে?

সাগর বুকে বল বেঁধেছিল। সাগর মরিয়া-র সাহস নিয়ে তৈরি হয়েছিল। সাগর বলেছিল, 'আমি! মিত্তিরদের সাগর—'

—সাগর! আই মিন তুমি! তুমি যে হঠাৎ, এই গরিবখানায়?

সাগর ঠিক করে এসেছিল নার্ভাস হবে না, গৌরচন্দ্রিকা করবে না, সোজা স্পষ্ট বলে বসবে, সেদিন যে সেই ছেঁড়া খাতার কথা বলেছিলেন সেই খাতা—

বলে ফেলেছিল সেকথা।

আর বলামাত্রই সাহেব হেসে উঠেছিল।

আরে ব্যাস! এ যে একেবারে রাজা-বাদশাই মেজাজ। রানিকে কেটে রক্তদর্শনের পর, আবার দেখতে চাওয়া। বাড়ি বেচে চলে যাচ্ছি, যেখানে যত কাগজপত্র চিঠিপত্তর ছিল, সব একসঙ্গে জড়ো করে, বুঝলে কিনা, একেবারে দেশলাই কাঠি। একটি কাঠি। সেই যে কী যেন একটা গান আছে তোমাদের, 'আগুনের পরশমণি—' না কী? তাই হয়ে গেল আর কী।

পুড়িয়ে ফেললেন!

বড্ড বোধ হয় করুণ শুনিয়েছিল সাগরের গলাটা। নাহলে মিলিটারি ডাক্তারের গলার স্বরটাও নরম নরম ভিজে ভিজে হয়ে গিয়েছিল কেন?

সেই ভিজে ভিজে নরম গলায় বলেছিল সে, 'তা এতদিন কি ঘুমোচ্ছিলে বাপু? সেদিন অত সাধলাম, তখন কী তেজ বাবুর। এখন মুখ কালি করলে আর কী হবে? কী করব বলো? এখন তো অবস্থা হাতের বাইরে। তোমার জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার দেখছি না।'

সাগর অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বলেছিল, 'কবে ছেড়ে দেবেন বাড়ি?'

—এই তো ইস্টারের ছুটিতে। তা বাইরে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? চলো-না ভিতরে গিয়ে বসা যাক। স্মৃতিচিহ্নমণ্ডিত মন্দির দেখেও সুখ—

সাগর হঠাৎ দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলে বলে উঠেছিল, 'সবসময় আপনি আমাকে উপহাস করেন কেন? কী করেছি আমি আপনার?

—কী করেছ? কী করেছ?

মিলিটারি ডাক্তার হেসে বলে ওঠে, 'কী করেছ তা তোমাকে বলে বোঝানো তো সম্ভব নয় বালক, তবে কিছু যদি করতে, অনেক উপকার করা হত আমার। তাহলে হাতের সুখ করে গোটা কতক গুলি অন্তত করতে পারতাম তোমাকে। বাঘ শিকারে উল্লাস আছে, উত্তেজনা আছে, আনন্দ আছে কিন্তু একটা ছুঁচো মেরে কি হাতে গন্ধ করব আমি? নিরীহ একটা ছুঁচো! ছিঃ! তাই তোমার গিয়ে ওই কী বললে? উপহাস! হ্যাঁ, একটু উপহাস ছাড়া বেশি কী করবার আছে। যাক গে, সব কিছুরই তো পরিসমাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। পাড়া ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলেই তো যাচ্ছি, প্রায় 'বিবাগী বিবাগী' মনে হচ্ছে নিজেকে, কী বলো, তোমার কী মনে হচ্ছে?

সাগর নীরব।

কিন্তু সাগর কেন ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে না? সাগর কেন নির্বোধের মতো দোতলার খোলা জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে?

মিলিটারি ডাক্তার একটু কাছে এসে আস্তে বলে, 'দ্যাখো হে আমার কথার ধরনটাই ওইরকম, ও কি আর সহজে বদলায়? তা উপহাস-টুপহাস নয়, এমনিই বলছি, যমের পিছনে ছুটে সত্যবানদের জীবন ফেরানো যায়, সাবিত্রীদের যায় না। তারা বড়ো ঘুঘু। নিজেরাই শিকলি কাটবার তালে থাকে, যমদূত বেচারা শুধু সাহায্যকারী। কাজেকাজেই তোমারও উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের পার্ট প্লে করে লাভ কিছু নেই। ছেলেবয়েস, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও গে, গরিব মা-বাপের দুঃখ ঘোচাও গে, আলেয়ার আলোয় ঘুরে মরতে যেয়ো না। খেলাধুলা করো, এক্সারসাইজ করো, লেখাপড়া করো, ঘোড়ারোগ সেরে যাবে।'

—আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ!

বলে তীব্র ঝটকায় বেরিয়ে আসে সাগর গেটের মধ্যে থেকে। পিছনে ভয়ানক একটা হাসির রোল উঠবে ভেবেছিল সাগর, কিন্তু উঠল না। পিছন ফিরে না-দেখেও অনুমান করতে পারল সাগর, লোকটা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সাগর কেন গিয়েছিল? সাগর কেন ফিরে এল?

সাগরের সমস্ত প্রাণটা কি একবার ওই দোতলার ঘরখানায় যাবার জন্যে ছটফটিয়ে মরছিল না?

বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবে!

সমস্ত সাজসজ্জা তচনচ করে ফেলে সমস্ত স্মৃতি ধুয়ে-মুছে দিয়ে অপর আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে যাবে ওই নির্মম দৈত্যটা!

সাগরের যদি অনেক টাকা থাকত? বাড়িটা কিনে ফেলত সাগর। বড়ো হয়ে, মানুষ হয়ে সাগর টাকা জমাতে পারবে না? অনেক টাকা?

তার পরের দিন জীবনে প্রথম রেলগাড়ি চড়ল সাগর। কাটোয়ায় গেল। তারপর আরও কত জায়গাই গেল সাগর, কিন্তু জীবনের সেই প্রথম রেলগাড়ি চড়া ভুলবে না। সেই রেলগাড়িতে চড়েই প্রথম আবিষ্কার করেছিল সাগর গতিই জীবন। সমস্ত গ্লানি, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে নেওয়া যায়, কেবলমাত্র গতির মধ্যে।

সেই প্রথম দেখেছিল আশেপাশে সামনে সব কিছু ছুটছে, ছুটছে মাঠ বাগান নদী পুকুর ক্ষেত খামার পাহাড় বন, আমি শুধু দর্শকের ভূমিকা নিয়ে অচল আছি। আমিই-বা ছুটব না কেন?

সাগর কি বড়ো হয়ে অনেক বড়োলোক হয়েছিল?

সেই বাড়িটা কি আবার কিনে নিয়েছিল সাগর তার নতুন মালিকের কাছ থেকে?

পাগল! সাগর পাগল নয়।

সাগর তো সে-পাড়া ছেড়ে চলে গেল কতদিন যেন পরে। আস্তে আস্তে ভুলে গেল বাড়িটার কী রং ছিল, দোতলার সেই সামনের ঘরটায় ক-টা জানলা ছিল। তারপর সাগরও তো হারিয়ে গেল। লুপ্ত হয়ে গেল কালস্রোতের তরঙ্গ আবর্তে। শুধু সাহিত্যিক সংবরণ চৌধুরীর কাছে সাগরের কাহিনিটা রয়ে গিয়েছিল।

বিষণ্ণ ম্লান একটু হাসির সঙ্গে সাগর বলেছিল, 'তা লিখলেও পারো। তুমি লেখক মানুষ, তোমার কলমের গুণে হয়তো এই তুচ্ছ কাহিনিটাই একটা উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবে।'

সেই অতীত যুগে একবার বোধ হয় চেষ্টা করেছিলেন সংবরণ!

ট্রেন থেকে নেমে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরবার সময় ঝট করে মনে পড়ে গেল সেই চেষ্টার ইতিহাস।

কিন্তু সে কি শুধু সাগরের কাহিনি শুনে? সেই চিঠিটা পেয়ে নয়?

বহু ছাপমারা একখানা ডাকের খাম বহু পরিচিত একটি হাতের লেখায় লেখা ঠিকানা বহন করে হঠাৎ যেদিন এসে হাজির হয়েছিল, সেদিনও কি এমনই বিচলিত হয়ে ওঠেননি সংবরণ?

আর সেই বিচলিত মুহূর্তে সংকল্প করে বসেননি, সেই যে ছেঁড়া খাতার টুকরো পাতাগুলো নিতান্ত অসতর্ক নির্বুদ্ধিতায় হারিয়ে ফেলেছিল সাগর, সংবরণ চৌধুরী তাকে নতুন করে গড়বেন? গড়বেন কলম দিয়ে শিল্পীর কল্পনা দিয়ে?

ঐতিহাসিক উপন্যাস কী করে লেখে লেখকরা? কী করে সাজায় পুরাণ উপপুরাণের কাহিনি? শুধু এতটুকু একটু ছায়া, দুটি-একটি কিংবদন্তীর গল্প, কোথাও কোনোখানে খোদিত একটি শিলালিপি। এমনি সামান্য কিছু মালমশলা, এই তো?

অনুমান আর অনুভব! কল্পনা আর মনের মাধুরী!

রচিত হয় ইতিহাস আর ঐতিহাসিকের গল্প। বিরাট বিরাট খণ্ডে বিপুলাকৃতি।

তবে?

সংবরণই-বা সেই এক পৃষ্ঠা চিঠির মশলা থেকে একশো পৃষ্ঠা ডায়েরি লিখতে পারবেন না কেন।

লিখতে বসেছিল।

কিন্তু পেরে ওঠেননি। সম্পূর্ণতা দিতে পারেননি। 'ফেলিওর' হয়েছিলেন লেখক সংবরণ চৌধুরী।

অনুমান আর অনুভবের সঙ্গে মনের খাপ খায়নি।

খাপ খায়নি, হয়তো অদ্ভুত একটা বেখাপ্পা ব্যাপার বলেই। ব্যর্থ চেষ্টার নিদর্শন গোছা দুই কাটাকুটিতে জর্জরিত কাগজ এখনও তোলা আছে সংবরণ চৌধুরীর 'দরকারি' নামাঙ্কিত ফাইলে। ফেলে দেননি, দিতে পারেননি।

আজকের এই উদ্‌বেলিত মনটাকে নিয়ে আবার কি সেই কাগজগুলো নিয়ে বসবেন সংবরণ? যদি সাগরের কাহিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন? তা, সম্পূর্ণ করতে চাইলে নিয়ে বসতে হবে বই কী।

শুক্তির একান্ত অন্তরের কথাকে ধরতে না পারলে সাগরের কাহিনি সম্পূর্ণ হবে কী করে?

অনেক রাত্রে আলো জ্বালিয়ে ঘরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে খাটের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করলেন সংবরণ চৌধুরী। ওয়াই, এম, সি-এর এই ঘরটাই সংবরণের বহুদিনের সংসার। কালোরঙা চৌকো এই ট্রাঙ্কটাই তাঁর চিরকালের 'সাহিত্যিক ভাঁড়ার!'

নতুন পাণ্ডুলিপি, বাতিল লেখা, অসমাপ্ত রচনা, অবসর মুহূর্তের 'কবিতা কবিতা' খেলা সব এই ট্রাঙ্কটার মধ্যে।

সব নীচে একেবারে সমস্ত কাগজপত্রের তলা থেকে সেই কাটাকুটিতে ভরা অসমাপ্ত লেখাটা বার করলেন সংবরণ। সিগারেট ধরালেন।

নিজের পুরোনো লেখা আবার পড়া কম ধৈর্যের নয়, তবু সংকল্প করলেন সংবরণ ও-থেকে একটা কিছু করবেনই।

না করলে বুঝি ঋণ শোধ হবে না সাগরের। ঋণ শোধ হবে না শুক্তির! আচ্ছা সাগর তাঁকে শুক্তির যে ছোট্ট একটা ফটো দিয়েছিল, সেই ফটোটা কোথায়?

কবে যেন কোথায় কোন মেলাতলায় একটা অক্টোফটোর দোকান খুলেছিল, মেলা ঘুরতে ঘুরতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শুক্তি সেই দোকানের সামনে। চোখে-মুখে খুশির আলো মেখে বলে উঠেছিল, 'ওরে 'কিছু নয়' এরা বলে কী? আধ ঘণ্টার মধ্যে ফটো তুলে ছেপে হাতে দিয়ে দেবে? আয় আয় এই আশ্চর্য ঘটনাটা একবার ঘটিয়ে নিই।'

সাগর?

হ্যাঁ, সাগর গিয়েছিল।

শুধু সাগরই নয়, ঝুমি, অজিত, অজিতের ছোটো ভাইটা আর বোনটা।

শুক্তি নিয়ে এসেছিল ওদের মেলা দেখাতে।

জনে জনে সক্কলের ফটো তোলানো হয়েছিল, শুক্তির দু-তিনটে। ফেরার সময় যার যার ফটো তার তার হাতে দিয়ে নিজের একখানা ফটো ঝুমির হাতে গুঁজে দিয়েছিল শুক্তি। বলেছিল, 'নে আমার একখানা ফটোও নিয়ে রাখ। যখন মরে যাব দেখলে মনে পড়বে। ইচ্ছে হলে ফুলের মালা দিয়ে পুজো করতেও পারিস।'

সেই ফটো আর সেই কথা বাড়িতে নিয়ে এসে হেসে কুটি কুটি হয়েছিল ঝুমি। সবাইকে দেখিয়েছিল, 'আধঘণ্টার অক্টোফটো'।

তারপর ঝুমির হস্তচ্যুত হয়ে কবে যেন ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল ছবিটা, কবে যেন সাগরের সংগ্রহশালায় ঠাঁই পেল, কে তার হিসেব রেখেছে?

যার হারিয়ে গেল সে কি খোঁজ করেছে, গেল কোথায়?

করেনি।

তা সাগরও তো একবার হারিয়ে ফেলেছিল।

আবার এল সেই ছবি। অপ্রত্যাশিত, অভাবিত!

তারপর সংবরণ চৌধুরীর কাছে চলে এসেছিল সেই আশ্চর্য অপূর্ব ছবি।

তা সংবরণও কি সে-ছবিটা হারিয়ে ফেললেন শেষপর্যন্ত?

আর সেই চিঠিটা?

ট্রাঙ্কের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে খুঁজলেন সংবরণ, কাগজপত্র তচনচ করলেন, হতাশ হয়ে আবার চেয়ারে এসে বসলেন।

কাগজগুলো টেবিলে রাখলেন।

অলস হাতে ওলটাতে লাগলেন।

কাগজগুলো লেখা সম্পূর্ণ হলে, কী নাম দেবেন তা-ও ভেবে ঠিক করে রেখেছিলেন সংবরণ। 'শুক্তির অন্তরালে।'

কী থাকে শুক্তির অন্তরালে?

মুক্তা? শুক্তির যন্ত্রণা থেকে যার উদ্ভব!

কিন্তু অনেক উলটেও প্রথম শুরুটা খুঁজে পেলেন না সংবরণ। ছিঁড়ে ফেলেছিলেন কি? আবার নতুন করে লেখার জন্যে?

হয়তো তাই! কতদিন আগের যে ব্যাপার এসব।

মাঝখান থেকেই একটা পাতা দেখতে লাগলেন সংবরণ।

শুক্তির হাতের লেখা নয়, সংবরণের নিজের হাতেই লেখা। মনের লেখাটাই শুধু বুঝি শুক্তির।

কিন্তু শুক্তির মনের সত্যিকার হদিস কি পেয়েছেন সংবরণ? অনুমানে, অনুভবে! সাগর কতটুকু সন্ধান দিতে পেরেছে তাঁকে?

কলমটা কাছে রাখলেন সংবরণ, পাখার স্পিডটা বাড়ালেন, সেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠাখানা চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

'যাই বাবা পালাই। উঠে পড়ি খাতাপত্তর তুলে। ডাক্তার এক্ষুনি এসে পড়বে। অবিশ্যি আমার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে, পড়ে ফেলতে ও আসবে না। আমার এই ছেলেমানুষিতে ওর ভারি অবহেলা শাপে বর আমার।

কিন্তু সেই পাজি হতভাগা ছোঁড়াটা আজ এল না কেন? পাজিটা তো জানে, না এলে আমি কী 'হালুচালু' করি!

তবুও মাঝেমাঝেই কামাই করে।

এ মাসে তো এই এক্ষুনি একদিন, এখনও মাসের সাত দিন বাকি। গেল মাসে দু-দুটো দিন। সেদিন খুব রাগ দেখিয়েছিলাম। তা চালাক দুষ্টুটা বলে বসল কিনা 'আমি তোমার ঝি না চাকর? যে "কামাই" বলছ। কামাইটামাই শুনলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

রেগে একেবারে লাল।

রাগলে বোকাটাকে এত মিষ্টি দেখতে লাগে। দেখে দেখে আশ মেটে না। তাইতো যখন-তখন রাগাই।

তা রাগলে যাকে ভয়ংকর দেখায়, তাকেই কি আমি রাগাতে ছাড়ি। সে যত রেগে জ্বলে মরে, আমার ততই মজা লাগে।...

ননদ বলে, 'ধন্যি দিই তোকে বউ, কী বুকের পাটা! অত বড়ো একটা রাশভারী মানুষ, বাইরে না

কি যার দাপটে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়, তার অপছন্দসই কাজ তারই নাকের সামনে করিস কী করে?'

ওই গিন্নিটিকেও রাগিয়ে দিই আমি। ওর কথার উত্তরে অবাক অবাক ভাব দেখিয়ে বলি, 'ওমা, বাইরে আপিসে আদালতে রাশভারী বলে কি ঘরে পরিবারের কাছেও 'রাশ' দেখাতে আসবে? কথায় আছে 'গিন্নির কাছে জজও জুজু!'

ননদ কালিমুখ আরও কালো করে বলে, 'ও তেমন বেটাছেলে নয়। বোয়ের পাদপদ্মে আত্মনিবেদিত ভেড়ুয়া-পুরুষ নয় ও। কোনদিন যে কী অপমান করে বসবে তোমাকে সেই ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকি।'

ওর কথা শুনলে এত হাসি পায় আমার। কী সাংঘাতিক বোকা, বাবা!

বোকাদের খেপিয়ে সুখ আছে। আমিও তাই সুখ করি। বলি, 'শোনো কথা! আমার বর আমাকে চাবুকই মারুক আর কোতলই করুক, তোমার তাতে ভয়ে কাঁটা হবার কী হল?'

ও রেগে বলে যায়, 'জানি গো জানি তোমারই বর। জানি এ সংসারের সর্বেসর্বা তুমি। তবু ও আর আমি এক মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম, সেটা ভুলে যেও না। একটা কচি খোকা ছেলে নিয়ে যে ন্যাকরা করো তুমি, তাতে আমাদেরই গায়ে বিষ ছড়ায়, আর ও একটা দুঁদে পুরুষ—'

এই, এইটাই হল আসল জায়গা।

ওই সাগর।

ওকে নিয়েই দুটি 'এক মায়ের গর্ভের' ভাই-বোনদের যত আক্রোশ, যত বিষ!

নিজেমুখে বলে 'কচিখোকা' কিন্তু আক্রোশ তো কম দেখি না। ও ওই কচিখোকা না হয়ে একটা জোয়ান পুরুষ হলেই-বা আর কী বেশি আক্রোশ করতে পারতে বাবা? অথচ আমিও—

পাতা ওলটালেন সংবরণ।

...সাগরকে একটা কবচ পরাতে ইচ্ছা হয় আমার! রক্ষাকবচ। এক মায়ের গর্ভের দুটি ভয়ংকর ভয়ংকরীর যা 'দৃষ্টি' ওর ওপর! ও-দৃষ্টি ডাকিনীর চাইতে কম নয়, শয়তানের চাইতে হালকা নয়। অহরহ ওই ছোটো ছেলেটার দিকে ওই বিষদৃষ্টি হানে ওরা। ওই বিষদৃষ্টির সামনে থেকে ওকে নিয়ে কোথাও যদি পালিয়ে যেতে পারতাম আমি।

সাগর! বেচারা সাগর! ওর যন্ত্রণা আমি বুঝি। বাড়িতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, এখানে অগ্নিবাণ, অথচ আমি আছি পুলিশ সাহেব, হাজরে খাতায় রোজ সই না পেলেই রসাতল তলাতল করে ছাড়ি। জীবন অতিষ্ঠ ছোঁড়ার।...কিন্তু আমিই-বা কী করব? আমি যে ওকে একদিন না-দেখতে পেলে বিশ্ব অন্ধকার দেখি।

আবার পাতা ওলটালেন সংবরণ।

সুরে কি খাপ খাচ্ছে?

এ ভাষা সংবরণের এ যুগের নায়িকার মতো হয়ে যাচ্ছে না তো? শুক্তি তো সেই যুগের মেয়ে, যে-যুগে বউরা মাথায় কাপড় দিত।

শুক্তিও দিত।

বড়োলোকের বউ, বারোমাস বাড়িতেই চমৎকার চমৎকার শাড়ি পরত। দুধের মতো সাদা, মাখনের মতো জমি, সুন্দর নক্সার পাড়। সেই সুন্দর পাড়টি সর্বদাই তো বেষ্টন করে থাকত তার সুন্দর মুখটাকে ঘিরে।

মুখটা কি খুব সুন্দর ছিল শুক্তির?

সংবরণ জানেন না।

সংবরণ তো তার সেই ছবিটাও হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু সাগরের কাছে শুনেছিলেন সে-মুখ অনির্বচনীয়।

অনির্বচনীয়াকে কি রেখায় বন্দি করা যায়? লেখায় ফোটানো যায়? লাবণ্যকে কি নিখুঁৎ বর্ণনায় বোঝানো যায়?

তবে?

সংবরণ কি বৃথা শ্রম করছেন?

বড্ডবেশি কাটাকুটি!

সংবরণ চৌধুরীর পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি দৈবাৎ অথচ এই সামান্য ক-খানা পৃষ্ঠা বিদারণ রেখায় একেবারে ক্ষতবিক্ষত।

নিজেরই অবাক লাগল সংবরণের।

অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন একখানা পাতা তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

...রূপকথার গল্পে উপকথার গল্পে কতরকমই শোনা যায়। মন্ত্রবলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল, পাখি হয়ে গেল, মাছ হয়ে গেল, গাছ হয়ে গেল, আবার মায়া সরোবরের জলে ডুব দিয়ে এসে কুরূপ, 'সুরূপ' হয়ে গেল, বুড়ো যুব হয়ে গেল, বোবার বোল ফুটল, কানার চোখ ফুটল, আরও কত কীই-না আছে গল্পে। হায়! জীবনে যদি তার ছিটেফোঁটাও হত। কোনো একটা মন্ত্র পড়তাম কি মাথায় একটা ভস্ম গুঁড়ো মাখতাম আর সঙ্গে সঙ্গে এই বাইরের খোলসটা উপে যেত আমার।

মিলিটারি ডাক্তারের বউ হঠাৎ যেত হারিয়ে, আর হঠাৎই পাড়ার খেলার মাঠে, গলির মোড়ে ছোটো একটা মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। মেয়েটাকে কেউ চিনতে পারত না, বলত, 'তুমি কে বলো তো। কাদের মেয়ে।'

মেয়েটা হেসে কুটি কুটি হয়ে চুল দুলিয়ে ছুটে পালাত! তারপর মেয়েটা লাল মুখ একটা ছেলেকে ডেকে বলত, 'এই তোর নাম কী রে।'

ছেলেটা নিশ্চয় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ওই মেয়েটাকে অগ্রাহ্য করত, নিশ্চয় নেহাৎই অবহেলায় নামটা বলত। তখন মেয়েটা আবার হেসে কুটি কুটি হত, 'সাগর! সাগর! সাগর আবার একটা নাম নাকি।'

ছেলেটা রেগে আগুন হত, —নাম-নয়? সাগর মানে সমুদ্র তা জানিস। সমুদ্রগুপ্ত নামে একজন রাজা ছিলেন তা জানিস?

সাগরের রাগ দেখে ও আবার হেসে উঠত!

সংবরণ আবার কলম কামড়ালেন।

খুব কি খাপ খাচ্ছে।

মিলিটারি ডাক্তারের বউয়ের খাতাটা যদি অমন নষ্ট না হত, যদি সাগর দেখত সে-খাতা। আর সে-বউ যদি দেখত তার বেনামিতে লেখা এই হিজিবিজি! সে কি সংবরণের এই লেখা সংশোধন করতে আসত। বলত, 'এ তুই কী লিখেছিস। ধ্যাৎ!'

হয়তো বলত।

কিন্তু সাগর তো দেখেনি সে-খাতা! আর কেউ দেখেনি সংবরণের লেখা! সংবরণের লেখা তবে

সংশোধন করতে আসবে কে। লেখক সংবরণ আবার আত্মস্থ হলেন, ভাবলেন শুক্তি আর সাগরের কাহিনি আমায় শেষ করতে হবে।

মিলিটারি ডাক্তারের বউ শুক্তি! 'ষোলো সুখের' মধ্যে বসে থেকে যে দুম করে একদিন বিষ খেয়ে বসেছিল।

কিন্তু শুক্তি বিষ খেতে চায়নি।

শুক্তি শুধু ছেলেমানুষ হয়ে যেতে চেয়েছিল। শুক্তি সেই সাগর বলে ছেলেটার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লাট্টু ঘোরাতে চেয়েছিল, মার্বেল খেলতে চেয়েছিল, ঘুড়ি ওড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু এ কাল সেকাল নয়। একালে রূপকথার গল্প সত্যি হয় না। তাই শুক্তির খোলসে ঢাকা সেই মুক্তো কণাটুকু ক্রমশ শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে।

তার সেই হিজিবিজি কাটা খাতার মাঝে মাঝে সেই কাঠিন্যের ছাপ।

...সক্কাল বেলা আমি গঙ্গাস্নান করে এলাম। গাড়ি নিইনি, সুখীর মাকে সঙ্গে করে চলে গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে।...ননদ বলল, 'মা-গঙ্গার হঠাৎ এমন কপাল জোর যে!'

বললাম, রাতে স্বপ্ন দেখলাম গঙ্গায় ডুব দিচ্ছি আর মুঠো মুঠো সোনা পাচ্ছি তাই লোভে পড়ে ছুটে ছুটে গেলাম।

ননদ চোখ গোল করে বলল, 'স্বপ্ন দেখলে রাতে না ভোরে?'

ওকে নাচাতে ইচ্ছে হল। বললাম, ঠিক ভোরে নয় এই শেষরাত্রে।

ননদ চমকে বলল, 'শেষরাত্তিরই তো মোক্ষম সময় বউ। তা তুমি একটু গভীর জলে নেমেছিলে তো? না কি পৈঁঠেয় বসেই ঘটি করে জল তুলে মাথায় ঢেলেছ?'...বললাম, ওমা সে কী! কতখানি চলে গেলাম! গলা জল, আর একটু হলেই নাক পর্যন্ত ডুবে যেত।

—তা ডুব দিতে বসে মাটি হাতড়েছিলে? চকচকে চোখে বলে ওঠে ননদ।

আমি ভুরু তুলে বলি, কত! তা এমনই পোড়া ভাগ্য যে যত বারই মুঠো করে তুলি, দেখি মাটি আর বালি, শামুক আর মড়ার কয়লা।

—দুগ্গা দুগ্গা! ননদ শিউরে বলে, 'সধবা মেয়েমানুষ কোন মুখে উচ্চারণ করলে "পোড়া ভাগ্যি!" জ্ঞানগম্যি কি আর তোমার কখনো কিছু হবে না বউ? ওই মেলেচ্ছপনার জন্যেই স্বপন পেয়েও-রতন পেলে না। আশ্চয্যি, আমি তো ছাই জন্মে এমন স্বপন দেখি না!'

আহা বেচারা! ওর মুখ দেখে মনে হল ও যদি ডুব দিত, নির্ঘাত দু-চার মুঠো সোনা কুড়িয়ে আনত!...ননদ চলে গেল, কে জানে গঙ্গাতেই গেল কি না।...কিন্তু আমি কি ভোর না-হতেই মা গঙ্গার কাছে ছুটেছিলাম সোনা কুড়োতে?

না, সোনা কুড়োতে যাইনি আমি, গিয়েছিলাম দাহ জুড়োতে। আমার অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা বরের আদরের অগ্নিদাহ যে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি লংকাবাটার জ্বলুনি ধরিয়ে দিয়েছে! সে-জ্বলুনি ফ্যানের হাওয়ায় ঠান্ডা হল না, ছাতের হাওয়ায় শীতল হল না, সারারাত ছটফটিয়ে তাই না গিয়েছিলাম মা-গঙ্গার কাছে!

শীতল হতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু হতে পারলাম কই? সোনা মুঠির বদলে বালি মুঠি তুললাম, বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু দাহর নিবৃত্তি হচ্ছে না। দেহ থেকে মনে, মন থেকে আত্মায় সঞ্চারিত হচ্ছে ক্রমশ!

এ জ্বালা জুড়োবার নয়। জুড়োবে কখন? জ্বালার ওপর জ্বালা ধরবে।...

তবু মাঝে মাঝে ভাবি ভাগ্যিস মাঝে মাঝে ছুটি পাই, ভাগ্যিস মিলিটারি ডাক্তারদের বদলির নিয়ম আছে!...

...লোকে বলে 'বাঁজা'।

আমি বলি 'ভগবানের আশীর্বাদ'।...হ্যাঁ তাই বলি। ভগবান তুমি জানো প্রতি মুহূর্তে এর জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই তোমাকে।...তবে এই একটা কারণে কৃতজ্ঞতা আমি আমার 'নারায়ণসাক্ষী' বিয়ের বরকেও জানাই। সেই তো নিমিত্ত। ঈশ্বরের আশীর্বাদটা তো এসেছিল তারই হাত দিয়ে।

বিয়ের কনে, কী-বা বয়েস, কীসে কী হয় জানি না, ওষুধটা দিয়ে বললে 'খেয়ে ফ্যালো'। ডাক্তারের হাতের ওষুধ খেতে আপত্তি হবার কথা নয়, তবে আশ্চয্যি হয়েছিলাম। বলেছিলাম অসুখ নেই ওষুধ খাব কেন?

ও হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'অসুখ নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ? আগে থেকে প্রতিষেধক দিয়ে রাখলাম। খাও, ভালো হবে।'

খেলাম, নাক সিঁটকোলাম। বললাম, কিন্তু কোন অসুখের ভয়ে? কলেরা বসন্ত টাইফয়েড এই সবের জন্যে তো টিকে দেয় দেখেছি আর কোন—

ও সেদিন আমার দিকে ভয়ংকর একটা কটমটে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'সব কাজে এইরকম জেরা করা স্বভাব না কি? ওসব আমি পছন্দ করি না। যা বলব শুনে যাবে, ব্যাস! তবে শুনে রাখো, যাতে 'ফিগার' নষ্ট না হয় এ তারই ওষুধ! চিরকাল এইরকম টাইট থাকবে।'

জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, পরদিন বউদিকে বলেছিলাম।

শুনে বউদি আমার দিকে অনেকক্ষণ ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গভীর নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'মুখ্যু বোকা নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, নিজের হাতে নিজের এই সর্বনাশ করলি?'

ভয় পেলে গেলাম। দারুণ ভয়।

বউদির ওই দৃষ্টিতে, ওই নিশ্বাসে। ওই কথায় যেন কোন এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত! ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, কেন বউদি? কী হবে?'

বউদি সামলে গেলেন। হয়তো আমার বয়েসটা ভেবে করুণা হল। বললেন, 'আরে বাবা, অত ভয় খাবার কিছু নেই, আমি জানি ও-ওষুধের কথা ওতে মাথার চুল সব উঠে যায়।'

—চুল উঠে যায়? সব?

চোখে জল এসেছিল আমার।

বউদি বলেছিল, 'না না, সব কী আর? তবে ওঠে। যাক তুই মাকে যেন বলিসনি ঠাকুরঝি ওইসব ওষুধপত্তরের কথা, মা রেগে যাবেন, 'চুল চুল করে অস্থির হন মা। কাউকেই বলিসনি, বুঝলি? নতুন বর এত যত্ন করছে, সেটা হাসির কথা।

না, চুল আমার ওঠেনি।

বৃথা ভয় পাওয়া নিয়ে বউদিকে ঠাট্টা করেছিলাম। তারপর...আস্তে আস্তে বুঝেছিলাম কেন বউদি 'সর্বনাশা কথাটা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু বউদি তো আমাকে জানে না, বোঝেই না আমাকে। আমি ওই সর্বনাশকেই 'সর্বরক্ষে' ভেবেছি। শাপে বর হয়েছে আমার। নইলে তো আমাকে আমার ওই ননদের পিতৃবংশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হত!

আর, আর হয়তো সাগরের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তে পারে এত বড়ো একটা ছেলে থাকত আমার। থাকত আরও অনেকগুলো কুচো-কাঁচা। তাহলে আর খাবার তৈরি করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেতাম না আমি, যাকে ইচ্ছে হবে তাকে খাওয়াব বলে।

তাইতো ভাবি শাপে বর, ঈশ্বরের করুণা।

সংবরণ চৌধুরী আবার উঠে ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ! ভাবলেন, শুক্তির মনস্তত্ত্ব বোঝবার সাধ্য কি আছে আমার...শুক্তি কি সেই ছোট্টবেলার ভয়ংকর একটা অক্টোপাসের কঠিন কর্কশ বাহুবন্ধনে বন্দি হয়ে গিয়েছিল বলে, আপন মনের নিটোল মুক্তাটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেলেছিল গভীরতার অন্তরালে? তাই আর সেই মনের বয়েসটা বাড়ল না শুক্তির?

কিন্তু এদিকে ক্রমশ কেমন করেই যে অমন দুর্বার হয়ে উঠল শুক্তি।

ছুঁচলো গোঁফওলা মিলিটারি ডাক্তারের মুখের ওপর অনায়াসে হেসে উঠতে পারছে, তার বোনকে রাগিয়ে মজা দেখতে পারছে! আর খাতায় লিখছে...

আমার ননদটিকে রাগিয়ে দিতে কী মজাই লাগে। আজ ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে সাগরের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলাম, দাড়ি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, দেখি যে ঘরের বাইরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সাপিনীর মতো ফুঁসছে ও।

তা রেগে সাগরও যাচ্ছিল।

আঃ আঃ! করে মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছিল। ননদ সেটা দেখে আর থাকতে পারল না, ঘরের দরজায় এসে বলে উঠল, 'আচ্ছা বউ, ছেলেটাকে অমন যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন? দেখছ ছটফট করছে তোমার কবলমুক্ত হতে।'

আমি হেসে উঠে বললাম, শোনো কথা, আমি ওকে কবলে ফেলেছি? হ্যাঁ রে সাগর, আমার কবলমুক্ত হবার জন্যে ছটফটাচ্ছিস তুই?

বলে কিন্তু ভয়ে মরছি, যে হাঁদা ছেলে, এক্ষুনি হয়তো কী একটা কী বলে বসে ননদের কাছে আমার মুখটা হেঁট করাবে। রেগেই তো যায় আদর করলে। রেগে আগুন হয়ে ওঠে...অথচ আবার দ্যাখো রোজ আসে ঠিক। বেচারার ওপর আমার যেন রাহুর প্রেম। বুঝি তো! তবু ছাড়িয়ে নিতে পারি কই? মিলিটারিরও বোধ করি সেই দশা। রেগে জ্বলে যায়, মনে হয় আমাকে বোধ করি এক্ষুনি গুলি করবে, কিন্তু আশ্চয্যি, করে না। বন্দুক আছে গুলি আছে, তবু কেন নিজেকে সামলায় বুঝতে পারি না। কী করেই-বা সামলায়?

আসলে ওরা ভেতরে ভীরু।

ভাই-বোন দু-জনেই।

তা নইলে ওই ননদই কি পারত না আমায় কোনোরকমে জব্দ করতে? সাহস থাকলে করত। কিন্তু সাহস নেই। সাহসের মধ্যে শুধু শুনিয়ে দুটো কথা।

তা সেই তখন কিন্তু সাগর আমার মুখ রাখল।

বলল, 'ছটফট করতে যাব কেন? তোমার হাতে চিরুনির তেল তাই—'

ননদ চলে গেলে বললাম, এই পাজি তখন মিছে কথা বললি যে? ও রেগে উঠল, বলল, 'বলব না তো কি ওই বুড়ির মনের মতন কথাটি বলব?' আমি বলি, কিন্তু তুই ওই বুড়ির ভাইয়ের কাছে অমন ভয়ে কাঁটা হয়ে যাস কেন বল দিকি? পারিস না চোটপাট শুকিয়ে দিতে?

সাগর কেমন অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

আমার ঝোঁক চেপেছে, বলি, কেন পারিস না? ভয়টা কী? মারবে? সে-ভয় করিস না। সে-সাহস নেই ওর।

সাগর আস্তে বলল, 'সে-ভয় করি না। উনি এমন অপমান করা অপমান করা কথা বলেন সেটাই বিচ্ছিরি লাগে। তোমাকেও যা তা বলবেন তো!'

অপমানের ভয়ে সাগর ওর কথার জবাব দেয় না। নিজের অপমান আমার অপমান। কিন্তু আমার

ইচ্ছে করে ভয় না করে জবাব দিক সাগর।...মিলিটারি রেগে যাক, আরও রেগে যাক, ও রেগে মারুক ওকে, আমি তার নামে আদালতে গিয়ে নালিশ করি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে ডেকে বলি, এই দেখুন, এই ছেলেটা! আর ওই আমার স্বামী! একে নিয়ে সন্দেহ-বিষে জর্জরিত হচ্ছেন ইনি।

জজসাহেব সর্বসমক্ষে খুব কড়া কথা বলে, বেশ কিছুকাল ঘানি টানায়, বেশ হয়। কিন্তু এসবের তো কিছু হবে না।...

সাগর পারবে না ওর রাগের মুখে দাঁড়াতে, আর ও পারবে না চরম কিছু একটা করে বসতে। যেই ভয়ংকর একটা রাগের মুহূর্ত আসবে, সেই হঠাৎ 'হেঁ-হেঁ' করে হেসে সামলে যাবে।

কত বারই তো দেখলাম রাগিয়ে দিতে চেষ্টা করে। চরম কিছু একটা করে বসে না। বসতে পারে না।

কিন্তু একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে, আমি চাই আমার স্বামী আমাকে মারুক, গালাগাল করুক, গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিক?

না বিশ্বাস করবে না।

অথচ সেই ইচ্ছেই হয় আমার।

কিন্তু কেন?

আমি কি তবে পাগল?...

আচ্ছা এসব আমি লিখি কেন?

আমি মরে গেলে কেউ পড়বে বলে?

কে পড়লে লেখাটা সার্থক হয় আমার?

আমার স্বামী?

আমার আদরের ননদ।

আমার দাদা? বউদি?

এর তো শুধু একটাই উত্তর পাচ্ছি মনের কাছে, না, না, না।

তবে কি আমি এত কষ্ট করে বসে বসে এত সব লিখছি ওই পুঁচকে ছেলেটার জন্যে?...ও বড়ো হবে এই আশায়? আমি মরে যাব, ও থাকবে।

ও পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাববে, 'কিছু নয়'কে দেখে তো বোঝা যেত না ওর মধ্যে এত কথা আছে, ওর খাতায় এত লেখা আছে। তারপর ভাববে, উঃ কী বোকাই ছিলাম আমি!

বোকা, সত্যি ভারি বোকা।

একেবারে অবোধ। কিন্তু ওই বোকা বলেই তো মিষ্টি। এত মিষ্টি। সাগর যদি তার জেঠির ছেলেটার মতো পাকা-চোকা হত, আমি কি সাগরকে এমন করে ভজতাম?

আচ্ছা আমি কি ওর ক্ষতি করছি?

না কি আমার নিজেরই ক্ষতি করছি?

বড়ো হয়ে ও কি আমাকে ঘেন্না করবে? সাগর বড়ো হবে। ওর সেই বড়ো হয়ে যাওয়া চেহারাটা কতদিন কল্পনা করি আমি। লম্বা হয়ে যাওয়া সাহসী হয়ে যাওয়া সত্যিকার বড়ো। তখন আর কুণ্ঠায় সংকোচে গুটিয়ে থাকবে না ও। ওর সেই দীপ্ত দৃপ্ত মূর্তিটা কেমন না-জানি হবে তখন!

কিন্তু আমি! আমি কি তখন এমনই থাকব?

এইটা ভাবতে গেলেই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় আমার।

আমার মনের মধ্যেকার নিটোল মুক্তোটি যতই আমি লুকিয়ে তুলে রেখে থাকি, বাইরের চেহারাটা তো বদলে যাবে আমার! মিলিটারি ডাক্তারের 'ফিগার' ঠিক রাখার ওষুধের মহিমাও আর কোনো কাজ দেবে না।

হয়তো দাঁত পড়ে যাবে, হয়তো চুল পেকে যাবে, হয়তো মুখটা বেচারি বেচারি হয়ে যাবে, সাগর করুণা করবে সেই বুড়িটাকে। হয়তো ওর বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলবে, উঃ কী খাওয়ানোটাই খাওয়াতেন উনি আমায়, নিজের মাসি-পিসিতে অমন পারে না।

তাছাড়া আর কীই-বা বলবে?

খাওয়ানো ছাড়া আর কোন স্মৃতি থাকবে সাগরের?

সাগরের বউ!

কেমন জানি না হবে সে। ভাবতে গেলে যেন বিশ্বাসই হয় না। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি না আমি, মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করে। আচ্ছা এতরকম ওষুধ বেরোচ্ছে জগতে, এমন ওষুধ কেউ বার করতে পারে না, যাতে বয়স আর বাড়ে না, যেখানে আছে, সেখানেই একেবারে স্থির হয়ে থাকে?

যেখানে আছে সেখানেই স্থির হয়ে থাকে!

সংবরণ সামনের একটা সাদা শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকালেন; তারপর মনে মনে উচ্চারণ করলেন, আছে বই কী, সে-ওষুধ তো আছেই। আর তুমিও তো শেষ অবধি সে ওষুধের খোঁজ পেয়েছিলে। পেয়েছিলে তাই সেই একটা বয়সেই স্থির হয়ে আছ তুমি। যে-বয়সে তুমি একদিন স্বদেশি মেলা দেখতে গিয়েছিলে।

তোমার সেই 'আধঘণ্টায় তোলা ফটোখানা' সাগরের কাছে আছে আমি জানি।

ছিল না, হারিয়ে গিয়েছিল।

সাগরের সেই জ্যাঠা-জেঠির বাড়িতে, সাগরের নিজস্ব বলতে সেই যে একটা ভাঙা টিনের বাক্স ছিল, যার মধ্যে সাগরের বাল্যকালের সব সঞ্চয় লুকোনো থাকত, লাট্টু লেত্তি, মার্বেল গুলি, গুলতির রবার, চকখড়ি, চকোলেটের রাংতা, আরও সব কত কী হাবিজাবি, সেই বাক্সটার একেবারে তলার দিকে সেই ফটোখানা ছিল তোমার। কিন্তু ওবাড়ি থেকে চলে আসার সময় বাক্স গোছাতে গিয়ে সে-ছবি আর দেখতে পেল না সাগর।

কিন্তু খুঁজে দেখবে কী করে? কোথায়-বা খুঁজবে?

আর কাকেই-বা জিজ্ঞেস করবে? তলে তলে পাগলের মতো সারা সংসার হাঁটকেছে। পুরোনো পঞ্জিকার, আর পুরোনো খবরের কাগজের তলা, লেপ তোশকের চালি, কিছুই খুঁজতে বাকি রাখেনি সাগর। তারপর সাগর কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে তোমায় মনে মনে বলেছে, 'কিছু নয় দেখছ তো তুমি স্বর্গে থেকে? নিজে আমি অসাবধানে হারিয়ে ফেলিনি। এ ওই পাজিদের কাজ। তোমাকে যারা নিন্দে করে আর আমাকে হিংসে করে, সেই তারা!'

সাগরের সেই সন্দেহ যে ভুল নয় তা জানেন সংবরণ। সাগরের সব কথাই জানেন। সাগরের সব কথাই তাঁর কাছে ব্যক্ত আছে।

অনেক কাল পরে একদিন অজয় এসেছিল সাগরের কাছে সেই ছবি নিয়ে।

প্রথমটা দেখায়নি। বলেওনি।

এসেই বসে পড়ে বলেছিল, 'এক গেলাস জল দে দেখি।'

অজয়ের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রংটা কালি-পড়া, বেশভূষা একেবারে হাড় লক্ষ্মীছাড়ার মতো আর বুকটা যেন একটা সরু কাঠিতে গড়া পাখির খাঁচা।

দেখে মায়া না-হয়ে পারেনি সাগরের। চাকরকে ডেকে এক গ্লাস জল তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিয়েছিল।

জলটা এক নিশ্বাসে শেষ করে অজয় বলে উঠেছিল, 'বিয়ে-টিয়ে করলি না তাহলে? ধ্যাৎ! এত পয়সাকড়ি করলি বিয়ে না করার হেতু?'

সাগর একটু হেসে বলেছিল, আমি বিয়ে করা-না-করায় তোমার লাভ ক্ষতি কী?

—কী আর! অজয় বলেছিল, 'একটা গেরস্তবাড়িতে এলে তবু একটু আদর আপ্যায়ন পাওয়া যায়। তোর বউয়ের আমি তো আবার ভাসুর হতাম, যাকে বলে গুরুজন। অবিশ্যিই আদর-যত্ন করত। জল চাইলে শুধু এক গেলাস জল ঠেকিয়ে দিত না।'

সাগর লজ্জিত হয়ে চাকরকে দিয়ে খাবারটাবার আনিয়ে দিয়েছিল। তারপর অজয় আসল কথাটি পেড়েছিল, কিছু টাকা ছাড় দিকি?

—টাকা!

—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। বড়ো টাইট যাচ্ছে। সিগারেটের বদলে বিড়ি চালাচ্ছি, তবু কুলোতে পাচ্ছি না। বউ তো রাতদিন ঝাঁটা ধরে বসে আছে। তা টাকাটা অমনি নেব না তোর কাছে, একটা দুর্লভ বস্তুর বদলে—'

সাগর ভুরু কুঁচকেছিল, আর অজয় পকেট থেকে বার করেছিল সেই অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া ফটোখানা।

কিন্তু সে-ফটোর কি কিছু ছিল আর?

মেলাতলায় 'আধঘণ্টায় ফটো নিন'-এর সেই ফটো কবেই ঝাপসা হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে।

শুধু যেন একটা বিষণ্ণ করুণ ছায়াকে সেই কাগজখণ্ডটুকু বেষ্টন করে আছে।

মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠেছিল সাগরের মধ্যে, তারপরই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল সে সেই বিষণ্ণ ছায়াটার দিকে।

অজয় একটা বিশ্রী হাসি হেসে বলেছিল, 'গোটা পঞ্চাশ হবে না?...তোর কাছে তো বাবা এ ছবির দাম আছে ..... যাকে বলে প্রথম প্রেম—'

'চুপ' বলে থামিয়ে দিয়েছিল সাগর। ওর মুখ দেখে হঠাৎ অজিতও একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিল।

বোকার মতো বসে বসে গাল চুলকেছিল কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিল 'মিথ্যে বলব না সাগর, কালে ভবিষ্যতে কখনো তোর কাছে প্যাঁচ কষে কিছু বাগাবো এই আশায় ছবিটা তোর বাক্স থেকে চুরি করেছিলাম আমি। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ বউ কী যেন গোছাতে গোছাতে বার করল, বলল, 'কার ছবি?'

—কেড়ে নিয়ে বলে এলাম ও আমাদের এক বউদির ছবি। আর কী বলি বল? তা যাক গে, গোটা পাঁচেক টাকা না-হয় এমনিই দে ভাই, তোর তো এখন অভাব নেই।

সাগর আলমারি খুলে পঞ্চাশটা টাকাই বার করে দিয়েছিল। অজয় কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আস্তে তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'ছবিটা নিবি না?'

সাগর ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, 'নেওয়া আর না-নেওয়া, ওতে আছে কী? থাক গে রেখে যেতে পারো।'

রেখে গিয়েছিল অজয়।

সাগর সেই ছবিটাকে সামনে রেখে অনেকক্ষণ বসেছিল আর ভাবছিল! অজয় ভুলে গিয়েছিল,

কিন্তু আমারই কি মনে ছিল? হয়তো সেই অভিমানেই ছবিটা অমন ঝাপসা হয়ে গেছে, ধূসর হয়ে গেছে। সে-রাত্রে সাগর ঘুমোতে পারেনি।

সাগরের সেকথা সংবরণ জানেন।

কিন্তু ঘুমোতে না পারা আর কী?

লেখক সংবরণ চৌধুরীও তো রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে কাটান।

শুক্তির খাতায় আবার ফিরে গেলেন সংবরণ। খাতা নয়, খাতার ভগ্নাবশেষ। তবু—তাই। যা আছে, আর যা থাকতে পারত, তাই নিয়েই তো মানুষের সব কিছু। জীবনখাতার অনেক পাতাই তো শূন্য থাকে, থাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। 'আপন মনের ধেয়ান' দিয়েই তো তার পরিপূর্ণতা।

শূন্যতাই তো পূর্ণতার ধারক।

তাই মিলনের চেয়ে বিরহে পূর্ণতা।

মিলন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ক্ষয় করে, বিরহ প্রতিটি মুহূর্তে নতুন করে সৃষ্টি করে চলে। মিলন তোমাকে হরণ করে নেয়, বিরহ তোমাকে পূরণ করে দেয়। মিলন শুধু প্রিয়জনের ভগ্নাংশটুকু তোমার চোখের সামনে মেলে ধরে, বিরহ পুরো মানুষটাকে তোমার কাছে ধরে দেয়।

শুক্তি যদি সেই ওষুধটার সন্ধান না পেত!

যে-ওষুধটা শুক্তিকে একটা বয়সেই স্থির রেখে দিয়েছে। তাহলে কী হত? তাহলে হয়তো শুক্তি—সেই ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাওয়া শুক্তি, আস্তে আস্তে মুছে যেত সাগরের মন থেকে। ওই ফটোটার মতোই ঝাপসা হয়ে যেত, ধূসর হয়ে যেত।

কিন্তু শুক্তি জীবনের উপর মর্মান্তিক একটা রেখা টেনে দিয়ে নিজেকে বিরহের ঘরে জমা দিয়ে রেখে গেছে। সে-ঘর থেকে মুছে যায় না কেউ। সেই ঘর কখনো কপাট বন্ধ করে বসে থাকে, কখনো কপাট খুলে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সেই কথাই বুঝি লিখে রেখে গেছে শুক্তি।

কিন্তু সেদিনও কি শুক্তির মাথাটা সমান পরিষ্কার থাকা উচিত ছিল? তাই এত খুঁটিনাটি লিখে রাখতে পারবে?

ঘড়ির দিনের কথা তার আগের দিনের কথা! এগুলো বরং বেশি পরিষ্কার। শুক্তি কি ভেবেছিল ওর ডায়েরিটা কেউ ছাপিয়ে দেবে?

কিন্তু এ তো লেখক সংবরণের গড়া শুক্তি।

খাতাটাকে আলোর আরও কাছাকাছি নিয়ে এলেন সংবরণ।

দেখলেন শুক্তির মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন চিরে চিরে ফেলছে শুক্তিকে?

.....আমি কি খুব খারাপ? হিন্দু শাস্ত্রে কি আমার মতো মেয়েকেই 'অসতী' বলে? নইলে তিন বছর পরে স্বামী বাড়ি ফিরল আমার, তবু কিছুতেই কেন 'আহ্লাদ' খুঁজে পাচ্ছি না। কেন মনে হচ্ছে ওর খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসাটা নীচ, কুৎসিত ইতরতা।

তবু বাড়িতে খুব একটা জমজমাটি ঘটা লেগে গেল বই কী! লাগাতে হল। বাড়ির কর্তা এতদিনের পর বাড়ি ফিরেছে।

সাগর যদি এই ঘটনার মধ্যে এসে না-পড়ত!

সাগরকে ঘড়িটা দিয়ে আমি ভুল করেছিলাম।

আমার বোঝা উচিত ছিল।

সাগরকে যদি আমি 'পুষ্যি' নিতাম, সাগরের সঙ্গে যদি আমি 'ধর্মভাই' পাতাতাম, অনায়াসে দিতে পারতাম! তাহলে ঘড়িটা আবার আমার টেবিলে এসে আছড়ে পড়ত না।...

সাগরের সেই মুখ দেখে বুকটা ফেটে গিয়েছিল আমার। তখন মনে হয়েছিল, আমার ননদ হয়তো ঠিকই বলে। আমার কবলে পড়ে ও খালি যন্ত্রণাই পাচ্ছে।

কিন্তু সাগরের চোখের মধ্যে আমি আজ বিদ্যুতের জ্বালা দেখেছি। যে-জ্বালা শুধু যৌবনের ঘরেই মজুত থাকে।

সাগর কি তবে সহসা 'বড়ো' হয়ে উঠল?

সাগর কি এবার সব কিছু বুঝতে পারবে? ওর তেজ দিয়ে ওর শক্তি দিয়ে আর একজনকে বহন করবার ক্ষমতা হবে ওর? আশ্রয় দেবার সাহস?

আমি কি তবে এখন সাহস করে বলতে পারব দ্যাখ সাগর, আমার জন্যে তো তুই এযাবৎকাল নিন্দেকে শিরোভূষণ করেছিস, আরও একটু নিন্দে কুড়োতে পারবি না? এই অশোকবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবি না আমাকে?

মিলিটারি ডাক্তার আজ আর আমাকে রাগাবে না, আজ আমাকে তোয়াজ করতে চেষ্টা করবে। তিন বছর পরে এসেছে ও, আজ সেটা উসুল করতে চাইবে। তাই আজ আমায় বলেছে ও, 'রান্নাবান্নার আয়োজনটা তো ভালোই করছ, তোমার দাদাকে আর বউদিকে খেতে বলে পাঠাও-না।'

কথা বাড়াব না। তাই আমি শুধু বললাম, ওরা এখানে নেই, কাশী গেছে।

ডাক্তার বিশ্রী একটা হাসি হেসে বলল, 'তা তোমার আর যদি কোনো বন্ধুবান্ধব থাকে, বলো-না? আমোদ আহ্লাদ করো একটু।'

বললাম, আমার কোনো বন্ধু নেই।

ও আমার খুব কাছে সরে এল। ও যা খেয়েছে, যা খায়, তার গন্ধ পেলাম!

সরে এসে বলে উঠল, 'আই সি! তাই নাকি? এই হতভাগ্যই তাহলে তোমার একমাত্র বান্ধব? শুনে বড়ো আনন্দ পাচ্ছি।'

বললাম, নিজের ওপর তো খুব আস্থা তোমার। আমি তো জানি তুমিই আমার একমাত্র শত্রু! পরম শত্রু।

শুনে ও টেনে টেনে হাসতে লাগল।

বোধ হয় ভাবতে চেষ্টা করল আমি ওর সঙ্গে মজার একটা ঠাট্টা করছি। ও আসামাত্র আমি চাকরবাকরকে তম্বি করে হইহই তুলেছি, মুরগি রাঁধানোর ব্যবস্থা করেছি, এটা ওকে নিশ্চয়ই অভিভূত করেছে।...

আচ্ছা এখনও পর্যন্ত ওর দিদি ওর কাছে এই তিন বছরের ঘটনাবলি বিবৃত করছে না কেন! চুপি চুপি ফিসফিসিয়ে? জপের মালা হাতে নিয়ে ওই তো কাজ ওর! তবে দোষ আমি দিতে পারি না আমার ননদকে। আজীবন বৈধব্যজ্বালায় জ্বলছে ও। ওর কাছে উদারতা আশা করব কেন?

কিন্তু ওর ভাই?

ও তো বঞ্চিত নয়, ভাগ্য বিড়ম্বিত নয়।

ওর মধ্যে যদি ছটাক খানেক সভ্যতা উদারতা থাকত!

সাগরকে আমি 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দিলাম। আমার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে বারণ করেছি।...কেন করব না? ওই ডাক্তারের মুখের ওপর মারবার জন্যে আর কোন চাবুক ছিল আমার?

সাগর চলে গেল!

সাগর আর কখনো এবাড়িতে আসবে না। সাগর বলে গেছে 'আসতে আমি চাইও না। নিজেই সেধে সেধে—'

সত্যিই কি একথা সাগরের মনের কথা? না না, অসম্ভব। সাগর শুধু নিতান্ত অপমানে আর অভিমানে—

হাতের কলমটা আস্তে ঠুকতে ঠুকতে সংবরণ সাগরের 'মনের' কথাটাই ভাবতে চেষ্টা করলেন।

সাগর কি ওই শুক্তিকে তার জীবনের শনি ভাবত? তাইতো ভাবা উচিত ছিল। জীবনের প্রারম্ভ থেকে সাগর তো ওই শুক্তির জন্যে শুধু লাঞ্ছিত হয়েছে, নিন্দিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। আর পরে, বড়ো হয়ে?

বড়ো হয়ে কী হল, তা-ও জানেন বই কী সংবরণ। সাগরের কোন কথাটাই-বা না-জানেন? বড়ো হয়ে ওঠার পর, সাগর যখন বহুকর্মের ঘাটে ঘাটে ঘুরছিল, সাগরের মায়ের রোগজীর্ণ দেহটা তখন একটু হাঁপ ফেলবার আশায় উদগ্রীব। যেন সাগরের ভারটা কারও হাতে তুলে দিয়ে সেই নিশ্চিন্ততার নিশ্বাসটা ফেলতে চান তিনি।

তখন, সাগর তোর 'কনে' দেখি, এই হল বুলি। ঝুমিও শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে এসে যোগ দিত। —দাদা, ভেবছ কী তুমি? মাকে একটু শান্তি দেবে না? চিরকাল মা খেটে খেটে সারা হবেন? এক ঘটি জল দেবার লোক হবে না কখনো?

সাগর একটা রাঁধুনি ধরে এনে দিয়েছিল। গিন্নিবান্নি বিধবা বামুনের মেয়ে!

দেখে সাগরের মা রেগে কেঁদে হাট বাধিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'তার মানে তুই জীবনে আর বিয়ে-থাওয়া ঘর-সংসার করবি না? সেই লক্ষ্মীছাড়ি, ধর্মখোয়ানো, কালনাগিনী মেয়েমানুষটার জন্যেই জীবনটাকে বরবাদ করে দিবি?'

সেদিন সাগর হঠাৎ তার চিরকালের স্বভাব ত্যাগ করে খেপে গিয়েছিল। বলেছিল, 'ভদ্রলোকের মেয়ের মতো কথা যদি বলতে না পারো তো, আমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলতে এসো না।'

অন্যায় হয়েছিল সাগরের, খুব অন্যায় হয়েছিল। সাহিত্যিক সংবরণ বার বার সাগরকে বলেছেন একথা তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টি দিয়ে, সত্যের দৃষ্টি দিয়ে।

—তোমার মা-র কাছ থেকে এ ছাড়া আর কোনো কথা শোনবার আশা করা তোমার উচিত হয়নি সাগর। তাঁর জীবনে তুমিই তো ছিলে একমাত্র সম্পদ, একমাত্র আলো। তুমি তাঁর সেই আলোটিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে, সেই আলো থেকে আর এক আলো জ্বালিয়ে তোমার সেই অল্প বয়সে মৃত পিতার বংশধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের ধারায়, এ আকাঙ্ক্ষা তো করবেনই তিনি।

তুমি তাঁর সেই বহুদিন লালিত আকাঙ্ক্ষাকে কঠিন আঘাতে ধুলো করে দিলে। আর—

সংবরণ ঈষৎ আবেগে ভাবলেন, আর আরও একটা বস্তুকেও তাঁর ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছিলে তুমি সাগর। সে-বস্তু হচ্ছে তোমার ওপর তাঁর বিশ্বাস! তোমার সম্পর্কে বহুজন বলেছে, ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে ছিছিক্কারের আর অন্ত রাখেনি, তিনি তাতে বিচলিত হয়েছেন, আহত হয়েছেন, ধাঁধার মধ্যে পড়ে 'কী, এ কী?' ভেবে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েছেন, কিন্তু তোমাকে কখনো সত্যি করে সন্দেহ করেননি। বিশ্বাস হারাননি তোমার ওপর।

যারা তোমাকে অবিশ্বাস করেছে, ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাদের ওপর। তিনি তোমাকে শিশু ভেবেছেন, পবিত্র ভেবেছেন, নির্মল ভেবেছেন।

সেই বিশ্বাসের ঘর ভেঙে দিলে তুমি।

উনি তবে কেন বলবেন না, 'এখন বুঝেছি সেই মায়ের বয়সি মেয়েমানুষটার সঙ্গেই তুই—'

সংবরণ জানেন কথা শেষ করতে পারেননি সাগরের মা! গলা ভেঙে গিয়েছিল ওঁর। বুকটাও ভেঙে গিয়েছিল।

আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলেননি তিনি সাগরকে। তার কিছুদিন পরেই মারা গিয়েছিলেন। সাগরের জীবনে এই এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। তার একান্ত আপনজনের মৃত্যুর কারণ সে নিজে।

মিলিটারি ডাক্তারও তো বলতে ছাড়েনি সেই কথা। সে সেদিনই বলেছিল...'তোমাকে আমার গুলি করে মারতে ইচ্ছে হয় কেন জানো? কেন ইচ্ছে হয় কুকুর দিয়ে খাওয়াতে? জানো না? ওই মহিলাটির মৃত্যুর কারণ হচ্ছ তুমি। বুঝলে? এই তুমি।...নইলে তিনি এভাবে মারা যেতেন না। লড়ায়ে মেয়েমানুষ ছিলেন তিনি, লড়তেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়তেন।...কিন্তু তুমি তাঁর সেই লড়াইয়ের শক্তিটি নষ্ট করে দিয়েছিলে। বাইরের এই পরমশত্রুটিকে ছেড়ে শেষ অবধি মনের সঙ্গে লড়াই করতে সুরু করলেন!...তার পরিণাম দেখতেই পেলে।...তবু দ্যাখো তোমায় আমি গুলি করে মারলাম না, কুকুর দিয়ে খাওয়ালাম না ক্ষমা করে ফেললাম! বুঝলে? বিশ্বাস করছ? আমি তোমায় ক্ষমা করে ফেলেছি!...কিন্তু বড়ো আক্ষেপ রয়ে গেল 'লাভার'...আমার এই মহানুভবতা সেই মহিলাটিকে দেখানো হল না!'

তখন সাগর সেকথা শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল সাগরের। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। কেন, কেন! কেন তবে দেখাওনি? তোমার এই মহত্ত্বর এক কণা দেখতে পেলেও হয়তো সেই প্রাণটা অমন করে চলে যেত না।

কিন্তু পরে সাগর নিজের সে-ভুল বুঝতে পেরেছিল।

ওই অনুতাপদগ্ধ মাতালের মহত্ত্বের সাধ্যও ছিল না সে-প্রাণকে রক্ষা করে...সেই প্রাণের ইতিহাস জেনেছিল সাগর।...ওই টুকুরো কাগজগুলোর মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যা ছড়িয়েছিল, যা সংবরণের কলম পূর্ণতার রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। তা অখণ্ড হয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিল ছোট্ট একখানা চিঠির মধ্যে।

লাইন কয়েক চিঠি!

যে-চিঠিটা সাগরের মনের মধ্যে তাতানো সিসের অক্ষর দিয়ে ছাপা আছে।...টুকরো কাগজগুলো বলেছে...ওদের এত নিন্দে করি, ওই দুটি ভাই বোনকে। কিন্তু ওরা যদি খুব ভালো হত, আমার কিছু লাভ হত? আমার জীবনের গতি বদলাত তাতে?...সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতাম আমি, পাকা মাথায় সিঁদুর পরে?

তা হত না। তা হয় না।

অপরের সঙ্গে আপোশ চলে, নিজের সঙ্গে আপোশ চলে না।

কিন্তু শুক্তির কথা, সাগরের কথা, সংবরণের কথা এমন একাকার হয়ে যাচ্ছে কেন আজ?

বহু যুগের বিস্মৃতির ঢেউ ঠেলে শুক্তি কেন উঠে এল মৎস্যকন্যার মতো?

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে সহসা যেদিন সেই মিলিটারি ডাক্তারের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, সেদিনও তো কই এমন একাকার হয়ে যায়নি? সেদিন তো সংবরণ দূরে থেকে দেখতে পেরেছিলেন সাগরকে, শুক্তিকে, তার বরকে।

ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

ঠিক একটা বুড়ো অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।...বুড়ো আর দুঃস্থ।

মিলিটারি ডাক্তারের প্যান্টের পায়ে কেন সুতো ঝুলছে, আর খাকি বুশ কোটটার বুক-পকেটের

কোণ দুটো কেন ছিঁড়ে ঝুলছে, ভেবে পাননি সংবরণ। নিজের গাড়ি থেকে হঠাৎ নেমেই-বা পড়েছিলেন কেন সেটাও ভেবে পাননি।

হয়তো অজ্ঞাতসারেই নেমে পড়েছিলেন। খোলা-বোতাম শার্টটার পিছন থেকে লোকটার লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছিল।...

সংবরণ অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, কত বয়েস হয়েছে ওঁর? বুকের লোমগুলো পেকে যাবার মতো বয়েস?

—কোথায় যাবেন?

জিজ্ঞেস করেছিলেন সংবরণ।

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ঝাপসা ঝাপসা গলায় বলে উঠেছিল, 'আপনি কে? আপনাকে তো—'

—না, আমাকে চিনবেন না। বলেছিলেন সংবরণ, 'চিনবার দরকারই-বা কী? কোথায় যাবেন বলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।'

—পৌঁছে দেবেন? আমি যেখানে যাব আপনি সেখানে আমায় পৌঁছে দেবেন? লোকটা ভয়ানক একটা সন্দেহে চোখটা বিস্ফারিত করে বলেছিল, 'কেন বলুন তো।'

—এমনি!

—এমনি! এমনিই আপনি রাস্তা থেকে জঞ্জাল কুড়িয়ে তাকে তার ডাষ্টবিনে পৌঁছে দেবেন? লোকটা হঠাৎ ভীষণ ভাঙা ভাঙা গলায় জোরে হেসে উঠেছিল।

আর শুনে সংবরণের মনে হয়েছিল লোকটার এত বিকৃতি ঘটেছে, কিন্তু বলার ভঙ্গি আর হাসির ধরনের একেবারে বিকৃতি ঘটেনি কেন?

—হাসছেন কেন?

বলেছিলেন সংবরণ।

ডাক্তার হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'হাসব না? এমন মজার বোকামি দেখে হাসব না? বলি আমাকে দেখে কি খুব একটা খানদানি লোক বলে মনে হচ্ছে আর এখন? তাই পৌঁছে দেবার লোভ দেখিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে পালাবেন?...কিচ্ছু নেই মশাই, কিচ্ছু নেই। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ!'

সংবরণ বলেছিলেন, 'আপনার পকেটের দিকে লক্ষ্য করছি একথা ভাবছেন কেন?'

ডাক্তার হেসে উঠেছিল।

হা-হা করা ওর সেই প্রচণ্ড হাসি।

—বলি মশাই, তার উলটোটাই-বা ভাবব কেন? এ জগতে তো ওইটাই দেখে আসছি!

সংবরণ বলেছিলেন, 'দেখাটাই যে সবসময় ঠিক হয় তার মানে নেই। যাদের চোখই বাঁকা তারা উলটো দেখে, ভুল দেখে।'

বুড়ো তার ক্ষীণ দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করেছিল। ভুরু তুলে বলেছিল, 'কথাগুলো তো বেশ জমকালো দেখছি। মানুষটা কে মশাই আপনি? দেশনেতা? না অভিনেতা?'

—আমি কিছুই নই! আসবেন তো বলুন। নইলে অগত্যা চলেই যাব।

—আহা-হা, রাগ করছেন কেন? চলুন চলুন। বুড়ো লোকটা রাস্তায় হাপিত্যেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে কেউ হৃদয়দরজা খুলে তাকে তুলে নিচ্ছে, এ দৃশ্য তো দেখিনি কখনো!...বিশ্বাস করতে দেরি লাগছে।

—কোন দিকে যাবেন?

—চলুন। চলুন বলে দিচ্ছি। খুব একটা রাজকীয় পাড়ায় তো থাকি না!

লোকটাকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন সংবরণ। 'আস্তানা' ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাঙা নড়বড়ে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আধতলামতো উঠে গিয়ে কাঠের ঘর একখানা। মাঠ কোঠারই আর এক সংস্করণ।

লোকটা বলেছিল, 'কেন যে আপনি আমায় এত যত্ন করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন জানি না মশাই। মানুষের মধ্যে যে দয়া-ধর্ম আছে এখনও বিশ্বাসই হয় না। তাও আবার মাতালকে দয়া!...তা আমার উচিত ছিল আপনাকে এককাপ চা অফার করা, কিন্তু নেই নেই, কিছু নেই। সব লবডঙ্কা! তবু বিশ্বাস করুন মশাই, আমারও একদিন সব ছিল। ঘরবাড়ি সুন্দরী স্ত্রী!...তা রইল না। মরে গেল!'

সংবরণ বলেছিলেন, 'আমি যাই এবার?'

—যাবেন? তা যান!

লোকটা একটা বড়োসড়ো নিশ্বাস ফেলেছিল। —আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত কালের চেনা! যেন গভীর একটা সম্পর্ক ছিল।...এরকম কী করে হয় বলুন তো?

সংবরণ চলে এসেছিলেন, বলেছিলেন, 'বোধ হয় পূর্বজন্মে দেখে থাকবেন।'

আর কী বলবেন?

ওকে কী বলবেন, সাগরকে তো চিনতে তুমি? সাগরকে আমি জানি। বলবেন, তোমার যে সব ছিল সে-খবরও আমি জানি বই কী।...তোমার সবই ছিল, ছিল না শুধু বুদ্ধি। ছিল না মমতা! ছিল না রুচি!

তাই তোমার সবই গেল।

তোমার সেই মস্ত বাড়িটা তা এখনও রয়েছে, যে কিনেছিল সে সাত টুকরো করে ভাড়া দিয়েছে।...যে দরজাটায় দাঁড়িয়ে থাকত তোমার সেই সুন্দরী স্ত্রী, যেখানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পথচলতি ছেলের হাত খপ করে ধরে ফেলে বলত, 'এই পাজি, পালাচ্ছিস যে?' সেই দরজাটা ভেঙে চওড়া করে ওরা গ্যারেজ বানিয়েছে।...

মানে হয় এসব বলবার?

বলেননি।

চলে এসেছিলেন সংবরণ।

মাতালটা বসে পড়ে বলেছিল, 'আপনি কিন্তু মশাই বড়ো ফ্যাসাদে ফেলে গেলেন আমাকে! ঘুমুতে পাব না। সারারাত জেগে বসে ভাবতে হবে আপনাকে কোথায় দেখেছি!'

সে-রাত্রে কেন কে জানে সংবরণেরও ঘুম হয়নি।

কেন? মানুষের পরিণাম দেখে?

কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বেশি নয়।

সেদিনও দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। আজকের মতো এমন সব একাকার হয়ে যায়নি।

সকাল হয়ে এসেছিল।

কতকগুলো এলোমেলো কাগজের গোছা, যা দীর্ঘকাল ধরে শুধু এলোমেলোই থেকেছে, যাকে পঞ্চাশখানা বইয়ের লেখক সংবরণ চৌধুরীও কোনোদিন গুছিয়ে লিখে তুলতে পারেননি। পারেননি তাকে একটা কাহিনির রূপ দিতে, সেইগুলোকে আবার তুলে ফেললেন এলোমেলো করেই। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

পুবের বারান্দা।

এই বারান্দাটিই সম্পদ এঘরের, পরম ঐশ্বর্য!

এখান থেকে ভোরের আকাশ দেখা যায়। যে-আকাশে বহু বিচিত্র রঙের মেলা বসে, আর তার পর যে-আকাশ প্রখর রৌদ্রের সাদায় ঝলসে ওঠে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন সেই রৌদ্রের প্রখরতা ঝলসে উঠেছে, তখন সরে এলেন।

এলেন আর ঝনঝনিয়ে উঠল টেলিফোন।

এত ভোরে কে?

এত ভোরে কার দরকার?

—নমস্কার, কে?

ওপক্ষ প্রাণপণে চেঁচিয়ে বক্তব্য পেশ করছে। 'আমি! আমি সতীশ মিত্তির, 'মধু কাকলীর' সম্পাদক...আমার লেখাটার কী হল?...হয়নি? বলেন কী? মারা যাব যে? কী বলছেন? বাইরে যেতে হয়েছিল? আঃ এইসব বাইরেটাইরে গিয়ে সময় নষ্ট করেন কেন?...আপনাদের কি এখনও পাবলিসিটির দরকার আছে মশাই? ওসব উদীয়মানেরা করুক গে। আপনাদের এখন কেবল সাহিত্যসাধনা।...যাক লেখাটা কবে আনতে যাচ্ছি?...কী সর্বনাশ! ধরেনইনি? সে কী!'

ভদ্রলোক বোধ হয় বসে পড়েছেন।

সংবরণ হাসলেন।

সংবরণকে এখন আর মনে রাখলে চলবে না পর পর দু-দিন সারারাত জেগেছেন তিনি। মনে রাখলে চলবে না হঠাৎ স্থান-কাল-পাত্রয় গুলিয়ে যাচ্ছিল তাঁর। সারারাত ভয়ানক একটা যন্ত্রণাবোধ করছিলেন।

এখন সংবরণকে হাসতে হবে। হাসলেন।

তারপর বললেন, 'ভাবছি একটা নতুন ধরনের প্লট নেব—!'

—নিন-না নিন-না!

সারা ঘরে সতীশ মিত্তিরের কণ্ঠস্বর গমগম করে ছড়িয়ে পড়ছে।...ভদ্রলোক বোধ হয় ভুলে গেছেন যে এটা ভোরবেলা।

এটা দিনের পবিত্রতম অংশ

—না না, মনেই তো রেখেছেন। মনে আছে বলেই তো বলছেন, আপনার তো সবসময়ই নতুন প্লট!...প্লটের রাজা আপনি।...সবাই তো তাই বলে—সেই জন্যেই তো এই ভোর বেলায় শান্তিভঙ্গ করছি। কখন কোথায় থাকবেন, পাব কি না-পাব— এ জানি, এই হচ্ছে মোক্ষম সময়। চেপে ধরবার উৎকৃষ্ট অবসর।...তাহলে কবে নিতে যাচ্ছি? কী বললেন, প্লটটা আমার পছন্দ হবে কি না?...কী বলছেন মশাই? আপনার প্লট—কী?...কী বলছেন?...সমাজবিরোধী?...তেরো বছরের নায়ক. আর তিরিশ বছরের নায়িকা?

সতীশ মিত্তিরের উৎসাহী কণ্ঠস্বর একটু স্তিমিত শোনাল...আপনার কলমের মুখে পড়লে সবাই

উতরে যাবে! তার জন্যে ভাবছি না! তবে কিনা বলছি—ওটা নাহয় পরে ধীরেসুস্থে লিখবেন। জটিল জিনিস! আপাতত আমায় যা হোক একটা দিয়ে ফেলুন।...আচ্ছা সামনের সপ্তাহে আসছি।...মনে কিছু করবেন না, তবে কী জানেন আমাদের দেশের পাঠকরা মুখে যতই আধুনিকতার জয়গান করুক, যতই প্রগতির বড়াই করুক, চিন্তার বিপ্লব সহ্য করতে পারে না। সেই গতানুগতিকটি না হলে—আপনি ওর বিপরীতটা দিন, এক প্রৌঢ় অধ্যাপক আর তরুণী ছাত্রী, লুফে নেবে পাঠক-পাঠিকা!...বেশি করে পাঠিকারা! দেখছি তো! আমাদের এই পত্রপত্রিকাগুলিই হচ্ছে মশাই সমাজের দর্পণ! ওদের দিকে ভালো করে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারবেন কোথায় আছে সমাজ।...তা আপনারা তো আবার শুনেছি একে অপরের লেখা পড়েন না।...হাঃ-হাঃ-হাঃ!

—আচ্ছা রাখছি!

রাখলেন।

সংবরণ বাঁচলেন!

সক্কাল বেলা এই বাচালতা কী অসহ্য! তবে ওর ওই অতি ভাষণের মধ্যে থেকে একটা তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন সংবরণ, আমাদের দেশের পাঠকরা গতানুগতিকতাই চায়। 'চিন্তায় বিপ্লব তাদের অসহ্য।'

সাগর, তোমার গল্প তবে এখন রইল!

শুক্তি, তোমার সেই খাতা!

যা শুধু তোমাকে ভেবে ভেবে তৈরি করে তুলেছিলেন সংবরণ, আর আজও পারেননি যাকে সম্পূর্ণতা দিতে.....

কেন পারেননি বলো তো ? সে কি ওই গতানুগতিকের ভক্তদের অবহেলার আশঙ্কায়? না গতানুগতিক সমাজের মুখ চেয়ে?...না কি কেবলমাত্র পেরে ওঠেননি বলেই? তাই, তা ছাড়া আর কিছু নয়। বারে বারে যে মনে হয়েছে এ ভাষা কি শুক্তির? না এ যুগের লেখক সংবরণ চৌধুরীর নায়িকার?

ওই সন্দেহটা-ই সেই এলোমেলো কাগজগুলোকে কিছুতেই গুছিয়ে তুলতে দেয়নি!

এখনও থাক অগোছালো।

শুধু আজ যখন লিখতে বসবেন সংবরণ, হয়তো লিখবেন 'শুক্তি' তোমার মতো চোখ ও কোথায় পেল বলো তো? ওই সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্ত্রী!...তোমার তো কোনো মেয়ে ছিল না?...ও কি তোমার ভাইঝি?...যে-ভাইয়ের বাড়িতে তুমি—'

কিংবা কিছুই নয়।

ওটামাত্র বিধাতার খেয়াল।

কোনো একটা সুন্দর জিনিস তৈরি করে আবার তেমনি একটা হয়তো করতে ইচ্ছে করে?...

বিধাতার এই কৌতুক ইচ্ছার জন্যেই আমরা মাঝে মাঝে অবাক হই, বিচলিত হই, হঠাৎ নিজের ওপর প্রভুত্বের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।

না, গল্প লিখতে বসে ওই কথাগুলো লেখেননি সংবরণ।

দ্বিতীয় বিধাতার ভূমিকা নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন অন্য নতুন চোখ, নতুন মুখ, নতুন ভাষাভঙ্গি।...

সংবরণের গড়া নায়িকারা বিধাতার গড়া নায়িকার মতো আবেগপ্রবণ নয়। তারা জোরালো, তারা শক্ত হাতে নিজের জীবনের হাল নিজে ধরে।...

ওদের নিয়েই সংবরণের কলম!

বিধাতার গড়া ওই প্লটটায় আর হাত লাগাবার দরকার নেই।...ও থাক হিজিবিজি কাগজের মধ্যে...বিবর্ণ হয়ে আসা একখানা ফটোর মধ্যে, আর অনেকগুলো ডাকের ছাপমারা একখানা চিঠির মধ্যে!

আবার যদি কোনোদিন ঘুমের শান্তি ভেঙে স্মৃতির সাগর এসে উথলে পড়তে চায়, যদি প্রৌঢ় সংবরণ চৌধুরী সহসা একটা নির্বোধ কিশোরের মৌন বেদনার মূর্তি স্মরণ করে উদ্‌বেল হয়ে ওঠেন, তখন আবার হয়তো খুলে বার করবেন সেগুলো।...

পড়বেন সেই চিঠিটা।

যে-চিঠিটা শুক্তি লিখে রেখে গিয়েছিল, যে-চিঠিটার বন্ধ খামের ওপর শুক্তি লিখে রেখেছিল, 'বিশ্বাস করে রেখে গেলাম, যদি ইচ্ছে হয় পোস্ট করে দিও।'

কাকে সম্বোধন করেছিল।

কাউকেই নয়।

কে জানে হয়তো পৃথিবীর যে-কাউকেই, হয়তো পৃথিবীর উপর সেই বিশ্বাসটুকু তখনও ছিল শুক্তির! ভেবেছিল মৃতার অনুরোধ রাখবে!

তা রেখেছিল। অনুরোধ রেখেছিল।

সংবরণ জানেন না কে সে!

আর কেন অত দিন পরে তার টনক নড়েছিল।

শুক্তির বিষ খাওয়ার তারিখের অনেক-অনেক দিন পরের একটা তারিখ ছিল পোস্টের ছাপে।...অনেক ঠিকানা ঘুরে সাগরের হাতে পৌঁছেছিল।...সাগর তুলে রেখে দিয়েছে সংবরণ চৌধুরীর নিভৃত ঘরে।

চিঠিটা কি সংবরণও বার বার পড়েছেন।

পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছেন?

না, বার বার নয়, হয়তো এক বার, হয়তো দু-বার, তবু মুখস্থ হয়ে গেছে। অক্ষরগুলো কি তাতানো সিসের অক্ষর ছিল? তাই মনের মধ্যে কেটে বসে আছে?

আর ভাষা?

সে কি কোনো নায়িকার ভাষা?

না।

একেবারে সাধারণ।

একেবারে গেরস্থালি!

'সাগর, সাগর! তুই কেন সত্যি সাগর হয়ে দেখা দিলি না? তাহলে সবটা এমন জটপাকানো হত না। সত্যি সাগরের বুকের মধ্যে কত ঝিনুক কত শুক্তির আশ্রয়।...

তা হলি না তুই। মিথ্যে একটা নামের লোভ দেখালি।...সেই দুঃখু, সেই তো জ্বালা!

দ্যাখ, শেষপর্যন্ত মরাই ঠিক করে ফেললাম।...মনে করিস না ডাক্তারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মরছি আমি! মরা অত সস্তা নয়।...ওকে আমি অতটা দাম দিতে যাব কেন রে?...না, ওর জ্বালায় আমি মরছি না!

মরছি কেন জানিস?

বেঁচে থাকলে কোনোদিনও তোর চাইতে ছোটো হতে পারব না বলে!...তুই বড়ো হবি, সাহসী হবি, হয়তো নামের মানমর্যাদা বজায় রাখতে সত্যি অগাধ সমুদ্র হয়ে উঠবি। কিন্তু কী বিপদ বল দেখি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বুড়ো হয়ে চলতে হবে।

ইস!

ভাবতে পারিস?

তার চাইতে এ বেশ কেমন মজা করলাম? যেখান পর্যন্ত এসেছি সেখানেই থেমে রইলাম।...

তুই চলতে চলতে এসে আমাকে 'বুড়ি' ছুঁবি, এক বার থমকে দাঁড়াবি, ভাববি 'তাইতো'!

তারপর আরও এগোতে থাকবি, আমাকে ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে এগিয়ে যাবি।...অনেক বড়ো হয়ে যাবি। তখন তো—তোর আমাকে 'ছেলেমানুষ' বলে একটু মায়া হবে? তখন তো কোনোদিন চোখ পড়লে একটা নিশ্বাস পড়বে তোর?...

ভাববি, 'আহা বেচারা।'

তখন তো সবটাই ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলি ভেবে মনটা একটু খারাপ খারাপ উদাস উদাস হয়ে যাবে তোর?...

যাবে না?

নিশ্চয় যাবে।

হ্যাঁ বাপু, আমার কথা ভেবে তোর মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যাবে, এ আমি চাই! এত কষ্ট করে বিষটিষ জোগাড় করে মরলাম আমি তার জন্যে, আর তুই আমার জন্যে এটুকু করবি না?

মাঝে মাঝে আমার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে বসে থাকবি তুই, বুঝলি? ছেলেমানুষ বলে মায়া করবি।...তাই চলতে চলতে থেমে পড়লাম। একদিন তোর চাইতে ছোটো হয়ে যাব এই আশায় ছবি হয়ে তাকিয়ে রইলাম!...

খুব মজা হল, না?

বিধাতাপুরুষকে কেমন একখানা ফাঁকি দিলাম!...তবে কিন্তু বলে রাখছি—সাগর, যদি বিয়ে করিস (আহা, বিয়ে করবি না তা বলছি না, 'যদি' দিয়ে বলছি) খবরদার কোনো একসময় প্রেমে গদগদ হয়ে তোর সেই আহ্লাদী বউয়ের কাছে আমার গল্পটি করবি না! খবরদার না।...মনে থাকবে তো?

এই পৃথিবী, এই আলো বাতাস, আমার আদুরে মাণিক তুই, আমার ওই মিলিটারি বর, এমনকী আমার ওই আগুনমুখী ননদ, সবাইয়ের জন্যেই মন কেমন করছে আমার, সবাইকেই ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু এই সিদ্ধান্তই নিলাম।...

মজা বলিস মজা।

সাজা, বলিস সাজা।

না, নাম সই করেনি শুক্তি।

'ইতি' লেখেনি।

'ইতি' লিখে শেষের সুর বাজায়নি। যেন আরও অনেক কথা বলবে, আরও অনেক কথা লিখবে, রইল সম্ভাবনা হয়ে। সেই অফুরন্ত কথার ফুলে সাগরের ইচ্ছে হয় মালা গাঁথুক, সেই অফুরন্ত কথার ফুলঝুরি সাগরের ইচ্ছে হয়তো জ্বালাক।

চিঠিটা পড়ে হয়তো ছবিটা বার করবেন সংবরণ! সাগরের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সংবরণ।

কিন্তু ছবি কোথা?

সে তো কালের হাওয়ার মিলিয়ে যেতে বসেছে।

শুধু ধূসর বিষণ্ণ একটু ছায়া! তবু তার মাঝখান থেকেই বুঝি উঁকি দেবে অপরূপ একজোড়া চোখের আভাস, অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় একটি ঠোঁটের সৌকুমার্য...

যা দেখলে মমতায় বুক ভরে ওঠে। যা দেখলে হঠাৎ অবাক হয়ে গিয়ে মনে হয়—আশ্চর্য? আমি একে অতবড়ো ভাবতাম কেন?

শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস

সুবোধ ঘোষ রচনাবলী

শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাস

সমাপ্ত

ভোরের আকাশকে শ্যামলের বড়ো ভয়। খুব আবছা ভোরের আকাশ। যখন মৃদু মোমের মতো ছায়া ছায়া নরম একটা আলো আকাশকে আর পৃথিবীকে যেন এক করে রাখে।

ওই আলোটাকে আর ওই আকাশটাকে দেখে ফেলবার ভয়ে শ্যামল অনেক রাত অবধি জাগে, যাতে না ভোর বেলায় ঘুম ভেঙে যায়। শ্যামলের সব লেখাপড়া তাই রাত্রে। অনেক রাত অবধি জেগে জেগে বেশি রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে এখন আর চেষ্টা ভাবনা করতে হয় না শ্যামলের, ওটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

তবু দৈবাৎ যদি কোনোদিন ওই মোমের আলো ভোরটায় ঘুম ভেঙে যায় শ্যামলের, ও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলে বালিশে মুখ ডুবিয়ে হারিয়ে যাওয়া ঘুমটাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সব দিন কি সেই হারিয়ে যাওয়া ঘুমটাকে ফিরে পায় শ্যামল? না কি সেই ভয়ংকর ভোর বেলাটা উঠে আসে চৈতন্যের কোনো এক গভীর স্তর থেকে।

সেই ভোর বেলাটার পটভূমিকায় শ্যামল দেখতে পায় একটা বাচ্চা ছেলে কার যেন হাতের ঠেলা খেয়ে আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে মশারিটা তোলা, বিছানায় মা নেই বাবা নেই, ঘরের দরজাটা খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে ঘুম ঘুম জ্যোৎস্নার মতো কেমন একটা আশ্চর্য আলো ঘরে এসে পড়েছে।

সেরকম আলো ছেলেটা এর আগে কোনোদিন দেখেনি, কোনোদিন দেখেনি এসময় এরকম দরজা খোলা। ওই খোলা দরজা দিয়ে দালান থেকে উঠোন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো মানুষ সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওরা কারা? কী করছে ওখানে?

ছেলেটার গা ছমছম করে উঠল। যদি কোনোদিন ও বেশি রাত অবধি রান্নাঘরে পিসির কাছে বসে গল্প শোনে, সেদিন উঠোন পার হয়ে ঘরে আসার সময় পাঁচিলের ধারে ঝাঁকড়া গাছগুলো দেখলে ওইরকম হয়। পিসির হাতটা চেপে ধরে ও চোখ বুজে ছুটে চলে আসে।

পিসি বলে, 'বাবা! ফেলে দিবি নাকি? ছুটছিস কেন? দেখছিস হাতে গরম দুধ।'

সব কাজ সেরে ওই দুধটা গরম করে নিয়ে আসে পিসি দাদুর জন্যে। দাদুকে ওই মস্ত বাটিটা ধরে দুধ খেতে দেখলে ভারি অবাক লাগে ছেলেটার। অত দুধ কী করে খায় দাদু?

কিন্তু গল্প শোনা দিন দৈবাৎই হয়, নেহাৎই যেদিন নাছোড়বান্দা ছেলেটা পিসিকে ধরে বসে। নইলে—সব দিনই তো সন্ধেবেলা মা তাকে নিয়ে এসে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘুম পাড়ায়। বলে, 'রাত অবধি জাগলে অসুখ করবে।' বাড়ির সবাই রাত জাগে অসুখ করে না, আর ওর বেলাতেই কেন অসুখ করবে তা বুঝতে পারে না ও।

ওই চোখ বুজে ছুটে আসা দেখে মা বলে, 'বেশি রাতে উঠোন দিয়ে আসা যেমন ভালোবাসি না!—ভয় পেয়েছিস তো?'

দাদু সেকথা শুনতে পেলে বলে, 'ছেলেকে ভীতু কোরো না বউমা, ছোটো থেকে সাহসী করতে হয়। শরৎকে আমি রাত্তির বেলা একলা ছাতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসতাম।'

শরৎ কী হয়েছে কে জানে, তবে এই ছেলেটা মোটেই সাহসী হয়নি। অন্ধকার দেখলেই ওর ভয় করে, ছায়া দেখলে গা ছমছম করে।

সেদিন ওই ছায়া ছায়া আলোটা দেখেও ওর ভয় করল। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। এগুলো তো সব ঠিকঠাক রয়েছে, মাথার দিকে জানলার নীচে টুলের ওপর জলের কুঁজোটা বসানো রয়েছে

যেমন থাকে, এপাশে বেঞ্চির ওপর থাক দেওয়া বাক্স-প্যাঁটরা, মা ঘরে না থাকলে যার ওপর চড়ে ছেলেটা ঘোড়ায় চড়া খেলা করে। আর ওধারে আলনায় মায়ের শাড়িগুলো যেমন ঝোলে তেমনি ঝুলছে, ছেলেটা মাঝে মাঝে যার পিছনে লুকোয় শাড়িগুলো আরও টেনে দিয়ে।

সবই তো ঠিকঠাক রয়েছে! তবে?

মা-বাবা ঘর থেকে চলে গিয়েছে কেন?

আরও সব লোকেরা কী করছে?

ছেলেটা আর একবার ঠেলা খেল। এ হাত মায়েরও নয়, পিসিরও নয়, ওবাড়ির ছোটোকাকিমা এখন এবাড়িতে এসেছে কী করতে? ছেলেটাকেই-বা বলছে কেন, 'ওঠ বাবা আয়! জন্মের শোধ মাকে এক বার দেখে নে। আর তো দেখতে পাবি না।'

'জন্মের শোধ' মানে কী?

মাকে দেখতে যাবে কেন সে? কোথায় মা?

ছোটোকাকি কোলে করবার চেষ্টা করে বলে, 'আয় বাবা, চল আমি নিয়ে যাচ্ছি। চুপ করে চল—'

সেই সময় পিসি ঘরে ঢোকে, অসন্তুষ্ট গলায় বলে, 'তোমায় বারণ করলাম ছোটোবউ, ওর ঘুম ভাঙাতে—?'

ছোটোকাকি বলে, 'না-হলে মনে বড়ো ঘা খেত ঠাকুরঝি! হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে দেখত, মা নেই, কোথাও নেই!'

মায়ের কথা এরকম করে বলছে কেন ওরা? কী হয়েছে মা-র? ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় মা?'

ততক্ষণে দেখা হয়ে গেছে কোথায় মা

ছেলেটা হঠাৎ মায়ের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠের মতো হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে উঠোনে শুয়ে আছে কেন মা? মা-র চারদিকে এত লোক কেন? বাবা কোথায়? বাবা?

বাবাকে দেখতে পেল ছেলেটা, দাওয়ার ধারে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

ছেলেটা এর আগে কোনোদিন মরার দৃশ্য দেখেনি, তবু ওর হঠাৎ মনে হল, মা মরে গেছে!

সেই ভয়ের শুরু।

সেই ভয় চিরদিন।

একটু পরেই দাদুর ভারী আর গম্ভীর গলা শুনতে পেল ছেলেটা, 'দেরি করা হচ্ছে কেন?'

কে যেন বলল, 'আর একটু সকাল না-হলে—'

আবার সেই ভারী গলা, 'সকাল হয়ে গেছে।' তারপর বললেন, 'শ্যামলকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

তার মানে ছেলেটার নাম শ্যামল। তার মানে ওই ছেলেটাই শ্যামল। কিন্তু অত চুপ হয়ে গেল কী করে? ও নিঃশব্দে ছোটোকাকির সঙ্গে ওবাড়ি চলে গেল কী বলে রান্নাঘরের পাশের সেই ছোট দরজাটা দিয়ে?

অথচ যেদিন ও পিসির সঙ্গে রঘুদের বাড়ি যাবার জন্যে বায়না ধরে, মা হাত ধরে টানলে, যেতে মানা করলে, চেঁচিয়ে রসাতল করে। পিসি রেগে রেগে বলে, 'বারণই-বা করছ কেন বউ, এক বার গোয়ালাবাড়ি গেলেই কি তোমার ছেলে গোয়ালা হয়ে যাবে?'

আবার মা কোনোদিন চণ্ডীমন্দিরে যাচ্ছে দেখলে যদি ও 'মা-র সঙ্গে যাব' বলে চিৎকার জোড়ে কার সাধ্যি আটকায়।

বড়োদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হলে চেঁচানোটাই যে একমাত্র অস্ত্র, সেকথাটা ভালো করেই বোঝা ছিল শ্যামলের।

কিন্তু সেই ভয় ভয় ভোরে শ্যামল ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল না 'মা-র কাছে যাব' বলে।

ছোটো কাকি ওবাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'ঘুমো'।

ও ভয় পেয়ে চোখ বুজল। কিন্তু ঘুমোবে কী? সেই অদ্ভুত ছবিটা তার চোখের ওপর সেঁটে বসে নেই?

উঠোনে নীচুমতো কেমন যেন একটা খাট, তার ওপর মা ঘুমোচ্ছে। চারদিকে কত সব লোক, তাদের চেনেও না শ্যামল, আর দাদু সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ মা-র মুখ খোলা, মা ঘোমটা দেয়নি।

এই ছবি পাথরে খোদাই হয়ে গেছে ততক্ষণে।

শ্যামল বুঝেছিল মাকে আর দেখতে পাবে না সে। শ্যামল নিজে নিজেই টের পেয়েছিল মরে গেলে মানুষ আর আসে না। কে একথা শিখিয়েছিল শ্যামলকে?

কে শেখায় এসব কথা? আরও যত কথা?

কেমন করে শিশুর চৈতন্যের জালে আস্তে আস্তে ধরা পড়ে বিশ্বরহস্যের লীলা? কেমন করে বড়োদের মনস্তত্ত্বের তত্ত্ব বুঝে ফেলে সে? কেমন করে তার মুহূর্তে মুহূর্তে উন্মেষিত বুদ্ধির দলগুলিতে কুটিল বুদ্ধির প্যাঁচ পড়ে!

তা প্যাঁচ পড়ে বই কী!

শিশুকে যে সরলতার প্রতীক বলে অভিহিত করা হয় ওর মতো ভুল আর নেই। অথবা ওর মতো আত্মপ্রবঞ্চনা। শিশুরা বড়োদের থেকে কিছু কম ধূর্ত হয় না। কার্যসিদ্ধির জন্য তারা এমন চাল দিতে পারে, 'নিপাট সরলের' ভান করে এমন চতুরতা করতে পারে যা অনেকসময়ই বড়োদের বোকা বানায়।

শ্যামল সেই শৈশবেই বুঝে ফেলেছিল তার মা-র মরে যাওয়াটার মধ্যে কিছু একটা উলটোপালটা আছে। মা-র কোনো অসুখ করেনি, (শ্যামল এটা জেনেছিল তখন অসুখ করলে মানুষ মরে যেতে পারে।) তবু মা মরে গেল! এর মানে কী?

আবার শ্যামল এও বুঝে ফেলেছিল পিসির কাছে মা-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করা চলবে না। পিসি মা-র এই হঠাৎ মরে যাওয়ায় মা-র ওপর খাপ্পা। যেন পিসিকে জব্দ করবার জন্যেই মা-র এই মরে যাওয়া।

নইলে হঠাৎ হঠাৎ দাদুর কাছে বলে বসে কেন, 'ভগবান নেয় তার ওপর হাত নেই! এ শুধু আমায় জব্দ করার জন্যেই।

মা মরে গেল বলে পিসি কেন জব্দ হতে যাবে, তা বুঝতে পারল না শ্যামল। বুঝতে পারে না পিসির জ্বালাটা কী!

মা যখন ছিল, তখন কি পিসি শ্যামলকে কোনোদিন নাইয়ে দিত না? খাইয়ে দিত না? বেড়াতে নিয়ে যেত না? মা রান্না করত, পিসি তো অনেক দিনই করত এসব।

তবে?

তবে কেন পিসির সর্বদাই মুখে এমন 'জ্বালা'র গল্প? আন্দি বুতাইদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পিসি শ্যামলকে ওদের সঙ্গে খেলতে ছেড়ে দিয়ে আন্দির মা-র কাছে বসে পড়ে বলে, 'দ্যাখো আমার জ্বালার ওপর জ্বালা। নিজের কপাল নিয়েই জ্বলে পুড়ে মরছি চিরটা কাল, তার ওপর আবার এই গলায় গেঁথে দিয়ে গেলেন।'

কথার সব শব্দগুলোর মানে না বুঝলেও, শ্যামল এটা বুঝতে পারে শ্যামলই পিসির ভার বোঝা।

পিসির ওপর দারুণ একটা রাগ আর অভিমান ক্রমশই ওই শিশুমনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল।

পিসিকে জ্বালাতন করবার দুষ্প্রবৃত্তি (যেটা আগেও একটু একটু ছিল) বেড়ে উঠছিল।

পিসিকে জব্দ করবার একটি প্রবল অস্ত্র আছে শ্যামলের হাতে।

সক্কাল থেকে সেই অস্ত্রটা বাগিয়ে নিয়েই রণক্ষেত্রে নামে শ্যামল।

অস্ত্রটা অবশ্যই অবাধ্যতা।

প্রতি ব্যাপারে অবাধ্যতা করার একটা হিংস্র সুখ উপভোগ করে শ্যামল সকাল থেকে রাত অবধি।

সকাল থেকে রাত।

কারণ এখন শ্যামলকে পিসির কাছেই শুতে হয়। দাদুর ঘরের পাশে যে-ছোট্ট ঘরটায় সরু একটা চৌকিতে পিসির বিছানা হত, তার পাশে আর একটা সরু চৌকি পেতে শ্যামলের বিছানা হচ্ছে। ঘরে আর পা ফেলবার জায়গা নেই, সেটাও পিসির একটা জ্বালা।

পিসি যে কখন উঠে যায় টের পায় না শ্যামল। ঘরটা যখন সাদা রোদ্দুরে ভরে যায় তখন পিসি এসে ডাক দেয়। প্রথমে সোজাসুজি বলে, 'শ্যামল ওঠ, বেলা হয়ে গেছে—'

তারপর শুরু করে, 'নবাব সাহেব উঠুন!...জমিদারবাবু দয়া করে গা তুলুন!' ...তারপর বলতে থাকে, 'ভেবেছিস কী তুই? কাজ নেই আমার? জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব তো এই কপালখাগির ঘাড়ে।'

এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতকগুলো কথা বলে পিসি! কপাল কথাটার মানে তো জানা আছে, কিন্তু খাগি' মানে কী?

তবু কথাটা যে খারাপ একটা কিছু তা শুনলেই বোঝা যায়। আর ওই খারাপ কথা শুনলেই জেদ আরও বেড়ে যায় শ্যামলের, শ্যামল তখন আর বালিশে মুখ ডুবিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে না, দিব্যি পিসির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে শুয়ে থাকে।

এতে আরও খেপে ওঠে পিসি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কটকট করে তাকিয়ে শুয়ে আছিস যে? কারানি পেয়েছিস আমাকে?'

শ্যামল যেন এতে আরও মজা পেত। ক্রূর একটা মজা। শ্যামল পিসির গলাটা আরও চড়তে দিত।

আর তারপরই দাদুর সেই ভারী গম্ভীর গলাটা শোনা যায় হঠাৎ। —মেজাজটা নামাতে শেখো মতি, মাতৃহীন শিশুকে মানুষ করতে একটু ধৈর্য লাগে।

তখন পিসি কেঁদে ফেলে।

তবু গলা নামিয়ে হিস হিস গলায় বলে, 'একটু একটু ধৈর্য লাগে? নিজেরা একদিন করে দেখুক-না কউ। বাপ তো দিব্যি গা ঝেড়ে বসে আছে! কেন, মা মরলে বাপে দেখে না? কাঁথায় শোওয়া ছেলে তা আর নয়? দু-দিন বাদে পাততাড়ি বগলে পাঠশালে যাবে। বাপ নিয়ে শুতে পারে না? রাজপুত্তুরের কালে ঘুম ভাঙিয়ে মুখ ধুইয়ে জামা জুতো পরিয়ে দেবার কথা তো বাপেরই। তা নয় যত চোর দায়ে রা পড়েছে এই লক্ষ্মীছাড়ি।'

বকবক করেই চলে, যদিও দাদুর কান বাঁচিয়ে। শ্যামল সেটা বোঝে, শ্যামলের সেটাই সাহস।

অনেকক্ষণ পরে ধীরেসুস্থে ওঠে শ্যামল, দাওয়ার ধারে বড়ো একটা ঝকঝকে ঘটিতে জল থাকে, র পাশে একটা পিঁড়ি, পিঁড়ির ধারে একটু ঘুঁটের ছাই। ওই পিঁড়িতে বসে ছাইটা দিয়ে দাঁত মাজতে য় শ্যামলকে, পিসি হাতে জল ঢেলে দেয়। সাধনের মা নাকি বাগদি, ও জল ঢেলে দিলে চলে না।

এখানে আর একবার অস্ত্রধারণ করে শ্যামল, এক মুখ ছাই মেখে মুখের জলটা নিয়ে শূন্যে ছোঁড়ে দিক-সেদিক ছিটিয়ে, সাধনের মা যদি তখন উঠোন ঝাঁট দেয় তো ডেকে ডেকে বলে, 'ও সাধনের

মা দ্যাখো রামধনু করছি।' ওই ছিটানো জল গায়ে লাগার ভয়ে পিসি সাত হাত দূরে সরে যায়, ডিঙি মারে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে জল দেয়, আর গাল পেড়ে ভূত ভাগায়।

গাল পাড়ে শুধু শ্যামলকেই নয়, পাড়ে তার মরা মাকে, গায়ে হাওয়া লাগানো বাপকে, নিজেকে, এবং আকাশ বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সব কিছুকে।

এদিকটায় দাদুর আসার সম্ভাবনা নেই, কারণ এদিকটা রান্নাবাড়ির পিছন দিক। তা ছাড়া দাদু এ সময় চণ্ডীমন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন। এদিকে ছোটোকাকিদের বাড়ি, ছোটোকাকির শাশুড়ি হন যিনি, মানে সেজোঠাকুমা, তিনি যদি পিসির চেঁচানি শুনতে পান তো গলা তুলে জিজ্ঞেস করেন, 'সক্কাল বেলাই কী হল রে সুমতি?'

পিসি আরও চ্যাঁচায়, 'হল আমার মাথা আর মুন্ডু! মুখপোড়া ছেলে আমার হাড় মাস ভাজা ভাজা করল গো!'

সেজোঠাকুমার গলা আবার শোনা যায়, 'তা মাওড়া ছেলে ব্যাদড়া তো হবেই! তোরও যেমন কপাল বাছা! নইলে কিছুর মধ্যে কিছু না মা-টা দুম করে অমন কাণ্ড করে বসে?'

এরকম কথায় শ্যামল হঠাৎ চুপ করে যায়, উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, আরও যদি কিছু শোনা যায় তার মা সম্পর্কে, কিন্তু আর বেশি কিছু শোনা যায় না। যেন হঠাৎ একটা না-বলবার কথা বলে ফেলে চুপ করে গেল সেজোঠাকুমা।

কিন্তু কাণ্ডটা কী?

শ্যামল দিনে দিনে টের পায়, শুধু মরে যাওয়া কোনো 'কাণ্ড' নয়। রঘুর ঠাকুমা তো মরে গেল সেদিন, হরুর কাকা মরে গেছে কিছুদিন হল, গোয়াল ঘরের সবচেয়ে ভালো গাই 'পদ্ম'ও মরে গেল ক-দিন আগে, কেউ তো বলছে না সেটা তাদের নিজস্ব কোনো কাণ্ড! ওরা শুধুই মরে গেছে, কিন্তু শ্যামলের মা একটা কাণ্ড করেছে। যার জন্যে শ্যামল আর মাকে দেখতে পেল না কোনোদিন! দেখতে পাবে না কখনো।

কী সেই কাণ্ড?

কী করেছে মা?

মা যখন ছিল?

কোনো কোনোদিন মাঝরাত্রে শ্যামল টের পেত বাবা আর মা কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া করছে। ঠিক ঝগড়াও নয়, যেন তক্ক করছে।

'তক্ক' কথাটার মানে জানে শ্যামল, শ্যামল মা-র কথার উপর কথা বললেই মা বলত, 'মুখে মুখে তক্ক করিস না শ্যামল! খুব খারাপ অভ্যেস!'

পিসিও মাঝে মাঝে সাধনের মাকে বলে, 'মুখে মুখে তক্ক কোরো না সাধনের মা, যা বলছি তা করো।'

বাবা মা-র ওই তক্কর কারণটা বুঝতে চেষ্টা করত শ্যামল ঘুমের ভান করে নিথর হয়ে পড়ে থেকে। কিন্তু বুঝতে পারত না। কোনো কোনোদিন বোঝবার চেষ্টা করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত, কোনো কোনোদিন অস্বস্তিতে ছটফটিয়ে ঝপ করে উঠে বসে বলত, 'জল খাব!' বলত 'গরম হচ্ছে!'

মা-বাবা চুপ হয়ে যেত।

বাবা বালিশটা উলটে দেয়ালমুখো হয়ে শুয়ে পড়ত, মা চৌকি থেকে নেমে কুঁজোর জল গড়িয়ে শ্যামলকে দিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে এসে আবার ভালো করে মশারি গুঁজে শুয়ে পড়ত।

কিন্তু এক-আধদিন শ্যামল টের পেত মা তক্ক করতে গিয়েই থেমে গিয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে কাঁদছে।

যেমন থাকে, এপাশে বেঞ্চির ওপর থাক দেওয়া বাক্স-প্যাঁটরা, মা ঘরে না থাকলে যার ওপর চড়ে ছেলেটা ঘোড়ায় চড়া খেলা করে। আর ওধারে আলনায় মায়ের শাড়িগুলো যেমন ঝোলে তেমনি ঝুলছে, ছেলেটা মাঝে মাঝে যার পিছনে লুকোয় শাড়িগুলো আরও টেনে দিয়ে।

সবই তো ঠিকঠাক রয়েছে! তবে?

মা-বাবা ঘর থেকে চলে গিয়েছে কেন?

আরও সব লোকেরা কী করছে?

ছেলেটা আর একবার ঠেলা খেল। এ হাত মায়েরও নয়, পিসিরও নয়, ওবাড়ির ছোটোকাকিমা এখন এবাড়িতে এসেছে কী করতে? ছেলেটাকেই-বা বলছে কেন, 'ওঠ বাবা আয়! জন্মের শোধ মাকে এক বার দেখে নে। আর তো দেখতে পাবি না।'

'জন্মের শোধ' মানে কী?

মাকে দেখতে যাবে কেন সে? কোথায় মা?

ছোটোকাকি কোলে করবার চেষ্টা করে বলে, 'আয় বাবা, চল আমি নিয়ে যাচ্ছি। চুপ করে চল—'

সেই সময় পিসি ঘরে ঢোকে, অসন্তুষ্ট গলায় বলে, 'তোমায় বারণ করলাম ছোটোবউ, ওর ঘুম ভাঙাতে—?'

ছোটোকাকি বলে, 'না-হলে মনে বড়ো ঘা খেত ঠাকুরঝি! হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে দেখত, মা নেই, কোথাও নেই!'

মায়ের কথা এরকম করে বলছে কেন ওরা? কী হয়েছে মা-র? ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় মা?'

ততক্ষণে দেখা হয়ে গেছে কোথায় মা

ছেলেটা হঠাৎ মায়ের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠের মতো হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে উঠোনে শুয়ে আছে কেন মা? মা-র চারদিকে এত লোক কেন? বাবা কোথায়? বাবা?

বাবাকে দেখতে পেল ছেলেটা, দাওয়ার ধারে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

ছেলেটা এর আগে কোনোদিন মরার দৃশ্য দেখেনি, তবু ওর হঠাৎ মনে হল, মা মরে গেছে!

সেই ভয়ের শুরু।

সেই ভয় চিরদিন।

একটু পরেই দাদুর ভারী আর গম্ভীর গলা শুনতে পেল ছেলেটা, 'দেরি করা হচ্ছে কেন?'

কে যেন বলল, 'আর একটু সকাল না-হলে—'

আবার সেই ভারী গলা, 'সকাল হয়ে গেছে।' তারপর বললেন, 'শ্যামলকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

তার মানে ছেলেটার নাম শ্যামল। তার মানে ওই ছেলেটাই শ্যামল। কিন্তু অত চুপ হয়ে গেল কী করে? ও নিঃশব্দে ছোটোকাকির সঙ্গে ওবাড়ি চলে গেল কী বলে রান্নাঘরের পাশের সেই ছোট দরজাটা দিয়ে?

অথচ যেদিন ও পিসির সঙ্গে রঘুদের বাড়ি যাবার জন্যে বায়না ধরে, মা হাত ধরে টানলে, যেতে মানা করলে, চেঁচিয়ে রসাতল করে। পিসি রেগে রেগে বলে, 'বারণই-বা করছ কেন বউ, এক বার গোয়ালাবাড়ি গেলেই কি তোমার ছেলে গোয়ালা হয়ে যাবে?'

আবার মা কোনোদিন চণ্ডীমন্দিরে যাচ্ছে দেখলে যদি ও 'মা-র সঙ্গে যাব' বলে চিৎকার জোড়ে কার সাধ্যি আটকায়।

বড়োদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হলে চেঁচানোটাই যে একমাত্র অস্ত্র, সেকথাটা ভালো করেই বোঝা ছিল শ্যামলের।

কিন্তু সেই ভয় ভয় ভোরে শ্যামল ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল না 'মা-র কাছে যাব' বলে।

ছোটো কাকি ওবাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'ঘুমো'।

ও ভয় পেয়ে চোখ বুজল। কিন্তু ঘুমোবে কী? সেই অদ্ভুত ছবিটা তার চোখের ওপর সেঁটে বসে নেই?

উঠোনে নীচুমতো কেমন যেন একটা খাট, তার ওপর মা ঘুমোচ্ছে। চারদিকে কত সব লোক, তাদের চেনেও না শ্যামল, আর দাদু সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ মা-র মুখ খোলা, মা ঘোমটা দেয়নি।

এই ছবি পাথরে খোদাই হয়ে গেছে ততক্ষণে।

শ্যামল বুঝেছিল মাকে আর দেখতে পাবে না সে। শ্যামল নিজে নিজেই টের পেয়েছিল মরে গেলে মানুষ আর আসে না। কে একথা শিখিয়েছিল শ্যামলকে?

কে শেখায় এসব কথা? আরও যত কথা?

কেমন করে শিশুর চৈতন্যের জালে আস্তে আস্তে ধরা পড়ে বিশ্বরহস্যের লীলা? কেমন করে বড়োদের মনস্তত্ত্বের তত্ত্ব বুঝে ফেলে সে? কেমন করে তার মুহূর্তে মুহূর্তে উন্মেষিত বুদ্ধির দলগুলিতে কুটিল বুদ্ধির প্যাঁচ পড়ে!

তা প্যাঁচ পড়ে বই কী!

শিশুকে যে সরলতার প্রতীক বলে অভিহিত করা হয় ওর মতো ভুল আর নেই। অথবা ওর মতো আত্মপ্রবঞ্চনা। শিশুরা বড়োদের থেকে কিছু কম ধূর্ত হয় না। কার্যসিদ্ধির জন্য তারা এমন চাল দিতে পারে, 'নিপাট সরলের' ভান করে এমন চতুরতা করতে পারে যা অনেকসময়ই বড়োদের বোকা বানায়।

শ্যামল সেই শৈশবেই বুঝে ফেলেছিল তার মা-র মরে যাওয়াটার মধ্যে কিছু একটা উলটোপালটা আছে। মা-র কোনো অসুখ করেনি, (শ্যামল এটা জেনেছিল তখন অসুখ করলে মানুষ মরে যেতে পারে।) তবু মা মরে গেল! এর মানে কী?

আবার শ্যামল এও বুঝে ফেলেছিল পিসির কাছে মা-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করা চলবে না। পিসি মা-র এই হঠাৎ মরে যাওয়ায় মা-র ওপর খাপ্পা। যেন পিসিকে জব্দ করবার জন্যেই মা-র এই মরে যাওয়া।

নইলে হঠাৎ হঠাৎ দাদুর কাছে বলে বসে কেন, 'ভগবান নেয় তার ওপর হাত নেই! এ শুধু আমায় জব্দ করার জন্যেই।

মা মরে গেল বলে পিসি কেন জব্দ হতে যাবে, তা বুঝতে পারল না শ্যামল। বুঝতে পারে না পিসির জ্বালাটা কী!

মা যখন ছিল, তখন কি পিসি শ্যামলকে কোনোদিন নাইয়ে দিত না? খাইয়ে দিত না? বেড়াতে নিয়ে যেত না? মা রান্না করত, পিসি তো অনেক দিনই করত এসব।

তবে?

তবে কেন পিসির সর্বদাই মুখে এমন 'জ্বালা'র গল্প? আন্দি বুতাইদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পিসি শ্যামলকে ওদের সঙ্গে খেলতে ছেড়ে দিয়ে আন্দির মা-র কাছে বসে পড়ে বলে, 'দ্যাখো আমার জ্বালার ওপর জ্বালা। নিজের কপাল নিয়েই জ্বলে পুড়ে মরছি চিরটা কাল, তার ওপর আবার এই গলায় গেঁথে দিয়ে গেলেন।'

কথার সব শব্দগুলোর মানে না বুঝলেও, শ্যামল এটা বুঝতে পারে শ্যামলই পিসির ভার বোঝা।

পিসির ওপর দারুণ একটা রাগ আর অভিমান ক্রমশই ওই শিশুমনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল।

াসিকে জ্বালাতন করবার দুষ্প্রবৃত্তি (যেটা আগেও একটু একটু ছিল) বেড়ে উঠছিল।

পিসিকে জব্দ করবার একটি প্রবল অস্ত্র আছে শ্যামলের হাতে।

সক্কাল থেকে সেই অস্ত্রটা বাগিয়ে নিয়েই রণক্ষেত্রে নামে শ্যামল।

অস্ত্রটা অবশ্যই অবাধ্যতা।

প্রতি ব্যাপারে অবাধ্যতা করার একটা হিংস্র সুখ উপভোগ করে শ্যামল সকাল থেকে রাত অবধি।

সকাল থেকে রাত।

কারণ এখন শ্যামলকে পিসির কাছেই শুতে হয়। দাদুর ঘরের পাশে যে-ছোট্ট ঘরটায় সরু একটা ৌকিতে পিসির বিছানা হত, তার পাশে আর একটা সরু চৌকি পেতে শ্যামলের বিছানা হচ্ছে। ঘরে ার পা ফেলবার জায়গা নেই, সেটাও পিসির একটা জ্বালা।

পিসি যে কখন উঠে যায় টের পায় না শ্যামল। ঘরটা যখন সাদা রোদ্দুরে ভরে যায় তখন পিসি সে ডাক দেয়। প্রথমে সোজাসুজি বলে, 'শ্যামল ওঠ, বেলা হয়ে গেছে—'

তারপর শুরু করে, 'নবাব সাহেব উঠুন!...জমিদারবাবু দয়া করে গা তুলুন!' ...তারপর বলতে াকে, 'ভেবেছিস কী তুই? কাজ নেই আমার? জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব তো এই কপালখাগির ড়ে।'

এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতকগুলো কথা বলে পিসি! কপাল কথাটার মানে তো জানা আছে, কিন্তু াগি' মানে কী?

তবু কথাটা যে খারাপ একটা কিছু তা শুনলেই বোঝা যায়। আর ওই খারাপ কথা শুনলেই জেদ ারও বেড়ে যায় শ্যামলের, শ্যামল তখন আর বালিশে মুখ ডুবিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে না, দিব্যি াসির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে শুয়ে থাকে।

এতে আরও খেপে ওঠে পিসি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কটকট করে তাকিয়ে শুয়ে আছিস যে? করানি পেয়েছিস আমাকে?'

শ্যামল যেন এতে আরও মজা পেত। ক্রূর একটা মজা। শ্যামল পিসির গলাটা আরও চড়তে দিত।

আর তারপরই দাদুর সেই ভারী গম্ভীর গলাটা শোনা যায় হঠাৎ। —মেজাজটা নামাতে শেখো মতি, মাতৃহীন শিশুকে মানুষ করতে একটু ধৈর্য লাগে।

তখন পিসি কেঁদে ফেলে।

তবু গলা নামিয়ে হিস হিস গলায় বলে, 'একটু একটু ধৈর্য লাগে? নিজেরা একদিন করে দেখুক-না গউ। বাপ তো দিব্যি গা ঝেড়ে বসে আছে! কেন, মা মরলে বাপে দেখে না? কাঁথায় শোওয়া ছেলে গ আর নয়? দু-দিন বাদে পাততাড়ি বগলে পাঠশালে যাবে। বাপ নিয়ে শুতে পারে না? রাজপুত্তুরের কালে ঘুম ভাঙিয়ে মুখ ধুইয়ে জামা জুতো পরিয়ে দেবার কথা তো বাপেরই। তা নয় যত চোর দায়ে া পড়েছে এই লক্ষ্মীছাড়ি।'

বকবক করেই চলে, যদিও দাদুর কান বাঁচিয়ে। শ্যামল সেটা বোঝে, শ্যামলের সেটাই সাহস।

অনেকক্ষণ পরে ধীরেসুস্থে ওঠে শ্যামল, দাওয়ার ধারে বড়ো একটা ঝকঝকে ঘটিতে জল থাকে, র পাশে একটা পিঁড়ি, পিঁড়ির ধারে একটু ঘুঁটের ছাই। ওই পিঁড়িতে বসে ছাইটা দিয়ে দাঁত মাজতে । শ্যামলকে, পিসি হাতে জল ঢেলে দেয়। সাধনের মা নাকি বাগদি, ও জল ঢেলে দিলে চলে না।

এখানে আর একবার অস্ত্রধারণ করে শ্যামল, এক মুখ ছাই মেখে মুখের জলটা নিয়ে শূন্যে ছোঁড়ে দিক-সেদিক ছিটিয়ে, সাধনের মা যদি তখন উঠোন ঝাঁট দেয় তো ডেকে ডেকে বলে, 'ও সাধনের

মা দ্যাখো রামধনু করছি।' ওই ছিটানো জল গায়ে লাগার ভয়ে পিসি সাত হাত দূরে সরে যায়, ডিঙি মারে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে জল দেয়, আর গাল পেড়ে ভূত ভাগায়।

গাল পাড়ে শুধু শ্যামলকেই নয়, পাড়ে তার মরা মাকে, গায়ে হাওয়া লাগানো বাপকে, নিজেকে, এবং আকাশ বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সব কিছুকে।

এদিকটায় দাদুর আসার সম্ভাবনা নেই, কারণ এদিকটা রান্নাবাড়ির পিছন দিক। তা ছাড়া দাদু এ সময় চণ্ডীমন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন। এদিকে ছোটোকাকিদের বাড়ি, ছোটোকাকির শাশুড়ি হন যিনি, মানে সেজোঠাকুমা, তিনি যদি পিসির চেঁচানি শুনতে পান তো গলা তুলে জিজ্ঞেস করেন, 'সক্কাল বেলাই কী হল রে সুমতি?'

পিসি আরও চ্যাঁচায়, 'হল আমার মাথা আর মুন্ডু! মুখপোড়া ছেলে আমার হাড় মাস ভাজা ভাজা করল গো!'

সেজোঠাকুমার গলা আবার শোনা যায়, 'তা মাওড়া ছেলে ব্যাদড়া তো হবেই! তোরও যেমন কপাল বাছা! নইলে কিছুর মধ্যে কিছু না মা-টা দুম করে অমন কাণ্ড করে বসে?'

এরকম কথায় শ্যামল হঠাৎ চুপ করে যায়, উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, আরও যদি কিছু শোনা যায় তার মা সম্পর্কে, কিন্তু আর বেশি কিছু শোনা যায় না। যেন হঠাৎ একটা না-বলবার কথা বলে ফেলে চুপ করে গেল সেজোঠাকুমা।

কিন্তু কাণ্ডটা কী?

শ্যামল দিনে দিনে টের পায়, শুধু মরে যাওয়া কোনো 'কাণ্ড' নয়। রঘুর ঠাকুমা তো মরে গেল সেদিন, হরুর কাকা মরে গেছে কিছুদিন হল, গোয়াল ঘরের সবচেয়ে ভালো গাই 'পদ্ম'ও মরে গেল ক-দিন আগে, কেউ তো বলছে না সেটা তাদের নিজস্ব কোনো কাণ্ড! ওরা শুধুই মরে গেছে, কিন্তু শ্যামলের মা একটা কাণ্ড করেছে। যার জন্যে শ্যামল আর মাকে দেখতে পেল না কোনোদিন! দেখতে পাবে না কখনো।

কী সেই কাণ্ড?

কী করেছে মা?

মা যখন ছিল?

কোনো কোনোদিন মাঝরাত্রে শ্যামল টের পেত বাবা আর মা কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া করছে। ঠিক ঝগড়াও নয়, যেন তক্ক করছে।

'তক্ক' কথাটার মানে জানে শ্যামল, শ্যামল মা-র কথার উপর কথা বললেই মা বলত, 'মুখে মুখে তক্ক করিস না শ্যামল! খুব খারাপ অভ্যেস!'

পিসিও মাঝে মাঝে সাধনের মাকে বলে, 'মুখে মুখে তক্ক কোরো না সাধনের মা, যা বলছি তা করো।'

বাবা মা-র ওই তক্কর কারণটা বুঝতে চেষ্টা করত শ্যামল ঘুমের ভান করে নিথর হয়ে পড়ে থেকে। কিন্তু বুঝতে পারত না। কোনো কোনোদিন বোঝবার চেষ্টা করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত, কোনো কোনোদিন অস্বস্তিতে ছটফটিয়ে ঝপ করে উঠে বসে বলত, 'জল খাব!' বলত 'গরম হচ্ছে!'

মা-বাবা চুপ হয়ে যেত।

বাবা বালিশটা উলটে দেয়ালমুখো হয়ে শুয়ে পড়ত, মা চৌকি থেকে নেমে কুঁজোর জল গড়িয়ে শ্যামলকে দিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে এসে আবার ভালো করে মশারি গুঁজে শুয়ে পড়ত।

কিন্তু এক-আধদিন শ্যামল টের পেত মা তক্ক করতে গিয়েই থেমে গিয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে কাঁদছে।

সেদিন ভারি ভয় করত শ্যামলের।

সেই আলো নেভানো ঘর, মুখের ওপর মাথার ওপর মশারি, মশারির বাইরে দেয়াল-ধারে রাখা বাক্স তোরঙ্গগুলোর কালো শরীর, আলনায় ঝোলানো কাপড়গুলোর ছায়া, খোলা জানলার বাইরে ভূতের মতো, ব্রহ্মদত্যির মতো, একানড়ের মতো সব গাছ, তার সঙ্গে কানের কাছে একটা চাপা কান্নার শব্দ, ভয়ানক একটা ভয়ে বুকটা হিম হয়ে যেত শ্যামলের, হাত-পা নাড়তে সাহস হত না, অনড় হয়ে পড়ে থাকত সে।

মা-র ওই চাপা কান্নার মধ্যেই কি এই 'কাণ্ড'র বীজ নিহিত ছিল?

কিন্তু সকালে তো কই কিছু বোঝা যেত না। শ্যামল তো আড়ে আড়ে দেখবার চেষ্টা করত।...দেখত সব ঠিকঠাক।

মায়ের ওপর দারুণ একটা অভিমানে এক-এক সময় শ্যামল একদম চুপ হয়ে থাকত। যেন মা শ্যামলের সঙ্গে ভয়ানক একটা দুর্ব্যবহার করেছে, যেন ইচ্ছে করলে এটা না করতেও পারত!

গল্পের রাজারা দুয়োরানির ওপর যেরকম নিষ্ঠুরতা আর অবহেলা করে, মা যেন শ্যামলের ওপর তাই করেছে।

দুয়োরানির মতোই দুঃখ হয় শ্যামলের।

হয়তো কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে, হয়তো কোনোদিন ঘুঘুপাখি ডাকা ভরদুপুরে, হঠাৎ ওই দুঃখটা চেপে ধরে শ্যামলকে। শ্যামলের চোখ দিয়ে শুধু শুধুই জল পড়ে যায়, শ্যামল এদিক-সেদিক চেয়ে তাড়াতাড়ি শার্টের কোণ তুলে জলটা মুছে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কী আশ্চয্যি, কোথা থেকে যেন সরসর করে আবারও বেরিয়ে আসে অবিরল জলের ধারা।

শ্যামল তখন লোককে এড়িয়ে বেড়াতে চায়; শ্যামল সেদিন নিঃশব্দে মুখ ধুয়ে নেয়, জামা বদলে নেয়, খেয়ে নেয়। খেতে ইচ্ছে হয় না, গলা দিয়ে নামতে চায় না, তবু খেয়ে নেয়। না খেলেই তো কথা শুনতে হবে? কথার উত্তর দিতে হবে?

পিসি আপনমনে বলে, 'বাবুর যে দেখছি আজ মেজাজ শরিফ?'

ঘুঘু ডাকা সেই দুপুরটায় পিসির হাত এড়িয়ে রান্নাঘরের পিছনের জঙ্গলে বাগানটায় চলে যায় শ্যামল। আপন মনে ঘোরে, বুনো সিমের লতাটা ধরে টানাটানি করে সিম ছেঁড়ে, আর সেগুলো টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। শ্যামল জানে এগুলো খাবার জিনিস নয়।

কিন্তু উচ্ছেলতার ঝোপটা তো পিসি সযত্নে রক্ষে করে! পিসি খায়, দাদুর তেতো না হলে চলে না। এটা জেনেও শ্যামল ওই লতার ঝোপ তুলে তুলে বেছে বেছে উচ্ছে ছেঁড়ে আর দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফল ফুল যা দেখে তাই ছিঁড়ে নিয়ে খুব দূরে ছুঁড়ে ফেলা শ্যামলের যেন একটা নেশার মতো।

এ নেশার ফলে একদিন খুব জব্দ হয়েছিল শ্যামল। কখন যেন টুকটুকে সূর্যিমণি লংকার গাছ থেকে লংকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে, হঠাৎ জব্দ হয়ে গেল চোখে ধুলো পড়ায় চোখ রগড়াতে গিয়ে। উঃ সে কী জ্বালা!

অন্য সময় হলে, কেউ কাছে থাকলে নিশ্চয়ই কেঁদে উঠত সে, কিন্তু ভরদুপুরে একা চেঁচিয়ে উঠতে পেরে উঠল না, গলাটা কে যেন চেপে ধরেছে মনে হল।

দুই পা ঠুকে দাপাদাপি করে শেষ অবধি ছুটে গিয়ে ছোটোকাকিদের বাড়িতে ঢুকে পড়তে হল শ্যামলকে। দুই চোখে অগ্নিদাহ, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে মুখ, পরনের ছ-হাত ধুতিখানার সাড়ে চার হাতই মাটিতে লুটচ্ছে, এই মূর্তিতে ঢুকে পড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় ডেকে উঠল, 'ছোটোকাকি?'

কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এল ছোটোকাকি, 'ষাঠ ষাঠ' করে বলল, 'ও বাছারে তুমি? কী হয়েছে?'

—লংকা লেগেছে চোখে।

—ওমা সে কী? চোখে লংকা কী? কোথা থেকে লাগল?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কাকি জলের ছাট দিয়ে দিল চোখে, মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিল, ধুতি পরিয়ে দিয়ে কোলে করে নিজের ঘরে নিয়ে শোওয়াল, জ্বর হলে যেমন কপালে ভিজে ন্যাকড়ার জলপট্টি দেয়, তেমনি জলপট্টি একটা চোখের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিতে দিতে বলল, 'ঘুমো! ঘুমিয়ে পড়লে সেরে যাবে।' বলল, 'ভরদুপুরে একা একা অমন করে আগানে-বাগানে ঘুরিসনে শামু। ঘুরতে নেই।'

ঘুমের প্রশ্ন নেই, চোখের অগ্নিদাহটাও একটু কমে যাচ্ছে, শ্যামল প্রশ্ন তুলল, 'কেন ঘুরতে নেই?'

ছোটো ছেলেকে ভূতের ভয় দেখাতে নেই এ শাস্ত্র জানা ছিল না ছোটোকাকির। ছোটো ছেলেকেই দেখাতে হয় সেই ভয়, এই তার জানা। ছেলেবেলায় এই ভয় পাওয়া যে একেবারে জীবনের মূলে শিকড় গেড়ে বসে, এমন হাস্যকর কথা টোলের পণ্ডিত এসে বললেও বিশ্বাস করবে না ছোটোকাকি।

তাই ছোটোকাকি অবলীলায় বলে উঠল, 'জানিস না কেন ঘুরতে নেই? এ মা, তুই কী বোকা ছেলে রে? ঘুরলে ভূতে ধরে যে—'

শ্যামল অলক্ষ্যে ছোটোকাকির শাড়ির একটা অংশ মুঠোয় চেপে ধরে বলল, 'কী ভূতে ধরে?'

—কী ভূত আবার! দুপুরে ভূত।

—দুপুরে ভূত!

নামটা তো নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়, বরং বেশ লাগসই বলেই মনে হল। তবু শ্যামল মুখে জোর দেখিয়ে বলল, 'কই আমাকে তো ধরল না?'

—ধরেনি, আজ শুধু লংকার ঝাঁজ দিয়ে ভয় দেখিয়েছে, আবার যদি যাও, খপ করে ধরে ফেলবে।

আগে কোনোদিন ছোটোকাকির দিকে তাকিয়েও দেখেনি শ্যামল, সেজোঠাকুমার সঙ্গে আসত সে, একটুক্ষণ বসে মা-র সঙ্গে কি পিসির সঙ্গে গল্প করত, হয়তো দুটো পান খেত চলে যেত। কে দেখে তাকিয়ে?

সেই অদ্ভুত ভোর বেলাটার পর থেকে ছোটোকাকিকে দেখতে পেয়েছে শ্যামল।

এক-এক দিন সন্ধে বেলা ছোটোকাকি শ্যামলকে এবাড়িতে নিয়ে আসে, দুধ-ভাত মেখে গল্প বলে বলে খাইয়ে দেয়, আর ঘুম পাড়িয়ে কখন কোলে করে ওবাড়িতে দিয়ে আসে।

পিসি শ্যামলকে কোলে নিয়ে টানতে পারে না, ছোটোকাকি অবলীলায় পারে।

পিসি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'হবে না কেন, বাঁজার গতর।'

পিসির অর্ধেক কথারই মানে বুঝতে পারত না শ্যামল, কত বড়ো হয়ে তবে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে বুঝেছে। কিন্তু না বুঝেও কথার ভাবটা ধরতে পারত যেন!....

পিসির একাদশীর দিন শ্যামলকে দু-বেলাই খাইয়ে দেয় ছোটোকাকি, সক্কাল বেলাই নিয়ে আসে। বলে, 'আজ তোমাদের বাড়িতে মাছ রাঁধা হবে না কিনা বাবু, আজ এবাড়িতে খেতে হয়।'

—তোমাদের বাড়িতে মাছ রাঁধা হয়?

—হয়।

—কেন?

—ওই নিয়ম।

—পিসি কেন মাছ খায় না?

—খেতে নেই।

—সেজোঠাকুমা মাছ খায় না?
—উঁহু, উঁহু। না না! বলতে নেই।
—তুমি খাও?
—দুগ্গা, দুগ্গা! খাই বাবা।
—কেন খাও?
—ওই নিয়ম।
রোজই কাকিকে একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না শ্যামল, প্রত্যাশা করে থাকে ছোটোকাকি বলে। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হয় না।
আজ কি সেই কথাটা বলে ফেলবে শ্যামল?
প্রসঙ্গটা তো প্রায় কান ঘেঁষেই এসে গেছে।
শ্যামল, বলে, 'ধরে ফেলবে কী করে? ভূতেদের কি হাত আছে?'
—আছে। সব আছে, শুধু দেখতে পাওয়া যায় না। অলক্ষ্যে এসে ধরে ফেলে।
শ্যামলের চোখের উপর ভিজে ন্যাকড়ার পটি, শ্যামলকে ছোটোকাকির দিকে তাকাতে হবে না। ল বলে ফেলে, 'মা দুপুর বেলা বাগানে গিয়েছিল?'
কতদিন পরে যেন শ্যামল 'মা' শব্দটা উচ্চারণ করল!
শ্যামলের হাত-পা কেমন কেঁপে উঠল।
শ্যামলের বুকটা ওঠা পড়া করতে লাগল।
ছোটোকাকিও ওর মুখে 'মা' শব্দটা শুনে চমকে উঠল। শোনেনি কোনোদিন এর মধ্যে।
ছোটোকাকি এই খাপছাড়া প্রশ্নে অবাক হল।
বলল, 'সে কী? দুপুর বেলায় বাগানে যেতে যাবেন কেন?'
—তবে ভূতে ধরল কেন মাকে?
—দুগ্গা দুগ্গ! ও-কথা বলতে নেই বাবা।
—তবে যে পিসি বলে।
—ওমা! কী বলে পিসি?
—বলে যে, 'তোর মাকে কী ভূতেই ধরল আমার মাথা খেতে।
—ওঃ! ও সে-ভূত নয়।
বলেই ছোটোকাকি হঠাৎ একটা কথা বলে বসে।
ছোটোকাকিও কি 'বলি বলি' করে থমকে থাকছিল, তাই আজ সুযোগ পেয়ে?
এই কথা বলল ছোটোকাকি, 'মাকে কেন ভূতে ধরতে যাবে? মা স্বর্গের দেবী, স্বর্গে চলে গেছেন।'
—স্বর্গে কী করে যাওয়া যায়?
—ভগবান এসে নিয়ে যান।
শ্যামল এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয় না।
ভগবান যদি হঠাৎ আস্ত একটা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে পারেন, তবে আর ভূতের সঙ্গে াত কোথায় ভগবানের?
শ্যামল তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'ভগবান বিচ্ছিরি! আমি ভগবানকে মেরে ফেলব।'
—ছিঃ বাবা! ও কথা বলতে নেই!
—কেন বলতে নেই?
—ঠাকুর রাগ করেন।

এই আবার আর এক প্যাঁচ

ভগবানের ওপর আবার ঠাকুর।

শ্যামল বেজার গলায় বলে, 'কোন ঠাকুর?'

—সব ঠাকুর।

—কেষ্ট? কালী? চণ্ডী? বাবা পঞ্চানন?

—হ্যাঁ ওঁরাই তো রাগ করেন।

—তবে ভগবান মাকে নিয়ে গেল কেন?

—ভগবানকে 'গেলেন' বলতে হয় শামু।

—আচ্ছা হয়তো হয়! বাবাঃ বাবাঃ! কেন ভগবান মাকে নিয়ে গেলেন বলো তুমি!

—তোমার মা-র এখানে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

—কী কষ্ট? মা-র অসুখ করেছিল?

—না অসুখ নয়, এমনি কষ্ট!

—কীসের কষ্ট বলোইনা তুমি।

—সে তুই এখন বুঝবি না শামু, বড়ো হলে বুঝবি।

—আমি এখনই বড়ো হয়েছি, তুমি বলো।

বাঁধভাঙা স্রোত দুর্বার।

ছোটকাকি আস্তে ওর গায়ে হাত রেখে বলে, 'না মানিক, যখন আরও বড়ো হবে, তখন বুঝতে পারবে।'

কিন্তু বাঁধ যখন ভেঙেছে, এত সহজে ছাড়বে কেন শ্যামল?

শ্যামল তাই অন্য দিক থেকে প্যাঁচ কষে, 'তোমার কষ্ট আছে?'

অর্থাৎ মিলিয়ে দেখবে মা-র সঙ্গে ছোটোকাকির জীবনের সাদৃশ্যটা কোনখানে, জানতে পারলে হয়তো বুঝতে পারবে কষ্টটা কী জাতীয়।

ছোটোকাকি শ্যামলের এই প্রশ্নে চমকে উঠে একটু চুপ করে থাকে, তারপর আস্তে বলে, 'আছে বই কী বাবা!'

কী কষ্ট?

ছোটোকাকি জানে উত্তর দেওয়া-না-দেওয়াটা অর্থহীন, তবু না দিয়ে পারে না। একটা নিশ্বাস চেপে বলে, 'এই তোমার মতন একটি সোনার যাদু নেই বলে।'

—য্যাঃ!

শ্যামল চোখের পটিটা টেনে খুলে ফেলে বলে, 'এ আবার কী কষ্ট? তুমি আমায় ঠকাচ্ছ।'

ছোটোকাকি জানত না অদূর ভবিষ্যতে তার বয়সের মেয়েরা কল্পনার কাজল পরে বিয়ের স্বপ্ন দেখবে, তারপর ছেলে-মেয়ে!

বেচারি নিজেকে 'মার্কামারা' বলে ভেবে নিয়েছে।

—ঠকাচ্ছি না রে শামু! ওটাই কষ্ট আমার।

শ্যামল হঠাৎ একটা উদার প্রস্তাব করে বসে, 'তোমাদের বাড়িতেই রেখে দাও-না আমায়।'

ছোটোবউ শিউরে উঠে বলে, 'বোলো না বাবা, ওকথা বোলো না, তাহলে তোমাকে আর এক বারও আসতে দেবেন না দাদু! পিসি বলবে বাঁজা আবাগি নজর দিচ্ছে।'

শ্যামল হঠাৎ তেড়ে উঠে বলে, 'তোমাদের সব কথা বোঝা যায় না কেন? অমন বিচ্ছিরি করে বলো কেন? তুমি যা বললে, তার মানে কী?'

—বড়ো হয়ে বুঝবে।

—আরে ধ্যাৎতারি। সবাই বলে বড়ো হয়ে বুঝবে। বড়ো হলে তো শুধু ছোটোদের ঠকাব।

ছোটোবউও হেসে ফেলে বলে 'ধ্যাৎ!'

শ্যামল আবার বালিশের পাশ থেকে সেই আধশুকনো ন্যাকড়াটুকু আবার চোখে চাপা দিয়ে শুয়ে ড়ে বলে, 'ঠকব না তো বলো, মরে গিয়ে মানুষ কী হয়?'

—ঠাকুর হয়ে যায় বাবা!

—ধ্যাৎ বোকা! জানে না। মরে গেলে তো ভূত হয়ে যায়। না হলে ভূত কোথা থেকে জন্মায়?

ছোটোবউ শঙ্কিত হয়।

এসব কথাই-বা বলছে কেন ছেলেটা?

ছোটোবউ সাবধানে বলে, 'খারাপ লোকেরা ভূত হয় শামু। ভালো লোকেরা, তোমার মায়ের মতো াকেরা, ঠাকুর হয়ে যান।'

—কোথায় যান?

ছোটোবউ সেই চিরপ্রচলিত কথাই বলে। আর কথা পাবে কোথায়?

বলে, 'আকাশে! আকাশে গিয়ে "তারা" হয়ে যান। তোমার মা-ও তাই হয়ে গেছেন। আকাশের ব "তারাই" মানুষ।'

শ্যামল সংশোধন করে দেয়, 'মরে যাওয়া মানুষ।'

তারপর আস্তে বলে, 'অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চেনা যায়?'

ছোটোবউ নিজের কাটা খালে নিজেই ঝাঁপ দেয়, বলে, 'খুব মন দিয়ে আকাশে চেয়ে থাকলে যায় না।'

শ্যামল একটুক্ষণ চুপ করে বোধ হয় অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বলে, 'তোমাদের বাড়ির আকাশে, না ামাদের বাড়ির আকাশে?'

ছোটোবউ ওর গায়ে আস্তে হাতের চাপড় দিয়ে বলে, 'বোকা ছেলে! বোকা ছেলে! আকাশ বুঝি তোমাদের আমাদের হয়? সব আকাশই এক।'

—সব আকাশই এক?

—হ্যাঁ রে পাগলা! দেখিস না চাঁদকে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায়।

—ওই একটাই চাঁদ?

—হুঁ।

—বিলেতেও? কলকাতাতেও?

—হ্যাঁ রে বাবু হ্যাঁ।

ছোটোকাকি হেসে ওঠে।

ছোটোকাকিকে বড়ো ভালো লাগে শ্যামলের। ছোটোকাকি যদি তার পিসি হত!

—ঘুমোবি না শামু?

—বা! রাত্তিরে তো ঘুমোই।

—দুপুরেও ঘুমোয়।

—আমি ঘুমোই না।

একটু থেমে বলে, 'আগে ঘুমোতাম, এখন ঘুমোই না।'

আগে। এখন।

ছোটোকাকির চোখে চল আসে।

—চোখ জ্বালা সেরেছে রে?

—একটু একটু আছে।

—ঘুমোলে সেরে যেত!

—এমনি সেরে যাবে। বলেই শ্যামল হঠাৎ বলে ওঠে, 'পিসি মরে গেলে ভূত হবে, না ছোটোকাকি?'

ছোটোকাকি শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বলে, 'ছি ছি! ও কথা বলতে নেই বাবা! পিসি তোমায় কত ভালোবাসেন।'

—ছাই বাসে।

—ও-কথা বোলো না। তোমার জন্যে কত খাটেন।

—শুধু তো খাইয়ে দেয়, নাইয়ে দেয়, আর মুখ ধুইয়ে দেয়!

ঘুম পাড়ান।

—আমি নিজে নিজে ঘুমোই।

ছোটোবউ চিন্তিত হয়।

এ প্রসঙ্গ বন্ধ করাই ভালো। কখন অসতর্কে কী সায় দিয়ে বসবে সে, আর ছেলেটা হয়তো ছেলেবুদ্ধিতে সেকথা বলে বসবে পিসিকে। ছোটোবউ বলে, 'বাবা তোকে বেড়াতে নিয়ে যান?'

—বাবা? না তো?

—তোর সঙ্গে গল্প করেন?

—না তো?

—তা তুই তো বাবার কাছে শুতে পারিস, গল্প করতে পারিস।

—বাবাকে আমার ভালো লাগে না।

বলে ও-প্রসঙ্গে যবনিকা টেনে দেয় শ্যামল।

কথা বলতে বলতে ঘুম এসে যায় ছোটোকাকির, জানলা বন্ধ করা ছায়া ছায়া ঘরে ঘুমন্ত ছোটোকাকির সিঁদুরটিপ পরা নরম মুখটার দিকে তাকিয়ে শ্যামলের ভাবতে ইচ্ছে করে মা মারা যায়নি, মা শ্যামলের কাছে শুয়ে আছে।

শ্যামলের মনে হয় এবার ও ঘুমিয়ে পড়বে। খুব ভালো লাগা ভালো লাগা একটা স্বপ্ন দেখবে।

কিন্তু ওই ভালো লাগাটা সইল না বেশি দিন, পিসি একদিন হুকুমজারি করে বসল, 'খবরদার যাবি না ওবাড়িতে! গেলে ঠ্যাং ভাঙব।'

শ্যামল উদ্ধত প্রশ্ন করে, 'কেন যাব না? কেন ঠ্যাং ভাঙবে?'

—সেকথা তোকে বলতে বাধ্য নই আমি। বলছি যাবি না ব্যাস!

—হ্যাঁ যাব। আমি ছোটোকাকির কাছেই থাকব। তোমাদের বাড়িতে আসব না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে পিসি, 'যা বলেছি তাই! এখন বুঝুক দাদা, বুঝুন বাবা।'

শ্যামলের হাতটা ধরে হড়িহিড় করে টানতে টানতে কালীপ্রসাদের কাছে গিয়ে বলে, 'এই দেখুন, যা বলেছিলাম ঠিক কি না। গুণতুক করেছে কি না! যেদিন দেখেছি কেষ্টপক্ষের একাদশী তিথিতে এক প্রহর রাতে ছেলেটাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে নিজেদের ওই আলশেভাঙা ছাতের মাঝ মধ্যিখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে ফিসফিস করে কী মন্তরতন্তর করছে, তখনই বুঝেছি সর্বনাশ হতে বসেছে।'

কালীপ্রসাদ বলেন, 'বাজে বকিস না সুমতি।'

সুমতি ক্ষোভে দুঃখে রাগে অপমানে গরগর করে, 'আচ্ছা এখন তো বাজে বকছি, পরে দেখবেন। কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে। কিন্তু কিছুই যদি নয়, তবে এই ছেলে আর সেই খুড়ি, দু-জনে অমন করে মুখে তালাচাবি লাগিয়ে বসে থাকল কেন? পুলিশের জেরা করেও বার করতে পারলাম না রাত্তির ন-টার সময় খোলা আকাশের নীচে কী হচ্ছিল ওদের?'

কালীপ্রসাদ বলেন, 'সেদিনের কথা যাক, আজ কী হয়েছে?'

যা হবার ঠিকই হয়েছে। ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। দাদার কথাও যেমন গোড়ায় গ্রাহ্য করেননি আপনি? পাওয়া গেল তো প্রমাণ? পেলেন তো ফল? আজ এই দেখুন হতভাগা ছেলে বলছে, 'হ্যাঁ যাব ওবাড়িতে! নিশ্চয় যাব। ওই বাড়িতেই থাকব, তোমাদের বাড়িতে আসব না। এখন বলুন, এসব গুণতুকের কাজ কি না। ওই লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি সব্বাইকে গ্রাস করবে।

দাদু তাঁর সেই ভরাটি গম্ভীর গলায় বলেন, 'সুমতি, ওঘরে যা—'

পিসি চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।

দাদু তারপর শ্যামলকে ডাকেন —সরে এসো।

—কী বলছ বলো-না।

—কাছে এসো।

আর বেয়াড়ামি করতে সাহস হয় না শ্যামলের। সরে এসে বলে, 'কী বলছ?'

—শোনো কাল থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে।

—রাত্তিরে?

—হ্যাঁ রাত্তিরে-দুপুরে-সকালে, সবসময়ে। আমার সঙ্গে খাবে, বেড়াবে, আর সোমবার দিন থেকে পাঠশালে যাবে।'

পাঠশালে!

ভয়ে হৃৎপিণ্ডটা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

ক্ষীণ কণ্ঠে একটা শব্দই উচ্চারণ হয়, 'বাঃ! হাতে খড়ি হবে না বুঝি?'

এই দুর্বল অস্ত্রটা ছিল তার হাতে। কারণ মা যখন ছিল, মাকে বলতে শুনত, 'এই বারে বাবুর আমার হাতেখড়ি হবে, পাঠশালায় যাবে।'

হাতেখড়ি জিনিসটা কী জিজ্ঞেস করায় মা হেসে হেসে বলেছিল, 'বলব কেন? হলে দেখতে পাবি।'

যে-জিনিসটার সঙ্গে পাঠশালার সম্পর্ক সেটা দেখার জন্যে উৎসাহ বোধ করেনি শ্যামল, তারপর তো সেই অদ্ভুত ভোর বেলাটা এসে শ্যামলের জীবনছন্দে প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। শ্যামল এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এতদিন পরে হঠাৎ চমক ভেঙে উঠে কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন তাঁর এযাবতের ঔদাসীন্যের প্রায়শ্চিত্ত করতেই বোধ করি এলোমেলো শব্দগুলোকে নতুন ছন্দে সাজিয়ে তোলবার ভার নিলেন।

উনি বললেন, 'হাতেখড়ি? হ্যাঁ সেটা হবে বই কী! সোমবারের আগেই হবে।'

পরের পরের দিন পূর্ণিমা তিথিতে হাতেখড়ি হয়ে গেল শ্যামলের।

সোমবার থেকে পাঠশালায়।

দাদুকে শ্যামলের বরাবরই ভয় করে। দাদুর ভারী গলা, অল্পকথা নিঃশব্দ চলাফেরা সংসার সম্পর্কে ঔদাসীন্য, অনেকক্ষণ পুজো করা আর সবসময় বৈঠকখানার দিকে থাকার জন্যে খুব দূরের লোক মনে হয় শ্যামলের।

বাবাও অবশ্য খুব একটা আমল দেয় না শ্যামলকে। তবু বাবা হঠাৎ হঠাৎ একদিন ডেকে কথা বলে, কঞ্চি কেটে তির-ধনুক বানিয়ে দেয়, হাত ধরে মেলা দেখাতে নিয়ে যায়, আর হাত ভরতি জিনিস কিনে এনে দেয়।

হয়তো তারও সেটা ঔদাসীন্যের প্রায়শ্চিত্ত, একটামাত্র ছেলে, তার প্রতি এতটুকু লক্ষ্য রাখে না সে, এটা হঠাৎ মনে পড়ায় হয়তো অনুতাপ হয়।

কিন্তু শ্যামলের তাতে খুব সুখ নেই। বাবার প্রতি প্রীতি উপছে পড়ার মুহূর্তেই হয়তো বাবা যত্নে তৈরি তির ধনুক মুচড়ে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'যা বেরো কিছু দেব না।'

এই দুর্বোধ্য বাবাকে ভালোবাসা শক্ত।

তবু আগে আগে তো বাবার বিছানাতেই শুত শ্যামল। একদিকে বাবা, একদিকে মা। তাই দাদুর মতো এমন দূরের মানুষ মনে হত না।

দাদু মাত্র খাবার সময় আর শোবার সময় ছাড়া ভিতরবাড়িতে আসে না। আর আসেন সকালে স্নান সেরে প্রাতঃভ্রমণ সেরে 'চণ্ডীবাড়ি' যাবার আগে গরদের ধুতি-চাদর পরতে।

দাদু যখন খেতে বসেন, তখন পিসি যেন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের পাখাখানা নাড়ে তাও আস্তে আস্তে।

কার্পেটের আসনে বসে শ্বেতপাথরের থালা-বাটিতে ভাত খান দাদু, দাদুর খাবার সময় দালানে উঠতে পায় না শ্যামল।

শ্যামল কী করে দাদুর সঙ্গে থাকবে, দাদুর সঙ্গে খাবে?

শ্যামল ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে কী করে খাব? তুমি কি মাছ খাও?'

—না খাই না! তুমিও খাবে না আর।

এখন অনেক দিন পরে সেই ছেলেটার দুর্গতির কথা স্মরণ করলে, শ্যামল মুখোপাধ্যায় নামের ভদ্রলোকটির কৌতুকের সঙ্গে একটা বেদনাবোধ না এসে পারে না।

একটা পাঁচ-ছ বছরের শিশুকে একটা পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে এক চাকায় বেঁধে নিয়ে চালানোর চেষ্টাটা যে কী নিষ্করুণ, সেটা সেই বৃদ্ধের মাথায় কেন আসেনি, তাই ভাবে শ্যামল। অথচ তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নামে ফুলপুরের সবাই মাথা নোয়াত। বিপদে সমস্যায় পরামর্শ নিতে আসত।

কিন্তু সেই শিশুটা? তার প্রতি যে নিষ্ঠুরতা করা হচ্ছে, সেটা কি সে ধরতে পারত?

বয়স্ক শ্যামল ভেবে দেখেছে সেকথা।

ধরতে পারত না।

দাদুর সঙ্গে এক চাকায় বাঁধা পড়ে গিয়ে নিজেকে সে মহামহিমান্বিত ভাবত। সেই ভাবনার থেকে সৃষ্টি হল দাদুর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ।

ইহজগতে যেন আর কেউ কোথাও নেই, আছেন শুধু দাদু, আর তাঁর ছত্রছায়াতলে শ্যামল নামের ছেলেটা।

একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব যা করতে পারে, তাই করেছিল, ওই ছোট্ট ছেলেটাকে একেবারে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল।

বিরাটের কাছে আত্মবিলোপের যে-সুখ সেই সুখে নিমগ্ন হয়ে দিন, মাস, বছরের ধাপগুলি অতিক্রম করতে লাগল ছেলেটা।

ছেলেটাকে দেখতে পায় শ্যামল! সকাল বেলা দাদুর সঙ্গে বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে সে, সব কিছু
র মতো হওয়া চাই বলে দাদুই শখ করে তার জন্যে ছোট্ট সাজি কিনে দিয়েছেন, করিয়ে দিয়েছেন
ট্ট খড়ম। সেই সকাল বেলাই স্নান করে চেলির ধুতি আর খড়ম পরে সাজিটি হাতে নিয়ে চলেছে
ছু পিছু। বেশি কথা পছন্দ করেন না দাদু, তাই শ্যামলের বকবকানি কমে গেছে। একটি ছোটো
পের বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তির মতো তার হাবভাব চালচলন।

—দাদু নারায়ণ পুজোয় বেলপাতা দিতে নেই, তাই না?

—হ্যাঁ শ্যামা, সেদিন তো বলে দিয়েছি।

দাদু ওকে শ্যামাই বলেন, কারণ দাদুর দেওয়া আসল নামটা তার শ্যামাপ্রসাদ, মা-পিসি ডাকার সময়
দর করে শ্যামাটাকে শ্যামলে এনে ফেলেছিল। সহজ বলে ওটাই সবাই বলেছে, 'শ্যামল' শামু।
দাদুই শুধু শ্যামা।

—দাদু, জবাফুল তো শুধু কালীঠাকুরের?

—কালীঠাকুরের বটে, তবে দুর্গা জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মী এঁদেরও।

—মেয়েমানুষ ঠাকুরদের?

—শ্যামা! আবার ওই কথা বলছ? সেদিন কী বলে দিয়েছি? ঠাকুরকে মেয়েমানুষ ব্যাটাছেলে
াতে আছে?

শ্যামল সভয়ে মাথা নাড়ে।

—বলো, কী বলতে হয়?

—দেবী আর দেবতা।

—হ্যাঁ। মনে রাখবে।

চণ্ডীমন্দিরের নাটমন্দিরে দাদু বসেছেন আসন পেতে, তার পাশে ছোট্ট একটি আসন। দাদুর কোশাকুশীর
শে তারও ছোট্ট একজোড়া কোশাকুশী। দাদুর কোলে চণ্ডীর পুঁথি, এইখানে বসে চণ্ডীর বিশেষ বিশেষ
্যায় পাঠ করেন তিনি। আর শ্যামলের কোলে তার পাঠ্যপুস্তক।

দাদু বলেন, 'এখন এই-ই তোমার পুজোর বই।'

শ্যামল দাদুর পাশে চোখ বুজে বসে থাকে কত কতক্ষণ, সাবধানে একবার চোখ পিটপিটিয়ে দেখে
য় দাদু এখনও মুদ্রিতনয়ন কি না। যেই দেখে দাদুর চোখ বোজা, তৎক্ষণাত আবার চোখ বুজে ফেলে।

দাদু চণ্ডীপাঠ করেন, শ্যামল 'প্রথম ভাগ' পাঠ করে বিড়বিড়িয়ে।

দাদু খেতে বসেন, তার পাশে শ্যামল।

শ্যামলেরও কার্পেটের আসন, শ্বেতপাথরের থালাবাটি। ছোটো-বড়ো অনেক সাইজেরই তো আছে
সারে।

শ্যামলের ইচ্ছে করে দাদুর মতো গণ্ডুষ করে, কিন্তু সেটা নাকি পৈতে না হলে করতে নেই। শ্যামল
তের প্রতীক্ষায় দিন গোণে।

দাদু যখন খেয়ে উঠে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করেন, শ্যামলেরও তখন বিশ্রাম ভিন্ন গতি নেই। 'দাদুমুক্ত'
মলকে দেখা যায় শুধু বিকেল বেলা ঘণ্টা দুই-আড়াই।

কালীপ্রসাদ বিশ্রামান্তে উঠে চলে যান দেবীপুরের টোলে অধ্যাপনা করতে, ফিরতে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাহ্নিকের
য় আবার শ্যামলের ডাক পড়ে। হাত-পা ধুয়ে কাচা ধুতি পরে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে দাদুর পাশে বসে
কতে হয়।

দাদুর মতে ওটাই বোধ করি 'অভ্যাসযোগ'।

শুধু ওই দু-আড়াই ঘণ্টা সময় খেলার ছুটি। তা নইলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু খেলার সঙ্গী নির্বাচনও দাদু করে দিয়েছেন। হরি পুরুতের নাতি দীনু আর পাড়ার সাধনকাকার ছেলে পল্টু। শুধু এরা দু-জন, ব্যাস!

তাও তারা এবাড়িতে এসে খেলবে।

কী খেলত শ্যামল?

মনে পড়ে না।

খেলায় সেই আগের উদ্দামতা ছিল না।

এই সময়টা পিসি তাকে একটু হাতে পেত। বলত, 'আয় মুড়ি-নাড়ু খাবি আয়, আম-চিঁড়ে খাবি আয়।'

শ্যামল শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করত, 'দাদু মুড়ি খান? নাড়ু খান? আম-চিঁড়ে খান?'

পিসি কপালে করাঘাত করে 'উঃ! কী দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন বাবা, ছেলেটা একেবারে সাধু হয়ে গেল! মুড়ি খাবে না, নাড়ু খাবে না, আম-চিঁড়ে খাবে না। ওগুলো মাছ-মাংস? কেন, একাদশীর দিন নাড়ু খেতে দেখিস না দাদুকে? সর্দি হলে ভাতের বদলে মুড়ি? আর দশহরার দিন আম-চিঁড়ে খেলেন না সেদিন?'

এহেন অকাট্য দৃষ্টান্তের পর খেতে রাজি হয় শ্যামল।

পিসি বলে, 'দুধের ছেলেটা নিরিমিষ খেয়ে খেয়ে জেরবার হল—'

বলে, কিন্তু তার বেশি কিছু করে না। জোর করার সাহস তার নেই।

একদিন কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন দীনুরা আসেনি তখনও, শ্যামল বাড়ির বাইরে বকুল গাছের নীচে ঘুরছে, বকুল ফল সংগ্রহ করতে। বাবা কোথা থেকে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'এদিকে শোন শামু!'

বাবা এসময়!

বাবা তো পাড়ার আরও সব বাবুদের সঙ্গে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় অফিস যায়। ফেরে সেই রাত করে। এই পষ্ট বিকেলে বাবা! আজ তো রবিবার নয়? শ্যামল কাছে যেতেই বাবা তাড়াতাড়ি একটা পাতার মোড়ক খুলে একটা বড়ো সাইজের হাঁসের ডিমভাজা বার করে চুপিচুপি বলে, 'নে, চটপট খেয়ে ফ্যাল।'

শ্যামলের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

—কী এ?

—দেখছিস তো হাঁসের ডিমভাজা। খা-না।

শ্যামলের মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় সব ওই সদ্যভাজা হাঁসের ডিমের সুগন্ধে যেন নিথর হয়ে যায়। কত কতদিন এই সুগন্ধের স্বাদ পায়নি।

রান্নাঘরে ওঠে না এ জিনিস, পিসি ছোঁয়ও না, মা-ও বোধ হয় নয়, কিন্তু বাবা মাঝে মাঝেই বাগানে কাঠকুটো জ্বেলে ভেজে অথবা সেদ্ধ করে খেত, আর ছেলেকে ডেকে ভাগ দিত। কী ভালোই লাগত তখন।

কিন্তু এখনকার কথা তো আলাদা।

এখন শ্যামল দাদুর মন্ত্রশিষ্য।

শ্যামল উল্লসিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে নিবৃত্তির শিক্ষা দিয়ে বলে ওঠে, 'এ মা! আমি খাব কী?'

—খাবি না কেন? বাবা ব্যাকুল গলায় বলে 'নিরিমিষ খেয়ে খেয়ে প্রাণ যাচ্ছে, খা-না বাপু! দাদু টের পাবেন না।'

শ্যামলের কেন কে জানে চোখে একঝলক জল এসে গেল। শ্যামলের গলাটা বুজে এল, শ্যামল তবু কষ্টে বলল, 'তুমি আমাকে পাপ শেখাচ্ছ?'

—পাপ।

কালীপ্রসাদের ছেলে সারদাপ্রসাদের সারা শরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহে যায়।

—পাপ কী রে শামু?

—নয় তো কী? শামু এবার সতেজে বলে, 'দাদু টের পাবেন না, ভগবান টের পাবেন না বুঝি?'

বাবা দু-এক পলক ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় উচ্চারণ করল, 'বুঝেছি, প্ল্যানমাফিক কাজ চলছে! আচ্ছা ঠিক আছে!'

হাতের জিনিসটা ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ের দিকে ফেলে দিয়ে হনহন করে চলে গেল বাবা।

আবার খুব কান্না পেয়ে গেল শ্যামলের।

সেদিন আর দীনুদের সঙ্গে খেলতেই পারল না। বলল, 'পেট ব্যথা করছে।'

বাবার সেই পাতাটা ছুঁড়ে দেওয়া, আর হনহন করে চলে যাওয়াটা চিরকাল মনে আছে শ্যামলের।

বাবা কালীপ্রসাদের কুলাঙ্গার পুত্র হলেও, কোথায় যেন একটু স্নিগ্ধতা, একটু স্নেহ, একটু কোমলতা বহন করত। আর সেটা এই এক-আধ টুকরোর মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ত।

কিছুদিন পরে আরও একদিন রাস্তার ধরে উদাস উদাস গলায় বলেছিল, 'তুই তো আমায় 'বাবা' বলে ধরিসই না তোর মা-ও মরে গেছে, বাপও মরে গেছে। কিন্তু দাদু তোকে কতদিন দেখবেন শুনি? কতদিন? আশি বছর বয়েস হবে না?

শ্যামল বাবার এই উদাস মুখের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখে।

বাবা বলে, 'একটা কচি ছেলে, তার মাছ-মাংস বন্ধ করে হবিষ্যি ধরিয়ে সাধু বানানো হচ্ছে। সে তোমার মতন দই-দুধ-ক্ষীর-ছানায় আড়াই সের দুধ পার করে?'

শ্যামল আস্তে বলে 'তুমি আপিস যাওনি?'

—না! আপিস ছেড়ে দিয়েছি।

—আপিস ছেড়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ দিয়েছি। এবার সব ছাড়ব।

বলে বাবা দু-চার বার পায়চারি করে বলে, 'ডিমভাজা না খাস, মাছভাজা খেতে কী? পিসির কাছে বসে চেয়ে নিয়ে খেতে পারিস না? দাদুকে বলতে পারিস না, আমি মাছ খাব।'

শ্যামল এবার উগ্রকণ্ঠে বলে ওঠে, 'কেন খাব? কেন বলব? দাদু মাছ খান?

—তুই দাদুর মতন বুড়ো?

—না হোক। আমি দাদুর মতন হব।

—হবে। তাই হবে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। মানুষের যে মন আছে তা মানবে না। পাথরের পুতুল তৈরি হবে।

হঠাৎ বাবা খুব কাছে সরে আসে শ্যামলের, প্রায় চুপিচুপি বলে, 'আমি আর এখানে থাকব না বুঝলি? কলকাতায় চলে যাব। তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

কলকাতা!

শ্যামলের বুকটা যেন একটা হিমপুঁটুলি হয়ে যায়।

—কেন কলকাতায় যাবে?

—এখানে আর ভালো লাগে না। আমার ইচ্ছে তোকেও নিয়ে চলে যাব। এখানে থাকলে তুই মরে যাবি।

শ্যামলের হঠাৎ মনে হল এটা দাদুর প্রতি দোষারোপ। যে-দাদু তার আদর্শদেবতা। শ্যামল তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে, 'আমি তোমার সব কথা দাদুকে বলে দেব।'

—ওঃ!

বাবা কেমন যেন লাল লাল মুখে একটু তাকিয়ে থেকে একটু ঘেন্না ঘেন্না হেসে বলে, 'যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর! ঠিক আছে যাসনে। এইখানে ওই নিষ্ঠুর বুড়োর হাতে পচে মরিস। বলে দেব! দিস বলে। বলে দিয়ে কী ঘণ্টা করবি আমার?'

বলে সেদিনের মতো হনহন করে চলে যায় বাবা।

শ্যামল কোনোদিনই বাবাকে ঠিক বুঝতে পারে না, তাই বাবার ওপর কোনোদিন নির্ভরতা নেই শ্যামলের, কোনোসময় ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, কোনোসময় বিচ্ছিরি লাগে।

কিন্তু বাবা আর এখানে থাকবে না?

বাবা কলকাতা চলে যাবে?

শ্যামল কি ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাবাকে ধরে ফেলে বলবে, বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব।

শ্যামল ছুটতে পারল না।

শ্যামল নীতুদের পাঁচিলভাঙা ইটের পাঁজার ওপর বসে থাকল।

কিন্তু বাবা আবার ফিরে আসছে যে!

শ্যামল চুপ করে তাকিয়ে থাকে। কোনদিকে যাবে বাবা! দাদুর সঙ্গে থেকে থেকে শ্যামল চাঞ্চল্য হারিয়েছে। শ্যামল স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিকায় অবস্থান করছে।

বাবা এল।

খুব শক্ত গলায় বলল, 'আমার চলে যাওয়ার কথা দাদুকে বলবি না খবরদার। বললে, তোর বিপদ হবে, আমার বিপদ হবে, দাদুরও বিপদ হবে। বুঝতে পারলি? মনে থাকবে?'

শ্যামল কষ্টে চোখের জল চেপে ঘাড় কাত করে। শ্যামলের আর বাবাকে বলা হয় না, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিপদটা যে কীরকম বুঝতে পারে না শ্যামল।

তবু বিপদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে।

বলে দেয় না, তবুও থাকে।

শ্যামলের কেবল মনে হয়, তার মা-র মরে যাওয়াটা যেমন লোকেদের মতন মরে যাওয়া হয়নি, বাবার কলকাতায় যাওয়াও তেমনি লোকেদের কলকাতায় যাওয়ার মতো হবে না। নীতুর বাবাও তো কলকাতায় চলে গেছে, কিন্তু সে তো অন্যরকম নয়। ছুটি হলেই চলে আসে, কত হইচই করে কত হাসিখুশি করে সবাইয়ের বাড়ি বেড়াতে আসে, ছিপ নিয়ে মাছ ধরে, তাস নিয়ে খেলে, নীতুকে নিয়ে নিয়ে ঘোরে।

শ্যামলের বাবার চলে যাওয়া কি ওইরকম হবে? তা মনে হচ্ছে না শ্যামলের। শ্যামলের মনে হচ্ছে বাবা যদি চলে যায়, আর আসবে না।

শ্যামল সেই ভয়ংকরের দুঃসহ প্রতীক্ষায় দিন গোনে। উৎকর্ণ হয়ে থাকে কখন কী কথা হচ্ছে। দাদুর সঙ্গে চণ্ডীমন্দিরে বসে থাকতে মন বসে না, মনে হয় হয়তো গিয়ে দেখবে বাবা চলে গেছে।

কিন্তু বাবা কি ওইরকম সময় চলে যাবে? না কি তেমনি একটা ভয়ংকর ভোর দেখা দেবে আবার শ্যামলের জীবনে?

কালীপ্রসাদ বললেন, 'তোমাকে যেন অফিস যেতে দেখছি না শরৎ?'

শ্যামলের বাবার নামেও একই ব্যাপার। বাড়ির ঐতিহ্যে সারদাপ্রসাদ, কিন্তু শরৎকালে জন্মানোর দরুন 'শরৎ'।

শ্যামলের বাবা তার বাবার মুখোমুখি খুব কমই হয়। তা ছাড়া ডেলি প্যাসেঞ্জারের অবসরহীনতাও একটা ছুতো ছিল।

আজকে কালীপ্রসাদ মুখোমুখি হয়েছেন।

শরৎ মাথাটা নীচু করে বলল, 'না ও-অফিসটায় যাচ্ছি না আর।'

—ও অফিসটায় যাচ্ছ না? অন্য কোনো অফিসে যাচ্ছ?

—যাচ্ছি না! সামনের মাস থেকে যাব।

—ওঃ!

কালীপ্রসাদ একটু থেমে অহমিকা চূর্ণ করেই বললেন, 'এতদিনের কাজটা ছাড়ার কোনো দরকার ছিল?'

—ওখানে কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। এখানে সে-আশা আছে।

—ভালো কথা।

বলে চলে গেলেন কালীপ্রসাদ।

বাঁচল শরৎ।

ভাগ্যিস আরও জেরা করেননি।

কিন্তু জেরা আর একজন করল।

জেরা করল সুমতি।

সুমতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে বসল, সত্যিই কোনো চাকরি পেয়েছে কি না দাদা, কত মাইনে তার? এখানটা ছাড়ায় অন্য লোকসান কিছু হল কি না।

তা ছাড়া এ চাকরিতে আবার কখন পৌঁছোতে হবে? সাড়ে আটটার গাড়িতেই চলবে, না আটটার গাড়ি ধরতে হবে?

শরতের মুখটা চুনচুন দেখাল।

শরৎ বলল, 'কী যে বলিস? আটটায় আবার কী? যেমন সাড়ে আটটায় যেতাম—'

ছোটো বোনের কাছেও বলতে পারল না শরৎ সে কলকাতায় গিয়ে থাকবে।

শ্যামল বলে দেবে?

না বিশ্বাসঘাতকতা করতে পাবে না শ্যামল।

কিন্তু শ্যামলের ছোট্ট মনটার জন্যে এত চাপই-বা তোলা ছিল কেন?

সেজোঠাকুমার বাপেরবাড়ির মেয়ে সাবিপিসি শ্যামলের বাবার গায়ে মাথা রেখে কাঁদছে, এ দৃশ্য শ্যামলকে দেখাবারই-বা কী দরকার ছিল শ্যামলের ভাগ্যবিধাতার?

বিকেল বেলা মারবেল লুকোনো খেলা খেলতে খেলতে সত্যঠাকুরদার পোড়ো ঠাকুরদালানের কোণেই-বা আসবার কী দরকার ছিল শ্যামলের? শ্যামল তো বুড়ো অশ্বত্থের ফোকরে রাখতে পারত? নীতুদের ভাঙা পাঁচিলের ইটের খাঁজে রাখতে পারত।

অথচ তা হল না।

শ্যামল সত্যঠাকুরদার পোড়ো ঠাকুরদালানের কোণে রাখতে এল ঘাসের চাপড়া ঢাকা দিয়ে।

সত্যঠাকুরদা নেই, বহুকালই নেই, তিনি গিয়ে পর্যন্ত পুজো বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে দালান পড়ে গেছে, ইটের স্তূপ জমে আছে। পাতলা পাতলা ছোটো ছোটো ইট! ওই দালান নাকি দুশো

বছর আগের। অনেকগুলো খিলেনের মধ্যে দু-একটা খিলেন খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কী করে এও আশ্চয্যি। কিন্তু আছে! ওদের ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় আলোর রেখা দেখা যায়, বেশ খানিকটা দূরে ভিতরবাড়ি। তার একটা অংশ কিছুটা শক্তপোক্ত আছে, সেখানে সত্যঠাকুমা "অমর" বর পেয়ে পড়ে আছেন। পিঠ গোল হয়ে গেছে ধনুকের মতো, তবু উঠোন থেকে শাক তোলেন, তুলসীতলায় জল দেন প্রদীপ দেন, রান্না করে খান।

আর বাকি সময়টা খিড়কির দরজার সিঁড়িতে বসে থাকেন।

এই বসে থাকার অর্থ হচ্ছে পথচলতি সবাইকে ডেকে ডেকে কথা বলা। এই গলিপথটা স্টেশনে যাবার শর্টকাট বলে, লোক যায় বিস্তর।

সত্যঠাকুমা ডাক দেন, 'কে যাচ্ছ? ভটচায্যিদের নিধু না? আজ যে বড়ো সকাল সকাল?...অনু কোথায় যাচ্ছ? কলকেতায় নাকি?...নয়? ইস্টিশানে কাজ আছে?...সতীশ না কি রে? আর দেখি না কেন?...বিরিঞ্চির মা, কোথায় চললে? হাটে?

সত্যঠাকুমার ডাকের ভয়ে অনেকেই না-শুনতে পাওয়ার ভান করে পালায়। সত্যঠাকুমা কি আর বোঝেন না সেটা? খুব বোঝেন। ওরা চলে গেলে আপন মনে বিড়বিড় করেন, 'সোনা নয়, দানা নয়, মুখের দুটো বাক্যি। তাও এত কেপ্পনতা। ভগবান কবে এই বুড়িকে নেবে গো! আমার হিসেবের খাতার পাতাটা হারিয়ে ফেলেছ না কি ঠাকুর?

তবু আবারও ডাকেন, 'কে যাচ্ছিস রে? কী রে শোন-না, ঠাকুরদালানের কোণে গ্যাঁদালের ঝাড় হয়েছে, বর্ষার সময় ঝোল খেলে পেট ঠান্ডা হয়, নিবি তো তুলে নে যা-না।'

এই উদার আহ্বানে একজন আসত সত্যঠাকুরদার ভাঙা দালানের কোণে। সে হচ্ছে সেজোঠাকুমার দূর সম্পর্কের বিধবা ভাইঝি সাবি। সেজোঠাকুমার পেট ঠান্ডা রাখবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তার আসা।

টাটকাতেই নাকি বেশি উপকার, আর কয়েক পা হাঁটলেই যদি টাটকা পাতার বৃন্দাবন, তো সেইটুকু আসবে না সে?

দূরসম্পর্কের এই পিসির কাছে তার কৃতজ্ঞতা নেই? নিকটজনেরা তো অসময়ে তাকিয়েও দেখেনি, দূর সম্পর্কের পিসিই তো কুড়িয়ে নিয়ে এসে মেয়ের আদরে রেখেছে। ছোটোকাকা খেটে সারা হলেও তাকিয়ে দেখেন না তিনি, সাবি একটু খাটলে হাঁ হাঁ করে মরেন।

সাবির জীবনটা বড়ো দুঃখের। মা নেই, বাপ নেই, ভাই বন্ধু কেউ নেই। পিতৃকুল শ্বশুরকুল সবই শূন্য।

থাকার মধ্যে এই মাসতুতো পিসি। ওবাড়ির সেজগিন্নি বালবিধবা মাসতুতো ভাইঝির এই দুঃখ লাঘবের চেষ্টায় বৈধব্যের অনেক কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের নিয়ম হ্রাস করে দিয়ে একটা শিথিল স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তাকে।

সে-হিসেবে শ্যামলের নিজের পিসি সুমতির অবস্থা আকাশ-পাতাল।

কালীপ্রসাদের কড়া শাস্ত্রের নির্দেশে সুমতির আঠারো বছর বয়েস থেকেই পরনে সাদা থান, হাত শুধু, মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। সুমতি একাহারী, রাত্রে 'আচমনী' খায় না। সুমতির একাদশীগুলো একেবারে সাহারাতুল্য, সুমতির দ্বাদশীর জলখাবার মাত্র শশা কলা ফুটি কাঁঠাল বেল ডাব হাবজিগাবজি।

ওবাড়ির ছোটোবউ কবে বুঝি একবার দুটি চালভাজা দিয়ে গিয়েছিল দ্বাদশীতে খেতে, আর হঠাৎ সেই দিনই কালীপ্রসাদ মেয়ের খোঁজ নিতে এসেছিলেন। শশা কলার পাশে চালভাজা দেখে, কালীপ্রসাদ রায় দিয়েছেন, 'ভাতটা আজ আর খাসনে সুমতি, ওটা তো ফলার খাওয়াই হল।' দ্বাদশীতে ভাত বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন খড়ম খটখটিয়ে।

কিন্তু সাবি?

সাবি পেড়ে শাড়ি পরে, হাতে চুড়ি রাখে, বউদির মাথা ঘসার মশলা দেওয়া তেলের বোতল থেকে তেল মেখে ঢলকো করে এলো খোঁপা বাঁধে।

সাবির একাদশীতে ফল মিষ্টি বাড়ির গোরুর দুধের ক্ষীর ছানার ভোগ চলে, আর দ্বাদশীতে ছোটোবউ সকাল বেলা শাশুড়ির ভাইঝির জন্যে পাঁপর ভাজতে বসে, চাল-ভাজার সঙ্গে কাঁঠাল বিচিভাজা মাখতে বসে তেল নুন দিয়ে।

তাও সেজোগিন্নির মনঃপূত হয় না, মাঝে মাঝেই বলেন, 'মোটামোটা করে বেগুন কুটে দুখানা পোরের ভাজাও তো করতে পারতে ছোটোবউমা! নিদেন বাগান থেকে দুটো কুমড়ো ফুল তুলে এনে বড়া করে দিতে মচমচে করে। রোজ রোজ একঘেয়ে দব্যি ভালো লাগে মানুষের?' সাবির রাতের আহার গোছাভরতি পরোটা তবে তরকারিটায় নুন পড়ে না। এ বিচারটুকু রাখেন সেজোগিন্নি।

সেজোগিন্নির মেয়ে নেই এটা সত্যি, সাবির ওপর তাঁর কন্যাস্নেহ। তবু বাপেরবাড়ি থেকে একটা মেয়ে এনে শুধু যে কন্যাস্নেহের স্বাদটাই পেতে চান সেজোগিন্নি তা নয়, ছেলের বউয়ের মুখের সামনে একটি প্রতিপক্ষ খাড়া করে রেষারেষির স্বাদটাও পেতে চান। তাই ভাইঝির ওপর ভালোবাসার বশে যতটা না হোক ছোটোবউমাকে দু-কথা শোনাবার সুখেও ভাইঝিকে আস্কারা দেন।

অধস্তন বলতে তো একমাত্র ওই বউটাই, বড়োবউ তো 'তেলি হাত ফসকে গেলি' করে বরের রেল কোয়ার্টার্সের বাসা মোগলসরাইতে চলে গেছে। সেজোগিন্নি কপাল চাপড়ান। সত্যি দুঃখের কপাল আর কাকে বলে, ছেলেপুলের মা-বউটি সব ক-টাকে গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন, আর বাঁজা তাল গাছটি চোখের সামনে চোখ জ্বলাতে রয়ে গেলেন।

সে যাই হোক, সাবি তার পিসির এই অগাধ প্রশ্রয়ের প্রতিদান দেবে না? সাবি তার বাতগ্রস্ত পিসির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে যতটা যা পারে করে। সাবি ভোর না-হতেই মাঠে মাঠে ঘুরে শিশিরলাগা দুর্বোঘাস তুলে এনে তাকে ছেঁচে কুটে রস খাওয়ায় পিসিকে মধু দিয়ে মেড়ে, সাবি দুপুর-রোদ্দুরে বেরিয়ে বড়ো দিঘি থেকে বড়ো ঘড়ায় করে 'রৌদ্রপক্ক' জল নিয়ে আসে পিসির স্নানের জন্যে। আগুনে গরম জলের থেকে রোদে গরম জলের যে উপকার বেশি এ আর কে না-জানে? তা ছাড়া সাবিকে তার বেতো শাশুড়িকে নিয়ে যে ভুগতে হয়েছিল পুরো দুটি বছর। তাই সাবির অনেক কিছু জানা।

সাবি জানে পেট ঠান্ডা থাকলে বাতও ঠান্ডা থাকে, সাবি জানে শ্লেষ্মা কম থাকলে বাত কম থাকে, আর এও জানে সাবি নিয়মিত গাঁদালের ঝোল খেলে পেট ঠান্ডা থাকে, এবং ভরসন্ধেয় তোলা কষ্টতুলসীর পাতার রস কাশীর চিনি দিয়ে খেলে শ্লেষ্মার ঠাকুরদা পর্যন্ত দৌড় মারে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তাই সাবি বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে এসব সংগ্রহ করে আনে, আর বাড়িতে এসে সেগুলির সুব্যবস্থা করে।

সেজোগিন্নি বলেন, 'তুই যাই আছিস সাবি, তাই আমার এতটি সেবাযত্ন হচ্ছে, নইলে আর কোন বাবের বেটির দায় পড়ত বল, বেতো বুড়ির জন্যে এত করতে?'

সাবি কখনো লাঠি ভেঙে সাপ মারে না, সাবির হাতে সাপও মরে লাঠিও আস্ত থাকে। তাই সাবি বলে, 'কী যে বলো পিসিমা, আমি একটা নিকামাইয়ের দরজি। বাড়িতে বসে আছি দু-বেলা গিলছি খাটছি, এটুকুও করলো না? আমি না থাকলে ছেলেবউ করত। আমি করে মরিনি আমার শাশুড়ির জন্যে? তবে সবাই তো সব জানে না। আমি ওই বুড়ির সেবা করতে করতেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছি এই আর কী?'

গ্রামের রীতি অনুযায়ী সেজোগিন্নির ছোটোছেলেও ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, তার আবার পৌনে আটটার ট্রেন ধরতে হয়। অথচ ওদিকে ওভারটাইম খেটে আসতে প্রায়ই রাত নটা-দশটা হয়ে যায়, রবিবারেও তার ওভারটাইম। অতএব বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তার নেই বললেই চলে। সেজোগিন্নি বলেন, 'ননে মোগলসরাইয়ে আছে, আর পুনে ফুলপুরে আছে, এ দুইয়ে পার্থক্য কিছু নেই। আমার কাছে দুই-ই সমান। থাকার মধ্যে রাতটুকু, তা সে তো বউয়ের অধিকারে।'

সমাজবিধির এই এক বিধি।

নিতান্ত নির্লজ্জ দজ্জাল বউকাঁটকি শাশুড়িব্যতীত ছেলের বউয়ের ওই অধিকারটুকু কাড়তে পারে না। তা সমাজপ্রদত্ত সেই অধিকারটুকুর কল্যাণেই ছোটোবউ নির্মলা স্বামীর কাছে চুপিচুপি বলার সুযোগ পায়, —তুমি তো সংসারের কিছুই দ্যাখো না, সাবিঠাকুরঝির রীতিচরিত্তির আমার ভালো লাগে না।'

পুনে, অর্থাৎ পূর্ণ গা ঝেড়ে বলে, 'সাবির চিন্তা মায়ের। মা-র ভাইঝি মা বুঝবেন।'

—একটা নিন্দেমন্দ রটে গেলে?

—বয়ে গেল! সাবি তো আমার বাবার বংশের নয়?

—তা তো নয়, 'নির্মলা ইতস্তত করে বলে, 'কিন্তু ঠাকুদার বংশে গিয়ে তো লাগতে যাচ্ছে? ভাসুর গুরুজন, কী আর বলব!

—বলাবলির দরকার নেই। শান্তিপ্রিয় পূর্ণ বলে, 'বোবার শত্রু নেই। তবে মেজদাকেও বলিহারি। বউটা বিষ খেয়ে মলো, তবু—'

রাত্রির এই সামান্য সময়টুকু পূর্ণ মায়ের মাসতুতো ভাইঝির চরিত্র সংশোধনের খাতে ব্যয় করতে রাজি হয় না। অতএব কথাটা ওই পর্যন্তই থেকে যায়। প্রতিবাদের প্রতিশ্রুতি ওঠে না।

আর সত্যি বলতে আসল কথা মাকে পূর্ণ যমের মতো ভয় করে, সাহস করে কিছু বলতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব সাবি অপ্রতিহত গতিতে পূর্ণর ঠাকুদার বংশের ছেলের সঙ্গে ভোরের শিশিরধোয়া চোখে চোখাচোখি করতে যায়, দুপুরের নির্জনতায় দিঘির শীতলতায় শীতলতর স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করতে যায়, সন্ধেয় তুলসীঝোপের পিছনে হাতে হাত রেখে বসতে যায়, আর বিকেলে পাড়ার ভাঙা ঠাকুরঘরের কোণে দাঁড়িয়ে তার অঙ্গে মাথা রেখে কাঁদতে যায়।

তা যাক গে যাক, জগতে এমন কত কান্না কত অঙ্গে আছড়ায়, কিন্তু সেই আছড়ানোর দৃশ্যটা শ্যামলকে দেখাবার কী দরকার ছিল ভগবানের?

শ্যামলের মধ্যে এ দৃশ্য ভয়ংকর একটা আলোড়ন তোলে। তার বোধের জগতে 'খারাপ' সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না, তবু তার মনে হয় এটা খুব খারাপ।

নিরবয়ব একটা 'খারাপের' ভার তাকে থরথর করে কাঁপিয়ে তোলে। শ্যামলের চোখটা কেমন একটা গরম জলে ভরে যায়। শ্যামল চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করে 'বাবা!' গলার স্বর ফোটে না।

আপ্রাণ চেষ্টা করে, তবুও না।

শ্যামলকে যেন বোবায় ধরেছে।

শ্যামল দ্বিতীয় বার আর সেদিকে তাকাতেও পারে না, হঠাৎ হাতের মারবেলটা ফেলে দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

যায় কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না।

একটা ভাঙা সিঁড়ির কোণে ইটে ঠোক্কর খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় নীচেয়।

কোণে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, ওই দুদ্দাড় শব্দেই সচকিত হয়েছিল তারা, এখন অস্ফুট একটা আর্তনাদে চমকে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে যায়।

বুড়ো আঙুলের কোণ চেপে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে শ্যামল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার হাত, ভুরুর ওপরও রক্তের রেখা।

দুর্বোঘাস চিবিয়ে কাটা জায়গায় থাবরে দিয়ে রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পাদনা করে ছেলেকে কোলে করে বাড়ি ফিরতে হল অপরাধীযুগলের একজনকে, অন্যজন চলে গেল। প্রথমে পুকুর থেকে শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে জল এনে সেবায় তৎপর হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু শ্যামলের তীব্র প্রতিরোধে চলে যেতে বাধ্য হতে হল তাকে।

শ্যামল তার সেবার হাত ঠেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠেছিল, 'তুমি চলে যাও! চলে যাও বলছি।'

তখন সত্যঠাকুমা এসে দাঁড়িয়েছেন।

সত্যঠাকুমা যে অকুস্থলে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন এটা নেহাতই দৈবের কারসাজি। নইলে শ্যামলের পড়ে যাওয়ার শব্দ, আর্তনাদের শব্দ, শরতের 'কী হল কী হল' এবং সাবির 'ওমা কী সর্বনাশ' ধ্বনির শব্দ কিছুই তার তালাবন্ধ কানের মধ্যে প্রবেশ করেনি।

সত্যঠাকুমা এমনিই বৈকালিক ভ্রমণ হিসেবে আজ এই পথ দিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সত্যঠাকুমার শুধু যে কানেই তালা তা নয়, চোখেও পর্দা, কিছুই ঠাওর হয় না তাঁর। তবু একটা মেয়েমানুষের আর একটা বেটাছেলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একই দৃশ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভঙ্গিটা ঠাওরে এল।

সত্যঠাকুমা বললেন, 'কে র‍্যা ওখানে?'

সাবি সুট করে অন্য দিক দিয়ে চলে গেল, শরৎ বলল, 'আমি ঠাকুমা।'

—ক্যা শনৎ নাতি? এখানে কী করছিস?

—এই দ্যাখো-না ঠাকুমা, ছেলেবাবু এমন করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেন যে, হোঁচট খেয়ে, কপাল ছেঁচে একেবারে রক্তপাত।

—ওমা কী সব্বনেশে কাণ্ড।

সত্যঠাকুমা লাঠি ঠকঠকিয়ে এগিয়ে আসেন, বলেন, 'কার ছেলে? তোর? তা ছেলে নে বেড়াতে বেরিয়েছিস, একটু শক্ত হাতে চেপে ধরতে পারিসনি? হাত ছাড়িয়ে পড়ে গেল?'

বিচলিত বিভ্রান্ত শরৎ সত্য ঘটনায় আবরণ দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলে, 'কে কার হাত ধরে! হুঁঃ!'

যেন দুরন্ত ছেলেকে এঁটে উঠতে পারে না শরৎ, তাই এই দার্শনিক অভিব্যক্তি।

সত্যঠাকুমার কিন্তু যা ঠাওর হবার তা হয়ে গেছে, তাই বলে ওঠেন, 'তা এখেন থেকে সুট করে চলে গেল কে? তোর সেজোজেঠির সেই বেহায়া ভাইঝিটা না?'

এ যুগের পৃথিবীর দ্বিধা হবার রেওয়াজ নেই তাই হন না, শরৎই বিদীর্ণ হয়ে যায়। শরৎই চোখে সর্ষে ফুল দেখে। শরৎ দিশেহারা হয়ে বলে ওঠে, 'আমিও তো এসে তাই দেখলাম! বাড়ি থেকে আইডিন আনতে গেল বোধ হয়। সাবিপিসির সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলি বুঝি শামু?'

শ্যামল তার পায়ের ব্যথা কপালের ব্যথা সব বিস্মৃত হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক পলক বাপের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খুব জোরে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ'।

এইরকমই জোরেই ওরা সত্যঠাকুমার সঙ্গে কথা বলে। খেলতে খেলতে ওনার উঠোনে ঢুকে পড়ে বলে, 'ঠাকুমা জল খাব।'...ঠাকুমা দুটো বাতাবিনেবু দাও ফুটবল করব।'

দুটো লেবু গাছে অজস্র লেবু, অনেকসময়ই তার সদগতি এইভাবেই হয়। তবে বুড়ির গালাগালির ভয়ে না বলে চেয়ে নিতে সাহস করে না কেউ। হাত পেতেই চেয়ে নেয়।

নিজে কালা বলে বুড়ি নিজেও চেঁচিয়ে কথা বলে, 'নেবু নিয়ে বল খেলব! নবাব সেরাজুদ্দোলা এল। কেন, নেবু খেতে জানিস না? নুন দে জারিয়ে? কর্তার হাতের পোঁতা গাছ, চিনি হার মানে এমন মিষ্টি। আয়-না কেটে দিই খা।'

ওরা সমস্বরে উচ্চধ্বনি করে 'না না না। আস্ত নেব।'

শ্যামলের জানা আছে সেই ধ্বনির উচ্চতার মাপ। শ্যামল সেই সুরেই বলেছে, 'হ্যাঁ!'

কিন্তু সত্যঠাকুমা ওদের বাপের ঠাকুমা, এ পৃথিবীতে তিনি আজ নতুন আসেননি। তিনি সন্দেহের গলায় বলেন, 'সাবিপিসির সঙ্গে আবার বেড়াতে বেরোলি কখন? এই তো একটু আগে সাবি তার সোহাগের পিসির জন্যে গ্যাঁদাল পাতা নিতে এসেছিল। ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছি, তবু রোজ দিন আদিখ্যেতা করে অনুমতি নেওয়া চাই।...ওমা এখনও যে রক্ত ঝুঁজছে। কই তোর আইডিন কোথায়?'

—কী জানি, বলল তো, দেখি যদি আইডিন থাকে। বলে শরৎ চট করে ছেলেটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল।

সন্ধের মধ্যেই ফুলপুরের এই বামুনপাড়ায় ঘরে ঘরে ফল্গুধারায় রটে গেল, ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কুলাঙ্গার ছেলেটা আর ন্যায়রত্নের জ্ঞাতিভাজ সেজোগিন্নির বেহায়া বেচাল বেসহবৎ ভাইঝিটা সত্যঠাকরুনের ভাঙা দালানে বসে গালগল্প করছিল, ছোঁড়ার মা-মরা বাচ্ছাটা হঠাৎ গিয়ে পড়ায়, তাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

মুখ গুঁজড়োনো ছেলেটা পড়েই থাকত ওখানে দু-জনেই লম্বা দিত, নেহাত সত্যঠাকরুনের চোখে পড়ে গেল বলে বাপ আর ফেলে পালাতে পারলে না, কোলে করে নিয়ে গেল।

ছেলেপুলের আঙুলে হোঁচট খাওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়, একফালি রেড়ির তেলে ভিজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে দেওয়ার ওয়াস্তা, তবু ওই তুচ্ছ ঘটনাটাকে উপলক্ষ্য করে বামুনপাড়ার সবাই যেন হোঁচট খেল।

সকলেই ভেবে নিয়েছিল ন্যায়রত্নের পুতবউটার অপঘাত মৃত্যুর ঘটনাটার পর বেহায়া দুটো বোধ হয় সামলে গেছে, এখন তো দেখা যাচ্ছে তা নয়।

কিন্তু আলোচনা দানা বাঁধতে পারল না ন্যায়রত্নের নাতির দৃঢ় সাক্ষ্যে। কেস ভেস্তে গেল।

কালীপ্রসাদ যখন বললেন, 'তুমি ওখানে কী করছিলে?'

শ্যামল নির্ভীক স্পষ্ট গলায় বলল, 'বলেছি তো মারবেল লুকোতে গিয়েছিলাম।'

—পড়ে গেলে কী করে?

—সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ভাঙা ইটের কোণে ঠুকে।

—বাবা কোথায় ছিল?

—রাস্তা দিয়ে আসছিলেন, আমায় দেখে চলে এলেন।

দাদুর শিক্ষামতো শ্যামল এখন গুরুজন সম্পর্কে ছিলেন, করলেন, এলেন গেলেন, শিখেছে।

কালীপ্রসাদ গম্ভীরভাবে বলেন, 'আর কেউ ছিল সেখানে?'

—ছিল না, সাবিপিসি গাঁদালপাতা নিতে গিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি জল এনে রক্ত ধুইয়ে দিলেন।

কালীপ্রসাদ নাতির মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলছ?'

—কেন বলব না?

—ওবাড়ির ঠাকুমা অন্য কথা বলেছেন।

শ্যামল মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'সত্যঠাকুমার তো ভীমরতি—'

কিন্তু শ্যামল অবলীলায় এমন মিথ্যা সাক্ষ্য দিল কেন?

শ্যামল নিজেই বুঝতে পারেনি।

এখনও শ্যামল ভাবতে বসলে বুঝতে পারে না।

সেই রাত্রে বাবাকে যে-কথা বলেছিল সেটাও তো সত্যি নয়।

রক্ত অশুচি, তাই কালীপ্রসাদ সেদিন সেই পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো ছেলেটাকে নিজের ঘরে রাখেননি। আর পিসি বলেছিল, 'আমার কাচা বিছানাতেই-বা কোথায় শোওয়াব ওই সত্যিকজনের ছোঁওয়া ন্যাকড়া দমেত?'

সে-রাত্রে তাই স্বর্গচ্যুত শ্যামলের এক রাত্রির জন্য স্বর্গবাস ঘটেছিল। বাপের বিছানায় শুতে এসেছিল। সুমতি চুপিচুপি বলেছিল, 'বাধ্য হয়ে আজ ওকে এঘরে দেওয়া, ওর মাথার বালিশের তলায় এই সরু লোহার শিকটুকু রেখে দাও দাদা। আর চাদরের নীচে এই রামনাম লেখা কাগজটুকু।'

অপঘাতের মড়া অপদেবতা হয়, তাই এই সাবধানতা। প্রিয়জনকেই নিতে আসে তারা।

কিন্তু কেবলমাত্র পরিত্যক্ত শোবার ঘরটাব্যতীত অন্যত্র তার প্রবেশক্ষমতা থাকে না কেন, অথবা থাকে কি না, একথা ভেবে দেখেনি কোনোদিন সুমতি।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর বাবা আস্তে বলে, 'শামু ঘুমোচ্ছিস না?'

—ঘুম পাচ্ছে না।

—পা ব্যথা করছে?

—হ্যাঁ।

—শামু।

—কী।

—দাদুর কাছে ঠিক কথা না-বলে উলটো কথা বললি কেন রে?

শ্যামল হাই তুলে বলল, 'আমার পায়ে লাগছিল, কী হয়েছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল শ্যামল।

ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না আর।

ছেলের সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল শরৎ।

পরদিন বাপকে আর ভাইপোকে খেতে বসিয়ে সুমতি পাখা নাড়তে নাড়তে বলল, 'দাদা বলছে ঘ—'

কালীপ্রসাদ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'দাদা কী বলছে, দাদার মুখেই শোনা যাবে মতি।'

সুমতি একটু থতোমতো খেয়ে তারপর বলে, 'নিজের বলবার মুরোদ থাকলে তো!'

—তাহলে আর বলা হবে না।

কালীপ্রসাদ ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে খান, তাই তাঁর ভোজ্য পাত্রে নুন থেকে দইটুকু পর্যন্ত সব য়ে তবে বসতে হয়, নিবেদনের পর আর কোনো জিনিস নেন না কালীপ্রসাদ।

অতএব খেতে দিয়ে ওঠাউঠি নেই, শ্যামলও তো প্রায় দাদুর মন্ত্রে দীক্ষিত। সুমতি তাই নীরবে খাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে বসে বসে। কোনো ছুতোয় উঠে গিয়ে ফিরে এসে সপ্রতিভ বার উপায় নেই।

তবু সুমতি ভাইপোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আর একটু ভাত নিবি রে শামু?'

শ্যামল মাথা নাড়ে।

কালীপ্রসাদ নীরবে আহার সমাধা করে আচমন করে উঠে যাবার মুখে বলেন, 'আহারকালে বাক্যব্যয়ে

আয়ুক্ষয় হয়, শাস্ত্রের এই উপদেশটা মানাই উচিত সুমতি। আমরা তো দ্বিতীয় বার কিছু নিই না, ভাত দিয়ে তুই অনায়াসেই অন্য কাজ করতে যেতে পারিস।

ভাত দিয়ে অন্য কাজে যেতে পারিস।

সুমতির চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্যাবলি সমেত পৃথিবীটা বোঁ করে ঘুরে গেল।

তার মানে দিনান্তে যে মাত্র একটা সময় সুমতি বাপের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পায়, সংসারের দরকারি কথা জানাতে পায়, পাড়ার দু-একটা খবর বিনিময় করতে পায় যত সংক্ষিপ্তই হোক, তবু পায়, সেই খোলা জানলাটুকুও বন্ধ করে দিতে চান কালীপ্রসাদ!

তার মানে 'বৃথা কথা'র শাস্তি।

কালীপ্রসাদ মেয়ের প্রতি সামান্যতম স্নেহের সৌজন্য দেখিয়ে এইটুকু তো বলতে পারতেন, ভাত দিয়ে নিজে খেতে বসতে যেতে পারিস।

না তা বললেন না কালীপ্রসাদ।

বললেন অন্য কাজে যাবার কথা।

কাজ! কাজ! আর কত কাজ করবে সুমতি? নীরস কঠিন নেহাত মোটা মোটা কাজ!

জীবন মানে কি শুধু অনেক কাজে ঠাসা কতকগুলো দিনের সমষ্টি?

কালীপ্রসাদ যুবতী বিধবা মেয়ের পাড়া বেড়ানো পছন্দ করেন না বলে সুমতি পিতৃগৃহেও শ্বশুরবাড়ির বউয়ের মতো বন্দিনী। বাড়িতে কেউ এলে তবে দুটো কথা কইতে পায়।

ভাজ ছিল একটা, তার সঙ্গে রেষারেষি হিংসাহিংসি করেও দুটো কথা কওয়া যেত, সুমতিকে জব্দ করতে সেও সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে চলে গেল। সুমতির জন্যে রইল শুধু কাজ! এক জনের কাজের ওপর আরও এক জনের কাজ!

এই নিশ্ছিদ্র কাজে ঠাসা দিনগুলোর ওপারে কী আছে জানে না সুমতি। সুমতি ভবিষ্যৎ ভাবতে ভয় পায়।

সুমতির মা থাকলে কি এমন অবস্থা হত সুমতির? মাকে কোন শৈশবে হারিয়েছে তবু 'মা' কথাটা মনে করতে গেলেই চোখে জল আসে সুমতির।

সামান্য একটা দূর সম্পর্কের পিসি একটা বালবিধবা মেয়েকে কত যত্নে রাখে, সেটা তো অহরহ চোখের সামনে দেখছে সুমতি, মা হলে আরও কত হত।

সুমতি দরজায় দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, 'ন্যায়রত্নমশাই বললেন, দাদার যা বলবার দাদা নিজেই বলবে।

বাপের ওপর রাগ হলে ছেলেবেলায় এরা দুই ভাই-বোন 'ন্যায়রত্নমশাই' বলে উল্লেখ করত, অনেক দিন পরে আজ সেই শব্দটা ব্যবহার করল সুমতি।

শরৎ তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

বলল, 'কায়দা করে বলে ফেলতে পারল না?'

—কায়দাটায়দা শিখিনি দাদা, সোজাসুজি কথা জানি তাই বলেছিলাম।

—আচ্ছা ঠিক আছে।

বলে আবার শুয়ে পড়ল শরৎ।

সুমতি মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল, বেজার গলায় বলল, 'ন্যায়রত্নমশাইয়ের উপযুক্ত পুত্র বটে! টাকাকড়ির মতো দুটো কথা খরচ করতেও নারাজ! বলি কলকাতায় গিয়ে তোমার কী হাত-পা বেরোবে?'

—বেরোয় কি না সেটাই দেখতে যাব ভাবছি। এখানে তো হাত-পা পেটের মধ্যে পুরেই বসে আছি।

সুমতি একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তা তুমি বলতে পারো, বেটাছেলে, বিধাতাপুরুষের স্বজাতি। নইলে এতেও তোমার হাত-পা বাঁধা বলে মনে হয়?'

শরৎ আবার উঠে বসে দুর্বল গলায় বলে, 'এততেও মানে? এতটা কী দেখলি আমার?'

—কী দেখলাম সেটা আর ছোটো বোন হয়ে বলি কী করে বলো? সুমতি উদাস উদাস গলায় বলে, ' হয়তো ধমকে বলবে, ছোটো মুখের বড়ো কথা! তবে আমি একা দেখছি না জগৎ দেখছে।'

—দেখছে! ওঃ!

শরৎ কড়া গলায় বলে, 'আচ্ছা! দেখছেই যখন, ভালো করে দেখাব।'

সুমতি চলে আসে।

সুমতি অবাক হয়ে ভাবে, আশ্চয্যি! দাদাও তো এক বার জিজ্ঞেস করল না সুমতি খাওয়া হয়েছে তোর?

এই এতদিন চাকরি ঘুচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দাদা, কোনোদিন বোন বলে দুটো দুঃখের কথা শুধিয়েছে?

সুমতির কপালটাই এমনি।

বাপ-ভাইয়ের সংসারে না থেকে সুমতি যদি একটা দূর সম্পর্কের পিসি-মাসির কাছে থাকত, অনেক সুখে থাকত।

তাতে সুখ আছে, স্বাধীনতা আছে।

শ্যামল দাদুর কাছে বসে স্লেটে আঁক কষছিল, বাবা এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়। শ্যামল দাদুর মুখের দিকে কটাক্ষে দেখে নিয়ে স্লেটে গভীর মনঃসংযোগ করল।

কিন্তু কালীপ্রসাদ এতে ভোলবার লোক নয়। গম্ভীর গলা ধ্বনিত হল তাঁর, 'শ্যামা, তুমি ওঘরে গিয়ে আঁক কষো।'

শ্যামলের আর কী করার আছে?

শরৎ বলল, 'নতুন যে-চাকরিটার কথা বলেছিলাম, সামনের পয়লা থেকে তাতে জয়েন করতে হবে।'

কালীপ্রসাদ বললেন, 'উত্তম।'

শরৎ এককোণে বলিদানের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ভাবছি কলকাতায় গিয়ে বাসা করব।'

কালীপ্রসাদ মোটা মোটা ভুরু সমেত চোখটা তুলে ছেলের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন ভয়ানক একটা আজব কথা শুনলেন। তারপর কেটে কেটে বললেন, 'বাসা করবে? তা কাকে নিয়ে বাসাটা হবে? দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে?'

শরৎ কি কেঁপে উঠল?

হয়তো উঠল, তবু শরৎ আজ স্থির করে এসেছে ভয় খাবে না। সেও তো ওই ন্যায়রত্নেরই আত্মজ।

শরৎ বলল, 'কলকাতায় রাঁধুনিঠাকুর সহজেই মেলে।'

—বাসাভাড়া এবং রাঁধুনি বামুনের মাইনের থেকে তোমার রেলের মান্থলির খরচটা কি বেশি বলে মনে হয়?

শরৎ এখন চুপ করে থাকল।

কালীপ্রসাদ আরও কাটা শব্দে বললেন, 'তা ছাড়া জমির ধানে খেতের আনাজে চলেছে—দুধও—'

—সবই জানি।

শরৎ বলল, 'শামুকে আমি কলকাতার ইস্কুলে ভরতি করতে চাইছি—'

—শামু? মানে শ্যামা?

কালীপ্রসাদ প্রায় হেসে উঠে বলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছ শরৎ?'

—একথা বলছেন কেন?

—এ ছাড়া আর কী বলব?

—শামু সম্পর্কে কোনো চিন্তা করা কি আমার পক্ষে অসংগত?'

কালীপ্রসাদ খাড়াই বসেছিলেন, তবু যেন আরও খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন, 'অসংগত! এ শব্দটার মানে বানান জানো তাহলে? কিন্তু বেশি কথার দরকার নেই, একটা কথাই বলছি, শ্যাম সম্পর্কে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই তোমার।'

শরতের চোখ-মুখ গরম হয়ে ওঠে। শরৎ বলে, 'ও কি আমার ছেলে নয়?'

কালীপ্রসাদ গমগমে গলায় বলেন, 'ও এই মুখুয্যে বংশের ছেলে। তুমি নিমিত্তমাত্র।'

শরৎ পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় না। শরৎ চোখে ধোঁয়া দেখে। তার মানে, বাবা তাকে ছেলে দেবে না!

ছেলে সম্পর্কে যে খুব একটা চিন্তা চেতনা আছে শরতের, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এযাবৎ, শরৎ নিজেও কোনো সাড়া অনুভব করেনি, কিন্তু সেদিন থেকে কী যে হয়েছে।

কেবলই মনে হচ্ছে ওই ছেলেটাই তার নিজস্ব আপন, আর ওটাকেই কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন নামের একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সবলে আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন।

শরৎ মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, 'আমি নাহয় কেউ নয়, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কখনো ওইটুকু ছেলে এভাবে হবিষ্যি খেয়ে মানুষ হলে ক-দিন ওর শরীর টিঁকবে?'

কালীপ্রসাদ চমকে যান।

কেঁচো কেন্নোকে কেউটের মতো ফণা তুলতে দেখলে যেভাবে চমকে উঠতে পারে মানুষ সেইভাবেই চমকে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

কালীপ্রসাদের চোখ দিয়ে আগুন ঝরে। কালীপ্রসাদ তেমনি আগুন-ঝরা গলায় বলেন, 'ওর এই দুর্গতির জন্য ওর বাপই দায়ী। অসংযমী বাপের রক্তের গুণ দূর করতে হলে শৈশব থেকেই সর্ব বিষয়ে সংযমের শিক্ষা দিতে হবে বই কী।'

শরৎও স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ধারণা ছিল না এভাবে আক্রমিত হবে।

শরতের পায়ের তলার মাটিটা যেন সরতে সরতে একটা শূন্যগহ্বর সৃষ্টি করে শরৎ নামের লোকটাকে তলিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু তবু যুদ্ধেরও বোধ করি একটা নেশা আছে। জয় পরাজয় যাই ঘটুক।

শরৎ বলে, 'আপনি কতদিন দেখতে পারবেন?'

—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কালীপ্রসাদ হেসে ওঠেন। —মৃত্যু তো বয়েস হিসেব করে আসে না। তুমি কতদিন দেখতে পারবে লিখে দিতে পারো? তবে একটা কথা জেনে রেখো, অধিকার জিনিসটা শুধু জন্মসূত্রেই পাওয়া যায় না, অধিকার অর্জন করতে হয়। ওর মায়ের অসহিষ্ণুতাকে আমি

সমর্থন করিনি, ক্ষমাও করিনি, তবু এটাও ঠিক যেদিন ওর মা ওইভাবে গেছে, সেদিন থেকে তুমিও বাপের অধিকার হারিয়েছ।...

শরৎ কি হেরে মাথা হেঁট করে চলে যাবে? শরৎ যদি ডুবতেই বসেছে তো পাতালটাই দেখুক।

তা ছাড়া কালীপ্রসাদের মুখের ওপর কথা বলা। এ এক অভূতপূর্ব স্বাদ।

শরৎ সেই স্বাদটা আর একবার চাখতে চায়। শরৎ বলে ওঠে, 'পৃথিবীর সব লোক সমান হয় না। দুর্বলচিত্ত লোক কি আপনি দেখেননি কখনো?'

কালীপ্রসাদ উঠে দাঁড়ান।

জ্বলন্ত গলায় বলেন, 'তোমার মতো নির্লজ্জের সঙ্গে যে এখনও কী করে কথা বলছি তাই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি।...দুর্বলচিত্ত! ওটা ভদ্রঘরের কথা নয়। চোখের সামনে তোমার নিজের ছোটো বোনকে দেখছ না? উনিশ বছর বয়েস থেকে কীভাবে কাটাচ্ছে সে? দেখছ না?'

যুদ্ধের নেশা!

নেশা চড়ে ওঠে।

শরৎও তীব্র গলায় বলে, 'লোহার ছেকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখে দিলে আর উপায় কী? ওর প্রতি যে-নিষ্ঠুরতা করা হয়—'

—উঃ! এখনও আমি তোমার মতো কুলাঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছি, মুখ দেখছি! কালীপ্রসাদ কাঁপতে কাঁপতে বলেন, 'বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। দূর হও এ ভিটে থেকে। নির্লজ্জ কুলাঙ্গার, বংশের কলঙ্ক চরিত্রহীন ছেলে! আজ থেকে জানব আমার কোনো পুত্র নেই, কোনোদিন ছিল না।'

—ঠিক আছে। কিন্তু আমার পুত্র?

—পাবে না ব্যাস! যাও।

পড়ায় অন্যমনস্ক শ্যামল পাশের ঘর থেকে ওই শব্দগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করছিল, তারপর খেই হারিয়ে গেল।

শ্যামলের কানের মধ্যে বাজ পড়ার মতো শব্দ হতে লাগল।

শ্যামল সেই শব্দের মধ্যে থেকে আপন ভবিষ্যৎ দেখতে পেল।

আচ্ছা কত বয়েস ছিল তখন শ্যামলের?

শ্যামলের কি তখন বোঝবার কথা 'চরিত্রহীন' মানে কী? বোঝবার কথা নয়। তবু বুঝতে হয়েছিল শ্যামলকে। ঘরে-বাইরে শ্যামলের সমস্ত পরিচিত জগৎ শ্যামলকে 'চরিত্রহীন' শব্দটার মানে বুঝিয়ে ছাড়ল।

বুঝিয়ে ছাড়ল শ্যামলের বাবা চলে যাওয়ার সঙ্গে সাবিপিসির হারিয়ে যাওয়ার একটা নিকট সম্পর্ক আছে, খুব খারাপ সম্পর্ক।

ওইটা বুঝে যাবার পর আর ভেবে ভেবে আকুল হয়নি শ্যামল। আস্ত একটা বড়ো মানুষ হারিয়ে যাবে কী করে? ছাগলটাগল কি গোরুটোরু হারিয়ে যায়, ছোটো ছেলেরাও মেলাতলায় কি ইস্টিশানে গিয়ে হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সাবিপিসি? সাবিপিসি তো রাস্তাটাস্তা সবই চেনে! তবে কি ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেল সাবিপিসিকে?

এই ভাবনার কথাটা প্রথম দিন বলে ফেলেছিল ছোটোকাকির কাছে। ছোটোকাকিদের বাড়িতে আর যেতে দেওয়া হয় না শ্যামলকে, ছোটোকাকিরা 'গুণতুক' না কী একটা করে যাতে খুব খারাপ হয়। এই সব শুনে শ্যামল কেমন আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, ও-দিকটায় তাকাতেও সাহস হত না।

কিন্তু কবে যেন একদিন পুকুরঘাটে চান করতে নিয়ে গিয়েছিল পিসি, বাড়িতে তোলা জলের বদলে। সেই দিন ছোটোকাকির সঙ্গে দেখা। ছোটোকাকি বলল, 'মোটে আর আসিস না কেন রে শামু?'

শামু সভয়ে পিসির দিকে তাকাল।

দেখল পিসির চোখ ছোটোকাকির দিকেই। পিসি বলছে, 'এখন যে দাদুর হাতে গিয়ে পড়েছে। পাঠশালে যাচ্ছে, সেলেট নিয়ে লেখা করছে, আবার দাদুর মতন পুজোপাঠ, দাদুর মতন খাওয়া-দাওয়া! আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। এই বালা কি নতুন গড়ালে নাকি ছোটোবউ?'

ছোটোবউ বলল, 'না তো ঠাকুরঝি! বিয়ের সময়কার, বাক্সে তোলা ছিল। তা দাদুর সঙ্গে খাওয়া মানে? নিরিমিষ না কি?'

—তবে আর বলছি কী! আর এক ন্যায়রত্নমশাই তৈরি হচ্ছে ফুলপুরে।

আরও সব কত কথা যেন হল ওদের মধ্যে, তার মধ্যে সাবিপিসির নাম বার বার শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।

ফেরার সময় শ্যামল ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে ছোটোকাকির সঙ্গ ধরল, —ছোটোকাকি, গুণতুক মানে কী?

ছোটোকাকি চমকে বলল, 'কে তোকে বলল, একথা?'

—তুমি বলোই-না।

—ওর মানে? ওর মানে ভূতে পাওয়া।

—তোমাদের বাড়িতে সে-ভূত আছে?

—কোন ভূত রে?

—ওই গুণতুক ভূত?

ছোটোকাকি একটু দুঃখু দুঃখু হেসে বলেছিল, 'আছে! তাই বুঝি আর আসিস না তুই?'

শ্যামল লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'না এমনি। আবার যাব—'

—নাঃ! তোকে আর আসতে হবে না।

—তুমি রাগ করছ?

—উঁহু! আমি নয়। এলে তোর দাদু রাগ করবেন। পিসি রাগ করবে।

তবে একবারে কি আর যাওয়া হয়নি?

জ্ঞাতি বলে কথা!

নিকটতম জ্ঞাতি।

বিজয়ার নমস্কারে যেতে হয়েছে, সত্যনারায়ণের শিরনিতে যেতে হয়েছে, সেজোঠাকুমার 'বত্ত' সারায় নেমন্তন্নে যেতে হয়েছে। কিন্তু সে তো পিসির সঙ্গে।

সেজোঠাকুমা যেদিন শ্যামলদের বাড়িতে এসে খুব রেগে, পিসিকে বকে বকে সাবিপিসির হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে গেল, আর পিসি কপালে হাত থাবড়ে বলতে লাগল, 'তা আমি কী করব? আমি কী করব? আমার কী দোষ?'

তখনই শ্যামল আর থাকতে না পেরে সেই রান্নাঘরের পিছন-দরজা দিয়ে ওবাড়িতে গিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছোটোকাকি, সাবিপিসিকে কি ভূতে নিয়ে গেছে?'

ছোটোকাকি বলল, 'হ্যাঁ বাবা?'

—আর আসবে না সাবিপিসি?

—ভূতে ধরলে কি আর আসে বাবা?

—ভূত যখন বাড়ি থাকবে না? সাবিপিসি তো রাস্তা চেনে?

ছোটোকাকি হয়তো তখনকার মতো ভুলে গিয়েছিল কাকে বলছে কথাটা; তাই বলেছিল, 'ভূতের সঙ্গে গেলে এক বার রাস্তায় হারিয়ে ফেললে আর চেনা রাস্তায় ফিরে আসা যায় না রে শামু!'

—কোনোদিনও আসা যায় না?

—নাঃ!

—এক বারও না?

শুনে বড়ো মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছিল শ্যামল।

সাবিপিসিকে তার খুব ভালো লাগত। কেমন হাসিখুশি। আবার গান গাইতে পারে কী সুন্দর। যাত্রাপালা দেখে এসে সেই গান মুখস্থ করে ফেলে।

সাবিপিসির সর্বদা মুখে গান, মুখে পান।

ফর্সা মুখে পান খাওয়ার লাল, দেখতে কী সুন্দর ভালো লাগে। সাবিপিসিও নাকি পিসির মতো বিধবা, কিন্তু কেমন কাপড় পরে, কেমন চুড়ি পরে।...একাদশীতে কি কোনোদিন ছোটোকাকিদের দালানে যেদিন যেদিন খেতে বসত শ্যামল, কাকি খাইয়ে দিত, আর সাবিপিসি কী সব সেলাই করতে করতে গলা খুলে গান গাইত—

'মাটিতে চাঁদের উদয় কে দেখবি আয়।
এমন সোনার চাঁদ কেউ দেখেনি দ্যাখ সে নদীয়ায়।'

আর ছোটোকাকির দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলত, 'তোর পয়ে পয়ে এবাড়িতেও একটা তোর মতন সোনার চাঁদ আন দিকি।'

শ্যামল বুঝতে পারত ছোটোকাকির জন্যে ওই ছেলেটা আনতে বলছে সাবিপিসি। নিজের জন্যে নয়। অথচ নিজেরও তো ছেলে-মেয়ে কিছু নেই সাবিপিসির। ঠিক শ্যামলের পিসির মতোই।

শ্যামল একদিন বলে ফেলেছিল, 'পিসি তোমার কেন ছেলে নেই?'

পিসি উদাসভাবে বলেছিল, 'ভগবান দেয়নি। কান কাঁদে সোনা রে, সোনা কাঁদে কান রে। ছেলে পড়ে রইল, মা নেই, আর—'

শ্যামল মায়ায় গলে গিয়ে বলেছিল, 'দ্যাখো ভগবান তোমায় ঠিক ছেলে দেবে—'

ব্যাস কী যে হল, পিসি ঠাঁই ঠাঁই করে শ্যামলকে ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, 'বেরো! বেরো বলছি লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! খুঁজে খুঁজে আর কথা পেল না।'

শ্যামল তাই সাবিপিসিকে আর ওসব কথা বলেনি কোনোদিন। কিন্তু শ্যামলের মনে হত সাবিপিসি কী ভালো। ভগবানের কাছে নিজের জন্যে চায় না, ছোটোকাকির জন্যে চায়!

সাবিপিসিকে খু—ব ভালো লাগত শ্যামলের।

সেই সাবিপিসি হারিয়ে গেল। এবং জিজ্ঞেস করতে গিয়ে উত্তর পাওয়া গেল 'এক বার রাস্তা হারিয়ে গেলে আর চেনা রাস্তায় ফিরে আসা যায় না।'

কিন্তু তারপর আবার আরও অন্য কথা শুনতে পেল। শুনল সাবিপিসি খারাপ, শ্যামলের বাবা খারাপ! ওদের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, ওদের নাম মুখে আনতে নেই।

বাবা চলে যাওয়ার পর আরও পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে শুরু করলেন দাদু শ্যামলকে নিয়ে।

শ্যামলকে তিন মাইল রাস্তা হাঁটিয়ে টোলে নিয়ে যেতে লাগলেন কালীপ্রসাদ। শ্যামলের জামা-জুতো

বাতিল হয়ে গেল, শুধু ধুতি-চাদর সার হল কালীপ্রসাদের মতোই। স্তবস্তোত্র মুখস্থ করাটা বাধ্যতামূলক হল এবং কবে ন-বছরে পা দেবে শ্যামল, সেই নিয়ে সুমতির সঙ্গে কথান্তর হতে লাগল।

ন-বছরে পা দিলেই পৈতেটা দিয়ে ফেলা যায়, এবং পুরোপুরি কবলিত করা যায়।

পিসি বলে, 'ঢের দেরি আছে বাবা, এক্ষুনি আপনি পাঁজি ওলটাতে বসছেন? বসলে তো চলবে না। ওদের দীনু আর শামু একবয়সি।'

শ্যামল পিসির ওপর চটে যেত।

ভাবত, পিসি কেন বলছে দেরি আছে।

বলতে তো পারত, এই এসেই গেল।

পৈতে হলে যে কী হাত-পা বেরোবে, তা জানা ছিল না শ্যামলের, তাই কেবল ভাবত একটা বিরাট কিছু ঘটনা সেটা!

পাঠশালার অন্য ছেলেরা হাঁ হয়ে যাবে।

শ্যামলের ধুতি-চাদর আর খড়ম দেখে যারা হি-হি করে হাসে, তারা বুঝে ফেলবে শ্যামল যে-সে নয়।

শুধু পড়ুয়ারা কেন, গুরুমশাইও হাসেন মজা দেখে। বলেন, 'এই যে ছোটোন্যায়রত্নমশাই এলেন!' বলতেন, 'দাদুর নাম রাখতে পারো, তবে তো বুঝি।'

গুরুমশাইয়ের সে-বাসনা সফল হয়েছিল কি?

তাই যদি হত, তাহলে মুখার্জি সাহেব কে? যে-সাহেব এখন এক বিলাসবহুল কক্ষে রাজকীয় শয্যায় শুয়ে কর্মহীন অলস প্রহরের শূন্যতা ভরাতে বালিশে মাথা ডুবিয়ে ডুবে আছেন স্মৃতিচারণে। যাকে দেখে দেখে শ্যামল নামের ছেলেটা দার্শনিক হাসি হেসে ভাবে ভাগ্যিস মরে গেলে মানুষের আর কোনো ক্ষমতা থাকে না।

ভাবে কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের তো অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা হবার ক্ষমতাও হয়নি। স্বর্গেই যেতে হয়েছে তাঁকে দেবাত্মা হয়ে। যেখানে গেলে হাত-পা বন্ধ।

কিন্তু কালীপ্রসাদ কি সেই তখনই দেবাত্মা হয়ে গিয়েছিলেন। যখন সদ্য ন-বছরে পদার্পিত শ্যামল ন্যাড়া মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আজানুলম্বিত এক পৈতের সঙ্গে ধুতি-চাদর সামলে।

দাদু অবশ্য বলেন, 'উপবীত' 'উত্তরীয়'। পিসি বলে, 'হাতের চেয়ে আম ভারী। ছেলের চেয়ে ছেলের পৈতে লম্বা। দুগ্গতি তো ছিলই আরও দুগ্গতি বাড়ল। মায়ে তাড়ানো বাপে খ্যাদানো একটা বেওয়ারিশ মাল পেয়েছেন হাতে, যা ইচ্ছে পরীক্ষে চালাচ্ছেন তাকে নিয়ে।'

ন্যায়রত্নদুহিতার বাপের সামনের মূর্তি আর বাপের আড়ালের মূর্তি আকাশ-পাতাল তফাত। এটা ন্যায়রত্ন দেখতে পান না, কিন্তু শ্যামল দেখতে পায়। শ্যামল তাই হতচকিত হয়ে থাকে পিসির এই অগ্নিপ্রবাহী মুখের দিকে, আর অন্য সময় সেই ভয়ত্রস্ত ভক্তিগদগদ শ্রদ্ধাসমীহ আপ্লুত মুখের দিকে।

পিসির কণ্ঠস্বরেও কত স্তর।

নরম-গরম-উগ্র-শীতল।

কিন্তু একদিন দাদুর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল সেই নেপথ্যমূর্তি। একাকার হয়ে গেল আকাশ-পাতাল।

এটা কি ন্যায়রত্নের কুলাঙ্গার পুত্রের ঔদ্ধত্যের প্রতিক্রিয়া? সুমতি কি তার দাদার হঠাৎ দুঃসাহসের মূর্তির ছবিটা থেকে তিলে তিলে সঞ্চয় করে তুলছিল আপন দুঃসাহসের ভাণ্ডার?

পরে সেই কথাই ভেবেছে শ্যামল।

নইলে কেমন করে কালীপ্রসাদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সুমতি নামের সেই কেঁচোর মতো ভয়ে

গুটিয়ে যাওয়া মেয়েটা বলতে পারে 'বজ্র আঁটুনিতেই গেরো ফস্কায় বাবা! এক ফোঁটা ছেলে খেতে বসে একটা কথা বলে ফেলেছে বলে সেদিন আপনি মুখের ভাত থেকে উঠিয়ে দিলেন, একাদশীর দিন একটা মেঠাই খেয়ে ফেলেছিল বলে, বাকি বেলাটা নিরম্বু উপোস করিয়ে রাখলেন, আর বন্ধুর মা-র কাছে দুখানা গজা খেয়ে এসেছে বলে মেপে সাত হাত নাকেখত দেওয়াচ্ছেন, এটাই কি ন্যায্য হচ্ছে? মায়া মমতা বলে কি কিছু নেই?'

সুমতির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল তখন।

হয়তো সেই দিকে তাকিয়েই এতবড়ো ধৃষ্টতাও ক্ষমা করে ফেলে কালীপ্রসাদ বজ্রক্ষেপণ না-করে উদাত্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'একটা ছেলেকে ঠিক পথে চালিত করে মানুষ করার দায়িত্ব সোজা নয় সুমতি, মায়া মমতাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে তুলে রাখতে হয়।'

তখন সুমতিই বাজ ফেলল।

সুমতি বলে উঠল, 'নিজের ছেলেকে মানুষ করে তোলবার ক্ষমতা যার হয়নি, তার আর পরের ছেলেকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নিতে যাওয়া শোভা পায় না বাবা।...নিজের ছেলেটিকে এমন মানুষ করলেন যে, তার জন্যে একটা মেয়ে বিষ খেল, একটা মেয়ে কুলে কালি দিল, তবু কিনা আপনি অন্যের ছেলেকে—'

সুমতি বসে পড়ল!

সুমতি হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

শ্যামলও নাকেখত দেওয়া ভুলে কেঁদে উঠল। দাদুকে কেউ বকছে, আর দাদু দাঁড়িয়ে সহ্য করছেন এ দৃশ্য এতই অস্বাভাবিক যে নিদারুণ ভয় পেয়ে গেল সে।

কিন্তু কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন?

তিনি কি হঠাৎ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন!

তারপর কতদিন যেন এলোমেলো হয়ে কাটাল শ্যামল। বনস্পতির বিরাট আশ্রয়টা গেছে ভেঙে, অথচ আর কেউ আশ্রয়ের হাত বাড়িয়ে ধরছে না।

অদ্ভুত নিরলম্ব এক অবস্থা।

কিন্তু ধরবে কী করে?

হঠাৎ খেপে গিয়ে যা মুখে এল বলে ফেলে সুমতি যেন মরমে মরে গিয়ে নিজেকে একটা শক্ত খোলার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। যে-ছেলেটার জন্য ওকালতি করতে গিয়ে সুমতি নিজের এতদিনকার গড়ে গড়া প্রাসাদটি ধূলিসাৎ করে বসল, ঘোচাল আপন ইহকাল পরকাল, সেই ছেলেটাকে কুড়িয়ে তুলে নেবার সাহস আর হল না তার।

উলটে সুমতি তাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল।

শ্যামল কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাসটা বজায় রাখতে চেষ্টা করলে, পিসি রুষ্টগলায় বলেছে, 'দাদু তো নামের নামে ষাঁড় দেগে ছেড়ে দিয়েছে, আবার অত ঢং কেন?'

শ্যামল সেই শুনে নিয়মে কিছুটা শিথিলতা করে বসলে পিসি বলছে, 'একেই বলে বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর। দাদু আর চোখ রাখছে না বলে সাপের পাঁচ পা দেখলি নাকি রে? এতদিনের যত শিক্ষা, সব ভস্মে ঘি?'...

পিসির ওপর ভারি রাগ হয় শ্যামলের।

শ্যামলের তো কোনো কষ্ট ছিল না, শ্যামল তো দাদুর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক দাদুর মতোই হয়ে যাচ্ছিল,

সেই হওয়ার মধ্যে শ্যামলের গৌরব ছিল, অহংকার ছিল, অন্য সব ছেলেদের থেকে সে অন্যরকম, তাদের থেকে অনেক উঁচু, এই সুখের ভারে চিত্ত পূর্ণ ছিল, পিসি সর্দারি করে সব শেষ করে দিল।

কী দরকার ছিল পিসির শ্যামলের ভালো করতে আসার।

এখন হয়তো শ্যামল মনে মনে পিসির কাছে কৃতজ্ঞ, তবু দাদুর কথা মনে পড়লে মনের গভীরে একটা বিষণ্ণ বেদনার ভার ভারাক্রান্ত করে তোলে তাকে।

সবচেয়ে বেশি যদি কাউকে মনে পড়ে সে তো দাদুকেই। সেই বিশাল মানুষটার মধ্যে হয়তো কাঠিন্য ছিল, হয়তো-বা ভুলও ছিল, কিন্তু ভেজাল ছিল না।

এসব মানুষের প্রতি বুদ্ধিমানদের যে-শ্রদ্ধাটুকু থাকে তা মমতামিশ্রিত, যে-ভালোবাসাটুকু থাকে তা করুণামিশ্রিত।

কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে শ্যামল বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে বই কী।

তাই শ্যামলের দাদুর প্রতি সশ্রদ্ধ মমতা, করুণাঘন ভালোবাসা।

ন্যায়রত্নের অবোধ মেয়ে অসতর্কে একটা হাতুড়ির ঘা বসিয়ে বাপের 'বোধে'র ঘরের একটা বন্ধ দরজা ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে বসল, সেই ভাঙা দরজাটার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলের সেই আওতাটা গেছে চলে। তারপর?

তারপর শ্যামল কলকাতায় চলে এল।

জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়ল, ডাঙার খরগোস জলে।

নিজেকে নিজে ওই ব্যাখ্যাই দিয়েছিল শ্যামল। খরগোশ! ভীত সন্ত্রস্ত, সব কিছুতেই সঙ্কুচিত।

একেবারে উলটো পরিবেশ।

একেবারে বিপরীত জীবনযাত্রা।

কালীপ্রসাদ কি সত্যি নিজের ভুল বুঝে তার প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন?

না কালীপ্রসাদ ভয়ংকর একটা অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন ওই ছোট্ট ছেলেটার ওপর?

এ ছেলেটাকেও দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে শ্যামল।

সবে খোঁচা খোঁচা চুল গজানো ন্যাড়া মাথা, পরনে খাটো-ঝুল ধুতি, আর লম্বা-ঝুল ফুলপুরের হাটের থেকে নতুন কেনা শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো।

ছেলেটার সঙ্গে একটা বৃহৎ তোরঙ্গ আর একটা শতরঞ্জি মোড়া ছোট্ট বিছানা। তোরঙ্গটা বৃহৎই দরকার, কারণ ওর মধ্যেই ছেলেটার বই-খাতা পেন্সিল-স্লেট, আর জোড়া জোড়া কোরা ধুতি এবং একই প্যাটার্নের গোটা আষ্টেক শার্ট। তা ছাড়া একজোড়া লাল গামছা।

শ্যামল দেখতে পাচ্ছে ভালো ভালো গদিমোড়া চেয়ারে সাজানো একটা ঘরে দাদু বসে রয়েছেন একটা কাঠের টুলে। শ্যামল জানে দাদু ওই গদিগুলো ছোঁবেন না।

ওই টুলটার সামনে অন্য একটা টুলে কালো পাথরের রেকাবিতে অনেকগুলো সন্দেশ রসগোল্লা, একটা সাদা পাথরের গ্লাসে ডাবের জল। এদের বাড়িতে কাচের প্লেটের গোছা আছে, কিন্তু পাথরের কোনো মিলানো সেট নেই।

তবু যে সুন্দর চেহারার মহিলাটি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি যে তাঁর বুদ্ধি অনুযায়ী শুদ্ধতা রক্ষা করে এগুলি গুছিয়ে দিয়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু তাতে তো কিছু এসে যাচ্ছে না।

কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন ওসব স্পর্শও করেননি। তিনি সবিনয়ে বলেছেন রেলগাড়ির শরীরে তিনি জলস্পর্শ করেন না। খাওয়াটাওয়া একেবারে ফুলপুরে গিয়ে দ্বিতীয় প্রস্থ স্নানটান সেরে হবে।

মহিলাটি খুবই ক্ষুব্ধ হলেন বোঝা গেল।

হলে আর কী করা।

কালীপ্রসাদ আবার কবে অপরের ক্ষুণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন?

কালীপ্রসাদ উঠলেন, বললেন, 'রেখে গেলাম বলেই যে তোমাদের বন্দিদশাগ্রস্ত করে গেলাম তা নয়। ভার মনে করলেই আমাকে জানাবে।'

মহিলাটি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এ কী বলছেন জ্যাঠামশাই? আমাদের এই শূন্য ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে ভার মনে হবে কেন?'

কালীপ্রসাদ গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'অপরের সন্তানের দায়িত্ব ভার বই কী কমলা। নইলে আমি কেন তোমাদের ওপর চাপিয়ে যাচ্ছি?'

—সেটা তো আমাদের পক্ষে মস্ত লাভ জ্যাঠামশাই।

—লাভ লোকসান কি আর সহজে বোঝা যায় মা? কালীপ্রসাদ একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসেন। —তবে দ্যাখো। আর হ্যাঁ, একে উপনয়নের বছর পূর্ণ হওয়া বাবদ কিছু কৃচ্ছ্রসাধনে রাখা হয়েছিল, গতকাল সেই বছরটি পূর্ণ হয়ে গেছে, অতএব আজ থেকে কোনো বিধিনিষেধ নেই। শ্যামা, এঁদের জানিয়ে রাখ গেলাম, তোমাকেও জানাচ্ছি, এখন থেকে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই না।...ইনিও তোমার একজন পিসি, ইনি পিসেমশাই। আমার বাল্যবন্ধুর কন্যা-জামাতা। আমি বড্ড অশক্ত হয়ে পড়ছি, তোমার শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে হয়তো যথাযোগ্য করে উঠতে পারব না, তাই ভেবেই তোমাকে এখানে.....! মন টেঁকিয়ে থাকবার চেষ্টা করবে।

দাদু চলে গেলেন।

ছেলেটা প্রণাম করতে গেল, ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছেন তিনি।

ছেলেটা সিঁড়ির রেলিং ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর আর চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরতে লাগল।

ছেলেটার মনে হচ্ছিল গল্পের রাজারা যেমন দুয়োরানিকে 'বনবাস' দিয়ে যায়, দাদু তাকে তেমনি বনবাস দিয়ে গেলেন।

কী করেছিল শ্যামল?

পিসির দোষে শ্যামলের শাস্তি হল কেন?

অথচ সেই বনবাস, স্বর্গবাস হয়ে উঠেছিল আস্তে আস্তে, সেই শাস্তি, সৌভাগ্য।

কিন্তু সে কবে?

প্রথম দিকে তো কেবলই অশ্রুধারা।

দূরে থেকে বলে শ্যামল, 'ছেলেটা কী ছিঁচকাঁদুনেই ছিল! কতদিনেই যে সেই কাঁদুনে রোগ সেরেছিল।

তখন শুধু বেঁধে মারার ছটফটানি। ফুলপুরের মাঠ-ঘাট আকাশ-বাতাস গাছ পাখি এদের জন্যে প্রাণটা যাকে বলে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে যেতে চাইছে, আর তারা সবাই যেন শ্যামল নামের হাড়দুঃখী ছেলেটাকে 'দুয়ো' দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে সরে যাচ্ছে।

আর এখন শুধু হাহাকার।

সেই কলকাতাতেই আসতে হল শ্যামলকে, অথচ বাবা যখন কাতর মুখে বলেছিল 'আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি শামু?' তখন শ্যামল বাবার চোখে জল বার করে দিয়েছিল।

বাবার সেই চোখের জলের ফলেই শ্যামলকে আজ অজানা-অচেনা একেবারে পরের বাড়িতে এসে

থাকতে হচ্ছে। বাবার সেই গোপন অনুনয়ের মুখটা বার বার মনে পড়তে থাকে, শ্যামলের বাবাকে যেন আর এখন 'খারাপ' বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না।

এই কলকাতাতেই বাবা আছে!

কোথায় সে-জায়গাটা?

কলকাতাটা কত বড়ো শহর? এখানে একটা হারিয়ে-যাওয়া মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়? কলকাতা সম্পর্কে ধারণা শ্যামলের হাওড়া থেকে ভবানীপুর। দাদুর সঙ্গে ট্যাক্সিতে এখানে চলে আসতে আসতে যেটুকু দেখেছে। আর এখানে এই বাড়ি থেকে 'হরিশ পার্ক'। যেখানে রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতে হয় শ্যামলকে।

শ্যামল পড়ার বইয়ে চোখ রেখে সেই স্বল্প জানার জগৎটুকুতেই ঘুরে বেড়ায় সেটাকেই সমগ্র কলকাতার প্রতীক ভেবে।

ঘুরতে ঘুরতে শ্যামলের হঠাৎ বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়। বাবা চমকে বলে ওঠে, 'কে এ? শামু না? তুই? তুই এখানে?'

শ্যামল বাবার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'দাদু আমাকে এইখানে রেখে গেছেন। দাদু তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমায় ত্যাগ করেছেন।'...

বলবে, 'সেই কলকাতার ইস্কুলেই ভরতি হতে হল আমায় বাবা, অথচ তখন—'

বইয়ের পাতাগুলো আর দেখতে পায় না শ্যামল, বাবাকেও না।

আমি বাবাকে খুঁজে বার করব। মনে মনে প্রায় প্রতিজ্ঞা করে শ্যামল। খুঁজে বার করে সোজা জিজ্ঞেস করব, বাবা সাবিপিসি কোথায়?...তারপর বলব, তুমি যেদিন চলে এলে সেই দিনই কেন সাবিপিসি হারিয়ে গেল?

আর বাবা যদি আবার তেমনি করে বলে, আমার সঙ্গে যাবি শামু? তাহলে সোজা বাবার পিছু পিছু চলে যাবে।

বাবাকে যে এত ভালোবাসত শ্যামল তা তো কই আগে কখনো বুঝতে পারেনি। এখন ফুলপুর হারানোর বিরহটা যেন বাবারবিচ্ছেদ বিরহের সঙ্গে একাকার হয়ে উঠেছে।

এই কলকাতার বাতাসেই বাবার নিশ্বাস এইখানেই কোনো একটা বাড়িতে বাবা থাকে, খায়, ঘুমোয়, হয়তো-বা সেখান থেকে অফিস যায়, এই কথাটা যতই অনুভবে আনতে চেষ্টা করে শ্যামল, ততই বাবা যেন শ্যামলের সমগ্র অনুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে, বিশাল হয়ে ওঠে।

যে-ভালোবাসার সন্ধান ছিল না, সে-ভালোবাসা নতুন করে জন্মগ্রহণ করে।

আর দাদু?

তাঁর উপর বুঝি প্রচণ্ড এক অভিমান ওদিকটায় একটা প্রাচীর তুলে রাখতে চাইত।

পিসির দোষে দাদু তাকে ত্যাগ করে গেলেন, এই চিন্তাটা তো ছোট্ট মনটাকে দীর্ণ করছিলই, তার উপর চলে যাবার সময় দাদুর সেই শ্যামলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া?

শ্যামলের মনে হয়েছিল এর চাইতে অনেক কম কষ্টের হত দাদু যদি তাকে গুরুমশাইয়ের মতো বেত মেরে সর্বাঙ্গ কালশিটে পড়িয়ে দিতেন।

শ্যামল কি কোনোদিন বলেছিল, 'আমি মাছ খেতে চাই, দোকানের খাবার খেতে চাই, বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে চাই।'

...পেন্টুর দিদির বিয়েতে পাড়াসুদ্ধ সকল ছেলে-মেয়েই তো নেমন্তন্ন খেল, শ্যামল খেয়েছিল? তার জন্যে কি শ্যামল দুঃখ করেছিল?

পিসি যখন ওদের বিয়েবাড়ি থেকে 'ন্যায়রত্নমশাইয়ে'র নাম করে দিয়ে যাওয়া সন্দেশ নিয়ে এসে বলেছিল, 'বাবার নাম করে দিয়ে যাওয়াই সার, বাবা তো আর খাবেন না, তুই-ই খা একটু। তোর কপালে তো আর কিছুই জুটল না। মহাপুরুষের বংশধর!'

এটা পিসি ন্যায়রত্নকে কটাক্ষ করেছিল না তাঁর পুত্রকে, তা বোঝবার বুদ্ধি হয়নি তখন, কিন্তু এ বুদ্ধিটি হয়েছিল যে, দাদু যা খাবেন না, শ্যামল তা খাবে না।

শ্যামল অতএব তীব্র প্রতিবাদ করে উঠেছিল। পিসি রেগে চেঁচিয়ে একসা করে বলেছিল, 'চল বাবার কাছে, অনুমতি নিয়ে আসি।'

শ্যামল যায়নি।

শ্যামল রেগে কেঁদে অস্থির করেছিল।

শ্যামলের মনে হয়েছিল পিসি তাকে ভয়ানক কিছু একটা পাপের প্ররোচনা দিচ্ছে।

সেই শ্যামলকে কিনা দাদু চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ওঁদের সঙ্গে ভাত খেতে বসতে হল ডিমের ডালনা দিয়ে। মাছের ঝোল দিয়ে।

পাতের সামনে বসে শ্যামলের মনে হল, চারিদিকের সব কিছু ঘুরছে। শ্যামল হাত দিল না, বাবু হয়ে বসে রইল মাথাটাকে নীচু করে। শ্যামলের সামনে শাল পাতায় মোড়া একটা হাঁসের ডিমভাজা যেন শ্যামলকে দাঁত খিঁচিয়ে হাসতে লাগল।

সেই সুন্দর দেখতে মহিলাটি খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'খাও বাবা! লজ্জা কী?'

বলাই বাহুল্য শ্যামলের অবস্থার পরিবর্তন হল না।

দু-চার বারের পর পিসেমশাই নামের ভদ্রলোকটি হেসে হেসে বলে উঠলেন, 'কী হে, তোমার কি আজ আমাদের শুকিয়ে মারবার মতলব? এদিকে আমার যে পেটের মধ্যে বেড়াল ডাকতে শুরু করেছে, আর বেশি দেরি হলে বেড়ালটা কুকুর হয়ে উঠবে। মিউ মিউ তখন ঘৌ ঘৌ!'

আবার হাসি!

বয়স্ক পুরুষের মুখে এ ধরনের কথা কখনো শোনেনি শ্যামল। ফুলপুরের লোকদের ভাষাভঙ্গি আলাদা। খিদে পেলে ওরা বলে, 'পেট চুঁই চুঁই করছে।'

শ্যামল ভিতরে ভিতরে একটু আকৃষ্ট না হয়ে পারল না। তবে বাইরে তার প্রকাশ দেখা গেল না।

ভদ্রলোক এবার বলে উঠলেন, 'কমলা, তোমার ভাইপো দেখছি আমাকে অনশনব্রত করিয়ে ছাড়বে।'

শ্যামল আর একবার চমকাল।

বউকে আবার কেউ নাম ধরে ডাকে? পাড়ার কত গিন্নি কত বউ দেখেছে শ্যামল, তাদের বরেরা 'এই শোনো ওগো শুনছ' অথবা 'বড়োবউ মেজোবউ' গোছের কিছু বলে।

কিন্তু নাম ধরে ডাকা?

য্যাঃ!

শ্যামলের বাবা কী বলত শ্যামলের মাকে?

শ্যামলের মনে পড়ল না। কিন্তু নাম ধরে? নাঃ! অতএব শ্যামল আর একটু আকৃষ্ট হল।

শ্যামল ঘাড় তুলে বলল, 'আপনি খান-না।'

—এই সেরেছে। তুমি বসে থাকবে, আর আমি খাব? তাই কখনো হয়? তুমি যতক্ষণ হাত না-দেবে, আমারও ততক্ষণ হাত বন্ধ।

শ্যামল এবার বলে উঠল, 'আমি এসব খাই না।'

—কী সব?

বললেন কমলাপিসিমা।

—এই মাছটাছ।

—আরে সে কী!

পিসেমশাই বলেন, 'তোমার দাদু যে বলে গেলেন, পৈতের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আবার কী? আমার মনে আছে আমাকেও ওই পৈতের বছরে মাংস খেতে দিত না, বছর যেদিন পূর্ণ হল তার পরদিন ভোরবেলা হাঁক পাড়লাম, মা আজ মাংস রাঁধবে। ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে বলেন, মা হেসে বললেন, তোর যা অবস্থা দেখছি, ঠিক হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ। দেখিস বাবা আমাদের মাংসটাই যেন খেয়ে ফেলিস না? আর তুমি কিনা দাদুর অনুমতির পরও চিন্তা করতে বসেছ খাওয়া উচিত কি না?...নাঃ বাপু তুমি দেখছি তাজ্জব বানিয়ে দিলে আমায়। লাগাও লাগাও নির্ভয়ে হাত লাগাও।'

শ্যামল বোধ হয় মরিয়া হয়েই বলে, 'পৈতে হয়ে কেন, আমি তো এমনিই খাই না। পৈতের আগেও না। দাদু আর আমি। পাথরের থালায় খাই।'

ওঁরা তখন সত্যিই তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। তারপর কমলাপিসিমা বোধ হয় বলেছিলেন, 'তবে থাক। খেতে যদি ইচ্ছে না হয়। অন্য কিছু খাক।'

দুধ আমসত্ত্ব আরও কী কী যেন এসে গিয়েছিল শ্যামলের পাতে।

কিন্তু শ্যামলের সেই নিয়মনিষ্ঠা বদলে গেল কী করে?

কে শ্যামলকে 'মানুষ' করে তুলল?

—এই ঘরটা তোমার। এইখানে তুমি থাকবে, পড়াশুনো করবে। কেমন? এই দ্যাখো, এই দরজাটা খুললে একটা ছোট্ট বারান্দা আছে।

'কমলাপিসিমা' বলে যাঁকে ডাকতে হবে, তিনি শ্যামলকে সরুমতো একটা ঘরে নিয়ে এসে দেখিয়ে দেন। আগে থেকেই তার ঘর সাজানো ছিল। সরু চৌকি, ছোটো টেবিল-চেয়ার, বুক সেলফ, আলনা, ট্রাঙ্ক বসাবার চৌকি, এমনকী কোণে টুলের ওপর ছোট্ট একটা জলের কুঁজো গ্লাস।

শ্যামল বিহ্বলভাবে তাকিয়ে দেখল। শ্যামলের জন্যে এত সব ব্যবস্থা দেখে শ্যামলের আনন্দ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সে-ছাপ দেখা গেল না শ্যামলের মুখে। যে-ছাপ ফুটে উঠল, সেটা অসহায় ভীতির।

মহিলাটি বোধ করি বুঝতে পারলেন, তাড়াতাড়ি বললেন, 'রাত্রে একা থাকতে হবে না, এইখানে মেজেয় আমার চাকর জটাধর শোবে।'

শ্যামল নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

হোক জটাধর!

হোক চাকর, তবু একটা মানুষ তো!

কিন্তু ওই জটাধরের উপস্থিতিটাই বিরক্তিকর হল কবে থেকে? কবে থেকে একা ঘরে থাকাটাই আরামদায়ক মনে করতে শিখল শ্যামল?

আর কবে থেকে রাত জেগে জেগে নিজের সব কথা খাতায় লিখে লিখে পাতা ভরানোর নেশায় পেয়ে বসল তাকে?

এই লেখাকে যে 'ডায়েরি' রাখা বলে তা-ই তো জানত না শ্যামল। ফুলপুরের হাটে কেনা খাটো-ঝুল ধুতি আর লম্বা-ঝুল শার্টগুলো তার সেই বৃহৎ তোরঙ্গয় বন্ধ থাকলেও। এবং তার বদলে হাফ প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরতে শিখলেও।

ওই লেখার শখটা এল আকস্মিক একটা দৈবদুর্বিপাক ধরে।

আচমকা পিসেমশাইয়ের কোন যেন এক আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে পিসেমশাই-পিসিমা ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন সেখানে, শ্যামলকে জটাধরের জিম্মায় দিয়ে।

বলে গেলেন, 'ভালো করে খাস বাবা। আর শোন, তিনতলার ছাতের চিলেকোঠা ঘরে, যে-ঘরে তোর পিসেমশাই রাত্রে পড়াশোনা করেন, ওখানে অনেক ছোটোদের পড়বার মতো গল্পের বই আছে, তুই বরং তা থেকে কিছু নিয়ে এসে পড়িস। একা একা কী করবি সারাদিন!'

শ্যামলের ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, তোমরা তো দু-জনেই বড়ো, ছোটোদের বই নিয়ে কী করো? রেখেছ কী করতে?

কিন্তু শ্যামলের পক্ষে সম্ভব হল না জিজ্ঞেস করা। তা ছাড়া ওঁরা তো চলেই গেলেন।

সেই ঘরে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল শ্যামলের।

শ্যামল দেখল সেলফের ওপর বইয়ের খাঁজে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা!

খাতাখানা খুলে দেখল।

পিসেমশাইয়ের হাতের লেখা!

পিসেমশাই কি গান লেখেন? অথবা শেখেন? তাই গানের খাতা?

গল্পের বইয়ের দিকে না তাকিয়ে শ্যামল ওই খাতাখানা নিয়েই পড়তে বসে গেল। এটা যে ন্যায়সঙ্গত কাজ হচ্ছে না সে-বোধ এল না ন্যায়রত্নের নাতির।

কিন্তু এ তো গান নয়।

পদ্যে লেখা রয়েছে।

তার মানে পিসেমশাই পদ্য লেখেন।

তার মানে পিসেমশাই কবি!

কিন্তু কী ছাই কবিতা?

পড়ে মানে বোঝা যায় না। শ্যামল পাতা ওলটায়।

সবই কবিতা নয়।

এমনি লেখা।

স্কুলের রচনার খাতার মতো। কত কথা লিখেছেন পিসেমশাই।

কিন্তু এর মধ্যে দাদুর হাতের লেখা চিঠি কেন! প্রতি সপ্তাহে পোস্টকার্ডে যে-হাতের দুই ছত্র লেখা শ্যামল পায়।

শ্যামল বসে পড়ে।

শ্যামল চুরির উত্তেজনা অনুভব করে, চুরির অপরাধবোধ।

শ্যামলের চিঠি ধরা হাত কাঁপে, বাড়িতে কেউ নেই জেনেও মনে হতে থাকে পিছনের দরজা দিয়ে কে ঢুকছে।

শ্যামল কাঁপা-কাঁপা পায়ে উঠে গিয়ে দরজাটায় ছিটকিনি দিয়ে বসে।

পুরোনো চিঠি পুরোনো তারিখ।

শ্যামল যখন এখানে আসেনি তখনকার।

দীর্ঘ একটি সম্বোধন লিখে, লিখেছেন তিনি, 'মা কমলা, দীর্ঘদিন তোমাদের কোনো সংবাদ নিই নাই, এখন নির্লজ্জের ন্যায় আপন স্বার্থে পত্র লিখিতেছি। আমার একটি হতভাগ্য পৌত্রের জন্য তোমার কাছে আমার এই আবেদন।'...

শ্যামল থমকে যায়, 'হতভাগ্য পৌত্র'! হতভাগ্য মানে কী?

তা মানে বুঝতে বেশি দেরি হয় না।

অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মানে বুঝিয়ে দিয়েছেন কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন।

চিঠিখানা কি একটানা পড়তে পেরেছিল শ্যামল? সমস্ত জগৎ ঝাপসা হয়ে যায়নি তার চোখে? হাত থেকে পড়ে যায়নি? সেই পড়ে-যাওয়া জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে অনেক দেরি হয়নি?

চিঠিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে কতটা সময় লেগেছিল সেই জ্ঞানটুকু কি ছিল তার?

চিঠিটায় লেখা ছিল—'এই হতভাগ্যের মাতা এর শৈশবে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া মাতৃ কর্তব্যের দায় এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, এর পিতা গ্রামে একটি কলঙ্কিত চিহ্ন রাখিয়া পলাতক, আত্মীয় বলিতে একমাত্র আমি। আমার সাধ্যমতো বালকের শিক্ষাদীক্ষার ভার লইয়াছিলাম, কিন্তু যুগের উপযোগী শিক্ষা দিবার সামর্থ্য আমার নাই, তাই অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তোমরা নিঃসন্তান, হয়তো তোমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। তবু এ প্রস্তাব যদি তোমরা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না-করো পত্রপাঠ অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইবে। আর একটি কথা—বালকের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমার উপরই থাক, নচেৎ নিজেকে নিতান্ত ধিক্কৃত মনে করিতে হইবে। এই বুঝিয়া আশা করি অস্বীকার করিবে না।

তত্রাচ তাহাকে পুত্রজ্ঞানেই নিজ আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবে এই আমার প্রার্থনা। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সে যেন তার দুঃখময় অতীতকে বিস্মৃত হইয়া তোমাদেরই নিজ মাতা-পিতার মতো মনে করিতে পারে।

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশল।

ইতি নিত্য আশীর্বাদক
শ্রী কালীপ্রসাদ দেবশর্মা।

কিন্তু এটা কবে?

তখনও কি শ্যামলের মাথাটা ন্যাড়া ছিল? তখনও কি শ্যামল প্রতিপদে সঙ্কুচিত হয়, শিহরিত হয় খাবার থালায় অসেব্য বস্তুর স্পর্শে?

হয়তো একালটা আস্তে আস্তে অতিক্রম করছিল শ্যামল নামের সেই 'হতভাগ্য' বালকটি?

কিন্তু আর কি বালক থাকল সে?

ওই একখানা চিঠি তাকে বয়সের অনেকটা দূর সীমায় পৌঁছে দিল।

শ্যামলের অনেক কিছু বদলে গেল।

শ্যামলের চোখের সামনে থেকে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার জাল সরে গেল।

শ্যামলের মা-র সেই মোম আলোয়-মোড়া অদ্ভুত নীলচে মুখটার রহস্যভেদ হয়ে গেল।

শ্যামলের দাদুর উপর যে-তীব্র একটা অভিমান সঞ্চিত হয়েছিল তার চেহারাটা বদলে গিয়ে যেন একটি বিষণ্ণ বেদনার স্বাদ সঞ্চিত হল। যে-দাদুকে চিরদিনই হিমালয়ের চুড়োর মতো মনে হয়েছে, হঠাৎ তাঁর সম্পর্কে একটি শব্দ সৃষ্টি হল, 'বেচারি দাদু।'

আর শ্যামলের বাবার জন্যে যে একটি ব্যাকুলতাবোধের জন্ম হয়েছিল তার রংটাও যেন ফিকে ফিকে হয়ে এল।

বাবা আছে থাক।

এই কলকাতায় তো অনেক অনেক লোক আছে। শ্যামলের কীই-বা লাভ সেই অনেক লোকের মধ্যে থেকে 'বাবা' নামের লোকটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টায়?

'কলঙ্ক' শব্দটা বড়ো কুৎসিত।

শ্যামল প্রতিজ্ঞা করল, 'দাদু যা বলেছেন তাই হব। তাই হতে হবে আমায়। আমার অতীতকে ভুলতে চেষ্টা করতে হবে।'

হয়তো এই চেষ্টাটা তখন আর তত কঠিন চেষ্টা বলে মনে হয়নি। তখন ফুলপুরের আকাশ বাতাস মাঠ পুকুর পাখি ফুল যেন আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে। মাদকতাময়ী কলকাতা বাঁধন দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

শ্যামল তাই তার ওই প্রতিজ্ঞাটা লিখে রাখল একটা মোটা বাঁধানো খাতায়, যেরকম খাতা সে এর আগে চক্ষেও দেখেনি। ফুলপুরের কোন ছেলেটাই-বা দেখেছে? একখানা পেলেই হয়তো বর্তে যায়!

অথচ জগদীশপিসেমশাই অনায়াসে এরকম মোটা বাঁধানো রুলটানা খাতা এক ডজন এনে দিয়েছেন শ্যামলকে নতুন ক্লাশে ওঠার পর।

শ্যামল লিখল, 'ঠিক আছে। দাদু যা বলেছেন তাই হবে। পুরোনো শ্যামলকে মুছে ফেলে এঁদের মতোই হব!'

তারপর ভরতে থাকে খাতা। —পিসেমশাইয়ের সেই খাতাটা দেখে ফেলেছিলাম, কী সুন্দর হাতের লেখা, কী চমৎকার কথা। সেই যে দেখলাম, 'ঈশ্বর অবশ্যই করুণাময়। তাই নিঃসন্তানের শূন্য ঘরে একটি সুন্দরকান্তি সুন্দর বুদ্ধি ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।...শুধু যদি ছেলেটা একটু হাসিখুশি হত! বড়ো বেশি চুপচাপ, বড়ো বেশি লাজুক। মিনু এলে হয়তো ওর লজ্জাটা একটু ভাঙবে। দুটোমাত্র বয়স্ক লোক বাড়িতে। সেখানে ওর কত সঙ্গীসাথি ছিল।...তা ছাড়া অকালে মা চলে-যাওয়া ছেলে!'

বাপের কথা কিছু লেখেননি জগদীশপিসেমশাই। তার মানে ওই কথাটা নিয়ে ভাবেননি। এর জন্যে পিসেমশাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।...

এত চমৎকার মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। কী আশ্চর্য সুন্দর খোলা হাসি। আর কত সহজ ব্যবহার।

কেমন হেসে হেসে ডাক দেন, 'ছোটা সাহেব, ছোটাহাজরি রেডি!'

ছোটাহাজরি মানেটা তো জানতামই না আগে।

কিন্তু আগে কীই-বা জানতাম আমি?

রঘু পেণ্টু গোবিন্দ সত্য দীনু এদের জন্যে দুঃখ হয় আমার। ওদের জানার জগৎ ফুলপুরের মধ্যেই। কলকাতা যে কেমন দেখতে তাই জানে না ওরা। যেমন দু-বছর আগে আমিও জানতাম না।

পিসেমশাই কত জানেন।

উনিও নাকি শুধুই বি. এ. পাস!

আমাদের ফুলপুরেও বি. এ. পাস লোক আছে অনেকে। তারা শুধু ডেলি প্যাসেঞ্জারি জানে আর অফিস জানে। আর ছুটির দিনে মাছ ধরতে কি তাস খেলতে।

হয়তো এই কলকাতাতেও ওরকম লোক আছে, আমার ভাগ্যে পিসেমশাই অন্যরকম। কত বিষয়েই যে ওঁর জ্ঞান!

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে পিসেমশাই আমায় ছাতে ডেকে নিয়ে যান, বলেন, 'আয় শ্যামল তোকে তারা চেনাই।'

ধ্রুবতারা ছাড়া আর কোনো তারার নামটাম আমি জানতাম না, পিসেমশাইয়ের কাছে জানলাম কাকে বলে 'অরুন্ধতী' কোনটা 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'। তা ছাড়া—পৃথিবীর কত খবরই পিসেমশাইয়ের জানা, কে প্রথম রেলগাড়ি আবিষ্কার করেছিল, কে রেডিয়ো, কীভাবে আস্তে আস্তে উড়োজাহাজের জন্ম, আর তা থেকে এত উন্নতি।

আমাদের ফুলপুর মধ্য ইংরাজি স্কুলের বইতে রবীন্দ্রনাথের লেখা পদ্য ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কত বড়ো কবি সেকথা কে কবে এমন করে বুঝিয়েছে? পদ্যকে যে কবিতা বলতে হয় তাই-বা কে বলেছে কবে?

এক-একদিন উনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করেন, একটার পর একটা! কী ভালো লাগে! কতই যে মুখস্থ। দাদু যখন চণ্ডীতলার নাটমন্দিরে বসে স্তব-পাঠ করতেন, তখনও এমনি ভালো লাগত, আর দাদুরও কত মুখস্থ। পুরো চণ্ডী, পুরো গীতা দাদুর মুখস্থ।

কিন্তু সে তো শুধু শুনতেই ভালো লাগত, বুঝতে তো পারতাম না?—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতাই কি বুঝি? বুঝি না, তবু বাংলা ভাষা তো?

কমলাপিসিমা একদিন বলেছিলেন, 'তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে দাও-না—'

পিসেমশাই বললেন, 'কবিতা কি আর বুঝিয়ে দেবার জিনিস গো? ওটা আপনি হয়। শুনতে শুনতে কান তৈরি হয়, পড়তে পড়তে মন তৈরি হয়।'

আবার এক-একদিন বলেন, 'কমলা অনেক দিন তোমার গান শোনা হয়নি, ছাতে বসে গান গাইবে চলো। শ্যামল, তোমার পিসিমার গলা আগে কী ফার্স্ট ক্লাশ ছিল সে তো জানলেই না। না গেয়ে গেয়ে ভদ্রমহিলা গলাটির বারোটা বাজিয়ে বসে আছেন।—চর্চা রাখতে হয় কমলা, চর্চা রাখতে হয়। ভগবানদত্ত একটা সুন্দর গুণ! রূপ, গুণ, এগুলো হচ্ছে বিশেষ সম্পত্তি বুঝলে?'

কমলাপিসিমা হেসে হেসে বলেন, 'সম্পত্তিটি তো খুইয়েই বসে আছি। গাইতে গেলে নিজেরই হাসি পায়, লজ্জা করে।'

তবু গাইতেও শুরু করেন।

প্রথমটায় গলাটা একটু ভাঙা একটু চাপা লাগে, গাইতে গাইতে অনেকটা ঠিক হয়ে যায়। তখন বোঝা যায় একসময় গলা ভালোই ছিল। তা ছাড়া ভাব আছে। গাইতে গাইতে যেন আত্মহারা হয়ে যান।

একদিন গাইলেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো, সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো—'

গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল ওঁর।

দেখে দেখে মনে হয় এঁরা যেন অন্য জগতের মানুষ! অনেক উঁচু জগতের। দাদুও অন্য জগতের, কিন্তু সেটা যেন সংসারের আর সকলের ভয়ের জগৎ!

দাদু সাধারণও নয়, বুঝি-বা স্বাভাবিকও নয়। দাদু কোনোদিন দীনুর দাদুর মতো হাট থেকে বাজার করে আনছেন একথা ভাবা যাবে? অথবা পেন্টুর জ্যাঠামশাইয়ের মতো দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসে পাড়ার কর্তাদের সঙ্গে গল্প করছেন এটা কল্পনা করা যাবে?

অথচ এঁরা একেবারে স্বাভাবিক, সাধারণ।

কমলাপিসিমা তো ভোর থেকেই শুরু করে দেন কাজকর্ম, ডাকহাঁক। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পাই ডাক দিচ্ছে 'ও বাপ জটাধর! ওঠ বাবা উঠে পড়। চোখ মেলে দ্যাখ স্বপ্ন দেখবার সময় আর নেই।

আর দেরি করলে গয়লাবাবু আমাদের জন্যে দুধ আর রাখবে না, রাখবে দুধের বালতি ধোয়া জল। কী রে নিদ্রাভঙ্গ হল?'

ফুলপুরেও পিসি সকাল থেকে ডাকহাঁক করে, কিন্তু সে ঠিক এ ধরনের মজার নয়। পিসি চ্যাঁচাবে, এই এখনও সাধনের মা এল না, উঠোনে ছড়াজল পড়ল না, গেরস্থর লক্ষ্মী থাকবে এতে? আমারই হয়েছে যত জ্বালা। এই যে এতখানি বেলায় এলি তুই সাধনের মা? কেন? মাইনে পাস না? অমনি খাটিস? যত জ্বালা আমার।

পিসি সেই সকাল থেকে কেবল জ্বালার কথা বলে। কমলাপিসির মুখে 'জ্বালা' শুনিনি কোনোদিন।

বড়ো হয়ে-যাওয়া শ্যামল অবশ্য আর ওর জন্যে পিসিকে দোষ দেয়নি। শ্যামল বুঝে ফেলেছিল পিসির জ্বালাটা আসলে কোথায়!

...পিসেমশাইও দিব্যি সকাল বেলা চা-টা খেয়ে বাজারে বেরিয়ে যান একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে। পিসেমশাই তাতেই মাছ তরকারি সব চাপিয়ে নিয়ে আসেন।

পিসিমা ওটা নিতে নিতে বলেন, 'আমার সব ভালো ঝোলাগুলো তুমি বাজার করে করে শেষ করলে!'

পিসেমশাই হাসেন, আর বলেন, 'কী করব বলো, চটের থলি হাতে ঝুলিয়ে বেরোলে নিজেকে প্রেফ চাকর চাকর মনে হয়।'

—হলে কী হয়? চাকর হয়ে যাবে তাতে?

—আহা মনে হওয়াটাই তো আসল গো। মনে হতে হতেই মনের মধ্যে দৈন্যভাব এসে যাবে। তখন চেনা কাউকে দেখলে না দেখার ভান করে সরে পড়তে ইচ্ছে করবে, আর নয়তো তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেশি পয়সার জিনিস কিনতে ইচ্ছে করবে।

—এত জানো তুমি! বলে পিসিমা বাজার নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যান।

এঁদের দেখলে মনে হয় না পৃথিবীতে কোনো ভার আছে। যদিও প্রথম প্রথম আমি সন্দেহ করতাম এঁদের মধ্যে কোনো শোকের ভার আছে।

এ ধারণাটা আমার হয়েছিল এঘরের আর খাবার ঘরের উঁচু দেওয়ালে একটি ছোটো মেয়ের ছবি ঝোলানো থাকতে দেখে।

একই মেয়ের দুটো ছবি রাখার মানে আর কী হতে পারে?

বেঁচে থাকা মানুষের ছবি আর কে কবে দেওয়ালে টাঙায়? তাও ছোটো মেয়ের। ওই ভেবে সাহস করে কোনোদিন ওঁদের জিজ্ঞেস করিনি ছবিটা কার?

হায় ভগবান! পরে শুনলাম জলজ্যান্ত একটা মেয়ের ছবি। পিসেমশাইয়ের ভাগ্নি মিনুর, যার ভালো নাম মোনালি।

কী অদ্ভুত নাম। সোনালিই হয় জানি।

তা ওর নাম অন্য কোনোদিন উঠতে শুনিনি, একদিন পিসেমশাই অফিস থেকে ফিরেই বলে উঠলেন, 'শ্যামল তুমি এই ছবিটা দেখেছ তো? এ কে জানো?'

শ্যামল মাথা নাড়ল।

—জানবে না সত্যি। বলিনি তো কোনোদিন। এ হচ্ছে আমার ভাগ্নি। মানে আমার বোনের মেয়ে। ভীষণ ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী, ফি বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাশে ওঠে। শুনে হঠাৎ মনে হল এটা বোধ হয় আমায় শুনিয়ে বলছেন, যাতে আমি লজ্জা পেয়ে মন দিয়ে পড়ি। রেজাল্ট তো ভালো করিনি আমি।

আমি নিজেকে শক্ত করে নিলাম।

বললাম, ও।

পিসেমশাই কিন্তু মোটেই ওই প্যাঁচের দিকে যাননি। পিসেমশাই উৎফুল্ল গলায় বললেন, 'ওর নাম মোনালি, মিনু বলে ডাকা হয়। ও আসছে!'

ও আসছে।

শুনে সত্যি বলতে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি নিজে নিজেই বুঝতে পারলাম এটা আমার হিংসুটেপনা হল! কিন্তু কী করব মনের ওপর তো হাত নেই। মন যে বলে উঠল ওই কোঁকড়া চুলে রিবন বাঁধা সুন্দর দেখতে মেয়েটা এলেই আমি বোকা বনে যাব। আমি অবান্তর হয়ে যাব। তা ছাড়া ওর এটা নিজের মামার বাড়ি, অধিকারের জায়গা। ও যদি বলে, এ ছেলেটা আবার কে?

আর সবথেকে বেশি কথা ও ফি বছর ফার্স্ট হয়।

পিসেমশাই অবশ্য আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন না, মহোৎসাহে বললেন, 'এতদিন ওরা ম্যাড্রাসে ছিল, হঠাৎ ওর বাবা ত্রিচিনাপল্লিতে বদলি হয়ে যাচ্ছে, তাই ওকে কলকাতায় স্কুলে ভরতি করে দেবার জন্যে আমার কাছে পাঠাচ্ছে। বলেছে বোর্ডিঙে থাকবে, সপ্তাহে সপ্তাহে এখানে আসবে। আমি বোর্ডিঙে থাকতে দিলে তো? মামার বাড়ি থাকতে, কেউ বোর্ডিঙে থাকে বলো তো শ্যামল? ও-ব্যবস্থা নাকচ। তুই একা একা থাকিস, এবার একটা বন্ধু পেয়ে বাঁচবি।'

আমি চুপ করেই থাকলাম।

পিসেমশাই খবরটা পিসিমাকে জানাতে গেলেন। অফিসে ওঁর বোনের চিঠিটা এসেছে।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, হে মা চণ্ডী পিসিমার যেন ওকে বাড়িতে রাখতে মত না হয়। ও যেন বোর্ডিঙেই থাকে। ওর ছবি দেখেই বোঝা যায় ফ্যাসানে বাড়ির ফ্যাসানে মেয়ে, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না। ফুলপুরে লোকে তো বলে, 'মামা দিল দই সন্দেশ, মামি আনল ঠ্যাঙা—'

ওই মোনালির ভাগ্যে মামি যেন তেমনি হয়। মা চণ্ডীই এখন ভরসা আমার। খুব তো জাগ্রত ঠাকুর! মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, কত লোকের কত অসুখ সারাতে পারেন, মামলাটামলা জিতিয়ে দিতে পারেন, আর এটুকু পারবেন না?

খাতাতে এই এক-শো আট বার চণ্ডী নাম লিখে রাখি।

শ্যামলের কলমের কালির বোধ হয় জোর ছিল না। তাই এক-শো আট প্রার্থনাবাণীও চণ্ডীমাতার না পড়ল চোখে, না-পৌঁছোল কানে! অথবা তাঁর গতিবিধি ওই ফুলপুরের মধ্যেই। কলকাতার দিকে ঘেঁষেন না।

অতএব—

যথা দিনে এবং যথা নির্দিষ্ট ট্রেনেই এসে হাজির হল জগদীশের ভাগনি মোনালি রায়।

ফ্যাসানে বাড়ির ফ্যাসানি মেয়ে।

কিন্তু কথার কী ধরন?

এরকম কথা তো শ্যামল এই কলকাতায় এসেও শোনেনি কখনো। যা মুখে আসে, তাই বলে ফেলে! এমন বলে ফেলতে হয়? তা ছাড়া মুখেই-বা আসে কী করে এসব কথা?

জগদীশ ওকে নিতে গিয়েছিলেন, ট্যাক্সি থেকে তিনি নামবেন, তবে তো? তা নয় তিনি নামবার আগেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ে দুদ্দাড়িয়ে সোজা দোতলায়।

জগদীশ যে এত বার 'ওরে দাঁড়া, ওরে দাঁড়া' করলেন কানেই নিল না।

শ্যামল সকাল থেকেই খুব বিচলিত আর উত্তেজিত ছিল, তাই জগদীশ স্টেশনে যাওয়া অবধি বার বার বারান্দায় বেরিয়ে দেখছিল আবার ঘরে ঢুকে পড়ছিল।

মোনালিকে নামতে দেখেই ও বারান্দা থেকে সরে এসেছে, কিন্তু গুণবতী মেয়েটি আর কোথাও না গিয়ে আগে এই ঘরেই।

শ্যামল বোকার মতো অন্য দিকে তাকাল।

মেয়েটা হি-হি করতে করতে ডাক দিল, 'মামি, ও মামি, এমন রাজপুত্তুরের মতো চাকর কোথা থেকে জোটালেন গো? দেখে ভয় হচ্ছে সিনেমা কোম্পানি হিরো করবে বলে চুরি করে না নিয়ে যায়।' আবার হি-হি।

শ্যামল অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা মামিকে 'আপনি' করে কথা বলল (যেটা মামিকে কেউ বিশেষ করে না) অথচ একটা প্রণামও করল না।

আর আরও অবাক হল অকারণ একজনকে অপদস্থ করার চেষ্টায়। এ কী ভদ্রতা!

কমলাপিসির ভুরুটা একটু কুঁচকে উঠল।

কমলাপিসি এগিয়ে এসে বললেন, 'ওকে দেখে তোর চাকর মনে হল?'

—আহা, মনে তো হচ্ছে না। কিন্তু তা ছাড়া? আপনার তো আর ইতিমধ্যে এত বড়ো একটা ছেলে হয়ে যায়নি?

কমলা খুব সংক্ষেপে বললেন, 'ও আমার ভাইপো।'

জগদীশ এসেছেন ততক্ষণে।

কমলা বললেন, 'মিনুকে তুমি শ্যামলের কথা বলনি?'

জগদীশ হেসে উঠে বললেন, 'না! "সারপ্রাইজ" দেবার জন্যে কিছু বলিনি। খুব অবাক হয়ে গেছে তো?'

কমলা বললেন, 'অবাক হয়ে যায়নি, অবাক করে দিয়েছে।'

জগদীশ থতোমতো খেলেন। জগদীশ স্ত্রীর কপালে এরকম বিরক্তির রেখা আশা করেননি। ভাগনির দিকে তাকালেন জগদীশ। মোনালি আবার হি-হি করে উঠল, —আমি না মামা, ওকে না হি-হি—ভেবে নিয়েছিলাম হি-হি— না বাবা বলব না। ও আবার মামির ভাইপো। মামি আবার শুনলে মুখ 'অ্যাই' করবে।

এ-ই মোনালি।

ভাব করতে আসার পদ্ধতিও তার এমনই উৎকট।

শ্যামল মাথা নীচু করে পড়ছে, পিছন থেকে এসে চেয়ারের পিঠটা ধাঁই করে উলটো টেনে ধরে বলে ওঠে, 'ওঃ কী জ্ঞানতপস্বী ছেলে! ফেলে দিই? ফেলে দিই?'

কষ্টে চেয়ার থেকে নেমে পড়ে শ্যামল বলে, 'এটা কী হল?'

—কী আর হল। মজা হল! রাত-দিন এত পড়িস কেন রে?

প্রথম কথাতেই 'তুই' বলেছিল মোনালি।

খাবার টেবিলে।

মোনালি বলল, 'এই, কোন ক্লাশে পড়া হয়?'

শ্যামল বলার আগেই জগদীশ তাড়াতাড়ি বলে দেন, 'ক্লাশ এইটে।'

—এইট্! এ মা এত বড়ো ছেলে এইটে কেন রে? মামি আবার বলছিল তুই নাকি আমার থেকে বড়ো, তোকে নাকি দাদা বলতে হবে। দায় পড়েছে আমার দাদা বলতে! আমার থেকে নীচু ক্লাশে পড়ে। তুই তুই তুই।

এখনও 'তুই' বলল।

বলল, 'রাতদিন এত পড়িস কেন রে?'

শ্যামল এই বাচালতায় অবাক হয়ে গেল।

শ্যামল মুখ লাল করে বলল, 'তোমার মতো ভালো ব্রেন নয় বলে।'

—আহা রে কী বিনয়। সারাক্ষণ পড়ে গাধারা বুঝলি?

—তাহলে আমিও তাই!

—ওঃ বাবুর আবার রাগ আছে খুব। সারাক্ষণ পড়া আমার দু-চক্ষের বিষ! আয়-না একটু আড্ডা দিই।

—না, আমায় এখন পড়তে হবে।

মোনালি ওর বিছানাটায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ে হি-হি করে বলে, 'হাঁদা নম্বর ওয়ান! যে যত পড়ে, তার বুদ্ধি তত ভোঁতা হয়ে যায় বুঝলি? ভোঁতা না হলে ওই পিসিকে একেবারে দেবীজ্ঞান করিস?'

—তার মানে?

—মানেই যদি বুঝবি তো বলছি কেন! মামির ব্যবহারটা দেখলি তো? আমাদের মাছ দিল, তোকে দিল না। হলেই-বা আশ্রিত, একটা মানুষ তো!

শ্যামল দাঁড়িয়ে ওঠে।

শ্যামল ছিটকে ওঠে, 'এসব কী বলছ তুমি? এভাবে কথা বলছ কেন?'

—সত্যি কথা আমি এইভাবেই বলি। খোলাখুলি।

শ্যামল শান্তভাবে চেয়ারে গিয়ে বসে বলে, 'এটা সত্যি নয়। আমি ওসব খাই না।'

—খাস না? একদম না?

—না।

—মাংস? ডিম? মুরগি?

—না না না।

—ওরে বাবা! এতে এত রাগের কী আছে? খাস না কেন?

—ওর আর কেন কী? সবাই কি সব খায়?

—বাজে জিনিস খায় না। ভালো জিনিস খাবে না মানে? নিরিমিষ খেলে চোখের জ্যোতি কমে যায় তা জানিস?

—ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের লোকই নিরামিষাশি!—তা ছাড়া এত সাধুসন্ন্যাসী এ দেশে, ক-জনের চোখে চশমা দেখেছ?

—ও বাবা! এ ছেলের যে দেখছি ভেতরে ভেতরে অনেক জ্ঞান! তা তুই বুঝি সাধু হবার সাধনা করছিস? কর বাবা কর! আমার সাধনা বাবা অসাধু হবার।

—খুব সুন্দর চিন্তা তো।

—দ্যাখ তুই দেখছি বড্ড গতানুগতিক। মানে চিরকালের ছাঁচে ঢালা! জগতে সবাইকেই সুন্দর হতে হবে, তার কোনো মানে আছে? প্রকৃতির রাজ্যেই কি সব সুন্দর? বাঘ সুন্দর? ব্যাং সুন্দর?

এমনই অদ্ভুত কথা ওর।

আসলে কথা বলবে বলেই যা ইচ্ছে বলে।

কথা। কথা! কথা! অনর্গল কথা কয়ে যায় মেয়েটা। যেন কথাই ওর নেশা। এত কথা ও শিখল কবে? আর কী করেই-বা শিখল? বাংলার বাইরে তো মানুষ।

কথা কয়ে কয়েই ও শ্যামলের মতো মুখচোরা ছেলের কাছ থেকে কথা আদায় করে নেয়। শ্যামলের নিজের কথা, পারিবারিক কথা!

শুনে নেয়, নিয়ে তীব্র তীব্র মন্তব্য করে, 'ওঃ দাদুর কারসাজি? বুড়োহাবড়াদের যদি কোনো বুদ্ধি থাকে। ওরা কেবল নিজের কানের চশমা দিয়ে পৃথিবী দেখে।'

শ্যামল অবাক হয়ে বলে, 'আচ্ছা কী-বা বয়েস তোমার? এত কথা তুমি শিখলে কোথায়?'

—কথা? ওটা শিখতে কি মাস্টার লাগে রে শ্যামচন্দর! তবে হ্যাঁ, আদর্শ একটি থাকলে চাষ বেশি হয়। তা আছেন! আমার মাতৃদেবীটিই তো আছেন। জগতে যত কথা আছে, আর যত ওঁচা কথা আছে, সব তাঁর দপ্তরে আছে।

—মা-র বিষয়ে এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

—লজ্জা? ফুঃ! এইভাবে কথা বলার সুযোগ যারা দেয়, লজ্জা তাদেরই হওয়া উচিত বুঝলি? তুই খুব ভাগ্যবান। তোর মা নেই, বেশ আছিস! মজায় আছিস! রাত-দিন বকবার লোক অন্তত নেই!

শ্যামল তীব্র হয়।

শ্যামল বলে, 'আমার মা সম্পর্কে কোনো কথা বলবে না তুমি।'

মোনালি একটু বুঝি চমকায়।

একটু তাকিয়ে থাকে।

তারপর আস্তে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তা হলেও বলব তুই খুব ভাগ্যবান। মা সম্পর্কে শ্রদ্ধা রাখতে পেরেছিস।...হয়তো কম বয়সে মারা গেছেন বলেই, নয়তো গ্রামের মেয়ে বা বউ বলে।'...

—শহরের সবাই খারাপ নয় মিনু।

—তা বটে!

মোনালি আবার নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমারই ভাগ্য খারাপ! নইলে ভাগ্যে বাবাই-বা অমন অন্ধ কেন, আর মা-টিই বা অমন ধুরন্ধর কেন?

—আবার! আবার এইসব বলছ তুমি? শ্যামল উত্তেজিত হয়ে বলে, 'পিসেমশাইকে বলে দেব।'

—দিগে না বলে। কী বরবে মামা আমার। তাঁর গুণবতী বোনের সব গুণের কথা বলে দেব না তাহলে? হুঁঃ।

—যে গুরুজন সম্পর্কে শ্রদ্ধা করে কথা বলে না, সে যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে না।

—তুই কী 'লাকি' শ্যামল? তোর সব গুরুজন শ্রদ্ধার যোগ্য। ভাবলে হিংসে হয়।

নিশ্বাস ফেলে মিনু।

সব গুরুজন শ্রদ্ধার যোগ্য!

শ্যামল তাড়াতাড়ি বইতে চোখ রাখে।

কিন্তু মিনু যে শুধু গুরুজন সম্পর্কেই শ্রদ্ধাহীন তা নয়, ও যেন নিজের সম্পর্কেও শ্রদ্ধাহীন।

ও অনায়াসে বলে, 'ক্লাসে ফার্স্ট হই শুধু মাকে মুখের মতো জবাব দিতে। ফার্স্ট হলে তো আর আমার ওপর বেশি সর্দারি করতে আসতে পারবে না? নইলে আমার নিজের? ফার্স্ট ফেল-এ কিছুই এসে যায় না।'

—এসে যায় না?

—কিছু না। কী হয় একগাদা নম্বর নিয়ে। লোকে বলবে 'আহা আহা কী মেয়ে!' তাতে হলটা কী? লোকের কথা আমি থোড়াই কেয়ার করি। নিন্দে আর সুখ্যাতি, শুধু তো দুটো কথা মাত্র। লোকের কথা! তুই ভেবে বল কী এসে যায় কথায়? আমার যা ইচ্ছে করতে পারছি না, যা ভালো লাগছে তা নিতে পারছি না! যাতে সুখ তা স্বীকার করতে পারছি না। কেন? না লোকে আমায় একটু প্রশংসা করবে! ধ্যাৎ!

—তোমার কথা শুনলে আমার ভয় করে মোনালি! শ্যামলের সেই খাতাটায় লেখা হয়, 'এতটুকু মেয়ে এত সাহস কোথা থেকে পেলে তুমি? তোমার কথা শুনলে তোমায় ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে, তুমি ঘরে ঢুকলেই আমার আতঙ্ক হয়, তবু তুমি যেদিন অনেকক্ষণ না আসো মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেন এমন হয়? কেন সেদিন পড়ায় মন বসে না? আমি বুঝতে পারি কমলাপিসিমা আমার এই অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। তা নইলে হঠাৎ সেদিন কেন আমায় কাছে ডেকে ওই কথাগুলো বললেন?...তুমি তখন বাড়ি ছিলে না, পিসেমশাইয়ের সঙ্গে স্কুলে ভরতি হতে গিয়েছিলে।

কমলাপিসিমা আমায় বললেন, 'দ্যাখ শ্যামল, জ্যাঠামশাই তোকে বিশ্বাস করে আমাদের কাছে রেখে গেছেন, তুই যেন তাঁর সেই বিশ্বাসের মর্যাদা বজায় রাখতে পারিস। মন দিয়ে লেখাপড়া করবি, সর্বদা স্মরণে রাখবি কতবড়ো বংশের ছেলে তুই। তোর ওপর আমার অনেক ভরসা অনেক আশা, অনেক বিশ্বাস।'

শুধু শুধু এমন কথা কেন বলবেন উনি? আমি বুঝতে পারি ভাগ্নীর আচার আচরণ চালচলন তাঁকে ভীষণ পীড়িত করে, তাঁর রুচি আদর্শ এসবের সঙ্গে ওই মেয়ের অমিল যেন আকাশ পাতাল। পিসেমশাইয়ের নিজের বোনের মেয়ে কী করে ওরকম হতে পারল?...নাঃ আমি কী বোকা! তার আগে তো ভাবতে হয় শ্রীকালীপ্রসাদ দেরশর্মার নাতি অমন হল কী করে?

কমলাপিসিমা চান না যে মিনু এবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করুক, ওর বাবা-মা যেমন বোর্ডি-এর ব্যবস্থা করেছিলেন, তা-ই ভালো, এই ওঁর মত। অথচ মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারছেন না পিসেমশাইকে। যতই হোক ওঁর ভাগনি তো!...তা ছাড়া উনি পুরুষমানুষ বাড়ির বাইরেই থাকেন বেশিক্ষণ, ওঁর ভাগ্নী যে কী ধিঙ্গি অবতার, তা অত টের পান না।...আর—উনি তো জানেন ও একটা বাচ্চা মেয়েমাত্র। ওর মধ্যে যে এত আগুন, জানবেন কী করে?

ওঁর সামনে তো মেয়ে একেবারে ইনোসেন্ট! যেই উনি অফিস থেকে ফেরেন, মেয়ে স্রেফ পাঁচ বছরের মেয়ের মতো মামার হাত ধরে টানাটানি করে। —মামা কী এনেছ? মামা আমার জন্যে কী এনেছ?...টফি? চকোলেট? নাট লজেন্স? ও মামা—। হাউ লাভলি! কী মিষ্টি তুমি! কী নাইস! গুড বয়! গুড বয়!

হয়তো পিঠটাই ঠুকে দেয়।

আর দৈবাৎ যদি কোনোদিন কিছু না-আনেন খুকির মতো হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। —ও মামা, তুমি আজ এত ব্যাড বয় হলে কেন? মাঁমাঁ! কাল আনতে হবে বলে দিচ্ছি।'

মামা কী করে বুঝবেন এ মেয়ের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন। এ মেয়ের মধ্যে পৃথিবীর পাকামি!

জীবনে কখনো এ স্বাদ পাননি পিসেমশাই তাই আহ্লাদে গলে যান। ওটা যে সম্পূর্ণ বানানো জিনিস, তৈরি করা ন্যাকামি, তা ধরতেই পারেন না।

মামিকে 'আপনি' বললেও মামাকে মিনু 'তুমি' করেই বলে। তাইতো আরও ওকে একান্ত আপন বলে ভাবতে পারেন পিসেমশাই, আর একেবারে বাচ্চা।

কিন্তু পিসিমা বুঝতে পারেন! ওর সব ন্যাকামি, সব সাজানো ছেলেমানুষি!

তাই মিনু যখন মামার গলা ধরে ঝুলে পড়ে, ও মামা, মামাগো বলে, দেখতে পাই পিসিমার কপালের শিরাগুলো নীল নীল আর উঁচু উঁচু হয়ে উঠেছে। এসে পর্যন্ত এক দিনের জন্যেও এরকম দেখিনি পিসিমাকে।

এমনকী যেদিন পিসিমার পুরোনো ঝি কালোর মা হঠাৎ ওঁর আলমারি থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল, সেদিনও না। সেদিন শুধু পিসিমার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। সেই লাল লাল মুখে বলেছিলেন, 'কালোর মা তোমার যদি দরকার হয়েছিল, আমার কাছে চাইলে না কেন? চাইলে পেতে কি না দেখে নাহয় পরে চুরি করতে।'

সেদিন পিসিমার মুখে রাগের সঙ্গে দুঃখের ছাপ ছিল। এ তা নয়। এ হচ্ছে স্পষ্ট পরিষ্কার ঘৃণার ছাপ! খুব তীব্র ঘৃণা। সেই ঘৃণার দৃষ্টিতে ওকে প্রায় দহন করে ফেলেন পিসিমা। মামা বুঝতে পারেন না।

মিনু বুঝতে পারে।

আমি স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিতে পারি, মিনু পারে।

আর পারে বলেই আরও বাড়ায়।

এই বাড়ানোয় ওর দুটো উদ্দেশ্য। এক হচ্ছে মামিমাকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখা! আর হচ্ছে যত খুকিপনা করবে, ততই ওকে নেহাত সরল 'শিশু' বলে ভাববে লোকে। অন্তত ওর মামা!

এটা ও আমার কাছে বলেই স্পষ্ট।

আমার কাছে এসে এত বেশি বাচালতা করে যে আমার কষ্ট হয়, ভয় হয়, বুক ধড়ধড় করে। কিন্তু ওর কিচ্ছুটি হয় না। ও হেসে হেসে বলে, 'এত ভয় কীসের তোর? কীসের এত ভয়? আমাদের বয়েসই আমাদের পাসপোর্ট বুঝলি? কেউ কিছু বলতেই পারবে না। বলতে এলে এমন-না বাচ্চামি করব! মুখ বন্ধ হয়ে যাবে তার। নিজেই লজ্জা পাবে।'

আমি বলি, এদিকে তো তুমি রামপাকা! এখন কচি খুকিমি করতে লজ্জা করে না?

মিনু হেসে গড়িয়ে পড়ে!

মিনু বলে, 'লজ্জা আমার শরীরে থাকলে তো? যাক মামার সঙ্গে ঢের খুকিমি করা হয়েছে, আয় তোর সঙ্গে একটু পাকামি করি।' বলে হঠাৎ আমার গালটা টিপে ধরে। হয়তো কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, নয়তো গলা ধরে ঝুলে পড়ে। লম্বায় তো আমার থেকে অনেক ছোটো।

আমার বুক হিম হয়ে যায়, আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, ভেবেছ কী, তুমি কি আমাকে এবাড়ি থেকে তাড়াতে চাও?

মিনু তখন মাথা নীচু করে চুপ হয়ে দাঁড়ায়।

হয়তো মিনুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

ও বলে, 'তোকে তাড়াতে যাব কেন? নিজেই বিদেয় হব। দেখিস আমাকেই একদিন তাড়িয়ে দেবে।...বলে নিজের মা-বাপই আমায় দু-তিন বার তাড়িয়ে দিয়েছে। বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

মিনু উদাস গলায় বলে, 'এখন ইচ্ছে হয়েছে মরে গিয়ে ওদের জব্দ করি। কিন্তু কী করে যে মরা যায় সেটা ঠিক করে উঠতে পারিনি। পাড়ার লোকে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধরে রেখে রাত্রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।'

ওকে দেখে তখন মায়া হয়। বলি— মিনু তুমি ভেবে দেখেছ কোনোদিন দোষটা কোথায়? দোষটা কার? কোন ছেলে-মেয়েকে বাবা বাড়ির বাইরে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে?

বলে ফেলেই চুপ হয়ে গেছি আমি। তখন ভয়ানক একটা ঝড়ের শব্দ মনের মধ্যে উথলে উঠেছে

আমার। সেই ঝড় ছাপিয়ে একটা রূঢ় কর্কশ গলার স্বর মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে বলে উঠেছে, 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে! দূর হয়ে যাও! জীবনে আর কোনোদিন যেন—'

মিনু আমার চুপ হয়ে যাওয়াটা বুঝতে পারে না। মিনু বলে ওঠে, 'কোনটা আগে, কোনটা পরে, তুই-ই ভেবে দেখিস সেটা! যে-মেয়েকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে হয়, সে-মেয়েকে তৈরি করেছিল কারা? পাড়ার লোক?'

ওর যুক্তিকে আমি মানি না, কিন্তু ওর যুক্তির কাছে আমি হার মানি। তবু বলব ও এক হিসেবে আমার থেকে সরল। আমার কাছে ও সব খোলাখুলি বলে। ওর মা-র কথা, বাবার কথা। আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওর কাছে আমার বাবার কথা বলতে পারিনি। ও জানে আমার মা মারা গেছেন, আর আমার বাবা নিরুদ্দেশ!

আমি কোনোদিন বলতে পারিনি, মিনু আমার বাবা এই কলকাতাতেই আছেন। আমার বাবাকে তাঁর বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সেদিন জগদীশ ভাগনিকে নিয়ে ফিরতেই ভাগনি বলে, 'ও মামা শিগগির ছাতে চলো। কী চমৎকার রামধনু উঠেছে। ও মামা, এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে—'

বলে নিজেই দুদ্দাড়িয়ে ছাতে চলে যায়।

পায়ের জুতোটাও খোলবার সময় দেয় না।

যেন রামধনুটা মিলিয়ে গেলে তার যথাসর্বস্ব খোয়া যাবে।

কমলা সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ফিরিয়ে জগদীশের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ভরতি হওয়া হল?'

জগদীশকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

জগদীশ বসে পড়ে বলেন, 'কই আর হল? সিজন চলে গেছে তো। "রমেশ মিত্র"-এ তো সিট নেই। "বেলতলা" শুনে মেয়ে আবার নাক তুলল। দেখি শেষ অবধি হয়তো গোখেলেই—'

কমলা যেভাবে কখনো কথা বলেন না, সেইভাবে বলেন, 'কেন? নাক তুলল কেন? ওখানে কেউ পড়ে না?'

—আহা তা নয়। মানে নামটার জন্যে। হেসেই অস্থির। বলে, 'মামা আমি কি ন্যাড়া যে, বেলতলায় যাব? একটা মেয়ে, খুব আহ্লাদী করে মানুষ করেছে শানুটা। গোখেলটায় আমার দিতে তেমন ইচ্ছে ছিল না। মানে—'

কমলা কথার মাঝখানেই শান্ত দৃঢ় গলায় বলেন, 'ওকে ওর মা-বাপের ইচ্ছেমতো কোনো কনভেন্ট স্কুলে ভরতি করে দিয়ে বোর্ডিঙেই ব্যবস্থা করো—'

জগদীশ চমকে ওঠেন।

জগদীশ বলেন, 'তার মানে?'

—এর আর মানে কী? ওর মা-বাবার তো সেইটাই ইচ্ছে ছিল।

জগদীশ একটু বিরক্ত গলায় বলেন, 'ইচ্ছে ছিল মানে কী? আমাদের ওপর চাপ দেবে না বলেই ইচ্ছেটা! আমি শানুকে চিঠি লিখে দিয়েছি মামার বাড়ি থাকতে বোর্ডিঙে থাকা, মানে মামার প্রেস্টিজ

পাংচার! মিনু আমার কাছেই থাকবে, দেখে-শুনে ভালো স্কুলেই ভরতি করে দেব। স্কুলের মেয়াদ আর তো মাত্র দুটো বছর! এখন হঠাৎ অন্যরকম কথা উঠছে কেন?'

কমলা বোধ করি আজ মনস্থ করেই যুদ্ধে নেমেছেন। তাই এর পরেও বলেন, 'যদি বলি কেন উঠছে তা শুনতে চেয়ো না, আমার বিবেচনার ওপর আস্থা রেখে মেনে নাও?

জগদীশ একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। ওঁদের মধ্যে এ ধরনের কথা কোনোদিন হয়েছে বলে মনে পড়ল না। ওঁরা দু-জনেই সভ্য শান্ত, এক দুঃখে দুঃখী, একখানি ভালোবাসার নীড়ের বাসিন্দা। ওঁদের মধ্যে কথার কুয়াশা থাকে না, থাকে না অভিযোগ অসন্তোষ!

তাই জগদীশ অবাক হলেন।

তারপর বললেন, 'তোমার বোধ হয় আজ শরীর ভালো নেই, তাই কী সব বলছ বুঝছি না।'

—শরীর আমার খুবই ভালো আছে। আর এলোমেলোও বলছি না। তবে আরও স্পষ্ট করে যদি শুনতে চাও তো বলি। —মিনু থাকলে শ্যামলের পড়ালেখা হবে না। জ্যাঠামশাই বিশ্বাস করে রেখে গেছেন।'

আর কী বলবেন কমলা?

আর কত বলবেন?

কিন্তু জগদীশ?

তিনি যে এতেও বুঝলেন না।

নাকি স্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি বুঝতে চাইছেন না?

তাই আকাশ থেকে পড়ে বলেন, 'মিনু থাকলে শ্যামলের পড়ার ক্ষতি হবে? এটা কেন ভাবছ বুঝতে পারছি না। ছেলেমানুষ, একটু গল্প খেলা এসব তো করবেই। শুধু চোখ-কান বুজে পড়াটাই তো ঠিক নয়। আমি তো দেখছি শ্যামল একটা সঙ্গী পেয়ে বেঁচেছে। আমার সেই কোনকালের ধুলোপড়া ক্যারম বোর্ডটা টেনে বার করে খেলছে। এক সেট লুডো কিনে এনেছে। তাসের ম্যাজিক নিয়ে হইচই লাগায়, এগুলো শুধু শরীরের নয় মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও তো দরকার! বিশেষ করে শ্যামলের মতো গ্রন্থকীট মুখচোরা ছেলের। তা ছাড়া মিনু ওর থেকে ছোটো হলেও এক ক্লাস উপরে পড়ে, পড়াশুনোয় ভালো, দু-জনে একসঙ্গে পড়াশুনো করলে শ্যামলের যথেষ্ট উপকারই হবে।...একটু খেলা গল্প করলে পড়ার ক্ষতি হয় না কমলা।'

কমলা এক বার স্থির চোখে তাকান।

কমলা সেইভাবে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'আর শেষপর্যন্ত খেলাটা যদি আগুন নিয়ে খেলা হয়ে ওঠে?'

—ছি ছি কমলা!

জগদীশ দাঁড়িয়ে ওঠেন।

জগদীশ চাপা তীব্র স্বরে বলেন, 'ছি! তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। কাদের সম্বন্ধে কী বলছ তুমি? দুটো স্কুলের ছেলে-মেয়ে! দুটোতেই নিঃসঙ্গ ছিল, একটা সঙ্গী পেয়ে বর্তে গেছে, তাদের তুমি..... না কমলা! তোমাকে আমি এর অনেক উর্ধ্বে ভাবতাম। দোহাই তোমার তুমি এত ছোটো হয়ো না।'

কমলার চোখে জল এল।

কমলার গলা বুজে এল।

কমলা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেলেন।

কমলা কি এখন ভাবতে বসবেন, শ্রী কালীপ্রসাদ শর্মাকে জানাবেন কি না, 'আমি অক্ষম, আমি

নিয়তির কাছে হেরে যাচ্ছি। আপনার দেওয়া দায়িত্বভার ফিরিয়ে নিন আপনি।'

নাকি স্বামীর প্রতি অভিমানে চুপ করে বসে বসে নিয়তির খেলা দেখবেন? কমলা যতই উচ্চস্তরের হোন, কমলা মেয়েমানুষ। এ আগুন মেয়েমানুষের চোখ এড়ায় না। ওর ফুলকি দেখলেই চিনতে পারে সে কীসের মধ্যে কতটা দাহিকাশক্তি।

ঘরের মধ্যে থেকে দেখতে পেলেন কমলা সেই আগুন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে একটা পতঙ্গকে টানতে টানতে।

হাতে তার একখানা আধছেঁড়া ঘুড়ি, আর মুখে অলৌকিক লাবণ্যের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। —মামা, মামা, এই দ্যাখো ঘুড়িটা ধরে ফেললাম। শ্যামলটা হি-হি এত হাঁদা, ছাতে ঘুরে ঘুরে পড়া মুখস্থ করছে। না-দেখেছে রামধনু হি-হি-হি, না-দেখেছে ঘুড়ি। আমি গিয়ে দেখলাম তবে—সত্যি শ্যামল তোর মতো গবেট আমি দুটো দেখিনি।

জগদীশের ইচ্ছে হতে থাকে কমলা এসে দেখুক। কমলা অকারণ মনের মধ্যে একটা নীচ সন্দেহ পুষবে এ অসহ্য।

কিন্তু কমলা কোথায় দেখতে পেলেন না।

জগদীশ সস্নেহে বললেন, 'শ্যামল তো তোমার মতো হুড়ে নয়। ও শান্ত ছেলে!'

—আহা রে! মরে যাই। এতই শান্ত যে হাতের কাছে একটা ঘুড়ি পেয়ে গেলেও ধরবে না?

একথাটা মোনালি একটু আগে ছাতেই বলেছে।

—আশ্চয্যি! হাতের কাছে পেয়ে গেলেও ঘুড়িটা ধরিস না! কী গবেট! কী হাঁদা!

বলেছে, 'ঘুড়ি' আর 'হাত' এই দুটো শব্দের উপর বিশেষ একটি ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এখন আবার বলল। আলগা গলায়।

জগদীশ হেসে বললেন, 'তুই ঠিক তোর মা-র মতো হুড়ে হয়েছিস! শানুও অমনি লাফাইঝাঁপাই করে বেড়াত, আর রাত দিন আমায় ধিক্কার দিত, গবেট! বুদ্ধু! বোকারাম! "গোপাল অতি সুবোধ"...আমার মা বলতেন, শানুরই দাদা হয়ে জন্মানো উচিত ছিল, আর জগুর ছোটোবোন হওয়া! যত দুষ্টুমি বুদ্ধি শানুর মাথায়—'

মিনু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'সেটা এখনও আছে মামা—'

—আরে দূর! সে এখন কত বড়ো একখানা অফিসারের গিন্নি—

জগদীশের কথার মধ্যে বহুদিন না দেখা একটিমাত্র পিঠোপিঠি বোনের প্রতি স্নেহ ঝরে পড়ে।...

মিনু সেই একই কৌতুকের গলায় বলে, 'সেই তো সেই জন্যেই তো এখন মাথায় ইয়া বড়ো বড়ো দুষ্টুমির প্যাঁচ খেলে! কিন্তু তোমার বোনের প্রসঙ্গ এবার বন্ধ করো মামা। ও-গল্প করতে করতে তো তোমার সময়ের জ্ঞান থাকবে না? বুঝলি শ্যামল, এখন যদি মন দিয়ে শুনতে বসিস, মামার বোনের ছেলেবেলার সব কাহিনি আদ্যোপান্ত শুনতে পাবি। অবিশ্যি রাত কেটে যাবে।'

জগদীশ সহাস্যে বলেন, 'তুই তো দেখছি সেই তুইটুই-ই চালিয়ে যাচ্ছিস! শ্যামল তুমি 'অবজেকশান' তোলো না?'

—সে বুদ্ধিটুকুও থাকলে তো? মিনু হি-হি করে। —আমি তো বলি তুইও আমায় তুই করে শোধ নে। তা তাও পারে না। গুরুজনের মতো ভক্তিভাবে কথা বলে আমার সঙ্গে।

এ-ই মোনালি।

একে জগদীশ আগুন বলে সন্দেহ করবেন? ভাববেন ওর ভয়ে ঘরের চাল সামলানো দরকার!

শুধু শ্যামল নামের ছেলেটা ওই অদ্ভুত ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে থাকে। যাকে বলে 'হাঁ' হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মিনু আড়ালে হি-হি করে বলে, 'দেখলি তো কীরকম ম্যানেজ করে ফেললাম? জ্ঞান অবধি ওই বস্তুই দেখছি কিনা। ওই "ম্যানেজ" করা।'

ম্যানেজ করা।

শেষরক্ষা করে নেওয়া।

কিন্তু শেষরক্ষা কি হয়?

অতি বাড় বাড়লে কি ঝড় থেকে বাঁচা যায়?

শ্রী কালীপ্রসাদ দেবশর্মার স্বাক্ষরিত সেই পোস্টকার্ডটার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুখার্জি সাহেবের!

দুটি ছত্র!

কমলাকে লেখা।

'শ্যামলের পিসিমার একটি ব্রত উদ্‌যাপন উৎসব আছে, সামনের শনিবার যদি শ্যামলকে পাঠাইয়া দাও, ওর পিসিমা আনন্দিত হইবে।'

নিজের আনন্দের উল্লেখমাত্র নেই।

অনুরোধটা নৈর্ব্যক্তিক।

তা ছাড়া 'ওর পিসিমা'। আমার কন্যা নয়।

হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিটুকু প্রকাশ করে ফেলাকে ন্যায়রত্নরা হয়তো দুর্বলতা মনে করেন। নইলে এতদিনের মধ্যে ক-বারই বা ফুলপুরে গিয়েছে শ্যামল? সেই প্রথম দিকে পুজোয় আর গরমের ছুটিতে।

তারপরই ন্যায়রত্নমশাইয়ের নিষেধাজ্ঞা। 'ছুটির সময়ই পাঠাভ্যাসের কাল। বার বার স্থান বদলে মন উচাটন হইবার সম্ভাবনা। অতএব—'

এইটাই কি একমাত্র সত্য ছিল?

মুখার্জি সাহেব ভাবেন সেকথা। নাকি গ্রামে গেলেই পাছে লোকমুখে বাপের সম্বন্ধে 'সত্য ঘটনা' জেনে ফেলে ছেলেটা তাই এই সাবধানতা?

সত্য ঘটনা যে ছেলেটা শৈশবেই বুঝে ফেলেছিল, একথা বোধ করি ধারণায় ছিল না পণ্ডিত বৃদ্ধের।

পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে কমলা বলেছিলেন, 'জ্যাঠামশাই যখন নিজে ইচ্ছে জানিয়েছেন, পত্রপাঠ চলে যাও শ্যামল। ছুটিও রয়েছে যখন—'

কমলা যেন বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, বড়ো বেশি স্বল্পবাক। আর শ্যামলকে 'তুমি' করে বলছিলেন বেশিরভাগ সময়।

শ্যামলেরও তো সাহস হয়নি বলে উঠতে, 'ও কী পিসিমা আপনি আমায় তুমি বলছেন কেন?'...শ্যামলের মন সর্বদাই ভয়ংকর একটা অপরাধবোধের ভারে ভারাক্রান্ত।

নিজে সে অপরাধী না হলেও, তার উপর যে অপরাধমূলক কাণ্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে, সেকথা তো সে বলে দিতে পারছে না?

বুকের জোর করে!

চড়া গলায়।

পিসেমশাই আপনার ভাগনি একদম একটা বাজে মেয়ে! খুব খারাপ ও। আমাকে ও অতিষ্ঠ করে

মারছে। আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না, পড়তে দিচ্ছে না, ভাবতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। ও সবসময় আমার কাছে এসে আছড়াচ্ছে, আমার ওপর ঝাঁপাচ্ছে। প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে!

না, কোনোদিন বলে উঠতে পারেনি।

মিনুর দুটো রূপ দেখতে পেত সে। একটা সর্বনাশা, একটা দুঃখী রিক্ত। ওই শেষেরটাতেই মায়ায় মরে যেত শ্যামল।

কতসময় ভেবেছে, এ ওর ছলনা।

যে অত ছলনা করতে পারে, তার পক্ষে চোখে দু-ফোঁটা জল আনা কিছুই না। কিন্তু যখন তাকিয়ে দেখেছে তখন শ্যামল বিহ্বল হয়েছে, অভিভূত হয়েছে। অবিশ্বাস করতে পারেনি।

তাই নিজের ওই অপরাধের ভার নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। যেটা আরও সন্দেহকর।

কত-কতদিন যেন কমলাপিসিমাদের সেই ছাতের আসর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হয়েছিল পিসেমশাইয়ের সেই উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি।

সন্ধ্যাবেলাটা তখন কাটত জগদীশের মিনুর মুখের ইংরিজি গান শুনে আর মিনুদের ম্যাড্রাসের গল্প শুনে।

গল্প করার আশ্চর্য এক মোহিনী শক্তি ছিল মিনুর। জগদীশ ওদের সমস্ত প্রতিবেশীদের কলকাতায় বসে বসেই চিনে ফেলেছিলেন।

এ আসরে কমলা থাকতেন না।

জগদীশ কমলার এই ক্ষুদ্রতায় এই সংকীর্ণতায় পীড়িত হতেন, তাই আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ডাক দিতেন না, 'ও কমলা শোনো শোনো! মিনুর কথা শোনো! মিনুর বাবার বস একদিন—'

জগদীশ ভাবতেন কমলার এই স্তব্ধতা মেয়েদের সেই চিরাচরিত ননদের প্রতি ঈর্ষার ফল।

এটা কমলা বুঝতে পারেন বই কী।

তাই মিনু যখন 'আমিও যাব শ্যামলদের ফুলপুরে' বলে নেচে উঠল, তখন কমলা শুধু অসহ্য বিস্ময়ে মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'তোমার মামাকে জিজ্ঞেস করো গে।'

—বা রে! মামাও ঠিক ওই কথাই বললেন। ও মামি যাব। আমি কখনো পাড়াগাঁ দেখিনি।

—বললাম তো তোমার মামা বললে যাবে।

—আহা আপনারই তো জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। আপনি পারমিশন না দিলে?

—আমার জ্যাঠামশাই সম্পর্কে আমারও কোনো ধারণা নেই।

—বাবা! বাবা! একটা ছোটো মেয়ে তাঁর বাড়িতে গেলে কি মারবেন নাকি? নাকি তাড়িয়ে দেবেন? যাই আমি মামাকে বলি গে মামি বলেছেন তুমি রাজি হলেই..... দৌড়ে পালিয়েছিল।

রেলগাড়িতে বসে মিনু চোখ-মুখ নাচিয়ে বলেছিল, 'দেখলি তো? গেলাম কি না? তুই বলেছিলি অসম্ভব! তোর মামা-মামি মত দেবেন না। মত আদায় করার ক্যাপাসিটি থাকা চাই চাঁদু।'

নিজের ক্যাপাসিটি সম্পর্কে হিমালয়প্রমাণ ধারণা ছিল মিনুর।

কারণ মিনু কোনোদিন ন্যায়রত্নমশাইকে দেখেনি।

মিনু তাই ফুলপুরে পা দেওয়া থেকেই নিজের ক্যাপাসিটির মহিমা বিস্তার করে চলেছিল।

মিনু ফুলপুরে গিয়ে শুধু পাড়াগাঁই দেখল না, যেন সাপের পাঁচ পা দেখল।

প্রথম নম্বরেই মিনু দাদুর কাছে গিয়ে প্রণাম করতে ভুলে গেল। ওর সামনে শ্যামল প্রণাম করল দেখেও খেয়াল হল না তার।

মিনু ঘুরে ঘুরে শ্যামলদের বাড়িটা দেখতে এমন উন্মত্ত হয়ে গেল যে পিসিকে দেখতে ভুলে গেল।

তারপর মিনু পিসির ব্রতের ব্রাহ্মণভোজনের সময় শ্যামলকে বাড়ির বাইরে টেনে নিয়ে চলে গেল 'ওসব হাবজিগাবজি কী দেখবি?' বলে। গেল গঙ্গার ঘাটে ইটখোলার নৌকো দেখতে। মিনু তারপর সকাল বেলাই শ্যামলকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল চাঁপা ফুল পাড়তে।...মিনু মাছ ধরবার শখে পাগল হয়ে রঘুর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়ে ছিপ বাগিয়ে চলে গেল বড়ো দিঘিতে।

মিনু সবসময় সর্বত্র চটি পরে বেড়াল, মিনু খেতে বসে পাতে সব ফেলে দিয়ে খেল, মিনু পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজোর আসরে পুজোর পাঁচালি শুনতে বসে এটা? কী ওটা কী? এতে কী হয়? ওরে বাবা ঠাকুর কী প্রতিহিংসাপরায়ণ! ইত্যাদি করে নিজেই এমন পাঁচালি গাইতে শুরু করল যে অন্যের আর পুজোর পাঁচালি শোনা হল না।

শ্যামল অসহায়ের মতো দেখছে।

শ্যামল ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্যামলের মাথারও ঠিক নেই ভাবনারও ঠিক নেই।

কারণ শ্যামল যখন অন্যের চোখে নিজের চেহারার প্রতিফলনটা ভাবতে চেষ্টা করছে, বেশিক্ষণ ভাবতে পারছে না দিশেহারা হয়ে খেই হারিয়ে ফেলছে।

কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতি তুমি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভালো স্কুলে কলেজে পড়বে বলে কলকাতায় গিয়ে বসে আছ, তুমি কলেজে ওঠার আগেই এমন মস্তান হয়ে উঠলে যে একটা ধাড়ি ধিঙ্গি বেহায়া মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এই ফুলপুরের চোখের ওপর দাদুর বুকে বাঁশ ডলছ? দাদুর মুখে আলকাতরা লেপছ? দাদুর মাথায় বাজ ফেলছ?

ওই বেহায়া মেয়েটা যখনই তোমার হাত ধরে টানাটানি করে বলছে, 'এই শ্যামল কী বোকার মতো বাড়ির মধ্যে বসে আছিস? চল-না বেরিয়ে পড়ি। এমন ফার্স্ট ক্লাস সব বেড়াবার জায়গা রয়েছে তোদের দেশে—'

তখনই কাচপোকার কবলিত তেলাপোকার মতো সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছ তার পিছু পিছু।

আর সেই মেয়েটা যখন গ্রামের রাস্তায় হি-হি করতে করতে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গলা ছেড়ে গান গেয়ে বাগানে ঘুরছে, তুমি তাকে তাড়াতে তাড়াতে ট্রেনে তুলে দিয়ে না এসে, আবার বাড়িতে এনে তুলছ?

অথচ সে-ইচ্ছে তোমার অহরহই হচ্ছিল। কিন্তু শুধু ইচ্ছে হলেই তো হয় না? সাহসটা চাই।

সেখানে তোমার ভূমিকা নিরুপায় কাপুরুষের। তুমি শুধু ভাবছ ওকে বারণ করলে আরও বাড়াবে। অতএব সহ্য করে যাওয়াই ভালো।

অতএব শেষরক্ষা হল না।

কারণ সকলের সহ্যশক্তি তোমার সমান নয়।

প্রথমে পিসি 'বাস্ট' করল।

পিসি বলল, 'শ্যামল, বাবা তো তোকে ভালো শিক্ষাদীক্ষার জন্যে বেশ ভালো বাড়িতেই রেখে এসেছেন দেখছি। একখানা নমুনা যা নিয়ে এসেছিস তাতেই মালুম হচ্ছে তারা কেমন। তা তোর নাহয় মা-বাপ নেই, ওর তো শুনলাম আছে। কী করে তাহলে এই বয়সে এত বেহায়া এত নির্লজ্জ এত বদমাইস হয়ে উঠেছে? সত্যি সত্যিই সেই পিসের ভাগনিকে এনেছিস, না কোনোখান থেকে একটা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে জুটিয়ে এনে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ভিটেয় ঢুকিয়েছিস?'

ভাইপোকে উদ্দেশ্য করে বললেও, বক্তব্যটা যথাযোগ্য স্থানেই পৌঁছেছিল।

মিনু মোনালি রায় হয়ে গিয়ে রক্তবর্ণ মুখে বলে উঠল, 'বা রে শ্যামল, বাঃ! তোদের বাড়ির ভদ্রতার নমুনাও তো বেশ দেখলাম। অতিথিকে বুঝি তোরা এইভাবেই সৎকার করিস?'

পিসি ভুরু কুঁচকে বলল, 'তা রাগই করো আর যাই করো বাছা, মুখের ওপরই বলছি তোমার মতন এমন বেহায়া বাচাল ধিঙ্গি মেয়ে আমি ইহজীবনে দেখিনি।'

—ইহজীবনে তো আপনি অনেক কিছুই দেখেননি, মোনালি হেসে ওঠে। —তবে আপনাদের মতো ভদ্রতাও আমি ইহজীবনে দেখিনি। যাক চলি রে শ্যামল। খুব মনে থাকবে তোদের ফুলপুর।

এইসময় কোথা থেকে যেন ন্যায়রত্নমশাই বেরিয়ে এসেছিলেন, যাকে বলে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, 'ফুলপুরেরও খুব মনে থাকবে তোমাকে, সেইটুকুই জেনে যাও। কী শ্যামলবাবু আপনিও বান্ধবীর সঙ্গে সঙ্গে রেলগাড়িতে গিয়ে উঠবেন না কি? যাবেন তো যান। তবে মনে জানবেন সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া হবে। নচেৎ ওকে সঙ্গে পাঠাবার লোক আছে।'

—লোক?

মোনালি শেষ ছোবল দিয়ে চলে গিয়েছিল। বলেছিল, 'লোক কী হবে? এই ফুলপুর থেকে কলকাতায় যেতে যাদের বডিগার্ড লাগে আমি তাদের দলের নই। কথাটা তোর দাদুকে বসে বসে বোঝাস শ্যামল।'

চলে গিয়েছিল গটগটিয়ে। নিজের সুটকেসটা হাতে নিয়ে।

তখন মুখোমুখি শুধু শ্যামল আর কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন।

অথচ পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে শ্যামলকে আড়াল করল না।

কালীপ্রসাদ অদ্ভুত গম্ভীর একটি তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বললেন, 'গেলে না তাহলে? ভালো। এখন বিবেচনা করো আবার সেখানে ফিরে যাবে কি না। অথবা থাক, বিবেচনাটা আমার জন্যেই তোলা থাক। দায়িত্বটা আমারই।'

তারপর?

তারপরের কথাটা আর ভাবতে পারে না শ্যামল।

ভাবতে যন্ত্রণা বোধ হয় বলেই শুধু নয়, ভাবতে গেলে যেন ঝাপসা হয়ে যায়।

কারণ সেই দিনগুলো তার কেটেছে আচ্ছন্নের মতো। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু লেপে পুছে একাকার হয়ে গিয়ে দিনগুলো যেন জমাট বাঁধা এককাপ কালচে রক্তের মতো জীবনের মাঝখানে পড়ে আছে। আর নিহত লোকটা নিজেই তাকিয়ে আছে সেদিকে।

নির্মম কালীপ্রসাদ এই হতভাগ্য কিশোরকে এক বিন্দু মমতা দেখাননি। তাকেই নিজে হাতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন নিক্ষেপিত বিষাক্ত তিরটি।

শুধু সে-তিরটি কমলাকে না বিঁধে বিঁধেছিলেন জগদীশকে।

যদিও ন্যায়রত্নের চিঠির ভাষা ন্যায়রত্নের উপযুক্তই সংযত মার্জিত সংক্ষিপ্ত।

সেই তির নিজে হাতে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল শ্যামলকে, নিজে হাতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে আসতে হয়েছিল জগদীশের বাড়ি থেকে।

কালীপ্রসাদ তার জন্যে বাঁকুড়ার এক স্কুল বোর্ডিং-এ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

জীবনে সেই এক বার কমলার রাশ ছেড়ে দেওয়া আত্মহারা আক্ষেপ দেখেছিল শ্যামল।

বাক্সটা ঘর থেকে বের করে নেবার সময় কমলা সেইভাবে হাউহাউ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন.

যেভাবে চেঁচিয়ে ওঠে মানুষ, আঁকড়ে ধরে থাকা প্রিয়জনের মৃতদেহটা শ্মশানযাত্রীরা যখন টেনে বার করে নেয়।

কমলা কপাল চাপড়েছিলেন।

—আমি জানতাম! আমি জানতাম এই সর্বনাশ ঘটবে একদিন। যেদিন ওই জ্বলন্ত আগুনকে ঘরে এনে ঢোকানো হয়েছিল, সেই দিনই জেনেছিলাম।

জগদীশ কিন্তু স্ত্রীর এই আকুলতায় সহানুভূতি অনুভব করেননি। বরং বিরক্তিই বোধ করেছিলেন। কারণ আগেই মিনু চলে গিয়েছিল তাঁর বাড়ি ছেড়ে।

আর যা বলবার তাঁকেই বলে গিয়েছিল, মামিকে নয়।

জগদীশ ফুলপুরের ব্যাপারটাকে কঠিন গোঁড়ামির নীচতা, ক্ষুদ্রতা এবং সংকীর্ণতার চরম প্রতীক বলে ধরে নিয়েছিলেন।

তার উপর আবার পত্রের কশাঘাত।

জগদীশও কঠিন হয়েছিলেন।

শ্যামলকে ছাড়তে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়লেও বাইর স্থিরভাবে বলেছিলেন, 'ভালোই হল। এখনও কিছুটা সময় হাতে পাচ্ছেন তোমার দাদু তোমায় সৎপথে পরিচালিত করবার। আর বেশি দেরি হয়ে গেলে মুস্কিল হত।'

শ্যামলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল মফস্বলের একটি শহরে, তার কারণ আর কিছুই না, কলকাতা থেকে তাকে দূরে রাখা।

তবু অদৃষ্টের পরিহাসে মুখার্জি সাহেবের বাসা আজ খাস কলকাতার রীতিমতো এক অভিজাত পাড়ায়।

যেখানে তিনি আরামের সুখশয্যায় গা ডুবিয়ে শুয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মৃদু হেসে ভাবছেন, ভাগ্যিস 'প্রেতাত্মা' অথবা 'দেবাত্মা'র কোনো ক্ষমতা থাকে না, তা নইলে কালীপ্রসাদের আত্মা বোধ করি তাঁর পৌত্রের এই অধঃপতনে পৈতে ছিঁড়তে বসত।

যে-ছোকরা মুখার্জি সাহেবের রান্না করে, তার জাত সম্পর্কে মুখার্জি সাহেবের কোনো ধারণা নেই, এবং জানা নেই রান্নাঘরে সে কোন কোন প্রাণীকে ঢোকায়।

এ এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া।

অথবা এ হয়তো একটা প্রতিবাদ।

স্বেচ্ছায় গড়া আচার নিষ্ঠার লৌহশৃঙ্খল কেমন করে নাগপাশ হয়ে উঠে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মেরে চূর্ণ করে দেয় হৃদয়বৃত্তির সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলিকে, জীবনটাকে নীরস কঠোর, আর আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, এবং নির্বাসনে পাঠায় স্নেহকে ভালোবাসাকে চক্ষুলজ্জাকে তা দেখতে পেয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চেয়েছে শ্যামল সেই শৃঙ্খলভার থেকে।

একদা মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, 'যে আমাকে অমৃত দিতে পারবে না, সেই ঐশ্বর্য আমি কী করব?'

শ্যামল নামের ভীরু ছেলেটা সহসা একদিন সাহসী হয়ে উঠে দিব্যদৃষ্টি পেয়ে বলে উঠেছিল 'যে জীবনচর্চা হৃদয়বানকে হৃদয়হীন অভ্যাসের যন্ত্রে পরিণত করে তোলে, সেই জীবনচর্চার অনুসরণ করে আমি কী করব?...আমার পিতামহের কঠোর সন্ন্যাসীর রুক্ষ আদর্শকে আমি উঁচু তাকে তুলে রেখে প্রণাম ঠুকতে পারি, জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না।'

ভুলভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি ভরা মানুষের এই সংসারে শুধু বর্জনের নীতি নিয়ে চললে আমার অস্তিত্বটুকুকে বাঁচাব কী করে? যে আমি ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই, ক্ষমা করতে চাই, ক্ষমা পেতে চাই।

তখনও খাতায় কথা লেখার অভ্যাস ছিল ছেলেটার। যখন সে তার বিধ্বস্ত মন বিক্ষিপ্ত চেতনা আর মানসিক আশ্রয়হীন ভারসাম্যহারা অন্তরটাকে সংহত করে নিয়ে লেখাপড়ায় নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করছিল। তাকে বড়ো হতে হবে, মানুষ হতে হবে, স্বাবলম্বী হতে হবে।

পড়তে পড়তে টিউশনি ধরে পড়ার খরচ চালিয়ে নিয়ে দাদুর দেওয়া মাসহারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, শ্যামল লক্ষণীয়ভাবে লেখাপড়ায় উন্নতি করেছিল।

খাতার তখনকার তারিখের পাতা ওলটালে দেখা যাবে শ্যামল লিখে রেখেছে, দাদু বললেন, 'তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?...ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ, চিরকালের মূল্যবোধগুলি, জীবনের মহৎ অনুশীলন!...ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ সভ্যতা, নিজস্ব সংস্কৃতি! ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চরিত্র, শালীনতা, সদ্‌বৃত্তি।...মূলধনটি যদি সব চলে যায়, ফাঁপা ঠাট নিয়ে ক-দিন চালাবে তোমরা? দেউলে হয়ে যেতে ক-দিন লাগবে? দেউলে তো হয়েই গিয়েছে তোমাদের যুগ, ভারতবর্ষের সন্তান বলে পরিচয় দেবার মুখই নেই। কী করবে তোমরা এরপর? কী করবে?'

...আমার স্বাবলম্বী হতে চাওয়ায় আহত অপমানিত ন্যায়রত্নমশাইকে কিছু বলতে ইচ্ছে হল না, তাই চুপ করে থাকলাম। তা ছাড়া বলতে চাইলেই-বা বলতে দিচ্ছে কে?

যে-ভালো ভালো 'কথা' গুলি তিনি ব্যবহার করলেন সেগুলি যে শুধু আমাদেরই নয়, তাঁদের জীবন থেকেও চলে গেছে আত্মপ্রেমী বৃদ্ধের তো সে-খেয়াল নেই।

ওই ভালো ভালো শব্দগুলির শবদেহ আঁকড়ে পড়ে থেকে ভাবছেন, 'আমার অন্তত সব আছে।

নেই। কোথাও নেই।

থাকে না।

গতিময়ী পৃথিবীতে অহরহই চলছে ওলটপালট, ঘটছে পরিবর্তন, বদলাচ্ছে মূল্যবোধের ধারণা।

তাই বলে কি সত্যিই কিছু নেই?

নতুন ধ্যানধারণার অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে না?...

দেখলাম দাদু এখন স্বপাকে খাচ্ছেন। পিসি কর্মচ্যুত।

পিসি বলল, 'বাবা আমাকেও ত্যাগ করেছেন রে শ্যামল, নেহাৎ মেয়েমানুষ বলেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি।'

এই ত্যাগের কারণ প্রবল জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে পিসি একদিন একাদশীতে জল খেয়ে ফেলেছিল। আর খেয়েছিল ওই 'পতিত বাড়ির' ছোটোবউ নির্মলার হাতে।

দু-দুটো এতবড়ো পাতকের ভার বইবার, অথবা সইবার ক্ষমতা কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের হয়নি।

অতএব সুমতির এই দুর্মতির প্রতিফল স্বরূপ তাঁর স্বপাক ভোজন।

পিসি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'সকালে শুধু হবিষ্যি, রাত্তিরে ফল জল। এই চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। বাগানের ফল তরকারি, খেতের শাক ডাঁটা কত ভালোবাসতেন। এখন বলেন কিনা 'এতে খুব ভালো আছি। এখন মনে হচ্ছে আরও আগে থেকেই এটা করা উচিত ছিল।'...কই এ খেয়াল তো আগে হয়নি। মরতে আমি একাদশীতে জল গিলে মরেছি। সত্যিই তো আর

মরে যেতাম না? আর মরলেই-বা কী ক্ষতি ছিল? বাবার কষ্ট দেখে মরতেই ইচ্ছে করে। প্রাচিত্তিরও তো করলাম, তবু—'

কষ্টটা যে ইচ্ছাকৃত, সেটা বোঝাবার চেষ্টা করবার সময় ছিল না।

চলে আসতে হয়েছিল।

কারণ কয়েক ঘণ্টার জন্যে মাত্র গিয়েছিলাম পরীক্ষার ফল জানাতে।

—সাহেব! ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ডুবে থাকা মনটাকে মুঠোয় চেপে ধরে তুলে আনতে হল। সমাজবদ্ধ জীবের ওটাকে বড্ড দরকার। ওই মনটাকে।

ডাক্তার ঘোষ এসে মৃদু হেসে বললেন, 'এত অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি চালাবেন না। আর একটু অসাবধানে চালালেই তো হয়েছিল আর কী! সামান্যর ওপর দিয়ে গেছে। কেমন বোধ করছেন এখন? গায়ে ব্যথা আছে?'

—নেই বললে বাজে কথা বলা হবে।

—হুঁ। তিনটি দিন সম্পূর্ণ রেস্ট নিতে হবে!

—মনে হচ্ছে কালই ঠিক হয়ে যাবে।

—হোক-না! তবু দুটো দিন ফাঁকি দিন-না?

—ফাঁকি দেব? কাকে?

হেসে ওঠেন মুখার্জি সাহেব।

ডাক্তারও হাসেন।

—কখন কাকে ফাঁকি দিচ্ছি চট করে বলা শক্ত।

ডাক্তার বন্ধুসদৃশ, আরও কিছুক্ষণ গল্প চলল, আরও কিছু উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

এর পর চাকর এল।

বলল, 'সাহেব যাই গাড়িতে ধাক্কা খেয়েছিলেন, তাই একটু রেস্ট হচ্ছে।'

—রেস্ট হয়ে লাভ কী?

—কী যে বলেন? লাভ নেই? শরীর বাঁচে, মগজ বাঁচে, মেজাজ বাঁচে। আপনি যা খাটেন । উঃ! নাওয়া খাওয়ার অবকাশ নেই, চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই, কাজ আর কাজ।

—তাই পা মচকে চিন্তোচ্ছি, ভাবছি। হাসে মুখার্জি সাহেব।

কিন্তু সত্যি মুখার্জি সাহেবের তো গাড়ির ধাক্কা খাবার কথা নয়। গাড়ি চালনায় তাঁর হাত নির্ভুল, পদ্ধতি নিপুণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চেতনা অ-মনস্ক।

অথচ আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

ভাবলেন মুখার্জি সাহেব।

আমি একটা অলীক কল্পনায় মূঢ়ের মতো ভুল দিকে গাড়ির বাঁক নিলাম।

এত দিন পরে আমি একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে হারানো সোনা আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখতে বসলাম। জানি ভুল, তবু মন টানছে তীব্র আকর্ষণে। আমি যদি ফিরে এসে বিছানায় না পড়তাম হয়তো

আবার যেতাম সেখানে। চিনে চিনে বার করতাম সেই ফাটা চটা এনামেলের গ্লাসে চা পরিবেশন করা চায়ের দোকানটা।

কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ঘরে আটকে পড়তে হল। আর কী করব?

আর কী করতে পারি?

শুধু চিন্তাভাবনা ছাড়া?

চিন্তাভাবনাগুলোকে তো সহজে কাছে আসতে দিই না। ওরা বড়ো যন্ত্রণাদায়ক।

সুখের স্মৃতি বলতে প্রথম কলকাতায় আসার পর কমলাপিসিমাদের নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনের মাঝখানে একটি পরম আদরের আশ্রয়।

তবুও নিরঙ্কুশ কি?

প্রতি পদে নিজের গ্রাম্যতা নিয়ে কুণ্ঠা, প্রতি পদক্ষেপে সেই গ্রাম্যতাকে সংস্কার করে শহরজীবনের তালে তাল মেলাবার চেষ্টার সাধনা। অথচ সেই গ্রাম্যতাটাই তখন প্রাণের প্রিয়, তখন একান্ত আপন।

আমার সেই দ্বিধাবিভক্ত জীবন আস্তে আস্তে সরল হয়ে আসছিল, হঠাৎ তার ওপর ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। সেই ঝড় আমার সমস্ত জীনকে তচনচ করে দিয়ে গেল। আমায় কেন্দ্রচ্যুত করে ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্য এক জীবনে।

তবু সেই ঝড়ের স্মৃতিকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখতে কষ্ট হয়।

মনে হয় একটা কক্ষচ্যুত উল্কা যেন ঝড়ের মতো আছড়ে এসে পড়েছিল।

কিন্তু মোনালি রায় নামের সেই উদ্ধত দুঃসাহসের সঙ্গে কি আর দেখা হয়নি শ্যামলের? কোনোদিন কোনোখানে?

হয়েছিল।

অদ্ভুত এক পরিবেশে।

গ্র্যান্ড হোটেলের এধারে ফুটপাতের ওপর টুল পেতে বসে আছে মোনালি, একটা নকল গহনার স্টল দিয়ে।

উৎকট সাজ, উগ্র রং মাখা মুখ।

পরনে শাড়ি নয়, স্কার্ট-ব্লাউজ, গলায় বড়ো বড়ো দানার নকল পাথরের মালা, কানে স্টেনলেস স্টিলের ঝাড় ইয়ারিং। হাতেও নকল কিছু গহনা।

ফুলপুরেও স্কার্ট পরে বেড়িয়েছে মিনু কিন্তু তখন তো স্কার্ট পরার বয়েস ছিল। এখন? এখন ওকে ওই পাড়ারই কোনো একটা অ্যাংলো মেয়ের মতো দেখতে লাগছে।

প্রথমটা দেখেও বিশ্বাস হয়নি, পাশের দোকান দেখার ছুতোয় কাছাকাছি এসেছিল।

তারপর বলে না উঠে পারল না, 'মিনু এটা কী? এটা কী করছ?'

ও চমকে উঠল।

কত কাল হয়তো ওকে কেউ 'মিনু' বলে ডাকেনি।

ও চমকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে উঠে বলল, 'সাহেব আমায় চিনতে পারলেন! কী আশ্চর্য!'

বরাবরই ওর গলার স্বরে কিছু বাড়তি তীক্ষ্ণতা ছিল, সেটাই আরও বেড়েছে। যেন একটা ধাতুপাত্র থেকে শব্দ উঠল।

শ্যামল বলল, 'এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছ কতদিন?'

—কতদিন? কে জানে? কে কীসের হিসেব রাখে?

শ্যামল বিষণ্ণ গলায় বলে, 'মিনু তোমার তো মা ছিলেন, বাবা ছিলেন।'

মিনুর কাজল পরা চোখের অন্তরালে ফস করে যেন একটা দেশলাই কাঠি, জ্বলে উঠল। মিনু তেমনি ধাতব গলায় বলল, 'ছিলেন! এ বিশ্বাস সত্যিই ছিল তোমার শ্যামল? মা-বাপ থাকলে কারও এমন দশা হয়?'

—মিনু তুমি নিজেই নিজেকে নষ্ট করেছ।

মিনু উদাস গলায় বলল, 'তা হয়তো তাই। কিন্তু বলতে পারো ওই নষ্ট করবার ইচ্ছেটা কেন অমন তীব্র হয়ে এসেছিল ভিতরে?...কই, তোমার তো হয়নি এমন ইচ্ছে?...অথচ তোমার সত্যি মা-বাপ ছিল না।'

—মিনু ওই থাকা-না-থাকাটা তো সম্পূর্ণ দৈবের ঘটনা। কিন্তু জীবনটা নিজের, আর সেটা মাত্র একটাই পাওয়া যায়।

মিনু ওর কাচের বাক্সর উপর রক্ষিত নকল মুক্তোর মালা একগাছা হাতে তুলে নাড়তে নাড়তে বলে, 'কিন্তু ওই মস্তদামি কথাটা বোঝবার আগেই যদি জীবনটা বরবাদ হয়ে যায়?'

—মিনু, নিজেকে 'ভালো' করব ভাবলে সবসময়েই করা যায়।'

—হয় না। মিনু এখন আস্তে বলে, 'যাদের জীবনের গোড়ায় সামনে কোনো আদর্শ থাকে না তাদের পক্ষে—'

—জীবনের গোড়ার আদর্শে কজনই-বা টিকে থাকতে পারে মিনু? এই তো তুমি দেখছ আমায়? 'সাহেব' বলেই ডেকে ফেললে। আগে কি—

—তাতে কী? ওটা তো শুধু বাইরের মলাট।

—মিনু, পিসেমশাই মারা গিয়েছেন, জানো?

—জানি।

মিনু তেমনি উদাস গলায় বলে, 'সুনন্দা বলেছিল। ওঃ, সুনন্দাকে তো চেনো না তুমি। আমার কলেজের বন্ধু। মামার বাসার কাছাকাছি থাকে।...মামি এখন কোথায় আছে?'

—ওঁর দাদার বাসায়। খিদিরপুরে।

—ওই পুরোনো বাসাটায় এখন আর কেউ থাকে না, না রে?

এতক্ষণ পরে হঠাৎ মিনু শ্যামলকে তুই বলে ফেলল।

শ্যামলের মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল। আস্তে বলল, 'থাকবে না কেন? থাকে! অন্য লোক থাকে।'

—অন্য লোক! ওঃ।

—মিনু, তোমার বাসা কোথায়?

মিনু হঠাৎ সেই আগের মতো হি-হি করে উঠল, 'কোথায় বলে মনে হয়? বৈকুণ্ঠে? বাসা জাহান্নমে। বুঝলি? নাকি তুমি ওই কথাটার বানানই জানো না?'

—আমি জানি কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। তুমি কী করে বানান মানে ঠিকানা সব কিছু জানলে সেটাই জানতে চাইছি।

—জেনে কোনো লাভ নেই শ্যামল।

—লাভ লোকসান আমি বুঝব, তোমায় বলতে হবে।

—অত কথা কি ফুটপাতে বসে হয় শ্যামল?

—সেইজন্যেই তো তোমার বাসার খোঁজ চাইছি।

—খোঁজ পেলে কী করবে? যাবে?

—কেন যাব না? সব ইতিহাস জানতে চাই তোমার।

—পাগল! জাহান্নমে যাবার আবার ইতিহাসই বা-কী? কাহিনিই-বা কী? একটা শ্যাওলা ধরা পিছল সিঁড়িতে পা ফেললেই ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া যায়।

—আবার ধাপে ধাপে ওঠাও যায় মিনু।

মিনু হঠাৎ হাতের মালাটা ছুঁড়ে ফুটপাথে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, 'সাহেব কি রাস্তায় মেয়েলোককে জ্ঞান দেবার মহৎ ব্রত নিয়েছেন না-কি? বেছে বেছে সুন্দরী মেয়েদের? যান সাহেব নিজের কাজে যান।'

—এসব বলে তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে পারবে না মিনু। আমি তোমার সব কথা শুনতে চাই। তোমার ঠিকানা না দাও, আমার ঠিকানা নাও।

শ্যামল তার পকেট থেকে নামের কার্ড বার করে বাড়িয়ে ধরেছিল।

মিনু নেয়নি।

মিনু রাস্তার চলমান প্রবাহের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো বলেছিল, 'যাদের নিজের ঠিকানা থাকে না, তাদের এইসব ঠিকানাওলাদের কাছে যেতে নেই।'

—যেতে আছে মিনু। আমি বলছি আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো?

—সে কী সাহেব? আমার এইসব সওদার কী হবে? কী হবে আমার রুজিরোজগারের? না কি সাহেব দয়া করে এই সওদাসুদ্ধু আমাকেই সওদা করে নিয়ে যেতে চান?

—মিনু একসময় আমরা বন্ধু ছিলাম!

—বন্ধু?

মিনু তেমনি অন্যমনস্কের মতো বলে, 'তুমি হয়তো ছিলে, তা-ই থাকতেই চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তো তা ছিলাম না। আমি তো তোমার শত্রুর কাজ করেছিলাম।'

শ্যামল একটু হেসে বলে, 'শত্রুর কাজ করেছিলে, কী মিত্রর কাজ করেছিলে সেটা চট করে হিসেব করা শক্ত। তোমাকেও আমার নিজের সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে মিনু।'

মিনু টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মোনালি রায়ের মূর্তিতে বলে উঠল, 'সে-ইচ্ছেটা বোধ হয় এখনই জাগল?'

—যদি বলি তা নয় মিনু, এই ইচ্ছে নিয়েই এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—বিশ্বাস করছি না।

—না করলে! তবু এক বার দু-জনে দু-জনের গল্প করলেই-বা ক্ষতি কী?

—লাভও কিছু নেই।

—আমি তো বলছি মিনু সেটা আমার বিবেচনা। তোমাকে এভাবে এখানে দেখতে হবে কল্পনাও করতে পারিনি কোনোদিন

—ওরে ব্যাস! এইটুকুতেই এই। মোনালি রায় হি-হি করে বলে, 'আরও কত অকল্পনীয় ব্যাপার আছে পৃথিবীতে, গুড বয়দের ধারণার হাজার মাইল দূরে। কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালগল্প করলে গুড বয়ের নামে কালি পড়তে পারে! চলে যান চলে যান।'

—আর কোথায় দেখা হবে বলো তাহলে।

মিনু টুলের কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়াল।

মিনুর দোকানের কাছে দু-একটি খদ্দেরের ছায়া দেখা যাচ্ছিল।

মিনু দুই কোমরে হাত দিয়ে বেশ চড়া গলায় বলে উঠল, 'একটা ঝুঁটো মুক্তোর মালার জন্যে এতক্ষণ দরাদরি করছেন সাহেব? মজুরি পোষাচ্ছে? যান যান, ঘরে যান।'

খদ্দের দুটি অ্যাংলো মহিলা, তাঁরা শ্যামলকে আড়াল করে দাঁড়াল।

শ্যামল চলে আসে। কিন্তু শ্যামল আবার পর দিন সেখানে যায়।

দেখতে পায় না।

দেখে দোকানে অন্য একটা হাড়গিলে চেহারার মেয়ে বসে রয়েছে।

সে কিছু বলতে পারল না।

বলল, 'বোধ হয় অসুখ করেছে ওর।'

তার কতদিন যেন পরে আর একবার। দেখা গেল হাওড়া স্টেশনে একটা ম্যাগাজিনের স্টলে বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে মিনু।

শ্যামল আস্তে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে একখানা ম্যাগাজিন টেনে নিল।

মিনুর আজকের সাজটা তেমন উৎকট নয়। মিনুর পরনে একখানা হালকা শিফন শাড়ি, এটা শ্লিভলেস ব্লাউজ।

মিনুর চোখে একটা রোদের চশমা।

গাঢ় নীল।

সবটা মিলিয়ে মিনুকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল।

মিনু শ্যামলকে দেখল।

নীল চশমার মধ্যে দিয়ে।

তারপর বলল, 'শুনলে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আজ বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

—তুমি তো দেখা হওয়া চাও না মিনু?

—চাওয়ার মানে নেই বলে চাই না।

—সব কিছুরই কি মানে থাকতে হবে?

—হবে শ্যামল। তা-ই হয়, তা-ই হওয়াই উচিত। আমিও আগে ভাবতাম সব কিছুরই যে মানে থাকতে হবে তার কী মানে আছে। কিন্তু দেখলে তো ওইরকম ভাবতে গিয়ে জীবনটাই মানেহীন হয়ে গেল।

—চলো মিনু কোথাও গিয়ে বসিগে।

কী জানি কেন সেদিন আপত্তি করেনি মিনু।

ওরা একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেছিল।

সেদিন অনেক কথা হয়েছিল।

—শ্যামল মনে পড়ে, আমি একদিন তোমাকে রাগাবার জন্যে তোমার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম? তুমি সে-রাগে তিন-চার দিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছিলে? তারপর আমি তোমার রাগ ভাঙাতে বলেছিলাম, 'তার বদলে আমার কিছু একটা ক্ষতি করছি, বল কী করব? অঙ্ক খাতাটা ছিঁড়ে ফেলব? ফাউন্টেন পেনটা ভেঙে ফেলব? শখের টুকিটাকি জিনিসগুলো জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দেব?

তুমি বললে, 'ক্ষতির বদলে ক্ষতি দিয়ে শোধ হয় না। তুমি প্রতিজ্ঞা করো আজ থেকে ভালো মেয়ে হবে, তাহলে ঠিক আছে।'

আমি হেসে বলেছিলাম, আর যা বলিস শুনব, ওইটি বাদে। তুমি বলেছিলে তাহলে আর আমার কিছু চাওয়ার নেই। মনে পড়ছে?

—পড়ছে।

—দ্যাখো এতদিন পরে সেই একই প্রশ্ন! সেই একই অনুরোধ নিয়ে তুমি—কিন্তু আমার আজ অন্য জবাব।

—কী বলো।

—এখন বলব আমার বোধ হয় ভালো হবার ক্ষমতাই নেই আর। আমি নষ্ট হয়ে গেছি শ্যামল। খারাপ হয়ে গেছি।

শ্যামল নিশ্বাস ফেলে বলে 'এটা বড্ড ভুল ধারণা মিনু। ইচ্ছের জোর থাকলে সব হয়।'

মিনু হেসে বলেছিল, 'দেখতে-শুনতে অনেক বড়ো হয়ে গেছ তুমি, কিন্তু এখনও সেই ছেলেমানুষই থেকে গেছ। সরল, সৎ, পৃথিবীর সম্পর্কে বিশ্বাসী। দেখে হিংসে হচ্ছে।'

—মিনু ছেলেবেলা থেকে তোমার মনে ভালোবাসার সঞ্চয় ছিল না, ছিল ঘৃণার সঞ্চয়, তাই তুমি নিজেকেও ভালোবাসতে পারলে না কোনোদিন।

—আমার ভাগ্য রে শ্যামল। মানুষ তো জন্ম থেকেই মাকে ভালোবাসে—

মিনু একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'শ্যামল একথা মনে আছে, তোমার মা-র কোনো ছবি নেই বলে তোমার মনে কত দুঃখ ছিল?'

—সে-দুঃখ যাবার নয় মিনু। ফুলপুরে গিয়ে কত খুঁজেছি। পুরোনো দেরাজ বাক্স তন্ন তন্ন করে। যদি ঝাপসা হয়ে যাওয়া হলদে হয়ে যাওয়া গ্রুপ ফটোও থাকে একখানা।

মিনু কেমন একরকম হেসে বলে, 'অথচ আমি—'

—কী তুমি মিনু?

—শুনলে তোমার আমার ওপর ঘৃণা আরও বেড়ে যাবে শ্যামল। তবু বলছি, আমি আমার মা-র ছবির কাচ আছড়ে ভেঙে ফেলে ছবি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

শ্যামল ছিটকে উঠল।

—ছিঃ মিনু! ছিঃ!

—ছি টি আমার গায়ে লাগে না শ্যামল। তাইতো বলছিলাম তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়।

শ্যামল আস্তে বলে, 'আমি তোমার মা-র কথা জানি না মিনু, কিন্তু তুমি তো আমার বাবার কথা জান?

—তোমার বাবার কথা? তিনি তো শুনেছি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন?

—সবটা শোননি মিনু। নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একা নয়।

—একা নয়?

—না। গ্রামের একটি বিধবা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

—কী বলছ শ্যামল?

—বলছি। আজই বলছি তোমায় প্রথম। তবু বাবার হাতে নাম লিখে দেওয়া একখানা ধারাপাত আমি এখনও যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি মিনু। হারিয়ে ফেলা সইবে না বলেই রেখেছি। তবু আজও আমি বাবাকে খুঁজি। বাবা এই কলকাতাতেই আছেন ভেবে আমি ব্যাকুলতা বোধ করি। কোন শ্রেণির মধ্যে আজ পৌঁছেছেন তিনি জানি না, তবু রাস্তায় বেরোলেই আশা নিয়ে সামনের লোকের মুখে দিকে তাকাই, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।—হয়তো আদৌ নেই-ই বাবা, বেঁচে নেই, তবু এই নেশাটা যেন

মজ্জাগত হয়ে গেছে। সেই যে ছেলেবেলায় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাবাকে আমি খুঁজে বার করবই, সে-প্রতিজ্ঞা যেন রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

মিনু আস্তে বলে, 'বাবার হিস্ট্রি জেনেও বাবার ওপর তোর বিরূপতার আসেনি কোনোদিন?'

—হয়তো এসেছে। আবার মায়াও এসেছে। খুব মায়া।

—যদি সত্যিই হঠাৎ দেখা হয়ে যায়? মিনু কেমন উত্তেজিতভাবে বলে, 'যদি দ্যাখো খুব নীচুতে নেমে পড়ে আছেন? খুব খারাপ পরিবেশে?'

—সে-পরিবেশ থেকে যদি উঠে আসতে চান, তাহলে উঠিয়ে আনব। আর যদি কিছুতেই উঠতে না চান, উপায় নেই। তবু মনে হয় কী জানো? দুর্বলতাটাই পুরো মানুষ নয়। অনেক হারিয়েও হয়তো কোথাও কোনোখানে কিছু থাকে।

মিনু হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, 'তাহলে বলছ, আমার সম্বন্ধেও আশা পোষণ করো এখনও?'

—করি মিনু। তাই ভাবি তুমি যদি তোমার মা-র কাছে ফিরে যেতে। হয়তো তুমিই পারতে মাকে ফিরিয়ে আনতে।

মিনু শুধু একটু উদাস হাসি হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা চলি।' তারপর চলে যেতে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'একটা লক্ষ্মী দেখে মেয়ে খুঁজে নিয়ে বিয়ে করে ফ্যালো শ্যামল।'

—বিয়ে করতে বাকি আছে একথা তো বলিনি তোমায়।

—না বললেও বোঝা যায়।

বলে চলে গেল মিনু।

সেই শেষ দেখা হয়েছিল মিনুর সঙ্গে।

তারপর কতদিন যেন হয়ে গেল।

তারপর একদিন আর এক নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষকে দেখতে পেল শ্যামল।

হতশ্রী একটা চায়ের দোকানের সামনে।

কিংবা মানুষ নয়, মানুষের ছায়া।

চলন্ত গাড়ি থেকে কতটুকই-বা দেখা যায়?

কতটুকুই-বা বোঝা যায়?

অনেক খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল শ্যামল।

তখন কেউ নেই সেখানে।

চা-ওয়ালা বলল, 'খানিক আগে বসেছিল? রোগা? লম্বা?...বুঝেছি। টাকা ধার করে গা-ঢাকা দিয়েছে বুঝি? ওই তো পেশা ওর।'

—না না, মানে ওই ধরনের এক জনকে খুঁজছিলাম আচ্ছা নাম জানো?

—নামটাম জানি না বাবু। সবাই তো দেখি মুখুজ্যে বলে।

—কোথায় থাকে, জানো না?

—সঠিক জানিনে। ওই ওধারের বস্তিতে কোথায় যেন থাকে। মহা জোচ্চোর লোক মশাই। এই বলে দিলাম। ধারে চা খেয়ে খেয়ে জেরবার করল। আবার বলে কিনা, 'তুই আমায় ভাবিস কী? এক কাপ চায়ের জন্য অপমান করিস? জানিস আমার মস্ত চাকুরে ছেলে আছে, ইচ্ছে করলেই সকলের সব ধার মিটিয়ে দিতে পারে।'...

হেঁ-হেঁ করে হাসে লোকটা।

বলে, 'তা সে-ইচ্ছে করিস না কেন বাবা? সবাই হাসে। তবে ভালো ঘরের ছেলে ছিল বোঝা যায়।

গোল্লায় গেলে যা হয়। তিনকুলে কেউ নেই। খায় না দায় না। তা বলি না কিছু। ভাবি দৈনিক এক কাপ চা পাগলা বামুনকে ভিক্ষে দিই।...তা এই লোককেই কি খুঁজছেন আপনি?'

—ঠিক বুঝতে পারছি না। কোন দিকে থাকে বললে?

—ওই ওধারের বস্তিতে। জিজ্ঞেস করে দেখুন।

সেই বস্তির দিকে এগোচ্ছিল শ্যামল।

হল না যাওয়া।

একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেল।

হয়তো বিধাতার কারসাজি!

কিন্তু শ্যামল কি হেরে যাবে?

শ্যামল তার পরিবেশের দিকে তাকিয়ে দেখে।

এস্ মুখার্জির জীবনযাত্রার কত উপকরণ, কত আয়োজন।

অথচ এস্ মুখার্জির বাবা বস্তিতে থাকে, অভাবের তাড়নায় লোকের কাছে ধার নিয়ে গা-ঢাকা দেয়, আর ভিক্ষের চা খায়।

শ্যামলের ঘুম আসছিল।

সেই ঘুমের মধ্যে শ্যামল সেই বস্তিটায় চলে গেল। নোংরা গলির জঞ্জাল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'এখানে শরৎ মুখুজ্যে বলে কেউ থাকেন? শরৎ মুখুজ্যে? ভালো নাম সারদাপ্রসাদ!...রোগা লম্বা, একসময় রং খুব ফর্সা ছিল, এখন—'

তারপর কোনো এক অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল সেই রোগা লম্বা একসময় খুব ফর্সা ছিল এখন তামাটে হয়ে যাওয়া লোকটা।

বলল, 'আমায় কে ডাকে? আমায়?'

শ্যামল তাকিয়ে দেখে।

ডান ভুরুর ওপরে জড়ুলটা আছে তো ঠিক। দূর থেকেও যেটা চোখে পড়েছিল।

—আপনার নাম শরৎ মুখোপাধ্যায়? ভালো নাম সারদাপ্রসাদ? ফুলপুরে বাড়ি? সেই ক্ষয়ে যাওয়া পোকায় খাওয়া লোকটা বলে ওঠে, 'কেন? কেন? সে-খোঁজে দরকার কী মশাই?'

তখন শ্যামল বলে উঠবে, 'বাবা আমি শ্যামল।'

তারপর?

তারপর শ্যামল বলবে, 'বাবা তোমার কোথায় কোথায় ধার আছে বলো তো আমায়?'

—শ্যামল আমি ভদ্রসমাজের অযোগ্য হয়ে গেছি রে।

—যোগ্যতার কথা কি নিজে বোঝা যায় বাবা?

তারপর শুধু কথা আর কথা।

—বাবা, তোমার মনে আছে? তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলে?...সেই কলকাতাতেই এলাম আমি।

—জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে, তবু জিজ্ঞেস করছি ফুলপুরের খবর কী রে শ্যামল!

—কোন খবরটা তুমি চাও বাবা?

শরৎ নামের সেই ক্ষয়ে যাওয়া লোকটা কেমন হাসি হেসে বলে, 'তোর দাদুর কথা বলছিলাম শ্যামল।'

—তুমি জানো না বাবা?

শ্যামলের বাবা মাথা হেঁট করে।

—কত দিন হল?

—চার বছর হয়ে গেল।

—তুমি ছিলে?

—খবর পেয়ে গেলাম। তখন সব হয়ে গেছে।

—মুখাগ্নি কে করল?

—পুরুত মশাইয়ের নাতি দীনু। দীনু! দীনু মুখাগ্নি করল!...অদৃষ্টের পরিহাস দ্যাখ শ্যামল ছেলে থাকতে, নাতি থাকতে—

—উনি তো আগে থেকেই ত্যাগ করে রেখেছিলেন বাবা! দীনুকে দত্তক নিয়েছিলেন কিছু দিন আগে।

—দীনুকে!

শ্যামলের বাবা ছটফটিয়ে ওঠে।

—আমি নাহয় কুলাঙ্গার। বংশের কলঙ্ক। কিন্তু তুই? তুই কী দোষ করলি?

—আমি আচারভ্রষ্ট!

—আশ্চর্য। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়! আচ্ছা শ্যামল, বলতে পারিস এটাও এক রকম ভুল কি না?

—বলতে পারব না বাবা। শেষপর্যন্ত তো নিজের নিয়মে অচল থেকে মহিমার সঙ্গেই চলে গেলেন। আসলে কে ভুল, কে ঠিক বোঝা শক্ত বাবা! হয়তো সবাই ঠিক। অন্যরা বুঝতে পারে না।...

—তোর পিসি?

—আস্তে আস্তে বুড়িয়ে যাচ্ছেন। বলেছিল এখন আর এখানে কীজন্যে থাকবে পিসি, আমার বাড়ি চলে এসো। বললেন, 'না রে শ্যামা। নিজের পায়ের তলায় মাটি থাকা ভালো।...এরপর তুই যখন বউ আনবি, যদি না বলে?'

—যখন বউ আনবি?

—তুই কি এখনও বিয়ে করিসনি শ্যামল?

—না তো!

—কেন? তোর তো ভগবানের ইচ্ছেয়—

—বাঃ আমায় কে বিয়ে দেবে শুনি? একা একা নিজে নিজে হয় নাকি? এবার তুমি এসেছ—

—তার যুগ্যি বউ আমি কোথায় খুঁজে পাব শ্যামল?

শ্যামল আস্তে হেসে বলে, 'বউ খোঁজাই আছে বাবা।'

শ্যামল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়।

শ্যামলের আর জিজ্ঞেস করা হয় না, বাবা! সাবিপিসি কোথায়?

মুখর রাত্রি

বাড়ি নয়, প্রাসাদ।

বর্তমান নয়, অতীত।

এখন আর প্রাসাদ বলেও বোঝবার উপায় নেই, বাড়ি বলেও ভুল করবার জো নেই। ভাগ্যের হাতে মার খেতে খেতে বেচারা প্রাসাদ ওর কৌলীন্য হারিয়েছে, চেহারা হারিয়েছে, পরিচয় হারিয়েছে। এখন ওর সমস্ত নীচের তলাটা কেটে চিরে ফালি ফালি করে শ্রীহীন কুশ্রী করে দোকান ভাড়া দেওয়া হয়েছে। জাতগোত্রহীন হরেক দোকান, জুতো থেকে ফুল।

ভিতর দিকে যেখানটায় বুঝি ছিল ঠাকুরদালান আর নাটমন্দির, ছিল চক-মিলানো বাড়ির মাঝখানে চক, সেখানটায় আবার আজকাল দিব্যি একটি কাঁচা বাজার গড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে কোন ফাঁকে। বাইরে থেকে চট করে বোঝা শক্ত যে, দোকানের সারিগুলোর মাঝামাঝি ওই যে বিরাট উঁচু লোহার কপাট দুটো অবারিত প্রবেশের ইশারা নিয়ে দু-হাট হয়ে খোলা পড়ে থাকে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটু ডান হাতি তাকালেই এমন একটা সবজিবাজারের সন্ধান মিলে যাবে। এ যেন একটা আবিষ্কার। কে জানত এখানে হঠাৎ চোখে পড়বে লালে-সবুজে-গোলাপি-হলদেয় এমন আশ্চর্য সমারোহ। দৈনন্দিন আহারের তালিকায় যা-কিছু থাক আপনার, এখানে উঁকি দিলে পেয়ে যাবেন ঠিকই। মাছ মাংস আলু কপি বেগুন টমাটো শাকপাতা মুদি-মশলা। কে জানে এ বাজার কর্পোরেশনের অনুমোদিত না ক্রেতা আর বিক্রেতার প্রয়োজনটাই এর লাইসেন্স।

প্রচুর কেনা-বেচা আছে, শুধু একটু যেন ঠান্ডা ঠান্ডা। হট্টগোলহীন হাট। হয়তো এই চুপিচাপির কারণ কিছু একটা আছে, নইলে বেচা-কেনা করতে যারা আসে তারা কি কোনোদিন ওই উঁচু লোহার ফটকটার দিকে তাকিয়ে এক বারও ভাবে ফটকটা তৈরি হয়েছিল বারো হাত উঁচু চালচিত্তিরসুদ্ধ দুর্গা প্রতিমার আগমন নির্গমণের জন্যে। কোনোদিন কি ভেবে দেখে দেবীর আগমন নির্গমণের সেই বৎসরান্তিক চাকাটা কোন বছরে হঠাৎ জং ধরে ঠেক খেয়ে থেমে গিয়েছিল। না, সেসব কেউ ভাবে না।

দুইতলা-তিনতলার যে-মহলগুলো এখনও দোকান কি অফিস হয়ে যায়নি, শুধু আড়াল দিয়ে দিয়ে আর টুকরো করে করে মানুষের খোপ বানানো হয়েছে তাদের ভিতরে মাথা গুঁজে থাকা মানুষগুলোই কি সেকথা ভাবে? কিন্তু ওরাই-বা ভাবতে যাবে কেন?

এবাড়ির ইট-কাঠের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী? ওরা তো ভাড়াটে। মাথা গুঁজে থাকার প্রয়োজনেই শুধু ভারতের নানা প্রান্ত থেকে এসে এসে ভিড় করেছে এখানে। না ওরা কিছু ভাবে না।

ওরা কে? ওরা ভাবতে যাবে কীসের দায়ে?

ভাবে এরা! পিছনের বুকচাপা গুমোটের দিকের একটা কোণে খান চারেক ঘরের একটু টুকরো নিয়ে যারা আজও এখানে বাস করে এবাড়ির ইট-কাটের সম্পর্কসূত্র ধরে। কিন্তু বাস করে কি শুধু সেই ইট-কাঠের ভাবালুতা নিয়ে? না, সেটা বলা হাস্যকর। কোথাও আর ঠাঁই নেই বলেই বাস করে। ভাবালুতা ওদের নেই, তাই শুধু ভাবে। বাড়িসুদ্ধ সবাই ভাবে, দিন রাত রাত দিন। ভাবাটাই যেন ওদের পেশা। মা-বাপ-ছেলেরা-মেয়েরা এমনকী দাসী চাকরগুলোসুদ্ধ। ভাবে আর মনে মনে কথা কয়।

গভীর রাত্রে যখন মুখরা পৃথিবী বোবা হয়ে যায়, আর আকাশ সহসা ফিসফিসিয়ে কথা কয়ে ওঠে, তখন ওদের ওই মনে মনে বলা কথাগুলো যেন এই জীর্ণ প্রাসাদের হলদেটে হয়ে যাওয়া 'পঙ্খের কাজ' করা দেওয়ালগুলোয় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে, উচ্চারিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু দেওয়ালগুলোও কি হাসে, কাঁদে, ভাবে সুখলতার সঙ্গে, শচীপতির সঙ্গে, মন্মথর সঙ্গে, বিরজা, নীরজা, সরোজার সঙ্গে, দেবেশ, অনিলেসের সঙ্গে, চারুদাসী আর বৈকুণ্ঠ চাকরের সঙ্গে?

হয়তো কিছুই করে না। দেওয়ালগুলো হয়তো মহাকালের মতোই উদাসীন। শুধু কাজ নেই আর ঘুম নেই বলে কান পেতে শোনে। শোনে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে মনে মনে কী বলে ওরা? আর কী বলে সুখলতা।

।। সুখলতার কথা ।।

একদিন সকলকেই এই চারখানা ঘরে আঁটত, দিব্যি কুলিয়ে যেত। এখন আর আঁটছে না, এখন আর কুলোচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন অবিরত চাড় পড়ছে, মনে হচ্ছে হঠাৎ কখন ফাটল দেখা দেবে, আর সেই ফাটলের খাঁজ দিয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে সংবাদটা। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে গড়া সংসার!

জীবন দিয়ে! হ্যাঁ, সমস্ত দিয়ে। কিন্তু জীবন মানে কী?

জীবন মানে শুধুই কি আমার সেই চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এই সময়টা? আর কিছু নয়? নয় প্রাণপণ চেষ্টা, উন্মাদ লড়াই? নয় দুশ্চর তপস্যা, দুঃসহ প্রতীক্ষা? জীবন মানে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু নয়? নয় লজ্জা আর নির্লজ্জতার টানাপোড়েন? নয় তিল তিল করে গড়া আর তিল তিল করে মরা?

আর সকলের জীবন কেমন হয় আমি জানি না, শুধু আমার জীবনকেই জানি। জানি তিল তিল মৃত্যু দিয়ে জীবনকে গড়তে হয়। সেই জীবনের সমস্ত শক্তি নিংড়ে এ সংসারকে দাঁড় করিয়েছি আমি, দাঁড় করিয়ে রেখেছি এ পর্যন্ত। রেখেছি জোরের সঙ্গে, তেজের সঙ্গে, অহংকারের সঙ্গে। কিন্তু আজকাল কেন আর সে-অহংকারকে খুঁজে পাচ্ছি না? কেন মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন কোথায় হার হতে বসেছে আমার! কেন মনে হচ্ছে আমার সেই জোরের আর তেজের নৌকোখানার তলা দিয়ে জল উঠছে। কেন? কেন এমন মনে হয়? নতুন কিছুই তো হয়নি এ সংসারে।

হয়নি কোনো পরিবর্তন, কোনো বিশৃঙ্খলা, কোনো বিদ্রোহ। আজও আমার নিজের হাতে কাটা ছকে, আমার নিজের পছন্দে গাঁথা ছন্দে, আমার একটিমাত্র আঙুলের নির্দেশেই তো চলছে সংসার, যেমন এতকাল চলে এসেছে, এতদিন এতকাল।

তবু, তবু কেন এমন ভয় ভয় করে আজকাল? কেন মনে হয় এক মুহূর্তে সব ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাবে? এ কী সর্বনাশা এক ভাবনা পেয়ে বসেছে আমাকে? কবে থেকে এ ভাবনা এল? বুঝতে পারছি না, মনে করতে পারছি না কবে থেকে, শুধু এই ভাবনাটা অহরহ কুরে কুরে খাচ্ছে আমায়।

আমি কি তবে আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের ভয় করছি? কী আশ্চর্য! কেন তা করব? ওদের ওপর কি আমি কোনো অন্যায় করেছি? করেছি কোনো অকর্তব্য? বলুক ওরা সেকথা জোরগলায়। বলুক। বলতে আর হল না, কিছু বলবার মুখ আছে না কি ওদের? মায়ের কর্তব্যের চাইতে অনেক অনে-ক বেশি করিনি আমি? ওদের মানুষ করে তোলবার, তৈরি করে তোলবার সম্পূর্ণ গৌরব একা আমার নয়? নইলে ওদের লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া কর্তব্যজ্ঞানহীন দায়িত্ববোধহীন বাপের ভরসায় ফেলে রাখলে হত কিছু? বেঁচেই কি থাকত? যদি আমি শুধু আমার নিজের ভূমিকাটুকু অভিনয় করেই থেমে থাকতাম? পরমায়ুর জোরে নিতান্তই যদি টিকে থাকত, তো পথভিখিরির ছেলে-মেয়েদের থেকে কতটুকু উঁচু অবস্থা থাকত ওদের?

কিছু না কিছু না। পথভিখিরি ছাড়া আর কিছুই হত না ওরা। সেকথা কি বোঝে না ওরা? আমার বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়েরা? তার জন্যে কি মনে মনে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে নেই ওরা ওদের মায়ের কাছে? হওয়া উচিত। তবে?

তবে মিথ্যে ভয় করি কেন আমি? না না, ভয় নয়। নিশ্চয় এ আমার শারীরিক দুর্বলতার ফল। কিছুদিন থেকেই শরীরটা কেমন দুর্বল হয়ে চলেছে। শরীর থেকে মন! আমার ছেলে-মেয়েরা যে আমার এই সংসারের মতোই আমার জীবনের সমস্ত শক্তি নিংড়ে গড়া, ওরা তা বুঝবে না? শক্তির ক্ষয় আছে একথা ওরা বুঝবে না? বুঝবে, বুঝবে। বোঝে তো।

বোঝে বই কী। এই তো এঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার দুটি ছেলে, দেবেশ আর অনিমেষ। পাড়ার নামকরা ছেলে। রূপে গুণে বিদ্যেয় স্বাস্থ্যে অন্যের চোখ-ঝলসানো ছেলে। হ্যাঁ, লোকের চোখ ঝলসায় টাটায়! ওদের নিজেদের মাসিপিসিরই টাটায়। তাই ভুরু কুঁচকে বলে, 'যাহোক দেখালে বটে!'

কথাটা সত্যি। অভাবে অনটনে স্রোতের কুটোর মতো ভেসে বেড়াবার কথা যাদের, তারা কত আরামেই মানুষ হচ্ছে। পাশাপাশি দুখানি খাটে ঘুমোচ্ছে দু-জনে, যেন দুটি রাজপুত্তুর। আরামে ডুবে যাওয়া বিছানা, চিকনের ওয়াড় পরানো বালিশ, আর দামি নেটের মশারি ঘিরে রেখেছে ওদের। সস্তা জিনিস ওরা ব্যবহার করতেই পারে না। জুতোর কালিটি পর্যন্ত না।

হ্যাঁ, ওইরকম করেই মানুষ করেছি আমি ওদের। বড়োলোকের ছেলের মতো করে। সেই আমার সারা জীবনের একান্ত বাসনা ছেলে-মেয়েদের ভালোভাবে মানুষ করব। না বিলাসিতা নয়, শুধু সভ্য মার্জিত সুরুচিসম্মতভাবে। বিলাসিতায় আমার অরুচি, বিয়ে হয়ে এদের এই বাড়িতে এসে ঢের দেখলাম সেসব, তার পরিণামও দেখলাম। বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে তো এসে ঢুকিনি, ঢুকেছিলাম দাদাশ্বশুরের বাড়িতে। নিজের শ্বশুর ছিলেন বড়োলোকের ঘরজামাই। তা মামাশ্বশুর দাদাশ্বশুরের অনেক বোলবোলাও দেখেছি, অনেক রমরমা! কিন্তু ওই, ওই পর্যন্তই! তিন পুরুষ ধরে সবাই শুধু লক্ষ্মীকেই ভজেছে, সরস্বতীর দিকে মুখ ফেরায়নি! একা লক্ষ্মীর জোরে বেশিদিন টিকে থাকতে পারল না। পারত, তাও পারত, যদি লক্ষ্মীকে শুধু ভজনাই করত। কিন্তু তা তো করেনি, লক্ষ্মীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তাই গেল, সব গেল।

আমার ছেলেদের আমি বি. এ, এম. এ, পাস করালাম। হ্যাঁ আমিই! সভায় দাঁড়িয়ে জোরগলায় এ কথা বলতে পারি, আমি, আমি ছাড়া কেউ নয়। নইলে ওদের ওই তো অপদার্থ বাপ আর এই তো পরিবেশ।

আমি ওদের বিলাসিতা দিয়ে গড়িনি, সুরুচি দিয়ে গড়েছি। এই তো বাড়ি, ঘর থেকে দালান অবধি মেজেগুলো সব মার্বেলমোড়া বটে, কিন্তু দেওয়ালে দেওয়ালে দরজায় জানালায় ছাদের কড়িতে বরগাতে কালের ছাপ! সমস্তটা কী বিশ্রী বিবর্ণ কুৎসিত নিষ্ঠুর! এ আর একটু-আধটু মেরামতির কর্ম নয়। ঘরের রঙিন দেওয়ালের এই রং-জ্বলে যাওয়া রংগুলো চেঁচে তুলতেই যা মজুরখরচা লাগবে, তা ভাবতে গেলেও ভয় করে। ও আর কিছু হবে না। আমি শুধু দিন কাটাচ্ছি 'দিন কিনে নেওয়া'র উগ্র তাড়নায়। তবু এর মধ্যেই ওদের ঘরটি কেমন ছিমছাম করে সাজিয়ে রেখেছি। ওই তো মাথার কাছে আলাদা আলাদা দুটি ছোটো কাশ্মীরি টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প, আর ওদের রাত্রে খাবার জলটি কাট-গ্লাসের গ্লাসে বেতের সরপোশ দিয়ে ঢেকে রাখা, ওই তো পায়ের কাছে খাটের নীচে হালকা স্পঞ্জের চটি, ওই তো দু-জনের দুটি ওয়ার্ডরোব, দুটি আলনা, দুটি বুককেস। আর একেবারে দু-কোণে দু-জনের পড়ার টেবিল।

পড়া আর শোওয়া একই ঘরে, সে আর কী করব? এই যা জুটছে তাও তো প্রাপ্যের হিসেবে নয়।

ভাগ্যের দানও নয়, মায়ের দান। তবু ঘরগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাই। আগেকার আমলের তো! এ যুগের হলে ওই একটা ঘরেই একখানা বাড়ি তুলত। তা ছাড়া এ ঘরখানা যে ছিল আমার দাদাশ্বশুরের। মন্টু ঠাকুরপোই থাকত আগে, তার ঠাকুরদার আমলের সমস্ত সাজসজ্জা ঘাড়ে মাথায় বুকে করে গুদামঘরের মধ্যে থাকার মতো। কম চেষ্টায় আর কম কৌশলে মন্টু ঠাকুরপোকে ওই ওদিকের ছোটো ঘরটায় চালান করে, ঘরটি আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্যে বাগিয়েছি। ওরা আর কী করে জানবে সে-চেষ্টার ইতিহাস! শুধুই কি বাগানো? মন্টুঠাকুরপোকে না রাগিয়ে ঘরের সেইসব সেকেলে শৌখিন দস্যি দস্যি আসবাবপত্রগুলো বিদেয় করিনি একে একে? দেওয়ালের গায়ে গায়ে আঁটা সেই দু-পাশে দুই নির্লজ্জ পরি লাগানো ব্র্যাকেটগুলো সেই আধখানা ঘরজোড়া কালচে মেহগিনির দেরাজ আরশি, সেই মেজেয় দাঁড় করানো 'বীরভদ্র' ঘড়ি, সেই হাতখানেক চওড়া চওড়া 'আর্ম' দেওয়া পাঁচ হাত লম্বা বেত ছাওয়া আরামকেদারা, সেসব বুকে করে রেখে দিলে কি ঘরের এই হালকা ভাবটি আসত? ওসব জিনিস দামি বুঝলাম, কিন্তু অমন দম আটকানো দামি জিনিস আমার দু-চক্ষের বিষ! হ্যাঁ, দামে ভারী সোনা-রুপোগুলো থাকত তো বুঝতাম। তার বেলায় তো অষ্টরম্ভা! অত যে রুপোর বাসন, ভারী পাথরকুচি, বউবেলায় দেখেছি তো, তার চিহ্নমাত্র নেই। সোনা তো দূরের কথা অলক্ষ্মী উড়নচণ্ডে সব! নইলে কুবেরের ভাণ্ডার ফতুর করে? স্বামী আর অমন হবেন না কেন, সেই বংশেরই ছাঁট তো! আলসে কুঁড়ে অকর্মণ্য অপদার্থ! ঘুম থেকেই ওঠেন বেলা দশটায়।

উঃ কত কষ্টে কত চেষ্টায় আমার ছেলেদের আমি সেই প্রভাবমুক্ত করতে পেরেছি। ওরা নতুন আলো হাওয়ায় মানুষ। এই তো আমার চিরদিনের শিক্ষামতো ভোর বেলা উঠে চকচকে চুল, ঝকঝকে মুখ, আর ধবধবে পোশাক পরে এসে চায়ের টেবিলে বসবে, আস্তে কথা বলবে, আস্তে হাসবে, ধীরে ধীরে খাবে। পানটি মশলাটি পর্যন্ত ছোঁয় না। একবারে আমার সাধ-সাধনা রুচি-কল্পনার নিখুঁত প্রতীক। তবে? তবে আবার ভয় কীসের?

কী জানি! তবু কেন ভয় করে।

ওদের ওই মাপাজোপা কথার মধ্যে যেন আজকাল সহসা ক্ষুরের ধারের ঝিলিক উঁকি মারে, অকারণে চোখের দৃষ্টিটা যেন ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় তীব্র হয়ে ওঠে, আর ঠোঁটের কোণটা সবসময়ই কোনাচে হয়ে বেঁকে থাকে ব্যঙ্গের মতো! ওদের দিকে আজকাল তাই আর তাকাতে পারিনে আমি। মনে হয়, ওদের আর এখানে আঁটছে না, কুলোচ্ছে না। ওদেরই তপ্ত নিশ্বাস আর না-বলা কথার উত্তাপে সমস্ত সংসারটা গুমোট হয়ে উঠেছে, ভারী হয়ে উঠেছে। শুধু রাতটাই যা একটু দয়ালু, একটু স্নেহময়ী। তাই রাত্তিরে উঠে পায়চারি করে বেড়াই আমি, জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি ওদের।

দেখি আর অবাক হয়ে যাই, কেন কুলোচ্ছে না, কেন আর এখানে আঁটছে না! কোথায় চাপ পড়েছে?

যে আমি বুদ্ধির জোরে একখানা ভাঙা ডিঙি নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে এলাম, সেই আমিই এখন আর নিজের বুদ্ধিতে আস্থা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ছেলে-মেয়েদের আমি নতুন যুগের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওদের যুগকে দেখে আমার ভয় করছে, এ নতুন যুগকে আমি চিনি না। কৃতজ্ঞতার বদলে যদি ঘৃণা পাই, তবে চিনব কেমন করে?

তবু তো ছেলেরা একরকম সহজ। ওরা ওদের বাপকেও ঘৃণা করে। যা স্বাভাবিক, যা নিশ্চিত উচিত। কিন্তু আমার ওই মেয়েরা?

বিরজা নীরজা আর সরোজা?

ওরা ওদের ওই হতভাগা বাপটাকেই ভালোবাসে! আশ্চর্য! যে-লোকটা বাপ হয়েও এক দিনের

জন্য বাপের কর্তব্য করল না, খাওয়াল না পরাল না, এই এত এতখানি বয়েস পর্যন্ত মেয়েদের বিয়ে দিল না, চেষ্টাটি পর্যন্ত করল না, তার ওপর তোদের ভালোবাসা আসে? ভক্তি আসে? আর যে মা—না না, ভাবতে গেলেই বুকটা ফেটে দু-খানা হয়ে যেতে চায়, চোখ ফেটে জল আসে।

স্পষ্টই তো বুঝি আমাকে ওরা ভালোবাসে না, ভক্তি করে না, শ্রদ্ধা করে না, ষোলো আনা টান ওই অমানুষটার ওপর!

হায় ভগবান! কেন এমন হয়?

আমি তো ভয় ভক্তি কিছুই চাই না, চাই তোদের একটু ভালোবাসা, একটু দরদ, একটু সহানুভূতি, ছোটোবেলায় যার আস্বাদ দিয়েছিলি।

কী জানি কেমন করে কখন কবে হঠাৎ পালাটা বদলে গেল। বাবাকে ভয় করত, ঘেন্না করত, তাকে ভালোবাসতে সুরু করল, আর যার বুকের মধ্যে মিশে থাকত, তাকেই বিষনজরে দেখতে শুরু করল।

আচ্ছা, এ কি ওদের ফ্রক ছাড়া আর শাড়ি ধরার পর থেকে! এই তো এঘরে কিছুদিন আগেও তো ওই বড়ো ঢালা বিছানাটায় তিনটি বোন সুয়ে থাকত ফ্রকের নীচের দিকে তিন জোড়া লম্বা পা ছড়িয়ে। তখন কত সহজ লাগত ওদের, কত নিকট। আর এখন? এখন ওদের মেজাজের কাছে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় আমাকে, ওদের মন রাখার সাধনায় প্রাণপাত করতে হচ্ছে, তবু ওদের চোখ দিয়ে যেন বিষ ঝরে, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিযোগ ঝরে। হ্যাঁ, ওদের চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত যেন একটা নীরব অভিযোগ দিয়ে গড়া, এইটাই আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়, অসহ্য লাগে! এর চাইতে তোরা মুখ ফুটে কৈফিয়ত চা, বিদ্রোহ কর। চিৎকার কর। তাহলে আমি চিৎকার করে বলতে পারি, ওরে পোড়ারমুখীরা তোদের যে বিয়ে হয়নি সে কি আমার দোষ? তোদের বাপ যে জীবনে কখনো বাপের কর্তব্য করল না সে কি আমার দোষ? তোদের ভাইদের খোসামোদ করে পাত্র খুঁজতে বললে যদি, খেয়ে-দেয়ে তো কাজ নেই বলে মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়, সে কি আমার দোষ? যে-মন্টুকাকা চিরদিন তোদের ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করল, আমার কথায় উঠল-বসল, সেও যখন হাই তুলে তুড়ি মেরে বলে, 'খেপেছ? পাত্রপক্ষের পায়ে ধরা? দেবরায় বংশের কোনো বান্দা কখনো ও-কাজ করেনি—' তখন আর আমি কী করব বল তোরা? তবু তোদের সঙ্গে যেন যোজনের ব্যবধান। সেই ঘর সেই বিছানা সেই ওরা, ঘুমোচ্ছে বরং আগের চাইতে অনেক গুটিয়ে-সুটিয়ে শাড়ির নীচে পা ঢেকে, কিন্তু যেন কত বড়ো, কী ভয়ানক বড়ো!

নিজে বেরোব? পথে পথে পাত্তর খুঁজে বেড়াব? চেনাশোনা আত্মীয়স্বজন কুটমসাক্ষেৎ অনুরোধ করতে কি কাউকে বাকি রেখেছি? কে কবে গ্রাহ্য করেছে? একটি থেকে এখন তিনটিই যুগ্যি হয়ে উঠলি, যুগ্যি কী বরং বিয়ের বয়েস ছাড়াতে চললি, আমি কী করব? আমি তা কী করব? তোরা যে পৃথিবীতে এসেছিস সেও কি একা আমারই অপরাধ? তবে? তবে কেন তোরা প্রতিনিয়ত আমাকেই অপরাধিনী করে রেখে দিবি?

অথচ তোদের এই ভরা বয়েসের শূন্য মনের হাহাকার আমি যেমন বুঝি, তেমন আর কে বোঝে?

কেউ না। সবাই ভাবে সাজছেগুজছে, খাচ্ছে, মাখছে, সিনেমা দেখছে, নাটক নভেল পড়ছে, দিব্যিই তো আছে। তোদের মন ভালো রাখতে অহরহ এই সাজগোজ খাওয়া-মাখা সিনেমা-থিয়েটার নাটক-নভেলের জোগান দিয়ে চলেছে কে, সেকথা কি কোনোদিন তলিয়ে ভেবে দেখেছিস? কী করে যে তোদের তিন-তিনটি বোনকে অবিরত এইসব যোগান দিয়ে চলেছি, সে আমিই জানি আর

অন্তর্যামীই জানেন। তবু যুগিয়ে যাই, যদি তোদের মুখে একটু হাসি ফোটে, যদি চোখের বিষ একবার নরম হয়ে আসে।

কিন্তু কই ? ও সব নিয়ে নিজেরাই তোরা আলোচনা করিস, তর্ক করিস, হি-হি করিস, আমি একবার গিয়ে বসলেই ব্যাস—মুখের গড়ন পাথুরে হয়ে যায়। যেন আমার উপস্থিতিটাই তোদের স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায়। শাড়ি ধরে অবধিই তোদের এই হল!

হে ভগবান! ছেলে-মেয়ে কেন এমন বড়ো হয়ে যায়? কেন মা যতদিন বেঁচে থাকে, বিশেষ একটা বয়সে আটকে থাকে না তারা? বড়ো হয়ে যাওয়ার আগের বয়সটায়?

আচ্ছা, সব মায়ের সন্তানরাই কি এমনই বড়ো হয়ে যায়? না এ শুধু আমারই ভাঙা কপালের জের?

নীরজাটা আগে এমন ছিল না, ওর প্রাণে মমতা ছিল, ওর চোখে দরদ ছিল, দক্ষবুড়ি ওকে এইরকম করে তুলেছে, কে জানে তলে তলে সব্বাইকেই বিষিয়েছে কি না দক্ষ! ওর চোখেও যে অহরহ বিষ আর আগুন ঝরত। কিন্তু কেন? আমি দক্ষর কী ক্ষতি করেছি?

দাদাশ্বশুরের আমলের ঝি, ছাড়বার উপায় ছিল না, যতদিনে-না ভগবান ছাড়ালেন। কিন্তু তাতেই বা কী হল? ভগবান তো নিলেন তাকে, এই তো পৌষ এলে দু-বছর হবে মরেছে দক্ষ, আমার কতটুকু সুখ হয়েছে? অথচ আগে সর্বদা ভাবতাম, বুড়ি মরলেই আমার সব দিক শান্তি হয়।

কিছু না কিছু না। দক্ষ তার চোখের বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে আমার তিন মেয়ের তিন জোড়া চোখে।

অথচ ওই ওরাই বলত, 'বাব্বা, দক্ষ যে কী করে তাকায়! ঠিক যেন একটা ডাইনি বুড়ি!'

সত্যিই দক্ষবুড়ির চাউনিটা ছিল ডাইনির মতন। তার কোটরগত চোখের মধ্যে থেকে মণি দুটো যেন আধজ্বলন্ত পোড়া কয়লার মতো ধকধক করে জ্বলত। কী তীব্র কী ধারাল, বুঝি বুকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে ফেলছে। এখনও সাঁঝসন্ধেয় কি ভরদুপুরে আমি একলা একলা ওই সিঁড়ির ঘরটার কাছে যেতে পারিনে। হঠাৎ ওদিকে তাকিয়ে ফেললে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। মনে হয় ওই আঁধার ঘরটার মধ্যে সেই আগুনের ডেলা দুটো এখনও ধকধকিয়ে জ্বলছে। কম দিন তো ওই ঘরে বাস করেনি সে!

আমার ওপর যে দক্ষর এত আক্রোশ ছিল কেন, তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। সেই বউ বলা থেকেই ওর আক্রোশ ধরতে পারতাম। অপরাধের মধ্যে আমি এবাড়ির 'পুত-বউ' নই, ভাগনেবউ। কিন্তু গোড়ায় তো আমি উড়ে এসে জুড়ে বসিনি? দাদাশ্বশুর আদর করে রাঙামুলো নাতিটির বিয়ে দিয়েছিলেন সাতরাজ্য খুঁজে। গরিবের মেয়ে আমি, রুপো আনতে পারিনি, কিন্তু রূপ এনেছিলাম।

এখন ভাবি ওই রূপই আমার কাল। যদি আমি আমার মেজদি বড়দির মতো কালো কালো হতাম আর ওদেরই মতো যেমন-তেমন ঘরে বিয়ে হত, আমার জীবনের ইতিহাস কি এইরকম হত? তা হবার নয়, তাই রূপের ডালি নিয়ে জন্মেছিলাম আর সেই রূপের পাসপোর্টে এবাড়িতে ঢুকেছিলাম। তখন কি ছাই জানি এবাড়িতে আমার ঠাঁই কোথায়? আদর আছে অধিকার নেই, ভোগ আছে দাবি নেই, এ এক অদ্ভুত অবস্থা। কিন্তু এ ছাড়া আর কীই-বা হবে? আমার শ্বশুর ছিলেন ঘরজামাই, স্বামী হচ্ছেন বেকার অপদার্থ নেশাখোর বড়োলোকের ঘাড়ে পড়া ভাগনে।

কিন্তু তখন তো বুঝিনি। যখন দুধে আলতার পাথরে পা ফেলে এসে দাঁড়ালাম, আর দোহাত্তা সবাই বলতে লাগল 'আহা কী মানান মানিয়েছে, যেন হরগৌরী! যেন সত্যিই শচী আর শচীপতি! (নামটা কাজে লেগেছিল), তখন সৌভাগ্যের গর্বে বুক উথলে উঠেছিল, আনন্দে দিশেহারা হয়েছিলাম! বড়দি মেজদিকে কী অকিঞ্চিৎকরই মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমার নামটা কী সার্থক!

তারপর।

বেশিদিন লাগল না ভাগ্যের ব্যঙ্গ ধরা পড়তে। শিবের সঙ্গে যদি স্বামীটির আমার কোথাও মিল

থাকে তো সে হচ্ছে নেশা আর নন্দীভৃঙ্গিতে। শচীপতি নামটা যদি সার্তক তো সে উর্বশী মেনকাদের দিকে চটুল কটাক্ষপাতে। বাড়িতে তখনও বিস্তর লোক। সবাইকে চিনতেই পারতাম না। কে তারা, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক হিসেব মিলাতে পারতাম না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই একটা হিসেব স্পষ্ট হয়ে উঠল বেশ কয়েক জন তরুণীর সঙ্গে আমার স্বামীর বেশ একটু রসের সম্পর্ক আছে। হয়তো সে-সম্পর্ক চূড়ান্ত দোষের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ তারাও কেউ বোকা নয়। কিন্তু ফষ্টিনষ্টি হাসি-তামাশা পান কাড়াকাড়ি কি তাস-পাশা খেলার মাধ্যমে সে-রস ক্ষণে ক্ষণে উছলে উঠত।

প্রথম প্রথম এসব চোখে পড়লে তো আমি বজ্রাহতের মতোই আড়ষ্ট হয়ে যেতাম, তারপর ঘৃণা হত রাগ হত। কিন্তু সেই-বা ক-দিন? বাড়ির অন্য আত্মীয়দের কাছ থেকে অহরহই শুনতে হয়েছে, আমার ভাগ্যটা নাকি সোনা দিয়ে বাঁধানো। এবাড়িতে এমন ঘরপোষা ব্যাটাছেলে এই প্রথম। যে-স্বামী বছরের তিন-শো পঁয়ষট্টিটি রাত ঘরে কাটায়, সে-স্বামীর স্ত্রীর উচিত নিত্য তাঁর পদোদক খাওয়া!

তা পদোদক না খেলেও বড়োলোকের বাড়ির এ মনোবৃত্তি ক্রমশ মেনেই নিলাম। আরও মেনে নিলাম মামাতো বড়োজা আর ছোটো মামিশাশুড়িদের ভাগ্যের বহর দেখে। তাঁদের এমনই ভাগ্য যে, আমার ভাগ্যকেও হিংসে করতে হয় তাঁদের। অথচ তখন সেই বড়োমানুষদের বড়োমানুষির ছিলই-বা কী? তালপুকুরে ঘটি আর ডোবে না। দেখছি অহরহ তলায় তলায় অভাবের কাদা ঘুলিয়ে উঠছে, বড়োমানুষদের ভিতরের যত ছোটোমি ছলে ছুতোয় প্রকাশ হয়ে পড়ছে। 'খরচ খরচ' করে মামাতো ভাসুরের ভুরু কুঁচকেই থাকে। এদিকে মামিশাশুড়ির বিধবা বোন আমার এই অনধিকার অবস্থান নিয়ে অনবরত ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা শোনাচ্ছেন, অথচ আমার ভোলানাথ নির্বিকার। তখনও তিনি বাড়ির আদুরে নাতির পোস্টটা পুরোদস্তুর বজায় রাখতে চান। তাঁর ভালো খাওয়া চাই, ভালো পরা চাই, ভালো বিছানা চাই ; সেরা মদ চাই, সেরা তামাক চাই। কোথা থেকে আসবে এসব তা তিনি মানতে রাজি নয়, না পেলেই হাঁকডাক তম্বি। বিরক্ত হয়ে সংসারের কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত যোগান দিতে বাধ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু তার ফলে আমাকে যা মন্তব্য শুনতে হয়েছে সে আমিই জানি আর অন্তর্যামীই জানেন। সেকথা যদি কোনোদিন স্বামীকে বলবার চেষ্টা করতে গিয়েছি, তিনি চিৎকার করে বাড়ি ফাটিয়েছেন, 'কে দেবে, কেন দেবে, এসব কথা আমি শুনতে চাই না, আমার চাই এই হচ্ছে শেষ কথা।'

শেষ কথার ওপর আর কোনো কথা চলে?

অবশ্য বউ-ছেলে সম্বন্ধে তাঁর কোনো চাহিদা ছিল না। তারা ছেঁড়া ন্যাকরা পরে বেড়াক অথবা খেতে না পাক তাতে কিছুই এসে যায় না তাঁর। কিন্তু একটা মানুষের যথেচ্ছ বিলাসিতার যোগানই-বা আসে কোথা থেকে? তার ওপর আবার সেই মানুষটার যার এক কানাকড়াও দাবি নেই সংসারে।

তবু যতদিন দাদাশ্বশুর বেঁচেছিলেন সংসারের ঠাটটা মোটামুটি বজায় ছিল। মামারা বাপের আড়ালে ভাগনে সম্পর্কে কড়া কড়া মন্তব্য করলেও, মামাতো ভাইরা ভুরু কুঁচকে ভিন্ন না তাকালেও এবং অন্দরে মামিরা ভাগনেবউয়ের ফি-বছর একটি সদস্য আমদানি করা নিয়ে অহরহ তিক্ত ব্যঙ্গের হুল ফোটালেও, চলে যাচ্ছিল একরকম।

দুর্দিন এল দাদাশ্বশুরের মৃত্যুর পরেই।

দাদাশ্বশুরের নামটা মনে পড়লেই চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। শুনতে পাই যৌবনে নাকি অমিতাচারের শেষ ছিল না, কিন্তু আমি দেখেছি বার্ধক্যের নিরুপায় দিনে। মিতাচার না করলেই 'গেল গেল' অবস্থা হয় এমন শরীর। তবু কী আশ্চর্য সুপুরুষ ছিলেন তখনও। পাকা সোনার মতো রং, খড়্গের

মতো নাক, চওড়া কপাল, দীর্ঘদেহ। মাঝে মাঝে আমাকে কাছে ডাকতেন, বলতেন, 'আয় নাতবউ দুটো সুখ-দুঃখের কথা কই।'

যদি পাকাচুল তুলতে যেতাম, হাঁ-হাঁ করে উঠে বলতেন, 'দোহাই ভাই ও-কাজটি করতে চাসনি। ও যেন ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া ওরে শালা তুই বুড়ো হয়ে গেছিস। তোদের মতো সুন্দরী যুবতী মেয়ে দেখলে এখনও বুকটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে, রক্ত চাঙ্গা হয়ে উঠতে চায়, বয়েস ভুলে যাই। বুঝলি? আর তুই কিনা মনে করিয়ে দিতে চাস—'

হয়তো হেসে ফেলতাম, বলতাম, সর্বনাশ! বলেন কী দাদু, এখনও আপনার সুন্দরী দেখলে—তাহলে তো আপনার কাছে নির্জনে একা আসতে ভয় করা উচিত!

—উচিতই তো! একটু যেন হতাশভাবে বলতেন, 'কিন্তু তোরা তো উচিত কাজ করিস না, নির্ভয়ে আসিস। তাই আর বেশিদিন বাঁচতে বাসনা হয় না। মনে হয়, সবাই মিলে তোরা আমাকে অপমান করছিস।'

সাতাত্তর-আটাত্তর বছরের বৃদ্ধের এই অদ্ভুত ধরনের অপমানবোধ দেখে ভারি কৌতুকবোধ হত। কিন্তু তাঁর যৌবনকালের গল্প শোনার বায়না ধরতাম। প্রতমটায় হয়তো বলতেন, 'দূর কী হবে ওসব গল্পে, বিষ নেই আবার চক্করের গল্প! দূর দূর! আবার হঠাৎ হয়তো কথাপ্রসঙ্গে সেই পুরোনো দিনের মধ্যেই হারিয়ে যেতেন, শুরু করে দিতেন কবে কোন বাইজির পিছনে কীভাবে হাজার হাজার টাকা খরচা করেছেন, কবে কোন জলসায় ভারতবর্ষের সমস্ত সেরা ওস্তাদ আর বাইজিদের জড়ো করবার জন্যে মরণপণ করেছেন। কবে কোন খেয়ালি প্রণয়িনীকে আমোদ দেবার জন্যে কেস ভরতি মদের বোতল আছড়ে ভেঙেছেন, হাতে করে হাজার টাকার কারেন্সি নোট মোমবাতিতে ধরে জ্বালিয়েছেন, এইসব বদখেয়ালের কাহিনি। বলতে বলতে যেন তাজা হয়ে উঠতেন, মাপে বড়ো হয়ে যেতেন, ছানিপড়া ছোখের কোণে কোণে আগুনের শিখার ইশারা দেখা দিত।

কোনো কাহিনিই ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে শোনবার যোগ্য নয়, একজন চরিত্রহীন মাতালের বেপরোয়া খেয়ালের ইতিহাসমাত্র। কিন্তু তবু সত্যি বলব—দাদুকে আমি ভালোবাসতাম, বোধ হয় ভক্তিও করতাম। মনে হত এটা চরিত্রহীনতা নয়, যেন চরিত্রের একটা উদ্দাম প্রাচুর্য। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, যা করেছেন নিজের টাকাতেই করেছেন। কেউ যদি নিজের জিনিস খুশিমতো নষ্ট করে তবে বলবার কী আছে? ভবিষ্যৎ বংশধরেরা গোল্লায় যাবে কি চুলোর দোরে যাবে সেকথা যদি সে না ভাবে? সে যদি গরিব হত, কী রেখে যেতে পারত ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্যে? রেখে যেত হয়তো-বা কিছু কর্জ দেনা। তবে? আমার বুদ্ধিতে এই বুঝি, যেকোনো উপায়েই হোক কেউ যদি বড়োলোক হতে পারে, বড়োমানুষি করবার অধিকার তার অবশ্যই আছে। কেন করবে না? কিন্তু আমার স্বামী? পরের পয়সায় এই বড়ো মানুষিকে আমি প্রাণভরে ঘেন্না করতাম।

আমার দাদাশ্বশুরের মধ্যে যে-আভিজাত্য ছিল তাতে তাঁকে যেন এ সমস্ত মানিয়ে যেত। আমার স্বামীর বড়োমানুষি ছিল, আভিজাত্য ছিল না! থাকবেই-বা কোথা থেকে? ঘরজামাইয়ের ছেলে, এই তো তাঁর বংশমর্যাদা!

মন্টুঠাকুরপো এখনও সময়ে-অসময়ে কেশর ফুলিয়ে বলে, 'দেবরায় বংশে ও-কাজ কেউ কখনো করেনি।' জল শুকিয়েছে, শুধু বালির চড়া—তবু নদীর নামের ঠাট। কিন্তু আমার ছেলেরা কি কখনো বড়োগলায় বলতে পারবে ওরকম কথা? দেখাতে পারবে কোনো ঠাট?

ওগো তাই তো আমি আজীবন প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি, যাতে ওরা নিজেদের গৌরবে বড়ো হয়ে উঠতে পারে। যাতে ওরা দশের একজন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ওরা কি আমার সেই কৃচ্ছ্রসাধন

বুঝতে চেষ্টা করেছে? ওরা পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করেছে আর ভেবেছে এ বুঝি তাদের নিজেদেরই কৃতিত্ব। একদিন তো দেবু মুখের ওপর বলেই বসল একথা! কী যেন কথা হচ্ছিল, কথার পিঠে কথা, ও চড়াগলায় বলে উঠল, 'তুমি এমন ভাব দেখাও যেন, আমাদের পাসটাস করা গুলোও তোমরা ক্রেডিট। কী এত হাতি-ঘোড়া করা হয়েছে আমাদের জন্যে? একটা মাস্টারও তো থাকেনি কোনোদিন! সবসময় শোনাতে আসো তোদের এত কষ্ট করে মানুষ করলাম! পৃথিবীতে যখন এনেছ, তখন এটুকু করতে তো বাধ্য। মানুষ করা মানেই-বা কী? আমরা যদি মানুষ না হয়ে গাধা-ছাগল হতাম, সাধ্য ছিল তোমার আমাদের মানুষ করবার?'

হাঁ-করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম বলেই ওর কথার উত্তরটা মুখে আসেনি, বলতে পারিনি, আমারই ভুল হয়েছে, মানুষ করেছি এই মিথ্যে ক্রেডিটাই নিতে চেয়েছি এতদিন। কিন্তু ওই যে বললাম হাঁ-করে তাকিয়েছিলাম, কথা জোগায়নি। আর দেবু ওর টকটকে মুখ আরও টকটকে করে আরও ক কী বলে চলেছিল। বোধ হয় ওর মামাতো জ্যাঠার ছেলেদের পাঁচ বার ম্যাট্রিক ফেল হওয়ার উদাহ দিচ্ছিল।

পৃথিবীতে আনলে ওইটুকু করতে বাধ্য! কিন্তু না করলেই-বা করতিস কী তাই শুনি?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ওরা ওদের মাকে আর বাপকে এক কোঠাতেই ফেলে রেখেছে। অথচ ছেলেবেলায় তো ওরা এমন ছিল না! সেই যখন দাদাশ্বশুর মারা গেছেন, সংসারের আবহাওয়া আকাশ-পাতাল বদলে গেছে, বাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে আর কাকায়-ভাইপোয় পার্টিশান স্যুটের মামলা শুরু হয়ে গেছে, চিরদিনের অহংকারী বনেদিবাড়িতে রাত দিন কাক উঠছে চিল পড়ছে, আর কেমন করে যেন আমার পোস্টটা দাঁড়িয়ে গেছে সংসারের ঝি রাঁধুতনর, তখন তো ওরা আমার প্রাণের সঙ্গে মিশে থাকত, আমার দুঃখে দুঃখী হত, আমার কষ্টে চোখের জল ফেলত।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস দক্ষবুড়িই যত নষ্টের গোড়া। ওই সর্বনাশীই আমার ছেলে-মেয়েদের তুক করেছে। আজন্মকাল এ সংসারের বুকে পাথর হয়ে টিকেও তো রইল!

কালবৈশাখীর ঝড়ে কত গাছ ভাঙল, কত পাখির বাসা গেল, এতবড়ো বিরাট গুষ্টির কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার হিসেব থাকল না কিন্তু দক্ষ আর বৈকুণ্ঠ খুঁটি আগলে পড়ে থাকল। চারু তো তার পরে, অনেক পরে। ও তো আমার আমলের।

না, সে-দিনগুলো স্পষ্ট করে যেন মনে পড়ে না। পড়বে কী করে? প্রচণ্ড ঝড়ের সময়, ভয়ংকর ভূমিকম্পের সময়, প্রবলবেগ বন্যার সময়, ঠিক কী কী অবস্থা ঘটেছিল, কোনটার পর কোনটা ধ্বংস হয়েছিল, একথা কি কারও স্পষ্ট মনে থাকে?

ঝপাঝপ দৃশ্যের পরিবর্তন হচ্ছিল। প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো আশ্রিত-আশ্রিতা চোখের জল ফেলে বিদায় নিচ্ছিল, বাড়িতে চারিদিকে মিস্ত্রি লেগে তছনছ করে বাড়ি ভাগ করছিল আর আমি অবোধ দর্শকের ভানে সেইসব দেখে চলেছিলাম। আমারও যে এ সংসারে আশ্রিতের পদ একথা আমি যেন জানি না, বুঝি না! ঠারেঠোরে ইশারায় ইঙ্গিতে বলতে কি কেউ ছেড়েছে? বদ্যিবাটির মাসশাশুড়ি তো যাবার সময় স্পষ্টই বলে গেলেন 'এবার তোমারও এ ভিটেয় বাস উঠল বউমা! আমি আজ এই বেয়াল্লিশ বছরের শেকড় ছিঁড়ে বেরোলাম! তবে আমার হচ্ছে একটা পেট যাহোক করে চলে যাবেই, তোমার বলতে নেই সাতটা পেট সাতটা মুখ, শ্যাল কুকুরের দশা হবে আর কী!'

মনে হচ্ছিল খুব সহানুভূতির সঙ্গেই কথাটা বলছেন, গলার সুরে দরদ ভরা, কিন্তু চোখ দুটো যেন তাঁর আহ্লাদের ঝিলিকে জ্বলছিল। কী জানি সত্যি না আমার মনের ভ্রম।

আশ্রিতের পালা চুকলো তারপর বিদায় নিতে শুরু করলেন খোদ মালিকেরা। এই খণ্ডবিখণ্ড

ভাগের বাড়িতে আর থাকতে রাজি নয় কেউ। কথায় বলে মরা হাতি! এখনও যা আছে, নগদে গহনায় জরিজড়োয়ায়, তাতে অন্যত্র গিয়ে ভদ্রভাবে থাকা চলে। অতএব নিজের নিজের বাড়ির ভাগে ভাড়া বসিয়ে ভদ্রভাবে থাকবার জন্যে বিদায় নিলেন তাঁরা। সমস্ত বৈঠকখানা বাড়িটায় দোকানভাড়া দেওয়া হল। শুধু মন্টুঠাকুরপো কোথাও গেল না। তার বউ তখন যক্ষ্মায় ভুগছে।

তারপর তো বউ মরল, আস্তে আস্তে সমস্ত নীচেরতলাটাতেই ভাড়াটে বসল। ভেতরবাড়ি, খাবার দালান, ভাঁড়ার ঘর, চাকরবাকরদের ঘর সমস্ত। কোনোটা গুদাম হয়েছে, কোনোটায় দোকান-কর্মচারীরা বাস করে, আর কোনো কোনোটায় বাইরের দেয়ালে নতুন করে দরজা ফুটিয়ে দোকানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। শেষ অবধি টিকে ছিল ঠাকুরবাড়ি, দালান, নাটমন্দির, ভোগঘর।

ওটার জন্যে কিছুদিন চলেছিল দ্বিধার ভান, তা ভান আর কতদিন চালানো যায়? এখন ওখানে মাছ তরকারির বাজার বসেছে। বসেছে ভালোই হয়েছে, বসেছে বলেই তো রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া চলেছে।

মন্টু ঠাকুরপো বলেছিল, 'বাজার জমা দেওয়া হয়েছে সুখবউদি, ও-বাজারের তোলা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য নয়।'

আমি কি শুনি সেকথা?

মুখ টিপে হেসে বলেছি, ন্যায্য প্রাপ্যের হিসেব আমার কাছে নেই, তোমাদের বাড়িতে এসে একটি কথাই শিখেছি আমার চাই, শিখেছি এইটাই পৃথিবীর শেষ কথা! নিজে গিয়ে দাঁড়াব দেখি তোলা দেয় কি না।'

অহংকারটা মিথ্যে হয়নি আমার! যে যতই মুখ ব্যাজার করুক, না দিয়ে পারে না কেউ। সক্কাল বেলাই নেমে যাই নীচে, একবারে ঠাকুরদালানে গিয়ে পৌঁছোবার যে চোরা সিঁড়িটা ছিল দোতলার বাসনের ঘর থেকে, সেই ঘরটা সিঁড়িটা মন্টুঠাকুরপোর ভাগে পড়েছিল বলেই আরও এত সুবিধে আমার। টুক করে নেমে যাই, ভিতর থেকে বন্ধ দরজাটা খুলে একেবারে বাজারের চাতালে গিয়ে পড়ি। সঙ্গে অবিশ্যি চারু থাকে মস্ত বড়ো ঝুড়িটা কাঁখালে নিয়ে।

দেখে আর বোঝবার উপায় নেই এখানে ঠাকুরদালান ছিল, নাটমন্দির ছিল, মনে হয় বাজারের প্রয়োজনেই বুঝি দালান গেঁথেছে, খিলেন গেঁতেছে. পুজোর দালানে ওঠার সিঁড়িটাতেই তো কত বাজার। শাকওয়ালি পানওয়ালি দিব্যি গুছিয়ে বসে জিনিসের ভাগা দিয়ে গিয়ে। আমি ওদের সকলের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছি। সক্কলের সুখ-দুঃখের খবর নিই। না-নিলে চলবে কেন? ব্যাজার মুখ যে আরও ব্যাজার করে তুলবে না-হলে!

আমি সকাল বেলা সদ্য স্নান করে ভিজে চুল ছড়িয়ে সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর আর কপালে বড়ো করে সিঁদুরটিপ দিয়ে পুজোর লাল কস্তপাড় গরদখানি পরে আর দুধে-গরদের চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে মূর্তিমতী দেবীর মতো গিয়ে দাঁড়াই, সাধ্য কী যে ওরা বলতে পারে, তোলা তোমাকে দেব না, এ বাজারের তোলা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য নয়।

ওদের অসুবিধে হয় বই কী! বাজার যে জমা নিয়েছে তার লোকও আসে তো। কিন্তু আমি যেন জানি না সেকথা। অমি সহজ সপ্রতিভ। চারু বিড়বিড় করে বকে, কিন্তু আমি তাতে কান করব কেন? আমি হেসে ওদের ঝুড়ি আর বস্তার সেরা জিনিসটি তুলে নিই, স্নেহে-গলা স্বরে বলি, বাঃ! কী চমৎকার বেগুন এনেছিস রে আজ গোবর্ধন, এগজিবিশনে দেবার মতন! না বাপু না, দুটো দিয়ে ফেলিসনি, একটা দে। আহা তুই গরিব মানুষ! বলি, কী গো নন্দর মা, আজ তোমার পটলে যে আলো ঝলসাচ্ছে, গোটা আষ্টেক দাও বাপু, ছেলেদের পাতে একটা একটা করে আস্ত ভাজা না দিলে বাঁচব না।

ওরাও বিড়বিড় করে বই কী, খুব করে ; তবু তুলে দেয়ও চারুর কাঁখের ঝুড়িতে। অবিশ্যি একটু ঠেক খেতে হয় মাছের কাছে। মাছওয়ালাগুলো যেন ঔদ্ধত্যের অবতার। যেই গিয়ে দাঁড়াব, অমনি ফিসিফিসিয়ে বলবে, ওই এলেন! ভ্যালা জ্বালা করেছে।

কিন্তু আমি ওসব কথা শুনতে পাব কেন? শুনতে পাই না।

ঠিক হাসিমুখটি নিয়ে দাঁড়াই, বলি, কই গো বাবারা একটু চটপট করো দিকি, ছিষ্টি সংসারের কাজ পড়ে।

ওরা গোমড়ামুখে হাত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাছটুকু দেয় আর বলে, 'তা আপনি আর কষ্ট করে আসেন কেন মা ঠাকরুন, ঝি-চাকর পাঠিয়ে দিলেই পারেন.'

হেসে বলি, তা অবিশ্যি পারি, কিন্তু রাত পোহাতেই তোদের সব এক বার না দেখে থাকতে পারিনে যে রে!

ওরা অবিশ্যি আমার এ ভালোবাসার মূল্য দিচ্ছে এমন ভাব দেখায় না, না দিক, মাছটা তো দেয়। আর কথা এই, কারও কাছ থেকেই তো বেশি নিই না আমি, আমার হচ্ছে রাই কুড়িয়ে বেল। গোড়ায় গোড়ায় এরা কিন্তু আমাকে যথেষ্ট সমীহ করত, আমি যখন চোখের জল ফেলে এই ঠাকুরদালানের সুদিনের গল্প করেছি, ঐশ্বর্য আর সমারোহের গল্প করেছি, এরাও সব কাতর হয়ে চোখ মুছেছে, মুখ শুকিয়ে 'হায় হায়' করেছে, কিন্তু এখন অন্য ভাব। সময়ে সবেতেই ভাঁটা পড়ে। আর করবেই-বা কী, যা দিনকাল পড়েছে, এক গণ্ডা কাঁচা লংকা এক পয়সা। তিন আনা এক জোড়া পাতিলেবু। মাছ তরকারি আলু কপির কথা নাই বললাম। বুঝি না কি? বুঝি সব, কিন্তু বুঝেও অবোধের ভান করতে করতেই তো এই জীবনটা কাটল। একান্নবর্তী সংসারে থাকতে কতজনের কত শ্লেষ ব্যঙ্গ বিরক্তি রাগ হজম করেছি ওই ভানের জোরে। মার খেয়ে আমি যদি না কাঁদলাম, তাহলে আমায় কে হারায়? যে মারল তারই হার। এখনও তো তাই চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আর বুঝি পারছি না। মনে হচ্ছে, হঠাৎ একদিন দম ফুরিয়ে যাবে।

বাজারে তোলা আদায়ের কথা তুলে ছেলেরা বলে, 'লজ্জা বলে কি কিছুই তোমার শরীরে নেই মা? আমাদের যে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, ওদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে আমাদের!' মেয়েরা বলে, 'ভদ্রঘরে এ কীর্তি বোধ হয় তুমিই প্রথম দেখালে মা! ঝুড়ি নিয়ে বাজারের তোলা আদায় করাটা নিশ্চয় একেবারে তোমার মৌলিক অবদান।'

উচিত উত্তর আমার ঠোঁটের আগায় আসে, কিন্তু বলতে পারি না। পারি না আর কেন, পোড়া মায়ার জ্বালায়। তাই উলটো তর্ক করি, আমি ঝুড়ি নিয়ে যাই?

—ও একই কথা।

মায়া, হ্যাঁ মায়াই আমার সর্বনাশ করেছে, মায়ার আতঙ্ক। কটু কড়া একটা কিছু বলে বসলেই তো অমনি ওরা বলবে, ঠিক আছে কাল থেরে আর খাব না। ও তো তেজের কথা। কিন্তু বলি তেজই আছে তোদের, মর্যাদাবোধ আছে? থাকলে ওই মাছ তরকারি দিব্যি গলা দিয়ে নামাস কী করে? নিজে থেকে কি কোনোদিন জোর করেছিস, ও মাছ তরকারি আমরা খাব না? হাসিমুখে নুন-ভাত খেয়ে তুলব? হুঁ তার বেলায় ষোলো আনা বাবুয়ানা। শুধু লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার গল্প। আমার শরীরে লজ্জা নেই?

ভগবানই জানেন আছে কি নেই।

ওই ছোটোলোকগুলো যখন ভিক্ষে-মুষ্টির মতো সামান্য কিছু ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বলে, 'আর বেশিদিন চলবে না মা ঠাকরুন, এবার আপনাকে বুঝে বিবেচনা করে দেখতে হবে। দু-দুটো তোলা জোগানো কি সোজা? আপনারা বড়োলোক আপনাদের এ উঞ্ছবিত্তির শখ কেন? আমরা গরিব যে মারা যাই!' তখন কি মা বসুন্ধরাকে ডাকি না আমি? তখন কি ভগবানকে বলি না, হে ভগবান, হঠাৎ এমন একটা কিছু করে দাও যাতে কাল আর আমাকে এই গ্লানির বোঝা বইতে না হয়। কিন্তু শুনছে কে? ভগবানও কালা, বসুমতীও কালা।

সকাল হতেই তো যে-কে-সেই! কে ভাবছে কোথা থেকে কী হবে! মন্টুঠাকুরপোর কথা ধরি না, একে তো সে একরকম রুগ্ন, তা ছাড়া তার দায় কী? তবু সে যা করেছে এ সংসারের জন্যে, সাতজন্মেও কি তার ঋণ শোধ হবে? কিন্তু বাকি তোরা তিন জন? তোরা তিন বাপ-ব্যাটা! নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই নিজেদের উচ্চ চিন্তা করছিস, তুচ্ছ চিন্তার সময় কোথা? ভেবে দেখছিস কি, আমি যদি নীচে নামা বন্ধ করি, কে তোরা বাজারে যাবি, কে সে বাজারের টাকাটা জোগাবে?

খরচের টাকা কোথা থেকে আসছে কেউ ভাবে না।

আমি যে তলে তলে কী করছি সে কি তোরা কেউ জানিস? না, কেউ না। আমার সমস্ত দুর্বুদ্ধির সাক্ষী শুধু ওই বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠকেও হাতে রাখতে হয়েছে আমায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস দক্ষ সব ধরে ফেলেছিল! নইলে অতই-বা শাপশাপান্ত করত কেন? যাক বাবা, ভাগ্যিস বুড়ি মরেছে, নইলে? দৈবাৎ কোনোদিন যদি মন্টুঠাকুরপোর সাধ হয় বাপের আমলের লোহার সিন্দুকটা খুলে দেখি, দেখি পুরোনো ঐশ্বর্যের স্মৃতিচিহ্ন ভারী ভারী রুপোর বাসন, রুপোর পিকদানি, গড়গড়া আর মরা বউয়ের গায়ের গহনাগুলো। সিন্ধুক খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো তখন চমকে আর্তনাদ করে উঠব, নীল হয়ে যাব, ফিট হয়ে পড়ব। সেসময় দক্ষ থাকলে? ওরে বাবা! সে কি তাহলে রেয়াত করত আমায়।

আমি কি নিজেকে ঘেন্না করি না? কেঁচো কেন্নোর মতো। গুবরে পোকার মতো? নরকের কীটের মতো? কেউ জানিস না নিজেকে কী ঘেন্না করি আমি, তবু হার মানিনি এখনও। সর্বাঙ্গে কাদা মেখে এখনও আমার এই মোচার খোলার নৌকাখানা নিয়ে সমুদ্র ঠেলে চলেছি। কবে কূল দেখতে পাবো, কবে আমার ছেলেরা দশের একজন হয়ে দাঁড়াবে, নিজের ভিটে করবে, কবে আমার মেয়েদের সব উপযুক্ত ঘরে বিয়ে হবে, কবে মন্টুঠাকুরপো—

একী, ছি ছি! চিরদিনের উপকারী মানুষটার অমঙ্গল কামনা করছি আমি!

রাত হলেই এ কী পাগলামিতে পায় আমায়! কী লাভ পুরোনো স্মৃতির জাবর কাটায়? কী দরকার প্রতিদিনকার জীবনকে এমন ভেঙে ভেঙে চিরে বিশ্লেষণ করবার? যা চলেছে চলুক-না। দেখি-না এই অভিশপ্ত জীবনের শেষ কোথায়! ওই রাত শেষ হয়ে এল, এখুনি চারু উঠে কাজ শুরু করে দেবে। দু-দণ্ডের জন্যে বিছানায় শুয়ে সকাল বেলা সহজ মানুষের মতন ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে হবে তো?

স্বামীর ঘরের দরজা!

।। অনিলেশের কথা ।।

আমি এবার পালাব। নির্ঘাত পালাব। এবাড়ির হাওয়ায় আমি আর দম নিতে পারছিনে, ভেতর পর্যন্ত বুজে এসেছে, বিষিয়ে উঠেছে। যখন দিনগত অভ্যাসের জাল ছিঁড়ে সহসা নিজের দিকে তাকাই, যখন

মনে পড়ে এ সংসারের অন্নেই আমার দেহ গঠিত, এবাড়ির ছাদের তলাটাই এখনও পর্যন্ত আমার একমাত্র আশ্রয়, তখন নিজের শরীরটাকেই গুলি করে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

জানি, আমি একা নয়, দাদাও অতিষ্ঠ, দাদাও সর্বদা আগুনের মতো জ্বলছে। দাদাও আমার মতো সারারাত ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে, আর হাপরের মতো নিশ্বাস ফেলে। দাদাও অহরহ চিন্তা করছে পালাবার। কিন্তু দাদার মতলব অন্য, দাদার মতলব খারাপ। ও আমাকে কোনোদিন ওর মতলব মুখ ফুটে বলেনি বটে, তবু আমি বুঝতে পারি, দাদা মতলবে আছে কোন কৌশলে মন্টুকাকার লোহার সিন্ধুকের চাবিটা হাতিয়ে সিন্দুক ফর্সা করে দিয়ে কিছু রেস্ত নিয়ে পালাবে। ওর কথার 'টোনে' ভেতরের ঝাঁজ ধরা পড়ে, মতলবও ধরা পড়ে। এই তো সেদিন কী কথায় বলে বসল, 'এ সংসারের ভাত খেয়ে যারা মানুষ তাদের কোনো কিছুতেই পাপ হবার ভয় নেই বুঝলি? চুরি-ডাকাতি-জাল-জোচ্চুরি কিছুতে না। তোদের অবাক হতে বারণ করে দিচ্ছি অনিল, যদি কোনোদিন দেখিস আমি সিন্ধুক ভেঙে চুরি করে পালিয়েছি।'

কিন্তু চুরি করাও অত সোজা নয়।

মন্টুকাকার সিন্ধুকের চাবি কি মন্টুকাকার কাছে আছে না কি? সে-চাবি আমাদের মা-জননী অনেক দিন আগেই হাতিয়েছেন। সব কিছু ওঁর আয়ত্তে। ওই যে...রাত্তিরের অন্ধকারে আলতো আলতো পা ফেলে সারাবাড়ি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছেন! মনে করেন আমরা বুঝি বুঝতে পারি না। নিঃশব্দে একখানা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে জানালায় উঁকি দিয়ে বেড়ান, আমাদের ঘরের, দিদিদের ঘরের। এমনকী বৈকুণ্ঠের ঘরে পর্যন্ত উঁকি দিয়ে আসেন। কই দিনের বেলা তো ওই সিঁড়ির ঘরটার দিকে মাড়াতেও দেখি না। বরং বলেন, 'দক্ষর ঘরটাতে আমার ভয় করে।' আসল কথা, কাউকে উনি বিশ্বাস করতে পারেন না, মেয়েদের তো নয়ই, ছেলেদেরও না, তায় চাকর!

মাঝে মাঝে ভাবি বড়দি মেজদি ছোড়দি কেউ কি মা-র এই সন্দেহের উচিতজবাব দিতে পারে না একদিন রাত্তির বেলা পালিয়ে গিয়ে? আমার ইচ্ছে হয় ওরা পালিয়ে যাক। ওরা যদি নিজের নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারে (আর তা না নিলে কোনোদিনই তো কোনো ব্যবস্থা হবে না। এখানেই ক্রমশ পচতে থাকবে তারা) তাহলে আমার পালানোটা সহজ হয়, শিগগির হয়। নাঃ, কারও ওপর মায়াটায়া আমার নেই, শুধু এমনি! শুধু জীবে-দয়া হিসাবে ওদের কথা একটু-আধটু ভাবি! বিশেষ করে ছোড়দির কথা!

আমি জানি ছোড়দির ভারি সাধ বিয়ে করবার, সংসার করবার, ভালোবাসার, ভালোবাসা পাবার। আশ্চর্য! এবাড়িতে জীবনের তেইশটা বছর পার করেও ওর জীবনে বিতৃষ্ণা আসেনি, পৃথিবীতে অরুচি আসেনি, এখনও ওর জীবনের ওপর ষোলো আনা লোভ আছে, এমনকী মানুষের ওপর আশাও আছে। মেয়েরা যেন বিশেষ একটা বয়সে এসে আর বড়ো হয় না, তার থেকে বেশি পরিণত হয় না। ভিতরে ভিতরে একটি নাবালিকা জগতের সমারোহের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, একটা ছোটো মেয়ে যেমনভাবে তাকিয়ে থাকে খেলনার দোকানের দিকে। ছোড়দির চাইতে আমি পাঁজির হিসেবে দু-বছরের ছোটো, কিন্তু মনের বয়সের হিসেবে? সেখানে ও আমার চাইতে অনেক অনেক ছোটো, শিশুমাত্র। কিন্তু শুধুই কি ছোড়দি? বড়দি, মেজদি, কাকেই-বা আমার চাইতে বড়ো মনে হয়? তবু মায়া বলে যদি ছিটেফোঁটা কিছু সত্যিই থাকে, তো ছোড়দির ওপরেই আছে। তাই বুঝতে পারি ওর মনের সমস্ত দলগুলি যেন ফোটবার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে। শুধু কে এসে ফোটাবে সেই অপেক্ষা।

কিন্তু কে আসবে? এবাড়িতে আসে কে? যেই আসুক, মানুষ আসে না। নইলে বড়দি তার অত রূপ অত রং নিয়েও শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে নভেল পড়ে বসে বসে বুড়িয়ে গেল! বড়দিকে ছেলেবেলায় আমার

রূপকথার রাজকন্যা মনে হত। বড়দিরই কি ঘর, বরের ইচ্ছে কম ছিল? এখন ইচ্ছেটা ফুরিয়ে গেছে, হতাশ হয়ে নিজেই ফুরিয়ে গেছে বড়দি। এখন কে বলবে একসময় অত সুন্দরী ছিল। সেই সদ্যতাজা দুধের ফেনার মতো রঙের ছায়াটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে, নীরক্ত কাগজের মতো। মুখের লাবণ্য কোথায় অন্তর্হিত, শুধু সে-মুখের রেখায় রেখায় অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। সে-ক্লান্তি ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার।

সেদিন দেখি জানলা দিয়ে এসে পড়া চৌকা এক টুকরো রোদ্দুরে বসে বসে বড়ি দিচ্ছে বড়দি মাথা নীচু করে। মাথার মাঝখানে টাকের আভাস দেখতে পেলাম আমি! আর কী মনোযোগ! ছি ছি! ঠিক যেন একটা সাতকালের বুড়ি গিন্নি।

এটা কী হচ্ছে, জিজ্ঞেস করায় বলল, 'বাবার জন্যে দুটো ভাজা বড়ি দিচ্ছি রে! বাবা ভালোবাসেন! মা তো আর—' ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

মাকে আমরা ফি-হাত সমালোচনা করি সত্যি, কিন্তু বাবার প্রিয় খাদ্য বলে মা যদি বড়ি দিতে না বসে থাকেন, মাকে আমি দোষ দেব না। বড়দি ছোড়দি (মেজদির মনের কথা ঠিক বোঝা যায় না, ও একটু আলাদা ধাতুর। যদিও ছেলেবেলায় ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম) যে এখনও বাবাকে ভালোবাসে এই দেখেই অবাক লাগে আমার। গুলি বন্দুক ব্যবহার করবার সুযোগ যদি আমার থাকত তাহলে নিজেকে শেষ করবার আগে একটা খড়ের পুতুলকে শেষ করার পাপও অর্জন করতাম।

ঈশ্বরের এইটুকু অনুগ্রহ আমাদের বাবা আর যাই করুন পিতৃত্বের দাবিতে কখনো আমাদের গায়ে পড়তে আসেন না। শাসন করতেও না, আদর করতেও না। আসল কথা সাহস নেই। ছেলেদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়েই ওঁর সমস্ত দিনটাকে সংকুচিত করে রেখেছেন ঘুম আর ঘুমের ভানের বেড়া দিয়ে। আমরা স্কুলে কলেজে যাওয়া পর্যন্ত বিছানার আশ্রয়ে আত্মগোপন করে পড়ে থাকেন। দৈবাৎ কোনো সময় চোখাচোখি হয়ে গেলে চোরের মতো পালিয়ে যান।

সেরকম পালানো অবশ্য আজকাল মন্টুকাকাও পালাচ্ছেন। সেই যেদিন দাদা সমঝে দিয়েছিল সেদিন থেকে। নইলে আগে তো খুব মোড়লি করতেন আমাদের ওপর। করতেন খুব স্নেহময় কাকাগিরি!

ভাবলে ঘৃণায় দেহের সমস্ত রক্ত তেতো হয়ে ওঠে যে, ওই মন্টুকাকাকে ছেলেবেলায় আমরা প্রাণতুল্য ভালোবাসতাম। মন্টুকাকা গল্প বলবেন, মন্টুকাকা বেড়াতে নিয়ে যাবেন, মন্টুকাকা ম্যাজিক দেখাবেন, মন্টুকাকা আমাদের সবরকম ছেলেমানুষ খেলায় যোগ দেবেন খেলার সরঞ্জাম কিনে এনে এনে। এককথায় মন্টুকাকা আমাদের কাছে ছিলেন স্বর্গের দেবতা।

দেবতা স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছেন।

অবিশ্যি দাদার সেদিনের ব্যবহারটা আমাকেও একটু আঘাত করেছিল, মন্টুকাকার পাঙাস হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন মমতাই হয়েছিল। তবে এখন আর সে-মমতার বাষ্পও নেই। এখন ভাবি ঠিক করেছিল দাদা, ওই ওর উপযুক্ত। উনি এসেছিলেন মায়া কাড়াতে, 'দেবু, আজকাল তোরা কী হয়ে গেছিস রে? এই যে বুড়ো কাকাটা বিছানায় পড়ে আছে, কই এক বার তো উঁকিও মারতে আসিস না?'

ব্যাস, দাদা যেন ফেটে পড়ল! সে একেবারে যা মুখে এল তাই। যেন এতদিনের জমানো যত গ্লানির ক্লেদ একসঙ্গে ঢেলে দিল। ভাষাটা সম্পূর্ণ মনে নেই, কিন্তু এ তো ভুলব না, প্রত্যেকটি ছত্রে ছত্রে কী ঘৃণা আর অপমান মিশিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, বুঝতে তো আমাদের বাকি নেই যে কী রোগে বিছানায় পড়েছেন উনি। হতে পারে উনি নিজে কোনো অপরাধে অপরাধী নয়, পিতৃপুরুষের রক্তঋণ শুধছেন, তবু যা ঘৃণ্য তা ঘৃণ্যই। কিন্তু শুধুই তো তা নয়?

আরও যা আছে? যার বিষাক্ত বাষ্পে আমাদের জীবনগুলো অভিশপ্ত।

সে-ইঙ্গিত কি দিতে ছেড়েছিল দাদা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কেটে কেটে? বাড়ির সমস্ত সদস্য দাদার সে-চিৎকারে আতঙ্কিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আশ্চর্য! কেউ সেদিন দাদাকে একটি কথা বলতে পারেনি। জ্বলন্ত আগুনের দিকে যেমন করে চেয়ে থাকে লোকে নিরুপায় দৃষ্টিতে, তেমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনেছিল দাদার কটুকাটব্য।

আর মন্টুকাকা?

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পুড়ে যাওয়া কয়লার ছাইয়ের মতো সাদাটে পাঙাস মুখে যেন হাঁ-করে তাকিয়েছিলেন এই আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের দিকে। তারপর থেকেই বদলে গেছেন।

মায়া অবিশ্যি ওঁর জন্যে নেই আমার। বলব দাদার এই অসভ্যতাও আমি সমর্থন করি না। না, এসব চেঁচামেচি গোলমালে আমার বিশেষ ঘৃণা! এতে নিজেই নিজের কাছে ছোটো হয়ে যেতে হয়। যাকে ছোটো করলে, তার চেয়ে ছোটো হয়ে গেলে তুমি নিজে। নাঃ, এসব খেলোমি আমার আসে না। আমি বুঝি, যাকে আমার অরুচি, তার কাছ থেকে আমি সরে যাব।

তাইতো প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি পালাবার।

এতদিন পারিনি। জীবনের উচ্চ আশার মোহ এই পাঁকে পুঁতে রেখেছিল আমায়। ভেবে এসেছি পালাব নিশ্চিত, শুধু এম. এ. পাসটা করে। পাড়ার মোহ নারীর মোহের চাইতে কি কিছু কম? নইলে শুধু আমি কেন, কত কত অসহায় ছাত্র কত অসহনীয় অবস্থাই সহ্য করে চলে শুধু পড়া শেষের অপেক্ষায়! বিদ্যালাভের জন্যে কি আর? কেবলমাত্র বৃত্তিলাভের জন্যে। দিন কিনে নিতে হবে, শত দীনতা স্বীকার করেও কিনতে হবে ভবিষ্যতের দিন।

সেই দিন কেনার অপেক্ষাতেই দাঁতে ঠোঁট কামড়ে পড়ে থেকেছি। কিন্তু এবার তো কেনা হয়ে গেছে সে-দিন, তবে আর বাধা কী?

না, বাধা আর কীসের?

তবু দিনের পর আরও একটা দিন কেটেও চলেছে কেন, অন্ধকার রাত্রে প্রাণপণে চোখ বুজে পড়ে থেকে তাই ভাবছি। বাবা নেই, বন্ধন আছে। দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসের বন্ধনই বুঝি সবচেয়ে মজবুত। অদ্ভুত এই অলাতচক্রের মধ্যে পড়ে আছি আমরা মানুষেরা! দম আটকে আসলেও আমরা ভাবতে বসি, ছুটে তো পালাতে চাইছি, কিন্তু পালিয়ে গিয়ে থাকব কোথায়? খাব কী? ভয়ানকরকম অসুবিধেয় পড়ে যাই যদি?

অতিষ্ঠ জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার পক্ষেও আমাদের সবচেয়ে বড়ো বাধা অসুবিধের ভয়। মরণাত্মক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে গিয়েও চিন্তা করি, যদি মারা পড়ি! এই বন্ধনেই সমগ্র পৃথিবী বাঁধা।

নইলে পৃথিবীতে এত কম লোক আত্মহত্যা করে কেন?

এই তো মেজদি! প্রতিদিন প্রতি সময় ওর মুখ দেখলেই মনে হয় কাল সকালে নির্ঘাত দেখা যাবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে ও। কিন্তু কিছুই হয় না পরদিন আরও কঠিন আরও তেতো মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে আধ-ঘণ্টা ধরে তরিবত করে মুখ ধোয়, পরিপাটি করে শাড়ি ব্লাউজ ম্যাচ করে পরে চায়ের টেবিলে এসে বসে, তারপর সমস্ত পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে দাঁতে ছিঁড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টোস্টের টুকরো খায়। অথচ ওই মেজদিই সেদিন মাকে দড়ির উপদেশ দিতে দ্বিধা করল না।

কী যেন কথায় মা বুঝি বললেন, 'তোরাও যদি আমায় না বুঝিস নীরু, তবে আর আমি কী নিয়ে থাকব?'

হেসে উঠল মেজদি, সাপের মতো হিসহিসিয়ে বলল, 'পৃথিবীতে টিকে থাকবার জন্যেই-বা কে মাথায় দিব্যি দিচ্ছে তোমায়? একগাছা দড়ি জোগার করলেই তো অনেক যন্ত্রণার হাত এড়াতে পারো।'

মা-র উত্তরটা, সত্যি বলতে কী, আমি শুনতে পারব না বলেই তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ফের মেজদির গলাটা শুনতে পেলাম, 'মায়াকান্নায় কোনো লাভ হবে না মা, ওতে পুরুষজাতকে ভোলানো যায়, মেয়েমানুষকে ভোলানো যায় না।'

না, তারপর সেখানে দাঁড়াতে পারিনি আমি।

কিন্তু কিছুতেই কি কিছু হয় কারুর? ঘণ্টা খানেক পরেই দেখি সেই নিত্য পদ্ধতিতে দালানের কোণে স্টোভে চায়ের জল চাপিয়েছেন মা, সেই আমাদের জন্যে প্লেটে প্লেটে সাজাচ্ছেন নিমকি সন্দেশ ঘুগনি। আর কী বলব?

মেজদিও অম্লান বদনে টেনে নিল একটা প্লেট।

তারপর তো আরও কত ঘণ্টা, কত দিন, কত রাত পার হয়ে গেল, কোথাও কোনো ব্যতিক্রম কি দেখলাম? তাই ভাবি যে, মানুষ আসলে কোন্ শ্রেণির জীব!

আচ্ছা, অপরের সমালোচনা করেই-বা কি ফল? গুলি বন্দুক নেই বলে কি আমার এই শরীরটা ধ্বংস করা যায় না? করছি কই? শেষপর্যন্ত হয়তো আমরা কেউই পালাব না, সুইসাইড করব না, পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও অবহেলা ছাড়া আর কিছুই করব না। এই পুরোনো পচা অট্টালিকার এই কোণটুকুতে সবাই মিলে পড়ে পড়ে পচব, বুড়ো হব, অভ্যাসের দাসত্ব করতে করতে ভাগ্যকে ধিক্কার দেব।

।। সরোজার কথা ।।

এইমাত্তর ও আমাকে একগাছা ফুলের মালা দিয়ে গেল। হঠাৎ ওর এ শখ কেন হল জানি না। সন্ধের অন্ধকারে আমাদের এই ঠাকুরদালানের চোরা সিঁড়ির মাঝখানে লুকোনো দেখা হাওয়ার তিন মাসের ইতিহাসে উপহার দেওয়া এই প্রথম!

গলার মালা নয়, খোঁপায় জড়াবার ছোট্ট গোড়েমালা। হেসে বললে, 'এই নাও, চুলে পরো। গলার মালা আগেভাগে দিয়ে পুরোনো করব না, একতরফাও দেব না। একগাছা আদায় করব তবে দেব।'

মালা-ধরা হাতটা আমার অবশ হয়ে এল, বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল। এমন স্পষ্ট করে একথা কোনোদিন তো বলেনি। এত সুখ আমি রাখব কোথায়? কিন্তু ফুলের মালা লুকিয়ে নিতে পারলেই কি লুকিয়ে রাখা যায়? রজনীগন্ধার গন্ধ কি খোঁপার তলায় চেপে রাখলেই চাপা থাকে? অথচ ওকে আমি একথা বলি কী করে?

কী করে বলি, তোমার মালা নেবার সাহস আমার নেই গো! মনে নিলাম প্রাণে নিলাম, আমার সমস্ত আকুলতা আর আবেগ দিয়ে নিলাম, শুধু চুলে ধরে রাখবার উপায় নেই আমার। আমি তো গ্রহণ করেছি, এবার তুমি ধরো, নিয়ে গিয়ে তুলে রাখো।

না তা কি বলা যায়?

আমি কি নাবালিকা? আমি কি কিশোরী? কিশোরীর লজ্জা আর কিশোরীর হৃদয়াবেগ আমাকে জড়িয়ে রেখেছে সত্যি, কিন্তু ও তো জানে আমি অনিলের দিদি। এম. এ. পাস করে বেরোনো

অনিলের। আমি কী করে বোঝাই ওকে, খোঁপায় একগাছা ছোট্ট মালা জড়ালেও আমাকে নিশ্চয় অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

না, মা নয়! মা-র আমাদের সময় কোথায় মেয়েদের দিকে কড়া নজর দেবার? ততক্ষণ বরং দেওর-ভাজে মিলে দাবা খেললে কাজ দেবে। মন্টুকাকার তাসের আড্ডায় যাবার ক্ষমতা গেছে। তাই ওঁর শূন্য মন পূর্ণ করতে এই দাবার ছকের আয়োজন। রাত দশটা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে চলবে এই পচা খেলা। তারপর হয়তা মা উশখুশ করে বলবেন, উঠি এবার, ছেলে-মেয়েদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মন্টুকাকা নিশ্বাস ফেলে হাই তুলে বলবেন, 'অমনি আমাকেও কী দেবে দিয়ে যাও। রাতের পাট চুকিয়ে ফেলি। ঠিক জানি ব্যস্ত হয়ে ওঁকেই আগে খাওয়াবেন মা, আর না খেয়ে খেয়ে যে মন্টুকাকার শরীরে আর পদার্থ নেই সেকথা বার বার বলে আধ সেরের জায়গায় আড়াই পো দুধ খাইয়ে ছাড়বেন।

তারপর এদিকে এসে আমাদের শ্রুতিগোচরের সীমানায় সশব্দ স্বগতোক্তি করতে থাকবেন, এই এক মানুষ বাবা! খিদে নেই তেষ্টা নেই, তবু সকলের আগে খেতে বসে যাওয়া চাই। আজন্মকাল যে কী জ্বালায় জ্বলছি, তা ভগবানই জানেন! যাদের করবার কথা, তারা মরে বাঁচল, পালিয়ে বাঁচল, আমার বন্ধনদশা আর ঘুচল না। স্বগতোক্তি আর ফুরোয় না। আমাদের খেতে দিয়ে আবার হয়তো শুরু করবেন, সম্পর্ক তো কত, মামাতো দেওর! এতে কে-বা কার করে? তবে নাকি সপরিবারে আজন্ম ধরে ওর গলায় পড়ে আছি, ওর ভিটেয় শেকড় গেড়ে বসেছি, তাই চক্ষুলজ্জার দায় এড়াতে পারি না। কিন্তু আর পারছি না। যখন ভালো ছিল, তখন বারোমাস 'এটা রাঁধো ওটা করো' করে ভুগিয়েছে, এখন রোগে পড়ে অন্য বায়নাক্কা! মেয়েমানুষ আবার দাবা খেলে? শুনেছে কেউ কখনো? তাও করতে হবে আমায়! আর যারা রয়েছে সংসারে, তারও যদি কেউ রুগিটার জন্যে খানিক সময় দিত, আমায় এত যন্ত্রণা পোহাতে হত না! তা আমার ভাগ্য! দোষ আমারই, গোড়ায় যদি—। প্রায়ই অবশ্য বলতে বলতে হঠাৎ চুপ মেরে যেতে হয় মাকে, দাদার অথবা মেজদির কড়া মন্তব্যে।

দাদা বলে, 'মা, দোহাই তোমার চুপ করো! এখানে কোনো ধর্মযাজক উপস্থিত নেই এবং তোমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়নি যে, আত্মদোষ কীর্তন করতে বসলে! আমাদের অন্তত একটু শান্তিতে খেতে দাও।' বলে আর মাংসর হাড়গুলো কড় কড় করে চিবোয়।

মেজদিও মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটে, 'দ্যাখো মা, জগৎসুদ্ধ লোককে নিজের থেকে বোকা ভাবার মতো বোকামি অল্পই আছে। তোমার কাছে তো কেউ কোনোদিন তোমার কোনো কাজের জবাবদিহি চায় না।'

মা চুপ করে যান।

এক এক দিন রান্নাঘরের কোণে বসে কাঁদতেও দেখেছি। দেখলে একটু দুঃখ হয় না তা নয়, কিন্তু পরদিন ভোর বেলাতেই যখন দেখি সেই মন্টুকাকার ঘরে গিয়ে ডিমসেদ্ধ আর চা-বিস্কুট নিয়ে তিনি সাধ্যসাধনা করছেন, তখন আর—যাক ওকথা! তবে এইটুকুই বলছি, মা কিছু বলবেন না, মা-র বলবার ফুরসত নেই।

বলবে বড়দি। বলবে মেজদি।

বড়দি ঠিক বলবে, ফুলের গন্ধ পাচ্ছি কেন রে। ফুল কে আনল? সরোজ! তোর খোঁপায় ও-মালাটা এল কোথা থেকে রে? কী? লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু শুরুটুরু করেছিস না কি? আজকাল যেন তোর ভাবভঙ্গি ভালো দেখছি না।

না, এর চাইতে জোরালো কথা বলবার ক্ষমতা বড়দির নেই। ওকে সহ্য করা যায়। সহ্য হয় না মেজদির কথাগুলো। ও যার সঙ্গেই যখন কথা কয়, মনে হয় জেনেবুঝে বিষের তির ছুঁড়ছে।

নিশ্চয় বুঝেছি এ মালা দেখতে পেলে ঠোঁটের কোণে ছুরির ডগার মতো হাসি এনে বলবে, মালা এল কোথা থেকে? কেউ নিজের দয়ায় দিয়েছে, না চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে জোগাড় করেছিস? এবাড়ির মেয়েদের ভালোবেসে ফুলের মালা দেবে এমন অখদ্যে কে আছে? নীচের বাজারের সেই ফুলওয়ালা ছোঁড়াটার সঙ্গে ভাব করেছিস বুঝি?

কী রাগ হয় বলো তো? মেজদির ওইরকম কথা!

আমার এই চোরাসিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠা, মনে হয় মেজদির চোখ এড়ায়নি। প্রায়ই দেখি কেমন যেন ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ বাঁকা বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে! কিন্তু তাই কী? কতটুকুর জন্যেই-বা যাই? কথা বলে কি কোনোদিন আশ মেটে? ও তো রোজ গঞ্জনা দেয়? বলে, 'তোমাকে দেখলে মনে হয় যেন সবসময় তোমার কোথায় ছুঁচ ফুটছে।'

ছুঁচ যে কেন ফোটে তা ওকে কী করে বোঝাই!

বড়দি মেজদির যদি বিয়ে হত, ঘরসংসার হত; স্বামী-সংসারের গরবে গরবিনী হতে পেত, তাহলে কি আমি এমন করে চোরাসিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুলের মালার বিপদ নিয়ে ভাবতে বসতাম? সকলের সামনে দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে এগিয়ে যেতাম মালা নিয়ে।

বড়দি মেজদির দুর্ভাগ্যই আমাকে আমার সৌভাগ্যকে হাত বাড়িয়ে নিতে দিচ্ছে না। ওদের রূপ ছিল, গুণ ছিল, প্রাণ ছিল, প্রেম ছিল, সবই বাজে খরচ হয়ে গেল! তা গেল ছাড়া আর কী? বড়দির একত্রিশ, মেজদির উনত্রিশ। আর কি আশা করবার দিন আছে?

সেকালে যে বালবিধবা থাকত, যাদের নিয়ে এত কথা এত হাহাকার, সমাজকে এত নিন্দাবাদ, তাদের সঙ্গে আর এদের তফাতটা কী? সমাজের যতই দোষ থাকুক, বিধবা হওয়াটা তো ভগবানের মার? কিন্তু এ যুগে এটা কী? বড়দি, মেজদি, বড়দি মেজদির মতো হাজার মেয়ের এই যে ব্যর্থ যৌবনের দুঃসহ জ্বালা, এর জন্যে দায়ী তো শুধু মা-বাপের অবহেলা, ঔদাসীন্য! আমাদের কথা আলাদা, আমাদের মা-বাপের মতো মা-বাপ কিছু আর সকলের নয়, কিন্তু খুব ভালো ভালো মা-বাপ, অর্থসামর্থ্যে পাণ্ডিত্যে প্রতিপত্তিতে সেরা, তাঁদের মেয়েদেরই-বা সময়ে বর জোটে কই?

বিয়ের একটা বয়েস থাকে, আর সে-বয়েস যে বসে থাকে না, একথা যেন ভুলেই গেছে আজকালকার মা-বাপ। মেয়ে-ছেলের বিয়ে দেওয়ারই যে প্রয়োজন আছে, তা-ই কেউ আর মানতে চায় না। দেখেছিও তো অনেক!

আমাদের কথা তো ছাড়াই যাক। আমাদের জীবন তো অভিশপ্ত জীবন!

আমাদের বাপের এ বোধ নেই যে সন্তানকে খেতে-পরতে দেওয়ার দায়িত্ব বাপের। বাপের মামার বাড়িতে একচিলতে কোণে আমরা মানুষ, মামাতো কাকার পয়সায় আমরা খাই পরি, বিলাসিতা করি! আর আমাদের মা? হে ঈশ্বর, থাক সেকথা! এর চাইতে নেহাত গরিব কোনো সভ্যবাড়িতে যদি জন্মাতাম আমরা তাহলে হয়তো আজ এই মালা আমার জ্বালা হয়ে উঠত না। ওই...ওই বুঝি মেজদি এদিকে আসছে। সিঁড়ির দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিই, একেবারে সরে আসি এর কাছ থেকে। ওগো, তোমার দেওয়া মালা মাথায় বইবার সাধ্য আমার হল না, তাই রাখলাম বুকের মধ্যে। ব্লাউজের নীচে একেবারে হৃদয়ের কোটরে। কেউ যদি উন্মনা হয়ে প্রশ্ন করে, ফুলের গন্ধ আসছে কোথা থেকে? হেসে বলব, বোধ হয় তোর হৃদয়কানন থেকে দিদি!

কিন্তু এমন করে আর ক-দিন? আমি কি ওর সঙ্গে পালাব?

গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! শেষকালে কিনা একটা বাজারের ফড়ে! ছি ছি! দেবা বলেছিল ছোঁড়া না কি গ্র্যাজুয়েট! এম. কম. পরীক্ষা দেবে বলে নাকি দোকানে বসে লেখাপড়া করে। বলুক গে, ওকথা আমি গ্রাহ্য করি না। ফুল, ফুলের মালার দোকান দিয়ে তো দিব্যি বসেছে ছোটোলোকের মতন। ওকে আমি ফড়েই বলি। দেবা জানে না, ওকে কিছু বলিনি, শুধু কৌশলে ছোঁড়াটার কথা তুলেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের উত্তর দরজার ধারে ফুলের দোকানটা যে বসিয়েছে, সে-ছোঁড়া দোকানে বসে অত কী পড়ে রে?

দেবা বলেছিল, 'পরীক্ষার পড়া'! আরও বলেছিল, 'দ্যাখ মেজদি ওদের কেমন সাহস, কী বুকের পাটা! গ্র্যাজুয়েট হয়ে কিনা ওইরকম তুচ্ছ একটা দোকান দিয়েছে! ওরা বেশ পারে। আমরা পারি না, আমাদের প্রতি পদে আভিজাত্যের বাধা। ভুয়ো, মিথ্যে, সস্তা এই এক প্রেস্টিজ। কেন আমরা পারলাম না একটা দোকান দিতে! আমরা শৌখিন পোশাক পরে দোতলা থেকে নেমে ওদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করব, আর ওদের দিকে এমন করে তাকাব যেন ওরা কীটস্য কীট। কিন্তু ওরা যদি জানত আমাদের ভেতরের অবস্থা কী পোকায় খাওয়া।'

যখন-তখনই দেবাটা এইরকম বড়ো বড়ো বুলি কপচায়। এতই যদি দার্শনিকতা তো কেন এই নীচ অন্ন খেয়ে পড়ে আছিস? কর-না দোকান, কর-না কুলিগিরি। আমি সবাইকে ঘেন্না করি সব কিছুকে ঘেন্না করি। ঘেন্না করি এবাড়ির প্রতিটি ইট-কাঠকে, এবাড়ির অন্নজলকে, তোদের ওই বড়ো বড়ো বুলি কপচানোকে, ঘেন্না করি আমাদের মা-র আমাদের কাছে মায়া কাড়ানোকে, আর সবচেয়ে ঘেন্না করছি সরি লক্ষ্মীছাড়ির এই প্রেমে-পড়াকে। আমাদের বোন হয়ে ওর এই প্রবৃত্তি! ছিঃ!

ও মনে করে কেউ কিছু বুঝতে পারে না। হুঁঃ! আঁচল দিয়ে কি আগুন ঢাকা যায়? ছলনা দিয়ে ঢাকা যায় নব অনুরাগ? ওই বাসনের ঘরের মধ্যেকার চোরাসিঁড়িটা দিয়ে ও নীচে নেমে যায়, আমি জানি, আর ওই ফুলওয়ালা ছোঁড়া আসে তরকারির বাজারের ভেতর দিয়ে। সবই আন্দাজ করতে পারি আমি। সরি যখন ওপরে উঠে আসে, ওর মুখ রাঙা, চোখে আলো, সেটা চাপা দেবার জন্যে ও তখন অকারণ বকবক করে, এলোমেলো উলটোপালটা কথা বলে, শুধু শুধু টেনেবুনে কাজ খুঁজে কাজ করতে বসে, এসব লক্ষণ কি চাপা দেওয়া যায়?

কিন্তু কেন? ওর এত আস্পর্ধা কেন? আমরা এত বড়ো বড়ো দু-দুটো দিদি বসে থাকতে, ও সকলের ছোটো হয়ে আমাদের নাকের সামনে প্রেম করবে? ভালোবাসার লোকের দেওয়া ফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়ে বেড়াবে? আবার যেচে গায়ে পড়ে মিথ্যে কৈফিয়ত দিতে আসা! বলে কিনা, 'মালাটা কিনলাম মেজদি।' শুনে গা জ্বলে গেল, বললাম না কিছু, শুধু আগুনজ্বালা চোখে তাকালাম। তবু লক্ষ্মীছাড়ি ন্যাকামি করে বলেই চলেছে, 'একদিন কোথায় যেন যেতে রাস্তায় একটা মেয়ের মাথায় দেখেছিলাম, ভারি সুন্দর লেগেছিল। ও হরি! আজ দেখি কিনা আমাদেরই নীচতলার দোকানে তেমনি মালা। দেখে লোভ হল।'

কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না তাই, নইলে মনে হল বলি, লোভ হল সেকথা আবার বলছিস কোন লজ্জায়। কিন্তু লোভের খবর কি আমি রাখি না? শুধু মালার? জ্বালার নয়? বললাম না কিছু, অগ্রাহ্য করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলাম। আর বোকাটা কিনা বলেই চলেছে, 'লোভ হবার মতোই সুন্দর না রে? আর দামও সস্তা।'

আর আমি না বলে পারলাম না, সস্তা সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

আমার চাউনিটা হয়তো একটু বেশি তীব্র হয়ে গিয়েছিল, আমার স্বরটা হয়তো একটু বেশি তীক্ষ্ণ শুনিয়েছিল, তাই ওর মুখটা শুকিয়ে গেল, কেমন ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে হঠাৎ ঝট করে সরে গেল।

তা যাক। আমি অত মায়া মমতার ধার ধারি না। আমি একদিন ওকে হাতেনাতে ধরব, ধিক্কারে ধিক্কারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব ওকে। একটা হতভাগা ফুলওয়ালার সঙ্গে প্রেম করা ওর বার করব আমি। কেন তোর এখনও জীবনের ওপর এত লোভ? কেন প্রেমভালোবাসা এইসব ন্যাকামির ওপর বিশ্বাস? তুই কি এবাড়ির মেয়ে নয়? জানিস না ওসব চাওয়া আমাদের পক্ষে পাপ, অপরাধ, দৃষ্টতা? আচ্ছা রোস, তোকে আমি ফেরাচ্ছি!

না, কেউ আমরা ভালোবাসব না, ভালোবাসা পাব না, পাব না স্বামী-সন্তান-সংসার। নিস্ফল যৌবনের তাপে জ্বলতে জ্বলতে ক্রমে ক্রমে পুড়ে ছাই হব।

আচ্ছা, ওই ছোঁড়াকে একদিন বেশ করে সমঝে দিয়ে এলে কী হয়? ঠিক হয়েছে, তাই যাব, গিয়ে দেখব সত্যি ও গ্র্যাজুয়েট কি না, সত্যি ও ওই দোকানে বসে এম. কম-এর বই পড়ে কি না। নাকি ওই বলে সরিটার মন কেড়েছে! তাই হবে, তাই ঠিক। নইলে এম. কম.-এর পড়া? কক্ষনো না, পাঠ্যপুস্তক না ছাই, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দোকান খুলে বসে পচা রাবিশ ডিটেকটিভ নভেল পড়ে ছোঁড়া। ছোঁড়ার নামটা যে কী তাও জানি না, তবে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলে অবিশ্বাস হয় না। রং আছে, রূপ আছে। তাতে কী? কত চাষাভুষোর ঘরেও রূপ থাকে। ওকে আমি শায়েস্তা করে দেব। চোরাদরজায় এসে দাঁড়িয়ে প্রেমের ন্যাকামি করা বার করব।

সরিটা চলে গেল। ওকে জেরা করলে হত।

ভীতু, ভীতু, ভীষণ ভীতু। হয়তো দু-বার জিজ্ঞেস করলেই কেঁদে ফেলবে। ভীরু, নইলে অত লুকোচুরি, অত নার্ভাস?

ওর জায়গায় যদি আমি হতাম? বুকজোর করে সকলের সামনে আমার প্রেমাস্পদের হাত ধরে এই নরক থেকে বেরিয়ে চলে যেতাম। বলতাম, মুক্তি পেলাম।

আশ্চর্য! আমারও যে একদিন নবযৌবন ছিল, ছিল সদ্য কৈশোর কাল, সে কি কোনোদিন পৃথিবীর কোনো পুরুষের চোখে পড়েনি? না এর আগে পৃথিবীতে কোনো মুগ্ধদৃষ্টি ছিল না? তেরো বছর বয়েস থেকে এই ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অহরহ যে-দৃষ্টি অন্তরে কামনা করে চলেছি।

কত বসন্ত পার হয়ে গেল, পার হল কত বর্ষার রাত্রি, কত শরতের উতলা সকাল, কত উন্মাদ বৈশাখী সন্ধ্যা, আমার জীবনের মাঝখানে ধরে রাখতে পারলাম না তার কোনো একটি ক্ষণকে। ওরা শুধু আমার বন্ধ জানালার ওপারে নিরুপায় ক্ষোভে মাথা কুটে মরল! আর আমি এই স্বল্পপরিসর জমির মধ্যে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, একটা যান্ত্রিক নিয়মের মতো উঠলাম-বসলাম, খেলাম-শুলাম, ঘুমোলাম-জাগলাম। এই ঢাউস চৌকিটার ওপর আমরা তিন বোন পাশাপাশি শুয়ে আসছি সেই পেনি আর জাঙ্গিয়া পরে শোয়ার কাল থেকে, জীবনভর দালানের ওই তাকটায় রাখলাম আমাদের চুলের ফিতে আর তেলের শিশি, চিরুনি আর স্নো পাউডার। ঘরের দেয়ালজোড়া এই আলনাটায় রাখলাম আমাদের তিন বোনের জামাকাপড়, পেনি থেকে ফ্রক, ফ্রক থেকে শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া।

সেকালে বালবিধবার দুঃখে আকাশ-পাতাল ভাসাত লোকে, একালের দিকে তো কই তাকাচ্ছে না? বিধবারা তো তবু আশা-ভরসা চুকিয়ে মাথা মুড়িয়ে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শর দিকে পিঠ ফিরিয়ে পরকালের দিন গুনত, কিন্তু একালে এ কী হচ্ছে? আমাদের আর আমাদের মতো হাজার হাজার মেয়েদের? আশার পদধ্বনি শুনছি, সে-আশা মরীচিকায় মিলোচ্ছে। বালবিধবার দুর্গতির চাইতে এ যে আরও শোচনীয়।

মেয়েদের বিয়ে না দিলে জাত যেত, সে-সমাজ বরং ভালোই ছিল। বাপ-মায়ের মনে কর্তব্যের অনুশাসন-না থাকুক, মমতার অনুশাসন না-থাকুক, সমাজের অনুশাসন ছিল। আমরা যদি সেকালে জন্মাতাম, তাহলে কি মা-বাপ শুধু অভাবের দোহাই দিয়ে আমাদের জীবনগুলো এমন ব্যর্থ নিষ্ফলা হয়ে যেতে দিতে পারত? বালবিধবার দুঃখ দেখেছে লোকে, বন্ধ্যার দুঃখে আকুল হয়ে বুক ফেটে মরেছে। অথচ এই হতাশ নিষ্ফলা কুমারী জীবনের দিকে তাকাবে না কেউ!

মেয়েরা স্বাবলম্বিনী হচ্ছে। নিজেরা নিজেদের পেটের ভাতের সংস্থান করছে। এইটাই নাকি শেষ কথা। এই তাদের সান্ত্বনা। কিন্তু পেটের ভাতটাই কি মানুষের জীবনের শেষ কথা? পুরুষও তো চিরদিন স্বাবলম্বী, তা বলে কি তারা স্ত্রী চায় না? সংসার চায় না? সন্তান চায় না? চায় না ভালোবাসতে, ভালোবাসা পেতে?

নির্মল নদীর জল না-জুটলেই কি লোকে তৃষ্ণার জ্বালায় ডোবার কাদাজল খেতে যায়, তাই আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের বোন হয়ে সরি মুখপুড়ি গেছে বাজারের একটা ফুলওয়ালার কাছে মন সমর্পণ করতে। আর আমাদের মা-বাপ?

বাবা ঘরের কোণে বসে বসে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন আর আমাদের মা ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজে পরিপাটি হয়ে পরপুরুষের সঙ্গে দাবা খেলছেন, তাস খেলছেন!...ওই...হাসির হর্‌রা উঠল ও ঘরে! কানের মধ্যে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছে। তবু সহ্য করতে হবে, কারণ, (আর কেউ কিছু বুঝুক-না-বুঝুক আমি তো বুঝি) এর বদলে আমরা ভালো খাচ্ছি, ভালো পরছি, উৎকৃষ্ট বিছানায় শুচ্ছি। পয়সার অভাবে আমাদের বিয়ে হল না, অথচ এখনও আমাদের ধোবার খরচ মাসে সত্তর-আশি টাকা, ইলেকট্রিকের বিল ষাট। আমরা সিনেমা দেখতে গিয়ে ফার্স্ট-ক্লাসের টিকিট ছাড়া কিনি না, রাস্তায় বেরোতে ট্যাক্সি ছাড়া ট্রাম-বাসের কথা ভাবতেই পারি না। আমাদের স্কুলে যেসব মেয়েরা নিজেরা ঘরে কেচে সাবানকাচা জামাকাপড় পরে আসত আমরা তাদের সঙ্গে কথাই কইতাম না, তাদের দেখে হাসতাম।

কেন? তা জানি না। হয়তো আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ওই মিথ্যে প্রেস্টিজের মোহ কাজ করেছে। তাই আমি সারির এই দুর্বলতায় এত জ্বলে মরছি। কিছুতেই ভাবতে পারছি না, আহা মরুক গে, তবু তো ওর জীবনে একটু সরসতা এল।' কিন্তু এটা কি শুধুই প্রেস্টিজের মোহ?

এই নির্জন সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার মনের সমুদ্রের অতল অন্ধকারে ডুবুরি নামিয়ে দেখবো? যদি দেখি, কী উঠবে সেখান থেকে? মণি-মুক্তো? পাগল! মণি মুক্তো আবার আমি কোথায় পাব? ডুবুরির জালে উঠবে সামুদ্রিক সাপ! হিংস্র কুদর্শন ভয়ংকর! যে-সাপটা নিজের বিষদাহে ছটফট করতে করতে ছোটোবোনের ওই সরসতাটুকু ছিনিয়ে নিয়ে গ্রাস করতে চাইছে।

সরি সুন্দরী, আমিই কি কুৎসিত?

আমার এই দীর্ঘ ঋজু নিটোল মজবুত শরীরটা কি ওর ওই গোলাপ ফুলের মতো গোলাপি, মাখনের মতো নরম শরীরটার চাইতে কিছু কম আকর্ষণীয়?

কী জানি কী, কোনোদিন তো পরীক্ষা হয়নি। আমি চিরকাল শুধু অহংকারেই মরেছি। তীব্র তৃষ্ণার জ্বালা বুকে পুষে এমন কাঠখোট্টার মতো বেরিয়েছি যে, কেউ কোনোদিন ভাবতেই অবকাশ পায়নি, আমার মধ্যে বাসনার হাহাকার আছে।

কিন্তু তাতেই-বা কী! দিদিটাও তো সরির মতোই ছিল, অমনি গোলাপি, অমনি নরম, আর অমনি মেয়েলি, কই কী হল ওর? বুড়িয়ে গেল, স্রেফ বুড়ো হয়ে গেল। ওর মধ্যে যেন আর কিছু নেই। কিন্তু অনেক ছিল। অনেক আশা অনেক সুখ। আগে আগে তো দেখেছি, অবিশ্যি সে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক

যুগে। মাঝে মাঝে যখন বিয়ের কথা উঠত দিদির, কী চঞ্চল কী উন্মুখ হয়ে উঠত দিদি! কীরকম আনাচেকানাচে দাঁড়িয়ে সেইসব আলোচনা শুনত—এবাড়ির পুরনো ঘটকী মাতঙ্গিনীর মেয়ে রাজুর সঙ্গে মায়ের আলোচনা। রাজুই মাঝে মাঝে পাত্রের সন্ধান আনত কিনা। কিন্তু তারপর সব কেমন ধূসর হয়ে গেল।

রাজুর আসা-যাওয়াও থেমে গেল, আর থেমে গেল দিদির সেই মাঝে মাঝে সেজেগুজে 'কনে' দেখা দেওয়ার মধুর উন্মাদনা। রাজুর আনা কোনো পাত্রপক্ষই কিন্তু দিদিকে অপছন্দ করে যায়নি, যাবে কেন, দিদি কি কম সুন্দরী ছিল? কিন্তু ক্রমশ শুনলাম এপক্ষ থেকেই সব পাত্রকে রিজেক্ট করা হচ্ছে। করছেন মন্টুকাকা, অতএব তাঁর ছায়ানুগামিনী তাঁর 'সুখবউদি'রও প্রত্যাখ্যান না করে উপায় নেই।

মা-র নামটা কি বিশ্রী!

এবাড়ির মেয়েদের পাত্র খুঁজতে নাকি দেবরায় বংশের উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে হবে। কেন হবে, আমরা কি দেবরায়? কিন্তু একথা কে শুধোবে? মা হয়তো-বা একটু-আধটু ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলেছেন, বলেছেন, 'তেমন যখন জুটছে না—' মন্টুকাকার প্রবল তাচ্ছিল্যের হাসিতে ভেসে গেছে মা-র সেই ক্ষীণ সাধু সংকল্পটুকু। কদর্য কুৎসিত বিশ্রীমুখে অবিরত পান-দোক্তা খাওয়া দাঁতের সেই ধাপে ধাপে চড়া হাসিটা কী জঘন্য লাগত। মন্টুকাকা হাসতেন আর অমার্জিত ভঙ্গিতে হাঁটু চাপড়ে বলতেন, 'তুমি যে তাজ্জব করলে সুখবউদি, উপযুক্ত পাত্তর জুটছে না বলে কি মেয়েদের সব অপাত্রে ধরে দিতে হবে? থাক-না, এত ব্যস্ত কীসের? মেয়েরা তো আর তোমার ঘর ভেঙে পালাচ্ছে না? বলি, ঘরের মেয়েকে পরের ঘরে দিতেই হবে এ শাস্ত্র গড়েছে কে? থাক-না, কত খাচ্ছে, কত পরছে?'

মা হয়তো বলতেন, 'খাওয়া-পরা ছাড়া আর—' মন্টুকাকার প্রবল কণ্ঠকল্লোলে ডুবে যেত সেকথা—আরে বাবা সবই ভাগ্যের কথা! তুমি মেয়ের সুখ হবে বলে বিয়ে দিলে, ধরো জামাইটা বদ হল, তখন? হবে তোমার মেয়ের সুখ? বাড়ারভোগ যন্ত্রণা। তার চেয়ে এ বেশ আছে। রাজুটাও হয়েছে তেমনি পাজি, যত রাজ্যের অখাদ্য পাত্তর ধরে ধরে আনছে। এবার আসুক-না, কড়কে দিচ্ছি। হয়তো তাই দিয়েছিলেন। এমন কিছু বলেছিলেন যাতে রাজু আর এবাড়ির ছায়া মাড়াল না। ব্যাস দিদিরও উঠি উঠি সূর্য মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল। ফুটি ফুটি বিয়ের ফুল আর ফুটল না।

দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, কৈশোর গেল, যৌবন গেল, দিদির যে একবার বিয়ের কথা উঠেছিল তা ভুলে গেল লোকে। হয়তো-বা দিদি নিজেও ভুলল। দিদির জীবনের আশ্রয় এখন সেলাই করা, পশম বোনা, সস্তা সস্তা সিনেমাপত্রিকা পড়া, আর ঝরে-যাওয়া যৌবনকে বেঁধে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় পাঁচজনকে লুকিয়ে আড়ালে আড়ালে প্রসাধনচর্চা করা।

এদিক দিয়ে একবারে ঠান্ডা মেরে গেছে, নেহাত স্তিমিত হয়ে গেছে, তবু এই হাস্যকর ছেলেমানুষিটুকু গেল না। ওই প্রসাধনের ছেলেমানুষি। অথচ লজ্জা আছে মনে, তাই সকলের অগোচরে চট করে দুধের বাটি থেকে এক চিমটি সর তুলে নিয়ে খস খস করে মুখে মেখে ফেলে, পাতিলেবুর টুকরো দেখলেই গালের পাশের আর নাকের খাঁজের মলিন রেখায় রেখায় প্রাণপণে ঘষতে থাকে, মাথার মাঝখানের চুল পাতলা হয়ে যাওয়া গোল মাপের টাকের আভাসটুকুর ওপর যখন-তখন এদিকে-ওদিক তাকিয়ে একটু গন্ধতেল বুলিয়ে নেয়। এ এক আচ্ছা পাগলামি!

আমি যা করি, সোজা সামনাসামনিই করি।

দিদিটার বিয়ে হলে একটি আহ্লাদে ডগমগ সুখী সন্তুষ্ট গিন্নি হতে পারত! বর অফিস থেকে এলে তার জুতো খুলে দিত, হাতে হাতে সাবান তোয়ালে গুছিয়ে দিত, ছেলেরা স্কুল থেকে আসবার আগে সারা দুপুর ধরে খাবার তৈরি করত, আর মাসিক পত্রিকার পাতা থেকে নতুন নতুন রান্না শিখে খেটে

ঘেমে বানিয়ে নিজের গুণে নিজেই মোহিত হত! দিদিটা একেবারে গিন্নি হবার জন্যেই জন্মেছিল।

আমি বিয়ে হলে অবিশ্যি ওসব করতাম না, মোটর ড্রাইভিং শিখে বরকে তার অফিসে পৌঁছোতে যেতাম, আর নিয়ে আসতাম। আর...আর মোমের পুতুলের মতো যে দু-একটা বেবি হত—

ধ্যাৎ! যত সব আষাঢ়ে কল্পনা!

আমরা হচ্ছি মরুভূমির মনসাকাঁটা। আমাদের শাখাপত্রের সমারোহ কখনো হবে না। দিদির তবু বিয়ের কথা হয়েছিল, আমাদের তাও না। মন্টুকাকা যে কেন দিদির বিয়ের অত বাগড়া দিয়েছে এখন বুঝতে পারি। তখন পারিনি, তখন মনে করতাম সত্যিই মন্টুকাকার মনে সুরূপা ভাইঝিদের সম্বন্ধে একটা চড়া মূল্যবোধ আছে। এখন বুঝি কিছু না, কিছু না, ও অন্য ব্যাপার। আসল কথা উনি চাননি যে জামাইয়ের শাশুড়ি হয়ে, নাতিনাতনির দিদিমা হয়ে, তাঁর সুখবউদি বুড়িয়ে যান, ফুরিয়ে যান। ছি ছি!

ওই ওই আবার হাসি!

না, এ তো রোজকার পরিচিত শব্দ নয়! নতুন গলা, নতুন হাসি। অন্য মহিলার গলা। তবে কি কেউ এল? কে এল? এবাড়িতে আবার আসবে কে। আত্মীয়স্বজন তো আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছে। হয়তো নেহাত কোনো বিয়েটিয়ের নেমন্তন্ন—তাই, তাই বোধ হয় এসেছে কেউ।

কী জানি কোন মেয়ের কপাল ফিরল।

যাক গে মরুক গে। নিজে থেকে আর এগিয়ে যাব না। ডাকে তখন বোঝা যাবে। অন্যের সামনে বেরোতে মাথা কাটা যায়। মা-বাপের কর্তব্যের অপরাধের দায় পোহাচ্ছি আমরা।

কিন্তু হাসিটা বারে বারেই যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে! এক বার উঁকি মারব নাকি? বৈকুণ্ঠর কণ্ঠোচ্ছ্বাসও সোনা যাচ্ছে, না? তবে কি এই পুরোনো বাড়ির কেউ এল? কোথায় যেন চলে গিয়েছিল যারা সব।

বুঝলাম! এ আমাদের এবাড়ির মেজোজেঠির গলা। মন্টুকাকার নিজের মেজো ভাজ। দরাজ হাসি, দরাজ গলা, দরজা কথা। কিন্তু ওকী, কী বলছেন উনি?

—একটা মেয়েরও বিয়ে দিসনি এখনও? ওমা কোথায় যাব আমি। কী করছে মেয়েরা? চাকরিবাকরি? তাও না? শুধু খোঁয়াড়ে পুরে রেখে জাব্ না দিয়ে পুষছিস? তা বিয়ে দিবি তো বল! দু-টি পাত্তর আমার হাতে আছে। সত্যি বলতে সেইজন্যেই আসা আমার।...লক্ষ্ণৌ থেকে কবে এসেছি? এই তো দিন পনেরো। হ্যাঁ, একেবারে চাটিবাটি গুটিয়েই এলাম। তা সেকথা যাক, মেয়েদের বিয়ে দিবি? আমি অবিশ্যি ভাবিনি যে, তিনটেকেই ঘরে রেখে দিয়েছিস, বরং কতদিন তোর ভাসুরকে বলেছি, দ্যাখো, শচীঠাকুরপো সুখবউয়ের আক্কেল, ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে পর্যন্ত একটা পত্তর দিয়ে উদ্দিশ করে না। তা মেয়েদেরই পার করিসনি, আবার ছেলে! আসলে হিসেবপত্তর করে ভেবে এসেছি, সরোজটা হয়তো এখনও আইবুড়ো আছে। দেখেছি তো ছোটোবেলায়, রঙের দিকে চাওয়া যেত না! একটি সত্যিকার রূপসি মেয়ের জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে একজনরা, পছন্দ হলে বিনি পয়সায় তুলে নেবে। আর পাত্তর তো হিরের টুকরো! তবে আরও একটি আছে, অবিশ্যি অতটা ধারালো নয়, একটু মাটো—!

না, আর ওর কথা শোনা গেল না।

নির্ঘাত মা ওঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে পুরলেন। কিন্তু এ কোন স্বর্গলোকের কাহিনি!

পৃথিবীতে আজও সুপাত্র আছে? তারা এখনও সুন্দরী পাত্রী খুঁজে বেড়ায়? এখনও তারা বিনিপয়সায় তুলে নেবার উদার সংকল্প ঘোষণা করে?

মা নিশ্চয় মন্টুকাকার কান বাঁচিয়ে আলোচনা চালাতে গেলেন। জানি মেয়েদের বিয়ে দেবার ইচ্ছে মা-র মনে এখনও ফল্গুধারার মতো বালুর তলায় বইছে। কিন্তু হতাশ হয়ে গেছেন।

কিন্তু দু-জন কে কে? দিদির কি আর বয়েস আছে? ওকে কি আর কেউ পছন্দ করবে? তাহলে সরি আর আমি ছাড়া কে?

কিন্তু হিরের টুকরো কার ভাগে পড়বে তাহলে?

মেজোজ্যঠি তো একেবারে সরিকে সাব্যস্ত করেই এসেছেন, সরির নাকি ছেলেবেলায় রঙের দিকে চাওয়া যেত না। বাড়াবাড়ি বলাটা আমাদের বাঙালির মেয়েদের একটা রোগ। ওগো মেজোজেঠি, এখন চেয়ে দ্যাখো সে-রং আর নেই। মেঘে মেঘে বেলা ওরও গেছে।

কী হল? মা ডাকছেন নাকি? হ্যাঁ। তাই মনে হচ্ছে। দেখি।

বনেদিবাড়ির মজবুত বনেদেও ঘুণ ধরেছে! একটু দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় বনেদের সেদিকটা আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে।

একতলার ভাড়াটেরা বাড়ি সারিয়ে দেবার জন্যে বার বার তাগাদা দেয়, তিনতলার বাসিন্দারা বৃষ্টির সময় ছাতে জল পড়ছে বলে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে যায়।

কিন্তু কোথায়-বা প্রতিকার, কোথায়-বা কী ! কে কার কথায় কান দিচ্ছে? বাড়ির চার শরিকের তিন শরিকই তো বাইরে, বাকি যে-শরিক আজও তার রোগখিন্ন দেহ নিয়ে এবাড়িতে পড়ে আছে, পৈতৃক বাড়ি সারিয়ে আবার মজবুত করে তোলবার গরজ তার নেই।

সে তো অপুত্রক।

তাই জীর্ণ বাড়ি জীর্ণতর হতে থাকে, নীচতলাটা আরও ঘেঁষাঘেঁষি দোকানে দোকানে কুৎসিততরো লাগে, এবাড়ির মাটিতে যারা মানুষ, আর এবাড়ির ইট কামড়ে আজও যারা পড়ে আছে, প্রতিনিয়ত তাদের অনুচ্চারিত মুখরতা এই ভাঙা ইটের খাঁজে খাঁজে খোদাই হতে থাকে।

আচ্ছা, যেদিন এই জীর্ণ অট্টালিকাখানা আর বয়সের ভার সামলাতে পারবে না, হুমড়ে পড়ে যাবে, সেদিন কি দেয়ালে গাঁথা এই লক্ষ লক্ষ অনুচ্চারিত ক্ষুব্ধ জ্বালা উচ্চারিত হয়ে উঠবে? সেদিন কি আকাসে বাতাসে সে-শব্দতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে? পৃথিবীর সহস্র সহস্র মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বে ওই অতৃপ্ত মানুষগুলোর মনের কথা? যে-মানুষগুলো কেবলমাত্র সম্পর্কের সূত্রে এক জায়গায় পড়ে আছে, হৃদয়ে হৃদয়ে যাদের সামান্যতম যোগসূত্রও নেই।

কে জানে কতদিনে ওই পুরোনো বনেদি একেবারে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে। কবে হুড়মুড়িয়ে পড়বে বাড়িটা? হয়তো সহজে পড়বে না, ওই ঝুলেপড়া কার্নিশ নিয়ে আরও দু-এক পুরুষ কাটিয়ে দেবে। কে জানে তখন যারা থাকবে, তারা নিশ্চিন্ত নিরুদ্‌বেগে ঘুমোবে, না বিনিদ্র রাত্রিকে এমনই মুখর করে তুলবে মনে মনে কথা বলায়।

বোধ করি এই মনে মনে কথা বলারও একটা নেশা আছে, নেশা আছে চুলচেরা বিচারে সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখার। আর বুঝি এ নেশায় সংক্রামকতাও আছে, তাই এবাড়ির চাকর বৈকুণ্ঠও একলা ঘরে বসে হাসে কাঁদে কথা বলে।

।। বৈকুণ্ঠের কথা ।।

টাক ডুমা-ডুম ডুম! নাকুর বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমা-ডুম ডুম!

এবাড়ির সকলে নাকুর বদলে নরুন নিয়ে নাচছে। একধার থেকে সব্বাই! নাকুর বদলে নরুন! আমিও বাদ যাইনে। নইলে আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠবিহারী মণ্ডল, এবাড়ির ভাতে হাড় গড়ল, মাস গজাল, আর এবাড়ির ভাত খেতে খেতেই যার গোঁফের চুলে পাক ধরল, সেই আমি এবাড়ির চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছি। কেন?

ওই নরুন!

এ সংসারে এসেছি তো আজ নয়, সেই যখন মন্টুদাদাবাবু এই এতটুকুটি, সবে বই বগলে নে ইস্কুল যেতে শিখেছে, তখন আমি মায়ের সঙ্গে এসে এবাড়ির হাঁড়িতে ভরতি হলাম। মন্টুদাদাবাবুর চাইতে বোধ করি বছর দু-একের ছোটোই হব আমি। বেশ স্পষ্ট মনে আছে, গাঁয়ে থাকতে তখনও কোমরে একগাছা কালো ঘুনসি ভিন্ন আর কিছু পরতে ধরিনি। বাবা মরতে মা দুঃখের জ্বালায় আমাকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে এল কলকাতায়, এসে বাসন মেজে খাবে বলে।

স্মরণশক্তিটে আমার বরাবরই ভালো, তাই জ্বলজ্বলাট মনে আছে এবাড়িতে প্রথম এসে মা অনেক দুঃখুগাথা গেয়ে যেই আমাকে আঁচলঢাকা খুলে কোল থেকে নামিয়ে গিন্নিকে প্রেণাম করতে গেল, গিন্নিমা শিউরে উঠে বলে ফেলল, 'একী বাছা, একী! এতবড়ো ছেলের পরনে কিছু নেই কেন? একটু কানিও জোটেনি?'

গিন্নিমার মুখের সেই তিরস্কার আর চোখের সেই শিউরানি দেখে উলুঙ্গু ছেলেটা যেন মরমে মরে গেল। তখন বড়ো বড়ো কথা বোঝবার বয়েস তার হয়নি, তিন্তু তদ্দণ্ডে এইটুকু বুঝে ফেলল পেটে ভাত না থাকার চেয়ে হাজার গুন লজ্জা পরনে কাপড় না থাকা!

ভাবলে অবিশ্যি বিশ্বাস হতে চায় না সেই ছেলেটা এই আমি। মনে হয় দূর থেকে বসে আর কাকে দেখছি। জন্মজন্মান্তর বলে যে কথা আছে, সে আর অন্য কোনো জগতের ব্যাপার নয়, এই জগতেরই ব্যাপার! আমি তো বাবা এই সার বুঝি। সেই হাতে-পায়ে খড়িক্ষ্মওঠা, নাকে কফ পড়া, ন্যাড়ামাথা ল্যাংটা ছেলেটা কি কম বার জন্ম হল।

প্রেথম জন্মান্তর তো তক্ষুনি।

গিন্নিমা কাকে ডেকে কী বললেন, তারপর একজন বউ মতন কে এসে আমার সামনে একটা পেন্টুলেন ফেলে দিল। গিন্নিমা আমার মাকে ডেকে বললেন, 'নে বাছা আগে ওই ইজেরটা তোর ছেলেটাকে পরা তবে কথা ক। তাকাতে পারছিনে।'

মা অনেক কসরত করে পেন্টুলেনটা আমার পরল। খুব সম্ভব সেটা মন্টুদাদাবাবুরই পুরোনো পোশাক। পেন্টুলটা আমার হাঁটুর নীচে অবধি ঝুলতে লাগল এও মনে আছে। আর মনে আছে সেটা ছিল সার্টিনের। তখন বুঝিনি পরে বুঝেছি। জন্মান্তর আর কাকে বলে?

বাসন মাজার কাজে ভরতি হবার জন্যেই এসেছিল মা, কিন্তু মায়ের কপাল ভালো, তাই ঝাড়ামোছের কাজ জুটল। বাসন তো এবাড়ির প্রেকাণ্ড-কাণ্ড, দু-দুটো গুলিভাঁটা খোট্টা চাকরে সে-বাসন মাজতে হিমসিম খেয়ে যায়। মাকে যিনি গাঁ থেকে নিয়ে এসেছিল, সেই পদ্মমাসি ছিল গিন্নিমার খাস-ঝি। পদ্মমাসিই আমাকে শিখিয়েছিল গিন্নিমাকে দিদিমা বলতে।

তা কদিন-বা ডাকলাম।

আমি একটু বড়ো হতে হতেই তো জগদ্ধাত্রী প্রিতিমে সগ্‌গে চলে গেলেন। গিন্নির পোস্ট পেলেন

বড়োমামি, মন্টুদাবাবুর মা। সংসারের গিন্নিপনা তাঁর ঘাড়ে পড়ল, আর ঘাড়ে পড়ল খামখেয়ালি বুড়ো শ্বশুরের বায়নাক্কা মেটানো, কোলের ছেলের আবদার পোয়ানোর সময় পেয়ে উঠত না বড়োমামিমা। অথচ ছেলে তেমনি দুদ্দান্ত।

চব্বিশ ঘণ্টা এটা চাই, ওটা চাই, এ খাব না ও নেব না, ডাকহাঁকের জ্বালায় অস্থির। তা'পর যে কোথায় জামা জুতো ফেলেছে, কোথায় বই স্লেট ফেলেছে, দেখেশুনে বড়োমামি একদিন বলল, 'দেখ বৈকুণ্ঠর মা, তোর ওই বৈকুণ্ঠবিহারীকে আমার মন্টুর খিদমদগারের চাকরিতে বহাল করলাম। সর্বদা মন্টুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, ওর জামা-জুতো গোছাবে, বই সেলেট ঠিক করে রাখবে। ঘুড়ি লাটাই লাট্টু মারবেল হাতে হাতে জোগান দেবে, খাসচাকর হবে ও, তার জন্যে মাসে আট আনা করে পাবে।'

মা কেতার্থ হয়ে বলল, 'আপনার কি দয়ার শেষ আছে বড়োবউদিদিমণি!'

কিন্তু আড়ালে এসে রান্নাঘরের বাটনাবুটনি ঝিকে বলেছিল মা, 'দেখলি হাজারির-মা, বড়োবউদির আক্কেল? আমার এই দুধের বাছাটাকে কিনা ওনার ওই দুদ্দান্ত দস্যি ছেলের খিদমদগার করে দিল। ওই ডাকাতের পায়ে পায়ে ঘুরতে হলে ছেলে আমার বাঁচবে?

বাটনাবাটুনি কী বলল, 'আহা বুঝছিস না, তোর ছেলেটা তো দু-বেলা দু-মুঠো খাচ্ছিল, বিনি মাগনায় দেবে কেন খেতে? গিন্নিমায়ের মতো উঁচু নজরটি তো না, এদের হল যে নজর নীচু।'

মনিবের নজর উঁচু-নীচু নিয়ে ঝি-চাকরদের মহলে এরকম অনেক ব্যখ্যানাই হত। আর শুধু কি নম্বরের উঁচু নিয়েই? তখন বয়েস কম বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বলেছি তো আমার স্মরণশক্তিটে বরাবরই ভালো, তাই এদের কথাবার্তার হাবভাব ঠারঠোরগুলো মনে গাঁথা থাকার দরুন বয়েস হতে অনেক রহস্যই ভেদ করতে পারতাম। আহা! মনিবরা যদি বুঝত, যেসব ঝি-চাকররা তাদের সামনে জুতোর সুকতলা, তারাই আড়ালে কত জুতো মারে তাদের উদ্দিশে!

আর সত্যি বলতে, অল্প বয়সেই অত পেকে উঠেছিলাম ওই জন্যেই। ওই দাসী চাকরমহলে বসে বসে মনিবনিদের কেচ্ছা শুনতে শুনতে।

সে যাক, তবু ছিলাম আমি ভালোই। ছ-সাত বছর বয়েস থেকে চাকরগিরি করতে হয়েছে বলে আক্ষেপ কিছু ছিল না। বাবুদের চাকরগিরি করাই তো আমাদের মোক্ষ। ওর বেশি আর কিছু চাইবার আছে নাকি? ঝিয়ের ছেলে চাকর হব না তো কি রাজা হব?

যদিও মন্টুদাদাবাবু আমাকে যা নির্যাতন করত, তা মনে করলে এখনও বুকটা ফেটে যায়, তবু আশ্চয্যির কথা, তাকে আমি ভালোও বাসতাম। দস্তুরমতো প্রাণতুল্য ভালোবাসতাম! আর নিজেকে খুব মান্যগণ্য ব্যক্তি বলে মনে হত। মন্টুদাদাবাবুর সঙ্গে সদাসর্বদা থাকতে পাওয়াও তো কম গৌরবের কথা নয়। কেতকেতার্থ মনে হত নিজেকে।

শুধু বড্ড যখন অত্যাচার করত, আঁচড়াত, কামড়াত, বুটজুতোসুদ্ধ পায়ে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে নাথি মারত, তখনই মনে হত মায়ের সঙ্গে আবার গাঁয়ে ফিরে যাই। আর মনে মনে শাপশাপান্তি করতাম ওই পায়ে তোর কুড়িকুষ্ঠি মহাব্যাধি হবে।

এখন ভাবি আমার সেই শাপশাপান্তির ফলগুনোই এখন ফলছে না তো? কথায় বলে 'মনস্তাপে যদি চণ্ডালে শাপে, এড়াতে পারে না ব্রাহ্মণের বাপে।'

আবার ভাবি তাই কি আর হয়! মহাব্যাধি হয় যার যার আপন আপন কর্মফলে। তা ছাড়া ও-তো তখন অবোধ, আমিও তখন অজ্ঞান। আর সবসময়ই যে নির্যেতন করত তাও তো নয়? দয়াধম্মও করত, নেকনজরেও দেখত। খেলার জিনিস একটু পুরোনো হয়ে গেলেই বলত—'তুই নিগে যা।' আর সব থেকে আঠা ছিল মন্টুদাদাবাবুর পেসাদে! কী খাওয়ায়, কী পরায়, সব তাতেই আমি পেরোয়

মনিবের ছেলের সমান সমান হয়ে উঠলাম। জরিমখমল সিলিক সাটিন সবই পরতে পেয়েছি আমি। একটু ছিড়েছে, কী একটু ফুটো হয়েছে, অমনি টান্ মেরে ফেলে দিত মন্টুদাদাবাবু, —এ পরব না, এ বিচ্ছিরি, এ ছাই' বলে। ব্যাস, সে-জিনিস সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঁড়ারে এস জমা হত। জুতোই কি কম জোড়া পরেছি। আর অন্য অন্য ঝিরা এর জন্যে কম হিংসে করেছে মাকে?

তবু তো একেবারে ভেতরের কথা জানত না তারা। মন্টুদাদাবাবুর যা-কিছু খাবার বরাদ্দ থাকত তার অর্ধেকের ওপর যে আমারই ভোগে লাগত একথা কি ওরা জানত?

না বাবু না, ভোগা দিয়ে কোনোদিন খাইনি আমি, মন্টুদাদাবাবুর উৎপীড়নেই খেতে হয়েছে। বড়ো মানুষের ঘরের যা দস্তুর, ছেলেপুলেদের খিদে না-হতেই ঠেসে ঠেসে খাওয়ানোর দরুন তাদের জ্ঞানাবধিই খাওয়ায় আতঙ্ক জন্মে যায়। মন্টুদাদাবাবুরও তাই ছিল। খাচ্ছি বলে ভালোমানুষের মতো নে আসত আর আড়ালে এসে আমায় তম্বিকরত, 'এই বৈকুণ্ঠ শিগগির এক মিনিটে এগুলো খেয়ে ফ্যাল বলছি।'

দেখেশুনে বুক কেঁপে উঠত আমার। সে কি সোজা খাবার!

সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীর, ছানা, হরেকরকম মিঠাই মণ্ডা, ফল পাকড়, মেওয়া, বাটি বাটি ঘন দুধ, গোছা গোছা লুচি। কাকুতিমিনতি করে বলতাম, হেই দাদাবাবু, তোমার পায়ে ধরি, তুমিই খেয়ে ফ্যালো। বড়োমামিমা টের পেলে আর আস্ত রাখবেনি আমায়। মন্টুদাদাবাবু চোখ পাকিয়ে বলত, 'অ্যাই পাজি, তুই-না আমার হুকুমের চাকর? আমি যা বলব তাই তোকে শুনতে হবে তা জানিস? আমি যদি বলি মাটি খা, তো মাটিই খাবি। যদি বলি সন্দেশ খা, তো সন্দেশ খাবি। আমার হুকুম, খা শিগগির!'

আমি ভয়ে ভয়ে কোঁৎকোঁৎ করে গিলে ফেলতাম সেইসব সুখাদ্যি দ্রেব্য। ঢকঢক করে চুমুক দিতাম গেলাস গেলাস দুধ, দেরি করবার জো ছিল না। তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার সুখ কখনো পাইনি! আর খাওয়া হয়ে গেলেই আর একবার চোখ রাঙাত মন্টুদাদাবাবু, 'এই পাজিটা, কাউকে যদি বলে দিবি, তো তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।'

আমার সঙ্গে এইরকমই কথাবার্তা ছিল তার। এখনও আছে।

কথাতেই তো আছে—আগ ন্যাংলা যেদিকে যায়, পাছ ন্যাংলা সেদিকে ধায়—বাড়ির কর্তাদের চাকরবাকরদের প্রিতি যা ব্যাভার দেখছে জন্মাবধি, তাই শিখেছে।

কিন্তু ওরকম বললে কী হবে, ভালোও আমায় বাসত বই কী। এক-এক দিন তো, হয়তো যেদিন আমার ওপর নেকনজর পড়ত, এমনও ধরে বসত, 'বৈকুণ্ঠ আজ আমার কাছে শোবে।'

শোনো কথা। পাগল, না খ্যাপা।

শুতে অবিশ্যি পাইনি কোনোদিন। শেষ অবধি বড়োমামি নানান্ লোভ দেখিয়ে ছেলেকে বাগে আনতেন। সে-লোভ আর কিছু নয়, 'আচ্ছা বেশ, বৈকুণ্ঠকে তোর মতন থালায় খেতে দেব।...আচ্ছা বেশ, বৈকুণ্ঠকে তোর মতন নাটাই কিনে দেব।'

তা দিতও। আর না দিলে কি রক্ষে ছিল? বড়োমামি ভুলে যাবার চেষ্টা করতে গেলেও মন্টুদাদাবাবু কি ভুলতে দিত।

তাই বলছি ছিলাম ভালোই। সে যে কেত্তন গানে বলে না, 'বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ', আমার অবস্থা ছিল সেই প্রেকার। কিন্তু তাই-বা মন্দ কী? গরিব আমরা, আমাদের হাতের জন্যে তো সর্বদাই দড়ির ব্যবস্থা, মাঝেমধ্যে বড়ো মানুষের খেয়ালে যদি 'হাতে চাঁদ' জোটে, সেটাই মস্ত লাভ।

লাভ আমার অনেক দিকেই হয়েছিল। এই যে দু-পাতা পড়তে শিখেছিলাম, যার জন্যে আজ শুধু

ঘর মোছা বাসনা মাজার চাকর না হয়ে বাবুদের নায়েব গোমস্তার কাজ করছি, সেই পড়তে শেখাও তো মন্টুদাদাবাবুরই কৃপায়।

এবাড়ির আর পাঁচটা ছেলের মতোই মন্টুদাদাবাবুও ছিল পড়াশোনায় মা 'জননী' কাজেই ইস্কুলে খুব মান্যিমান ছিল না। এ তো আর আমাদের গাঁয়ের ইস্কুল না যে, বাবুদের বাড়ির ছেলের সাতখুন মাপ। এ হচ্ছে গে কলকাতা। এখেনে এবাড়ির মালিকদের মতন বড়োমানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে আছে।

তা সেই ইস্কুলে মাস্টারের কাছে শাস্তি খেয়ে আসার শোধ তুলত দাদাবাবু আমায় 'পেড়ার' করে। আমাকে ছাত্তর সাজিয়ে নিজে মাস্টার সাজত, আর পড়া বলতে না পারলেই বেতের ওপর বেত!

কোথা থেকে যেন একটা বেতও জোগাড় করেছিল। কিন্তু যাই হোক, হাতের সুখ করবার শখেই হোক, আর শাসনের সুখ পাবার জন্যেই হোক,—অ আ ক খ—অচল অধমগুলো তো শিখিয়েছিল আমাকে! না শিখলে, এতবড়ো বাড়িখানার ইনচার্জো হতে পারতাম আমি? এবাড়ির এই এত ভাড়াটের ভাড়া নেওয়া, রসিদ দেওয়া, সমস্তর ভারই তো আমার। নীচেরতলার বাজার, দোকানের ভাড়াটেগুলো নিয়ে কি কম ঝামেলা? তাগাদা, শাসানি, উঠিয়ে দেবার ভয়, এসব না করলে ভাড়া বার করে কার সাধ্যি? অথচ যেসব শরিকরা বাসা ভেঙে অন্যত্তর বাসা বেঁধেছেন, তেনারা টাকা পেতে একটু দেরি হলেই চিঠির ওপর চিঠি দেবেন, 'বৈকুণ্ঠ, মনি অর্ডার এখনও এল না কেন? বৈকুণ্ঠ, অবিলম্বে ভাড়ার টাকা পাঠাও।'

অবিশ্যি ভাড়াটেরা মাঝে মাঝে আমায় টাকাটা সিকেটা দেয়ও, দেরির ফাইন হিসাবে। আর নতুন কোনো ভাড়াটে এলে দেয় সেলামি। যা সব আজকাল হয়েছে। ওইসবের লোভেই পড়ে আছি। এত অনাছিষ্টি অনাচার সয়েও আছি।

যাবই বা কোথায়? এবাড়ি ভিন্ন এই বয়সে আর কোথাও কি টিকতে পারব? চাকরের এত বাবুয়ানা সইতে যাবে কে? চাকর মনিব ভাবই কি আনতে পারব?

এবাড়িতে সে-ভাব তো শিখতে হয়নি। মন্টুদাদাবাবুর খেয়ালের তান ধরতে শিখেছি শুধু। তাই কখনো মনিবের জুতো খেয়েছি, কখনো মনিবের জুতো পায়ে দিয়েছি।

কথায় বলে বাল্যকালের ভালোবাসা। সেই বাল্যকাল থেকে যে মন্টুদাদাবাবুর ভালোবাসায় মজেছি, সে-ভালোবাসা তো ছাড়তে পারলাম না। তাই এ বাসাও ছাড়তে পারলাম না। নইলে মেজোবউদিদি কি যাবার সময় কম ভাংচি দিয়েছিল আমায়!

মন্টুদাদাবাবুকে ভালোবাসতাম বলেই বোধ হয় ছোটোবউদিদিকে কোনো দিনই সুচক্ষে দেখতে পারিনি। সুবিধে পেলেই তেনাকে যন্ত্রণা দেবার তাল খুঁজতাম। এতটুকু বকুনি খেলেই কেঁদেকেটে পড়তাম, এবার আমার বিদেয় দ্যান বলে।

তা সবক্ষেত্রে আমারই জিৎ হত।

মন্টুদাদাবাবু আমাকে পিঠে চাপড়ে তোয়াজ করে বখশিশ দিয়ে ঠান্ডা করত, আর বউদিমণিকে বকাবকি করত। বউদিদিমণিও তাই দু-চক্ষের বিষ দেখত আমায়। যেন সতিন সম্পর্ক। সোয়ামিসুখ বলতে তো কিছুই ছিল না, তার উপর চাকরের জ্বালা। আহা তা বেশিদিন আর জ্বালা সইতে হয়নি মানুষটাকে। মরমে মরে মরে কালরোগে ধরল। আর যখন এবাড়ির জ্বলজ্বলাট সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়ে যে-যার সরে পড়ল, কখন যেন সরে পড়বার খ্যামতার অভাবেই একেবারে আসল ঠাঁই পালিয়ে বাঁচল।

এখন মাঝেমধ্যে আক্ষেপ হয়, আহা সতীলক্ষ্মীকে কেন উৎখাত করেছি। তিনি বেঁচে থাকলে কি আর সংসারের এমন করে নেপোয় দই মারত বসে বসে।

আক্ষেপ অনেকের জন্যেই হয়।

কী সব মানুষ ছিল এক-একটা! এক-এক করে সব মনে পড়ে গিন্নিমা, কত্তাবাবু, বড়োমামাবাবু, মেজোমামাবাবু, ছোটোমামাবাবু, বড়োদাদাবাবু। আবার অন্যদিকে যাদের মনে পড়ে, যেমন তোমার গে হরিঠানদি, সোমড়ার ঠাকুমা, ন-পাড়ার রাঙা-ঠাকরুন, কত বলব। আর প্রেজাপতির মতন রঙিন পাখনামেলা দিদিমণি বউদিদিমণিদের ঝাঁকের কথা তো বলে কাজ নেই।

কত জনের কত লুকোচুরি কত কুকম্মের সাক্ষীই যে ছিল এই বৈকুণ্ঠবেহারী। আমায় দেখতে পারত না কেউ, কিন্তু কাজ করাতেও ছাড়ত না। কাজ করাত খোশামোদ করে, বখশিশ দিয়ে।

দেখতে পারত না আমি পষ্ট বক্তা মুখফোঁড় বলে, আর কাজ করাত অসাধ্যিসাধক ছিলাম বলে। রাত বারোটায় বোতলে সট পড়লে, ঠিকমতন বোতল এনে হাজির করবার খ্যামতা আর কার ছিল এই বৈকুণ্ঠ ছাড়া? তাপর তোমার গে প্রেমপত্তর চালাচালি? এঘর থেকে ওঘর, একতলা থেকে তিনতলা, অন্দর থেকে সদর, কত পত্তরই চালাচালি করেছি!

তা ফাঁস আমি কারুর কিছু করিনি কখনো। কেন করব, বিশ্বাস করেই যখন আমাকে দেয়। কিন্তু পাছে ফাঁস করে দিই এই ভেবে যখন ওরা আমায় গুরুঠাকুরের মতন তোয়াজ করত, তখন আমি সুযোগ ছাড়তাম না। কেন ছাড়ব?

ধর্মটা খোয়াচ্ছি যখন, তখন তার পরিবর্তে অর্থটা নেব না কেন? তাই মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করতাম সকলের কাছে। বখশিশ মিলত আরও একটা কৌশলে। এর নিন্দে ওর কাছে, আর ওর নিন্দে এর কাছে করতে শিক্ষা করাও একটা বিদ্যের মতো বিদ্যে। এইসব একানুবর্তী বড়ো বড়ো সংসারের ঝি-চাকরদের ও-বিদ্যে যাদের জানা আছে, তাদের পোয়াবারো!

তারাই পুজোয় কল্কাপাড় শান্তিপুরি বখশিশ পায়, শীতে শাল পায়। আমি তো অন্তত পেতাম। ঘরে ঘরে আলাদা আলাদা।

বেশ চলছিল। কাল করল ওই মামলায়, মামলা বেধেই সব উচ্ছন্ন গেল। আর উচ্ছন্ন গেল—যাক গে মরুক গে পষ্টাপষ্টি নামটা আর করব না। ঝগড়া করুক বিবাদ করুক, তবু এক ঝাড়ের বাঁশকে সওয়া যায়, কিন্তু আলাদা ঝাড়ের বাঁশ যদি ঢুকে পড়ে মাথা চাড়া দিতে চায়, গা জ্বলে কি না?

ঘরজামাই পিসেমশাইকে দু-চক্ষে দেখতে পারতাম না আমি, আর দু-চক্ষের বিষ দেখতাম শচীদাদাবাবুকে। ওরা তম্বি করতে জানত, বখশিশ করতে জানত না। ওরা ছোটোঘর।

আরও ছোটো ঘর থেকে মেয়ে এল বউ হয়ে।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে উর্বশী।—হ্যাঁ, ওই যা বললাম, রূপে লক্ষ্মী, গুণে উর্বশী। কিন্তু প্রেথম প্রেথম কর্তাবাবু যদ্দিন ছিল, ওই লক্ষ্মীমূর্তিখানিই প্রকাশ ছিল। মুখে যেন দেবীপিরতিমের মতন আলো করা ভাব, শান্ত নরম চলন-বলন, মাথায় ঘোমটা। আর তার মধ্যেই কাজ কত! যেন চরকি ঘুরছে।

অস্বীকের করব না, সুখবউদিমণির তখনকার মূর্তি দেখে আমি একেবারে ভক্তিতে বিভোর ছিলাম। কেবল মনে হত আমার মন্টুদাদাবাবুর বউটি কেন এমন হল না। শচীদাবাবু আর মন্টুদাবাবু দু-জনে তো বয়সে খুব বেশি তফাত নয়, আর বিয়েও হয়েছে দু-এক বছরের আড়াআড়ি। তবে না কি ছোটোবউদিমণি এই সুখবউদির চাইতে বয়সে অনেকটা ছোটো ছিল। বোকাসোকা রোগা, কাজেকম্মে এতটুকু দড় নয়, অথচ তার ভেতরেই আমার ওপর ষোলো আনা হিংসে! ওই যে, আমাকে নইলে যে মন্টুদাবাবুর একদণ্ড চলত না তাতেই। তিনি যদি অসাব্যস্ত হাতে কিছু করতে যেত সোয়ামির জন্যে,

টুদাবাবু অমনি হাঁ-হাঁ করে পড়ত, 'তুমি আবার কী করতে? ও তোমার দ্বারা হবে না, ছেড়ে দাও, বৈকুণ্ঠকে ডাকো।'

বাস, শুরু হয়ে যেত কান্নাকাটি।

এইসব মেয়েমানুষ আপনার বুদ্ধির দোষেই কষ্ট পায়। বোঝে না যে, ফুর্তিবাজ ব্যাটাছেলেরা কখনো এমন কান্নাপ্যানপেনে পরিবার পছন্দ করে না।

সুখবউদি-ঠাকরুনকে যে তখন আমি অত ভক্তিছেদ্দা করতুম তার কারণও ওই। কাঁদাকাটার মতন খলোমি ওনার ছিল না। অমন যে হাড়জ্বালানো সোয়ামি, তা কখনও দেখিনি কাঁদছে কি কারুর কাছে া-হুতোশ করছে।

অবিশ্যি লোকে আমার কথা শুনলে বলতে পারে, তুই চাকর নফর মানুষ, মনিবের অন্দরমহলের সকল সমাচার জানিস না কি?

বললে কিন্তু ঠকতে হবে। আমার উত্তর পড়ে আছে। চাকর নফরের মতন ছিলাম না আমি কোনো কালেই। মন্টুদাবাবুই যা বলত, 'তুই আমার হুকুমের চাকর।' নইলে আর সবাই আমায় সমেহা করত। কত্তাবাবু পর্যন্ত আদর করে ডাকত, 'অ্যাই শালা বৈকুণ্ঠবিহারী।' বলত 'হ্যাঁ রে তোর লক্ষ্মীটাকে বুঝি বৈকুণ্ঠ থেকে আর পাড়িসনি এজন্মে?'

বে থা হয়নি বলে বলত আর কী!

তা কে আর আমায় আগ্রহ করে বে দিচ্ছে? মা তো কবে মরে জুড়িয়েছে। তা মা মরে আরও যেন রাজ্যিপদ পেয়েছিলাম আমি। সবাই বলত 'আহা'! আর বলবে নাই-বা কেন, চিরটাকাল তো এই অন্দরমহলেই কাটিয়েছি। অন্দরের সকল অন্ধিসন্ধিই আমার গোচরে। সে কী-বা ঘরবাড়ি, উঠান-দালান, চোরকুঠুরি পাতালঘরের, আর কী-বা মানুষের মনের।

হ্যাঁ কী ভাবছিলাম? ও, লক্ষ্মী থেকে উর্বশী হওয়ার গল্প।

কত্তাবাবু গেলেন, হাড়ির হাল হয়ে উঠল বাড়ির, তখন কী দুঃখেই কেটেছে সুখবউদির! ঠিক যেন সংসারের কেনা বাঁদি। মুখ বুজে গাধার মতন খেটে যাচ্ছে, অথচ ছেলেপেলে নিয়ে পেটে ভালো করে খেতে পায় না, পরনে উচিতমতন কাপড়জামা জুতো পায় না। উদিকে শচীদাবাবুর চোদ্দোপোয়া নবাবির কামাই নেই।

সেইসময় ছোটোবউদির এল মরণরোগ। আর তাতেই চাকা ঘুরল। সাধে কি আর বলে, কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস! অবিশ্যি মিথ্যে বলব না, সেবাটা তেনার খুব করেছিল সুখবউদিদি। মা-বোনে অমন পারে না। কিন্তু দক্ষ আড়ালে দাঁতে দাঁতে পিষে বলত, 'ওসব ছল ছল! পুরুষকে হাত করবার কৌশল।' তখনও আমি দক্ষর কথা বিশ্বেস করতাম না। ওকেই দুষতাম।

তারপর ক্রমশই দক্ষর কথা ফলল। লক্ষ্মীর নিজমূর্তি বেরোল।

তবু অনেক দিন পর্যন্ত যেন গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছি। কিছুতেই ধরতে পারিনি স্বরূপটা সত্যি কী। লোকলোচনের অন্তরাল থেকে হাঁ-করে মুখপানে তাকিয়ে দেখতাম। দেখতাম সেই তো মুখে এখনও দেবী পিরতিমের মতন আলো আলো ভাব। অথচ মন্টুদাদাবাবুর সামনে এলেই—। ক্রমশ ভুল ভাঙল! দক্ষ মেয়েমানুষ, দক্ষ বুঝেছিল। মেয়েমানুষরা মেয়েমানুষকে যেমন চট করে চিনতে পারে, ব্যাটাছেলেরা তেমন পারে না।

ভুল ভাঙতে ভাঙতে শক্ত হয়ে উঠলুম। যেনাকে আগে মনে মনে [illegible]
তেনাকেই ঘেন্না করতে ধরলাম।

না করে করব কী ? মন্টুদাবাবুর লোহার সিঁদুকের চাবি হাতিয়ে উনি যখন একটি একটি করে সোনা-রুপোর ভার আমার হাতে তুলে দিতে থাকে বিক্রমপুরে পাঠাবার জন্যে, তখনও কি ভক্তি উথলে উঠবে আমার? তোর হাতে মন্টুদাবাবু সর্বস্ব সঁপে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে, আর তোর এই ব্যভার?

যখন দেয় তখন সে কত ভনিতে!

'ওরে বৈকুণ্ঠ, আমার ছেলেদের এক বার মানুষ হতে দে', এইসমস্ত আমি আবার কিনে, গড়িয়ে, সিঁদুকে মজুত করে রাখব।'

বৈকুণ্ঠ যেন তেমনি ন্যাকা, তাই ওকথা বিশ্বেস করবে! মনে মনে টের পাচ্ছি যে, মন্টুদাবাবুর শেষদিন ঘুনিয়ে এসেছে? মরে গেলেই তো সব ফুরিয়ে গেল, তখন কে কার কড়ি ধারে।

দাবিদার কেউ থাকত মন্টুদার, তাহলেও-বা হয়তো একবার খোঁজপত্তর করে বলত, 'কইগো আমাদের বখরা কই? এই বাড়ির বখরাটুকুই যে কী করেছে কে জানে! হয়তো বা কোন ফাঁকে আপনার ছেলেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। ও মেয়েমানুষের অসাধ্যি কিছু নেই। কিংবা হয়তো ওটুকু এযাবৎ লিখিয়ে নিতে পারেনি, তাই এখনও ধোপদুরস্ত শাড়ি পরে, পান খেয়ে টোঁট রাঙিয়ে হেসে হেসে দাবা খেলে।

ছি ছি! এতখানি বয়েস হয়েছে!

মেয়ে-ছেলেগুলোর বয়সে বে হলে একঘর নাতি-নাত্‌নী হত।

তাও মরুক গে, ওসব আমার গায়ে লাগত না, দক্ষর মতন অত শাপমুন্যি আসত না। সত্যি বলতে কি মন্টুদাবাবুর মুখ চেয়েই সয়ে যেত সব। বলেছি তো 'বাল্যকালের ভালোবাসা'! বউ মরে ইস্তক মন্টুদাবাবুর বারবোলা ভাবটা তো একেবারেই গিছলো, মনমরা মনমরা হয়েই থাকত। ভাবলুম, যাক গে মরুক কে, দুটো হাসি গল্প ঠাট্টামশকরা নিয়ে মনটা প্রেফুল্ল থাকে থাক। দেওর ভাজ সম্পর্ক তো বটে!

তবে ওই ছলে ক্রেমাগত ওনার কাছ থেকে দুইয়ে নেওয়াটায় গা জ্বলে যেত। ছেলেদের খাওয়া-পরা লেখাপড়া সবই তো আস্তে আস্তে ওনার ঘাড়ে চাপতে লাগল!

তারপর একেবারে সব চক্ষুলজ্জাই গেল।

বটবৃক্ষের বাসা ছেড়ে সকল পাখি উড়ে গেল, উনিই রয়ে গেলেন কোটরের আশ্রয়ে! ওনার সমগ্র সংসারটাই হয়ে উঠল যেন মন্টুদাবাবুর সংসার!

তবুও সব সহ্য হয়ে গেছে, সহ্য হয় না এই সিঁদুক খুলে মাল পাচার। আহা ছোটোবউদিদির গায়ের গয়নাগুলো পর্যন্ত!

তবে কিনা একথা ঠিক, লোকে শুনলে বলতে পারে, বৈকুণ্ঠ, তুই-ই তো নষ্টের গোড়া! তোর সাহায্যে না পেলে, ও গেরস্থঘরের মেয়েমানুষ, ওর সাধ্যি কী ছিল ঘরের মাল লুকিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে বেচা। এও বলতে পারে, প্রেথম যেই এ ঘটনা হল, তুই কেন চুপিচুপি তোর মন্টুদাবাবুকে বলে দিয়ে সাবধান করে দিলিনে?

কিন্তু সত্যি কথা আমি তা করিনি। আমিই কি বুঝছি না মন্টুদাবাবুর দিন ঘুনিয়ে এসেছে। আর কখনো সেরে শক্তসমর্থ হয়ে উঠে যে আপনার সম্পত্তি মিলিয়ে দেখতে বসবে, এ বিশ্বাস নেই, তবে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-টা দিই কেন? তেনার অত ভালোবাসার সুখবউদির এই প্রবৃত্তির কথা টের পেলে কি আর তিলার্ধ বাঁচবে মানুষটা।

আর আসল কথাটাও বলি, মনের অগোচর তো পাপ নেই। বউদিদিমণির চুরির ফসলে আমার ট্যাকও তো কিছু ভরছে। আমি তো আর ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নই গো! চিরটাকালই সকল জিনিসেই কমিশন কেটে নিয়ে তবে জিনিস কিনেছি। একটা টাকা দিলে কক্ষনো চোদ্দো আনার বেশি মাল আনিনি। আনবই-বা কেন? ঝিয়ের ছেলে চাকর! আমার আবার ওর চাইতে বেশি কী ধম্মজ্ঞান হবে?

এখন তাই চুরির ধনের ছ-আনা যাচ্ছে বাটপাড়িতে। বউদিদিমণি কি আর তা বোঝে না? খুব বোঝে।

কিন্তু করবে কী হাত-পা যে বাঁধা! আপনার অপকর্মের ছেকলেই বাঁধা। ডেকে হেঁকে তো আর বকাবকি করতে পারে না? বড়োজোর মুখখানা পাঙাস করে বলে, 'সে কী বৈকুণ্ঠ, অত বড়ো ভারী পাথর যেন রুপোর গেলাসটা বেচে এই ক-টা টাকা হল?...বলিস কী বৈকুণ্ঠ, সেই অত বড়ো তাবিজখানা মোটে সাত ভরি? আমি যে জানতাম ও তাবিজ জোড়াটা বারো-তেরো ভরি ছিল।

আমি অমনি ফোঁস করে উঠি, বেশ, অত যদি অবিশ্বাস তবে আর কাউকে এ কাজের ভার দিন? নচেৎ পোদ্দারকে বাড়িতে ডেকে এনে দিই, আপনার সামনে বসে ওজন করুক!

জানি এই হচ্ছে ওষুধ! জোঁকের মুখে নুন, সাপের মাথায় বিষপাথর! আহা, তখন যা মুখের চেহারা হয়! আমার হাতে ধরে কি পায়ে পড়ে এমনই অবস্থা!

—ওরে বৈকুণ্ঠ, আমি তোকে অবিশ্বাস করছি, এই কথা তুই বললি আমায়? আমি বলছিলাম, পোদ্দারটা কেমন, কলে কৌশলে ওজনে কিছু মারল কি না, তুই ওজনের সময় নিক্তির কাঁটার দিকে তাকিয়ে ছিলি, না অন্যমনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলি? .....এই বিত্তান্ত।

হুঁ বাবা! পথে এসো!

তাই বলছি মন্দই-বা আছি কী! খাচ্ছি-দাচ্ছি, লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে খাতাকলম হাতে নিয়ে বাবুদের নায়েবগিরি করছি, আর একজনের অকর্মের বখরায় পেট ভরাচ্ছি। তবে মনপ্রাণ বলে তো একটা বস্তু আছে? পুরোনো মানুষদের হঠাৎ দেখলে প্রাণটা কেমন করে ওঠে।

সেদিন আচমকা মেজোবউদিদি এল। দেখে প্রাণটা যেন উথলে উঠল। কপাল আমার, তাই অমন মানুষটার কাছে কাজ করতে পেলাম না, এই নরককুণ্ডুতে পড়ে রইলাম। মন্টুদাবাবু সেই পাঁচ বছর বয়েস থেকে কী কেনাই কিনে নিয়েছে আমায়!

ইচ্ছে ছিল চুপি চুপি দুটো কথা মেজোবউদিদির সঙ্গে কই, কিন্তু কইবার কি জো পেলাম? ঠাকরুণ একেবারে আগলে রেখে দিলেন। তবু এতটুকুন ফাঁক পেয়ে বলে নিয়েছি, আপনার অংশের ভাড়াটেটা ছাতে জল পড়ে জল পড়ে করে রোজ রাগারাগি করছে, এবার ওটাকে উঠিয়ে দিয়ে, ঘর মেরামত করে নিজে এসে থাকুন-না? মন্টুদাবাবুর তো এই হাল দেখছেন, কোনদিন কী ঘটে যাবে, আর ওনার বিষয়সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খাবে।

মেজোবউদিদি মুচকে হেসে বলল, সে আর নতুন কথা কী, খাচ্ছেই তো!'

তাও আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফুটিয়ে দিলুম, 'সে নয় এখন খাচ্ছে। উনি বেঁচে রয়েছে, শখ করে ভাইপো-ভাইঝিকে খাওয়াচ্ছে, কিন্তু ওনার অবর্তমানে? এই যে ওনার ভাগের তিনশোখানি করে টাকা বাড়িভাড়া, এ তো ত্যাখন আপনাদের প্রাপ্য হবে?

ওনার আর উত্তুর দেওয়া হল না, ঠাকরুন এসে উদয় হলেন! নিচ্চয় বুঝেছিল কোনো লুকোছাপির কথা কইছি, মুখখানা আগুনের মতন গনগনে হয়ে উঠেছিল, তবু সামলে নিয়ে দেঁতো-হাসি হেসে বলল, 'কী রে বৈকুণ্ঠ, মেজোবউদিদিকে পেয়ে খুব একহাত নিন্দে করে নিচ্ছিস বুঝি আমার?'

আমিও তেমনি ঘুঘু। হেসে বললাম, তা বই আর কী! আপনি আমায় খেতে দেন না, পরতে দেন না, হাড়ির হালে রেখেছেন, বলে নিচ্ছি এই ফাঁকে।'

তাপর চা জলখাবারের ঘটা পড়ল!

একটা ভাইপো না বোনপো কাকে যেন সঙ্গে করে এনেছিল মেজোবউদিদি। তাকে সুদ্ধু কত আদর! ওই যে মেয়েদের বের সম্বন্ধ দিয়েছে মেজোবউদিদি, তাই এত তোয়াজ! নইলে মানুষজন এলে কথা কয় না কি? মুখ ঘুরিয়ে সরে যায়।

অবিশ্যি পুরোনো কালের আসেই-বা কে? কালে কস্মিনে কেউ!

আহা মেয়েগুলোর যদি এক-একটা হিল্লে হয় তো, আমি সত্যপিরের সিন্নি দিই। কে যে কোনদিন কী করে বসে এই ভাবনা আমার! যতই হোক, চাকর নফর যা-ই হই, আর রক্তের সম্পর্ক নাই থাক, তবু তো এবাড়ির ভাতে মানুষ! পাড়া জানাজানি একটা কেলেঙ্কারি ঘটে গেলে, আমার যে আর রাস্তায় মুখ দেখাবার জো থাকবে না।

পুরোনো আমলের পড়শি তো এখনও কিছু কিছু আছে।

ছোটো মেয়েটার বিষয় সন্দ হয় আমার।

থাক বাবা, কুমারী মেয়ে, মা ভগবতীর অংশ, না-জেনে না-শুনে টপ করে কিছু বলে ফেলাটা ঠিক নয়, ওতে ভগবতীর রোষ লাগে। শুনেছি কিনা ছেলেবেলায় মায়ের মুখে। পদ্মমাসি, বামুনঠাকরুন, হাজারির মা, সকলে মিলে রান্নাবাড়ির দালানে জটলা করে যখন চুপিচুপি বাড়ির বউ-ঝিদের নামে নানান অপবাদের কথা কইত, তখন মা বলত, 'কুমারী কন্যেদের নামে কিছু বোলো না ভাই, ওরা ভগবতীর অংশ। বিনি অপরাধে অপবাদ দিলে ভগবতীর রোষ হবে।' এরা হয়তো একটু চুপে যেত, কিন্তু বামুনদি ছিল বেজায় মুখরা, সে হাত-মুখ নেড়ে বলত, 'ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলেন রে ধম্মকথা শোনাতে। বলি বিনি অপরাধে কী লা বৈকুণ্ঠর মা? বিনি অপরাধে কীসের? তা করলে আমার জিভ খসে যাবে না? স্বচক্ষে দেখা বুঝলি, এই রক্ত-মাংস চামড়ার চক্ষু দিয়ে দেখা। খুলে বলব বিত্তান্ত?'

মা তাড়াতাড়ি বলত, 'থাক বামুনদি থাক, অত খুলে বলার দরকার নেই। আমরা বাঁদি মানুষ, গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি, আমাদের মনিবের কথায় দরকার কী?'

বামুনদি মুখ ভেঙিয়ে বলতো, 'না দরকার নেই! গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি তাই বলে ন্যায়-অন্যায়ের মাথা খেয়ে বসে থাকতে হবে। ওই শচীদাদাবাবুটি হয়েছেন কলির কেষ্ট, আর এনারা সব ষোলো-শো গোপিনী! কত রঙ্গ, কত ঢং!'

মা ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালাত। বেজায় ভীতু ছিল মা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এসব ব্যাপারে আমি ছিলুম বামুনদিদিদের দলে। সত্যিই তো, মনিব বলে পাপ-পুণ্যি মানবে না?

এতটুকুন বেলা থেকে বুঝতম তো সমস্ত! পাকার ধাড়ি ছিলুম।

আর এইখানে বসে বসে আরও পাকতুম। মা উঠে গেলেও আমি নড়তুম না। অবুদ্ধি খোকার মতন একটু কাঠি কী একটু ভাঙা কাচ নিয়ে খেলতুম, আর কানখাড়া করে থাকতুম ওদের গালগল্পের দিকে।

সত্যি, বজ্জাত কম ছিলুম না। আর তারজন্যেই টিকে থাকতে পেরেছি। পাজি বজ্জাত না হলে কখনো কেউ বড়োমানুষের বাড়ি টিকে থাকতে পারে?

এখন অবিশ্যি বড়োমানুষের কাঁথায় ঘুমুর বাজছে। কিন্তু ভানটুকু তো আছে? এই যে সেদিনকে, মন্টুদাবাবুর ধোপধুতি ক-খানা চুনট করে রাখা হয়নি বলে বউদিমণি কম বকাটা বকল? সে একেবারে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' যাচ্ছেতাই! মন্টুদাবাবুসুদ্ধু খেঁকিয়ে উঠল, 'এত যদি অগ্যেরাহ্যি তো যা নতুন মনিব খুঁজগে যা! চুনট করা না হলে পরি আমি ধুতি?'

মুখে এল, বিছানায় অঙ্গ ঢেলে পড়ে থেকেই তো জেবন কাটছে, দাঁড়াতে গেলে পা কাঁপে, হাঁটতে গেলে হাঁটু নটপট করে, চুনট করা লম্বা কোঁচার বাহার আর দেবে কোথায়?'

বলতে পারলুম না। ওই যে বলছিলুম না, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আমি দিতে পারিনে। তাই ঘাড় গুঁজে বসে যতগুলো ধোপদস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি ছিল, সব চুনট করে আর গিলে করে ঘরের দেয়ালে তুলে রেখে এলাম।

মেজোবউদিদি যাবার সময় হাতের মধ্যে পাঁচটা টাকা দিয়ে গেল। বলল, 'সন্দেশ খাস বৈকুণ্ঠ।' টাকা ক-টা যত্ন করে তুলে রেখেছি. ঢের টাকা কামাই, ভগবানের দয়ায় বৈকুণ্ঠর পকেট কখনো শূন্যি থাকে না, কিন্তু সেসব হল উপরি রোজগার। তার দাম কানাকড়া। এ টাকার মূল্যই আলাদা।

টাকাটা নিয়ে স্পেশাল কিছু করব ভাবছি। ষাড়েশ্বরতলার মেলা শুনেছি খুব বিখ্যাত, একবার গেলে কেমন হয়? আর নইলে থেটার দেখতে গেলেও মন্দ হয় না! আগে আগে গিয়েছি ঢের, এস্টার, মিনার্ভা কত জায়গায়।

বউদিদিমণিদের সঙ্গে যেতে হত, ফরমাইস খাটতে, ছেলে কাঁদলে চুপ করাতে, সবই জ্বলজ্বলাট মনে আছে। এমনকী এস্টারের সেই মানদা ঝিটাকে পর্যন্ত। ভাঙা-কাঁসির মতন গলা ছিল সেই মাগির, আর যখন বাবুদের কিনে দেওয়া খাবারের ঠোঙা কি পানের দোনা নিয়ে ওপরতলায় মেয়েমহলে গিয়ে চ্যাঁচাত, ওগো অমুক ইস্টিটের অমুক বাবুর বাড়ি গো— তখন যেন থেটারবাড়ির ছাত ফাটত।

তখন সে এমন টাইম মাফিক যাওয়া ছিল না, সিটে সিটে নম্বর মার্কাও থাকত না। যে যত আগে যেতে পারবে, সে তত ভালো জায়গা দখল করে নেবে।

পুরোনো কথা মনে পড়লেই যেন প্রাণটার মধ্যে কেমন উচাটন করে ওঠে। সমুদ্দুরের ঢেউয়ের মতন কত কথাই যে তোলপাড় করে। দুত্তোর নিকুচি, মিথ্যে শুধু মন খারাপ করা। যে কালে আছি, মনটাকে সেই কালের উপযুক্ত করে ফেলাই ভালো। তাই নিচ্ছেও তো লোকে। নইলে থেটারের বদলে বায়োস্কোপ! ছিঃ! ছায়ামূর্তির হাত-মুখ নাড়া, যন্তরের কথা বলা, তাই নিয়েই নাচানাচি। মুখ নাড়ছে একজন তো গান গাইছে অন্য জায়গায় আর একজন! তাজ্জব! সব ফাঁকিবাজি। যত যন্তরের মেলা, তত ফাঁকির খেলা? সাধে কি আর নাকুর বদলে নরুন!

একটা রক্ত-মাংসর মানুষ ভীম সেজে গদা আস্ফালন করছে সেই দেখার একটা উল্লাস, আর একটা ফটোগেরাপের ছবি, ছায়ার গদা ঘোরাচ্ছে, তাই দেখার উল্লাস! হুঁ, কীসে আর কীসে! ভেতরের এত কথা জানতুম না অবিশ্যি, মন্টুদাবাবুর যে দু-একটা বন্ধু আসে, তাদের ক-জন নাকি বায়োস্কোপ খুলছে, সেই একদিন সব বোঝাল বসে বসে। বড়োমানুষের মর্জি তো? কোনদিন-বা শালা হারামজাদা, কোনদিন-বা মাই ডিয়ার!

আজন্মকাল বড়োমান্‌ষি দেখে এসেছি, ওটাই ভালো লাগে, ওতেই মনটা বসে। বাবুর জুতোটা খেলাম, বাবুর গায়ের শালখানা বকশিস পেলাম। তার আমোদই আলাদা। আর এই যে আমার শচীদাবাবুর ছেলেরা, এরা হচ্ছে হাড়ে গরিব। এদের মনে দরিদ্দির। বাইরে যতই নপচপানি করুক, দেলদরিয়া মেজাজ কোথা পাবে? কখনো তো দেখলুম না কাউকে এক পয়সা বকশিস দিল। নজর নেই। যেমন বাপ তেমনি বেটা হবে।

আশ্চয্যি হয়ে তাই ভাবি, এই শচীদাবাবুও তো সেই কত্তাবাবুরই নাতি, কিন্তু তেনার নজরের কি কিছু পেতে নেই? ওই আগে যা বলেছি, বাপকা বেটা! বাপ তো ছিল ঘরজামাই! শাস্তরেই আছে 'কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান, ঘরজামাই আর পুয্যিপুত্তুর সব ক-টা সমান।'

দূর ছাই ঘুম আসতে চায় না কেন!

রাতভর খালি উঠছি, বসছি, পায়চারি করছি, জল খাচ্ছি, আর, আর পুরোনো দিনের জাবর কাটছি। ঘুম আসবে ভোরের বেলা যখন আমাদের বউদিদিমণির টহল দেওয়া শেষ হবে, ঘরে গিয়ে শোবে, সেই তখন!

মনে ভাবে আমি বুঝি টের পাইনে! হুঁ। বৈকুণ্ঠবেহারীর অগোচরে বাড়িতে কেউ একটা নিশ্বেস ফেলুক দেখি?

এই রাতবেড়ানি রোগ কি ওনার আজ হয়েছে? কবে থেকে! কী যে পাহারা দিয়ে বেড়ায় ভগবান জানে! মনে হয় মেয়ে-ছেলেদের সব সন্দ করে! নচেৎ এমন ব্যাভারের মানে কী?

যখন অন্ধকারে গায়ে একখানা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে বেড়ালের মতন নিঃশব্দে এঘর-ওঘর উঁকি দিয়ে বেড়ায়, ঠিক যেন একটা নিশাচরীর মতন লাগে। আমিও তো কম শয়তান নয়, টের পেতে দিইনে যে, দেখতে পাচ্ছি।

এ সংসারে এসে জন্মভর কত কীই তো দেখলুম, কাউকে কি টের পেতে দিইছি? বই লিখিয়েদের মতন যদি লিখতে পারতুম তো এবাড়ির ইতিহাসবিত্তান্ত নিয়ে এই মোটা মোটা বই লিখতে পারতুম।

একা কত্তাবাবুকে নিয়ে পাঁচখানা বই লেখা যেত। কী রূপ! কী মেজাজ! কী নজর! আর রস কত! একবার যখন সেই পাঁচপাড়ার হারাম ঠাকুদ্দার বিধবা ভাইঝিটাকে নিয়ে কেলেঙ্কারি হল? বুড়োর তো তখন চুল সাদা ধবধবে। তবু সুন্দরী দেখে লোভ সামলাতে পারেনি আর কী, একলা পেয়ে এটটু বুঝি সাট্টে পাট্টে ধরেছিল, আর কিছু নয় অবিশ্যি, তাতেই ছুঁড়ি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একসা!

কিন্তু ধন্যি বলি, বুড়োর লজ্জার লেশ নেই! আলবোলা মুখে দিয়ে বসে বসে দিব্যি বলল, 'অত চেঁচামেচিতে কাজ কী, হাজার টাকা খেসারত দিচ্ছি, কাশী-বৃন্দাবন করে আয়। পরপুরুষের ছোঁয়ার প্রাচিত্তির হয়ে যাক!'

হারাণ ঠাকুদ্দার তো আহ্লাদে বুক উঠলে উঠল। ভাইঝির হয়ে দিব্যি টাকা নিতে এল। কত্তাবাবু বলল, 'উহু, তা হবে না, যার কাছে পাপ, তার কাছেই প্রাচিত্তির, যার হাত ধরেছি, তার হাতেই টাকা দেব।'

ওমা, গুট গুট করে এলও ছুঁড়ি। একগলা ঘোমটা টেনে হাতখানি বাড়াল। তাপর টাকা নিয়ে চলে যেতেই কত্তাবাবুর সে কী হাসি। সে-হাসি আর থামেই না। লহরে লহরে উছলে উছলে ওঠে। হাসি থামলে আমাকেই ডেকে বলল, 'বুঝলিরে শালা বৈকুণ্ঠবেহারী, ছুঁড়ি ভাবল আমি বুঝি সত্যিই অপরাধ করে জরিমানা দিলাম। হুঁঃ হাতের ময়লা এই টাকা ক-টা খরচ করলাম সাচ্চা ঝুঁটো যাচাই করতে, বুঝলি? একটু গা ছুঁয়েছি বলে, সতীপনা করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। ওরে বাবা সত্যিকার সতী হলে ওই টাকা বাঁ-পায়ের কড়ে আঙ্গুলে ছুঁতো? যে-মেয়েছেলে হাত পেতে ইজ্জতের দাম নিতে পারে, তার ইজ্জতের দাম কানাকড়াও না।'

আর সেই পলাশির বউয়ের কাণ্ড!

বাড়িতে অনেক বউ, কতরকম সম্পক্ক কতরকম ডাক! কে কার ভাজ, কে কার ননদ! তাই পাঁচ মিশিলি বউগুলোকে তাদের বাপেরবাড়ির দেশের নাম ধরে ডাকা হত! দিগ্‌নগরের-বউ, মুড়োগাছার-বউ, পাটুলির-বউ, পলাশির-বউ, এইরকম! তা সেই পলাশির বউটার ঘাড়ে চাপল দুর্মতি।

অবিশ্যি দুর্মতি এবাড়ির অনেক বউ-ঝিয়েরই ছিল, বৈকুণ্ঠ অনেক বৃন্দাবনলীলার প্রেত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু কখনো টুঁ শব্দটি করিনি। কী দরকার আমার! দু-পক্ষ থেকেই টাকাটা সিকেটা পাই, আর পাই বিনিপয়সায় রং-তামাশা, থেটার দেখার আমোদ। খাল কেটে কুমির আনি কেন?

কিন্তু আমি না আনলে হবে কী, কেমন করে যেন কর্তার কানে উঠে গেল একদিন, পলাশির বউয়ের রীতি চরিত্তির সুবিধে নয়।

ডেকে পাঠালে তাকে।

সম্পর্কে নাতবউ, তবু ভয়ে বলির পাঁঠার মতন এল। যেন নবাবের দরবারে কাফের আসামি। সবাইকে তাড়ালেন ঘর থেকে, কিন্তু বৈকুণ্ঠকে তাড়াবার সাধ্যি নেই, সেই হল মূল সাক্ষী! চিঠিচাপাটি চালাচালির কত্তা!

বললেন, 'পলাশির বউ, সেকালের পিতামহ প্রপিতামহরা ঘরের বউয়ের বেচাল দেখলে তাকে দেয়ালে সেঁটে ইট গেঁথে তার ওপর নতুন দেয়াল গেঁথে দিতেন, একালে সে-শাস্তির রেওয়াজ নেই বলে কি ভেবেছ কিছুই নেই?'

বউদিদি তো নিরুত্তর!

আবার বললেন, 'বলো তোমার কোন শাস্তিটা পছন্দ? রাতারাতি কেটে টুকরো করে গঙ্গায় দেওয়া, না বিষবড়ি দিয়ে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া? গুলি খেতে চাও তা-ও উত্তম, ছুঁড়লে শব্দ হয় না এমন বন্দুকও আছে।'

হঠাৎ কী যে হল, বলব কী, পলাশির বউয়ের যেন বীরবিক্রম এল, ফট করে বলে বসল, 'ধর্মজ্ঞান নিয়ে ন্যায়বিচার করতে বসলে আপনাকে নিজের জন্যেও তো শাস্তির পদ্ধতি খুঁজতে হবে দাদু! বরং আরও শক্ত শাস্তিই খুঁজতে হবে! তার চাইতে থাক-না এসব ছেঁড়া কথা ছোটো কথা!'

কর্তাবাবু কথার আগেই চমকে উঠেছিলেন, এখন খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কী বললে?'

—ওই তো বললাম! শাস্তি কার পাওনা হচ্ছে, সেটা বিধাতাপুরুষের খাতায় ধরা পড়বে।

আর একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কী বললে?' তারপরই আস্তে বললেন, 'বিধাতাপুরুষের জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য এই দেবরায় বংশের নেই, তৈরি হয়ে নাও। ইচ্ছে হয় তো তোমার সেই বিধাতাটাকে স্মরণ করে নিতেও পারো।'

আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি। আহা, বউটার পরমায়ু ফুরোল!

কিন্তু বউটার যে কোথা থেকে অত সাহস এল! বোধ হয় মরণ নিশ্চিত ভেবেই মরিয়ে হয়ে উঠেছিল। তাই বলে উঠল, 'সে-পরামর্শ থাক দাদু, যা করবার এখুনি করুন। কোথায় আপনার সেই নিঃশব্দ বন্দুক? সেটাই তো ভালো।'

কর্তারাজা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হুঁ মরার জন্যে বড্ড ছটফটানি দেখছি যে! কেন? নষ্ট মেয়েদের তো জানি প্রাণের মায়া খুবই বেশি।'

পলাশির বউ হেসে বলল, 'আমি তাহলে তাদের ছাড়া!'

—তা তো নয়। পষ্ট প্রেমাণ পেয়েছি আমি। এরপর আর বাড়তে দিলে বংশ কলঙ্কিত হবে।

ওমা বউটা হি-হি করে হেসে উঠে বলল, 'দাদু, মরে পচে ভূত হয়ে যে পড়ে আছে, তারও আবার মরণের ভয়? এ বংশের অন্ধিসন্ধি সর্বত্র তো কালিতে বোঝাই!'

সব কথা ঠিক বুঝতে পারিনি আমি, তবে কথা কাটাকাটি চলল অনেকক্ষণ। আমি তো হাঁ। এ কী পেল্লায় সাহস!

এদিকে-ওদিকে পাঁচজনা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল তাও বুঝিছি, কিন্তু কর্তারাজা যেন দিব্যি এক মজায় মেতেছে! কথা-কাটা খেলা। একবার বলে উঠল, 'পুরুষছেলের সব সাজে। তা বলে মেয়েছেলে?'

বউদিদি বলল, 'দাদু, এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, একখানা অস্তর এনে কেটে দেখুন না, কাটলে রক্ত পড়ে না জল পড়ে!'

কর্তারাজা বললেন, 'একথা জানোয়ারের কথা!'

বউদি চটপট বলে বসল, 'জানোয়ারের জঙ্গলে জানোয়ারের সঙ্গে এক খোঁয়াড়ে বাস করতে করতে রীতি প্রিকিতি জানোয়ারের মতো হয়ে উঠবে এ আর আশ্চর্য্য কী!'

বলব কী আশ্চয্যি কথা, মুখে মুখে এই চোটপাটে কোথায় রেগে গর্দান নেবে, তা নয় কীসে কী হল! ওই পলাশির বউয়ের জন্যে আলাদা মহল তৈরি হয়ে গেল। তার হাতখরচার ব্যবস্থা হল মোটা। সোয়ামির সঙ্গে ফারখত! যা খুশি করবে, যেমন খুশি থাকবে।

সবাই বললে এবার ওনার ভীমরতি হয়েছে, কিন্তু তা নয়! ওনার বিচারবিবেচনাই আলাদা ছিল। নইলে যে-নফরাকে নড়তে চড়তে বকশিস দেন, সেই নফরা একদিন মতিভ্রমে কর্তারাজার দেরাজ থেকে ক-টা মাত্র টাকা নিয়েছিল বলে তার সেই ডান হাতখানা এমন করে পিছমোড়া করে বাঁধলেন যে, জন্মের শোধ হাতটা নুলো হয়ে গেল হতভাগার।

এতো দু-একটামাত্র এমন কত কাহিনিই আছে। তাইতো বলি, তেনারা সব নরুনের বদলে নাকু পেয়েছে, আর এনাদের নাকুর বদলে নরুন।

।। দেবেশের কথা ।।

সব ঠিক করে ফেললাম।

পাঠিয়ে দিলাম চিঠির উত্তর। সে-চিঠি বোধ হয় এতক্ষণে উড়োজাহাজের পাখায় ভর করে সমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু করেছে। আশা করিনি, এতটা আশা করিনি আমি। আজ যেন ওইসব ভগবানটগবানও মানতে ইচ্ছে করছে।

বিছানায় পড়ে থাকতে পারছি না, গ্যাসবেলুনের মতো হালকা হয়ে গেছি, মনে হচ্ছে লাফিয়ে উড়ে যাব বুঝি! যদি ছাতে ওঠা যেত, ঠিক সেখানে উঠে গিয়ে খানিকটা লাফিয়ে নিতাম। হয়তো চ্যাঁচাতাম, হয়তো গান গেয়ে উঠতাম! এ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। তাইতো মনে হচ্ছে হয়তো ভগবান বলে আছে কেউ একটা।

নইলে প্রফেসার চক্রবর্তী কেন হঠাৎ আমায় এতটা সহায়তা করবেন, এ কি কোনোদিন কল্পনা করেছি? আরও ঢের ছাত্র ছিল ওঁর, ছিল নিজের আত্মীয়টাত্মীয়, তাদের মধ্যে কেউ কি আর আমার মতো ছিল না? অথচ আশ্চর্য! আমাকেই ডেকে পাঠিয়ে এই খবরটা দিলেন উনি। আমেরিকায় যাবার চান্স পেয়ে যাব, একথা কবে ভেবেছি? বাড়ি থেকে পালাব ভেবেছি, নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে অসাধ্যসাধন পণ করে ভাগ্যকে জয় করব ভেবেছি, কিন্তু এটা কোনোদিন ভাবিনি।

সবই অনুকূল হয়ে গেল।

ভাগ্য, ভগবান, গ্রহ-নক্ষত্র, সবই শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করব বোধ হয়। শুনেছি নাকি গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে যতসব আনুকূল আর প্রতিকূল ঘটনাগুলো ঘটে। কে জানে কোন শুভ গ্রহের যোগে ঠিক এই সময়ই ওবাড়ির মেজোজ্যাঠার রিটায়ার করবার সময় এল, আর সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কলকাতায় ফিরে এলেন। বাইরে যেতে কে আমার গ্যারান্টার হত যদি উনি রাজি না হতেন? ধারণাও করিনি উনি এমন এক কথায় রাজি হয়ে যাবেন। বলেছিলাম তো প্রায় খেলাচ্ছলে, লটারির টিকিট কেনার মতো। কে ভেবেছিল লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব।

উত্তর শুনে সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে এসেছিল আমার, মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আনন্দে যে এমন হয় আগে কোনোদিন অনুভব করিনি। রাগে হয়, অপমানে হয়, হতাশায় হয়, এই সবই জানা ছিল।

ঠিক যে কী বলেছিলাম নিজেরই আর এখন সব মনে পড়ছে না। বলিনি, বলে ফেলেছিলাম।

বোধ হয় বলেছিলাম, মেজোজ্যাঠামশাই, আপনার তো অনেক টাকাপত্তর আছে, আপনি আমার গ্যারান্টি দাঁড়ান-না।

বলার ভঙ্গিটি মোটেই শোভন হয়নি, এখন ভেবে লজ্জা করছে। ওর চাইতে অনেক সভ্য অনেক মোলায়েম করে বলা যেত। কিন্তু কী করব, আমার মুখে তখন আর এর চাইতে ভালো ভাষা জোগায়নি।

কিন্তু আশ্চর্য! ওই রাফ ভাষাটাও পুরো কাজ দিল। মেজোজ্যাঠা প্রথমটা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'গ্যারান্টি, কীসের?'

কীভাবে যে হুড়মুড় করে সব বলে ফেলেছিলাম এখন আর কিছুই মনে আসছে না। পর পর কী কথা হয়েছিল তাও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। সেই ছেলেবেলায় এক বার মাত্র দেখেছিলাম ওঁকে। তখন এক বারও কথা বলার কোনো দরকার বা সুযোগ হয়নি। এই দীর্ঘকাল পরে দেখা হতে সামান্যতম একটু আত্মীয়তাবন্ধনের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ এরকম প্রস্তাবটা যে মোটেই ভদ্রতা হচ্ছে না, এতকিছু ভাবিনি আমি! সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরতে চেষ্টা করেছিলামমাত্র!

কিন্তু তৃণখণ্ডই আমাকে সমুদ্র পার করবে।

সব শুনে ভয়ানক রকমের খুশি হয়ে উঠলেন মেজোজ্যাঠা। বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়! তা আবার বলতে? এটুকু করব না?' পরিবারের গণ্ডী ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বাস করলে বোধ হয় মানুষ উদার হয়ে যায়। অন্তত মেজোজ্যাঠা নিশ্চয়ই হয়ে গেছেন।

ছেলেবেলায় তো কই বিশেষ করে কোনো মহানুভবতা দেখিনি ওঁর। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি, আমাদের নাকের ওপর দিয়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মোটরে চড়ে বেড়াতে চলে গেছেন, কোনোদিন বলেননি, আয় তোরাও আয়।

এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘা খেয়ে খেয়ে বোধ হয় বদলে গেছেন। নইলে অমন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন 'ওগো শুনছ? কী করছ ভাঁড়ারঘরে বসে বসে? শুনে যাও, আমাদের দেবুর গৌরবের কথা।'

'আমাদের দেবু' বলতে উনি নিজেও যেন গৌরব অনুভব করলেন। প্রশংসা আর ফুরোয় না। তখন কিন্তু মনে সত্যির ধিক্কার আসছিল। উনি যা বলেছেন, আমি কি সত্যিই তাই? আমি তো নিজেকে নিজে জানি। তাই উনি যখন উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'হিরের টুকরো ছেলে। যেমন রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, তেমনি গুণ। রূপে-গুণে আলো করা আর কাকে বলে?' তখন মাথাটা হেঁট হয়ে এল আমার।

উনি বোধ হয় ভাবলেন ওটা আমার বিনয়। অতএব আমার খাতায় আরও কিছু বাড়তি নম্বর যোগ হল।

মেজোজেঠি বললেন, 'দেবুর চেহারাটি তো বসানো বাপ! মায় চুলের বাহারটি পর্যন্ত শচীঠাকুরপোর মতন।'

মেজোজ্যাঠা হেসে উঠলেন, বললেন, 'শচীটা ওর বাপ, ওর সামনে বলা উচিত নয়, তবু বলি, সেই যে আমার মা বলতেন, কীসেয় আর কীসেয়, সোনার আর সিসেয়,—এ সেই তাই। রূপের ওই বাহারটুকুই ছিল, আর কী ছিল? মুখে এমন বুদ্ধির উজ্জ্বলতা ছিল? রাঙামুলো একটি। এরা? এরা সব হচ্ছে বর্ন জিনিয়াস। শুনলে না, স্কুলে প্রত্যেক বার ফার্স্ট সেকেন্ড ছাড়া হয়নি, ম্যাট্রিকে 'স্টার' ইন্টারমিডিয়েটে জলপানি, বি. এ., এম. এ. সবটাতে কী রেজাল্ট। বাড়ির মুখোজ্জ্বল করা ছেলে।'

অভিভূত হয়ে গিয়েছি, একেবারে ওঁদের কেনা হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন করে আমাদের কে

কেন বলেছে? চিরদিন মা-র কাছ থেকে শুনে আসছি, আমাদের মানুষ করে তোলার যা কিছু ক্রেডিট সব তাঁর। থাক, মা-র কথা থাক, ভাবতে গেলে মনটা বিষিয়ে উঠবে।

ভালোবাসায় আমার অরুচি ছিল।

প্রফেসারেরা হয়তো ভালোবাসতে চাইতেন, কিন্তু সত্যি বলতে কী আমি কখনো সে-ভালোবাসা নিতে চাইনি, চিরদিনই ভিতর থেকে একটা বাধা ধাক্কা দিয়েছে, বাইরে থেকে যেটাকে বিদ্রোহের মতো দেখতে লেগেছে, অভদ্রতার মতো প্রতীয়মান হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে কারুর সঙ্গে মিশতে পারিনি, সবসময় ভয় করত যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে, তোমার বাবা কী করেন? যদি কেউ বলে, চলো-না তোমাদের বাড়ি যাই!

জিজ্ঞেস করলেই-বা কী হত, আর বাড়িতে এলেই-বা কী হত? গোঁজামিল দিয়ে, 'বাবার শরীর ভালো নয়' এমন কিছু কি বলা যেত না? একদিন বাড়িতে কেউ এলেই কি সে ধরে ফেলত আমাদের সমস্ত গলদ? তা তো নয়, তবু কী এক আতঙ্ক!

আজ মেজোজ্যাঠার কাছে গিয়ে কী অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে এলাম। মেজোজ্যাঠার এত উচ্ছ্বাসের কারণটাও ক্রমশ বুঝলাম। তাঁর নিজের ছেলেদের ব্যর্থতাই তাঁকে বদলে ফেলেছে। বললেন, 'দেখছ তো মেজোবউ, পয়সা থাকলেই হয় না। আমার ছেলে তিনটের পেছনে কি কম টাকাটাই ঢেলেছি? বলো তুমি, চেষ্টার ত্রুটি করেছি কিছু? জনে জনে দু-তিনটে করে মাস্টার, সব সাবজেক্টে আলাদা আলাদা। তার পরিণাম? এটা কোনোরকমে গাড়িয়েগড়িয়ে থার্ডো ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করল, দুটোর গোজন্ম খালাসই হল না। বুঝলি দেবু, বড়োবাবু ব্যাবসা করে আমার হাজার আষ্টেক টাকা ঘুচিয়ে এখন গাড়ির দালালি করছেন, আর ছোটোবাবু কালোয়াতি গান শিখবেন বলে বড়ো বড়ো সব ওস্তাদের পেছনে পেছনে ঘুরছেন। ওই মেজোটাই যাহোক কিছু করছে একটু—'

দেখলাম মেজোজেঠির মুখটা শুকনো শুকনো হয়ে গেল, যতই হোক মা! আর সত্যিকার মায়ের মতো মা। দেখলে ভক্তি আসে। দেখতে এমন কিছুই নয়, তামাটে রং, কপালে এতবড়ো একটা সিঁদুরটিপ ঘামে তেলে সারা কপালে গুলে গেছে, চুলগুলো মাথার ওপর তাল পাকানো, মোটাসোটা থপথপে মানুষ। তবু কী সুন্দর। কী চমৎকার একটা 'মা মা' ভাব।

আমি ওঁর শুকনো মুখ দেখে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটালাম, বললাম, 'আচ্ছা মেজোজেঠিমা, বুলাদি বিন্দুদির খবর কী?

খুব যাহোক নাম দুটো মনে করেছিলাম। এ যেন কী বলে ওই, ঈশ্বরের অনুগ্রহ। মেজোজেঠিমা মহোৎসাহে শুরু করলেন, 'শুধু বুলাদি বিন্দুদিকেই মনে আছে বুঝি? চারু, পারু, ওদের ভুলে গিয়েছিস না রে? চার জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে, তোদের মা-র মতো অমন মেয়ে ধাড়ি করে রাখতে ভালোবাসি না বাপু। সময়ে বিয়ে দিয়েছি, সবাই তিন-চার ছেলের মা। (হয়তো এই গৌরবের কথা দিয়েই তিনি নিজের ছেলেদের ত্রুটি ভুলিয়ে দিতে চাইলেন) জামাইরাও এক-একটি কেষ্টবিষ্টু।'

বলতে বলতে একগাল হাসলেন। —দেবুও বিলেত, আমেরিকা ঘুরে কেষ্টবিষ্টু হয়ে আসুক-না, ওকেও জামাই করব।

জামাই! মেজোজ্যাঠা তো অবাক! আমিও হাঁ!

—জামাই করবে কী গো? ঘরের ছেলেকে জামাই করবে কী? তা-ছাড়া আর মেয়েই-বা পাচ্ছ কোথায়?

মেজোজেঠি হেসে কুটিকুটি! আর বাপু আমাদের না থাক, আমার ভাইয়ের মেয়ে তো আছে।

—ও। ভেতরে ভেতরে এই মতলব। মেজোজ্যাঠাও হাসতে লাগলেন।

কী মনোরম পারিবারিক দৃশ্য। আমরা কী জীবনে কখনো দেখেছি আমাদের মা-বাপ দু-জনে সহজভাবে বসে হাসি গল্প করছেন। ছি ছি! আমরা আবার মানুষ।

ওদেশ থেকে এক বার ঘুরে আসি না, বাড়ির সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখব না। কোনো সংস্রব না। ফিরে এসে একেবারে অন্যত্র উঠব। সম্পূর্ণ নিজের পরিচয়ে নতুন করে জন্মাব। কেন করব না? কেউ তো আমাকে পয়সা খরচ করে বিদেশে পাঠিয়ে কৃতী করে আনছে না? আমি যাচ্ছি সম্পূর্ণ আমার নিজের কপালে। সেই কপাল নিয়ে জীবন শুর করব। মা-বাপ-ভাই-বোন কোনো পরিচয়ের গ্রন্থির মধ্যে জড়িয়ে রাখব না নিজেকে। আমি শ্রী দেবেশ মজুমদার, রিসার্চ স্কলার, এই হচ্ছে শেষ কথা। এখন শুধু প্যাসেজের টাকাটা জোগাড় করা।

ওরা টাকা দেবে অবিশ্যি, কিন্তু ওদের কাছে না-পৌঁছোলে তো নয়? পৌঁছোনোর টাকা আমাকে নিজেকেই—। তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি, বহুদিন থেকেই আছি। 'হিরের টুকরো ছেলে'র এ পাপ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

দূর ছাই, আমাকে কি আবার সেন্টিমেন্টের ভূতে পেল? নইলে পাপ-পুণ্যি ভগবান এইসব মানতে বসেছি? কে ভগবান, কীসের ভাগ্য? আমিটাই সব। আমি যদি ভালো রেজাল্ট না করতাম, ভগবানের সাধ্য ছিল আমার উন্নতি করিয়ে দেওয়া? সাধ্য ছিল প্রফেসর চক্রবর্তীর আমার উপকার করার? আমি যদি মেজোজ্যাঠার ছেলেদের মতন ভ্যাগাবন্ড হতাম, মেজোজ্যাঠা করতেন আমাকে স্নেহ?

তবে? সার কথা হচ্ছে—সব 'আমি'। আমি জোগাড় করব আমার পাথেয়। ছলে বলে কৌশলে কার্যসিদ্ধি তো শাস্ত্রেরই কথা।

তা ছাড়া মন্টুকাকার ওয়ারিশানই-বা কে? এই আমরাই তো? আমার অংশটা নাহয় আমি আগেই নিয়ে নিলাম। এখন শুধু সিন্দুকের চাবিটা—

মন্টুকাকার বউয়ের যা গহনা আছে, তার থেকে কিছুটা সরাতে পারলেই আমার প্রয়োজন মিটে যাবে। সোনার যা দাম আজকাল। আর কী প্রচুর গয়নাই ছিল। ছেলেবেলায় দেখে হিংসে হত, আমার মা-র কিছু নেই, আর ওঁর এত আছে বলে।

একটা জুয়েলারির দোকানে বেচতে গেলে ধরা পড়তে পারি, সামান্য সামান্য করে আলাদা আলাদা দোকানে বেচব। কলকাতার বাইরে গেলেও হয়। কিছু একটা ছুতো করে দু-এক দিনের জন্যে বাইরে গিয়ে—না, সেটা ঠিক হবে না তাহলেই বরং ধরা পড়বার সম্ভাবনা। কলকাতাই বেস্ট। কলকাতাতেই সব কিছু চাপা পড়ে যায়। উঃ এক বার শুধু চাবিটা।

আঃ তারপর?

আর মাত্র তিনটি মাস। তারপর আমি সমুদ্রে ভাসছি। মহাসমুদ্রে, জীবনসমুদ্রে।

।। মন্টু দেবরায়ের কথা ।।

পায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরে গেছে অনেকক্ষণ, পা নেড়ে ঠিক করে নেবার ক্ষমতা হচ্ছে না। উঠে বসে তবে ঠিকমতো ঢেকে নিতে হবে। তাও যেন বল পাচ্ছি না, রাত্তিরের দিকে কোমরটা পর্যন্ত যেন অবশ অবশ লাগে। সকাল বেলা উঠে হঠাৎ দাঁড়াতে গেলেই ভয় হয় বুঝি হাঁটু দুমড়ে পড়ে যাব। আস্তে আস্তে খাটের বাজু ধরে সইয়ে সইয়ে তবে দাঁড়াই। বুঝতে পারছি এ সমস্তই আসন্ন পক্ষাঘাতের লক্ষণ।

এই পায়ে যে একদিন ফুটবল খেলতাম, কাচের আলমারির মধ্যকার ওই মেডেলগুলো যে সেই

খেলার জয়গৌরবের স্বাক্ষর, একথা কি এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে? নিজেরই বিশ্বাস হয় না, মনে হয় যে খেলত, সে আর একটা লোক।

পিতৃপিতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। শিরায় শিরায় রক্তের কণায় কণায় যে-ঋণ জমা করা আছে, সে-ঋণ শোধ না করে উপায় কী? নিরুপায়ের মতো সেই ঋণ শুধে যাব আর লোকে অবজ্ঞা করবে, ঘৃণা করবে, সংস্পর্শ ত্যাগ করবে। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন যে এ ঋণ আমার জীবনের ওপর দিয়েই শেষ হয়ে যাবে, আমি আর জের টেনে গেলাম না।

কিন্তু আশ্চর্য! বংশে তো আরও অনেকে আছে, তাদের রক্তে কি এ ঋণ ছিল না ছিল না এই বিষ? তারা সবাই তো দিব্যি পায়ের ওপর ভর দিয়েই পৃথিবীর মাটিতে চরে বেড়াচ্ছে। আমিই শুধু—তবে কি শুধুই পিতৃপুরুষের ঋণ নয়? আমার নিজের পাপেরই ফল পাচ্ছি আমি?

না, না, কেন? কেন? কেন আমি একথা মানব? আমার কীসের পাপ? আমি তো নিজেকে মহৎ ছাড়া আর কিছু বলব না। আর সত্যকার ন্যায়পরায়ণ যদি কেউ থাকে, সেও আমাকে মহৎ বলে শ্রদ্ধা করতেই বাধ্য হবে।

আমার জীবনের দেনা-পাওনার খাতার হিসেব কষে কষে দেখেছি আমি, দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি, মুহূর্তে মুহূর্তে দেখছি, কতখানি দিয়ে, কতটুক পাচ্ছি আমি! সর্বস্ব গিয়ে, পাচ্ছি ভিক্ষার খুদমুষ্টি।

যদি আমি মহৎ না হতাম? যদি আমি ষোলো আনার বদলে ষোলো আনাই দাবি করতাম? তাহলে কি এমনই অসহায়ের মতো পড়ে থাকতে হত আমাকে? সারাজীবন ধরে—হ্যাঁ তা ছাড়া আর কী, প্রায় সারাজীবন ধরেই কাটাতে হত এরকম নিঃসঙ্গ রাত্রি? পায়ের চাদরটা টেনে ঢেকে নিতে পারছি না বলে, এরকম মাথা কুটে মরতে হত আমায়?

না, আমি কোনোদিন দাবি জানাতে পারিনি। এইরকম নিঃসঙ্গ রাত্রিতে, যখন ভগবানের উপর পর্যন্ত অবিশ্বাস আর আক্রোশ এসে যায়, যখন নিজেকে নিতান্ত নির্বোধ আর প্রতারিত মনে করে ধিক্কার আসে, তখন ভিন্ন ভাবতেই পারি না একথা। তাই অনুকম্পার ক্ষুদ্রমুষ্টি পেয়েই ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

তবে আমি নিজেকে মহৎ বলব না না কেন?

সত্যিকার ধন্য হয়ে যাবার মতো যদি কিছুও পেতাম। যদি কিছুও পেতাম। যদি পেতাম একটা চিরবঞ্চিত মেয়েমানুষের বুভুক্ষু মনের সত্যিকার একটু ভালোবাসা। খাঁটি, অকৃত্রিম, নির্ভেজাল ভালোবাসা। নাঃ! সেখানে আমি মূলেই হাভাত।

আমি জানি ও আমাকে যতই দরদ দেখাক, আর যতই প্রেমের ভাব দেখাক, সে-সমস্তই ফাঁকি। সব ওর অভিনয়। আমি জানি ও আমাকে মনে-প্রাণে কী ভয়ংকর ঘৃণা করে।

হ্যাঁ, সব জানি, সব। ওর ছলনা, ওর ঘৃণা। তবু এমনই অবোধের মতো, এমনই কৃতার্থের মতোই থাকি। অতএব অভিনয় আমিও করি।

যদি একদিন প্রতিমার রং সাজ খুলে ফেলে কাঠ খড় টেনে বার করতাম? যদি স্পষ্ট গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠতাম, আমি তোমাকে চিনি, চিরকাল চিনে আসছি। তুমি যে আমাকে কোন চোখে দ্যাখো সে আর জানতে বাকি নেই আমার। তোমার ওই ছলাকলা অভিনয়নৈপুণ্য নিয়ে পাবলিক স্টেজে গিয়ে নামো গে, তোমার সংসার চলে যাবে। সুখে পালিত হবে তোমার ছেলে-মেয়েরা আর ওই লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা। যাকে এখনও পর্যন্ত তুমি প্রাণতুল্য ভালোবাসো, যার এতটুকু সুখসাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েসের ত্রুটির আশঙ্কায় তুমি করতে পারো না এমন কাজ নেই। কখনো ছিল না, এখনও নেই।

ছলনাময়ী তুমি কি টের পাও, যতই তুমি ওর নিন্দাবাদ করো, যতই ওকে ঘৃণা করবার চেষ্টা করো,

কিছুতেই সফল হতে পারো না, তোমার প্রতিটি রক্তবিন্দু তার বিরুদ্ধাচরণ করে। ও যখন হেঁটে যায়, তোমার দৃষ্টিতে যে-সুধা ঝরে সে কি আমি দেখতে পাই না?

তবু সেই টের পাওয়াটাকে আমি ব্যক্ত করে বসি না। করে কী করব? যে-মুহূর্তে ব্যক্ত করে বসব, সেই মুহূর্তেই তো ভেঙে যাবে আমার এই তাসের প্রাসাদ। একদা যে-প্রাসাদ গড়া হয়েছিল, আমার বুদ্ধিহীনতা আর তোমার চালাকি দিয়ে।

হ্যাঁ, সেদিন আমি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম, তখন আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম। সাধারণ মানুষের, রক্ত মাংসের মানুষের বিচার দিয়ে বিশ্বাস করতাম এটাই স্বাভাবিক। স্বামীর কাছে অবহেলিত একটা বুভুক্ষু মেয়েমন একটা পুরুষের সমস্তটা প্রাণের ভালোবাসা, সমস্তটা হৃদয়ের অগাধ প্রেম, আর প্রেমের পূজা অবহেলা করতে পারে না, পারে না, পারে না আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে, এটা ভাবাই কি স্বাভাবিক নয়?

সেই স্বাভাবিক বিচারে বিশ্বাস করেছিলাম আমি তোমাকে, তোমার প্রেমের অভিনয়কে।

আমি কি জানতাম না আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ, আমি কুৎসিত, আমি তোমার ভালোবাসা পাবার যোগ্য নই? জানতাম বই কী। তবু যে বিশ্বাস করেছিলাম সে হয়তো শুধু আমার অজ্ঞানতাই নয়, আমার ভিতরের দুর্দম লোভ। তুমি যেদিন প্রথম এবাড়িতে এসে দাঁড়ালে, সেদিন থেকেই যে তোমাকে কী প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতে শুরু করলাম, সে তুমি কি টের পেয়েছিলে? টের পেয়েছিলে কি শচীদাকে কত হিংসে করতে শুরু করেছিলাম সেদিন থেকে?

তবু প্রকাশ করতে পারিনি। পারিনি তোমার প্রতি আমার টান দেখাতে। কোন সাহসে করব?

সাহস হয়নি কেন? লোকলজ্জার ভয়ে নয়, অভিভাবকদের ভয়ে নয়, সেসব ভয় এবাড়িতে তুচ্ছ, এবাড়িতে বহু অবৈধ প্রেমের চাষ চলতে দেখেছি, সেভয় ছিল না। ভয় ছিল তোমাকেই। তোমার কাছে নিজেকে কীটস্য কীট মনে হত।

তারপর যখন ছোটোবউয়ের অত বড়ো ছোঁয়াচে রোগে তুমি সেবা করলে—মায়ের মতো, বোনের মতো, নার্সের মতো। একেবারে বিকিয়ে গেলাম আমি, চিরকালের জন্য। ক্রীতদাসের মতো বিকিয়ে গেলাম।

ছোটোবউয়ের মারা যাওয়াটা আমার কাছে লাগলই না। বরং নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। না, আমার মুক্তি ভেবে নয়, তোমার মুক্তির কথা ভেবে। তুমি যে অবিরত রাত দিন একটা যক্ষ্মারোগীর সেবা করছ, এ আমি যে সহ্য করতে পারছিলাম না। সর্বদা ভয় হত যদি ওই কালরোগ তোমাকেও ধরে। সে-ভয় প্রকাশ করলে তুমি হাসতে।

আগে তো তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ছিল না, বউমানুষের রেওয়াজ হিসেবে ঘোমটা দিয়ে থাকতে তুমি। কথা হল ছোটোবউয়ের অসুখেই। কিন্তু যখনই আমি ছোঁয়াচের কথা তুলে সাবধান করতে চেষ্টা করতাম, কী অদ্ভুত অপূর্ব হাসিই না-হাসতে তুমি। বলতে, 'আমার আবার সাবধান! কী যে বলো ঠাকুরপো, ভূতের আবার জন্মদিন। আমার কিছু হবে না বুঝলে গো মশাই। যে-মানুষটা পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কেঁদে মাটি নেয়, যম তাকেই পৃথিবীর মাটি থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। আর যে চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মৃত্যুকামনা করে, ভাবে 'মলে বাঁচি, মলে বাঁচি' যমের সে নিমছেঁচকি।'

কথা! কথা! অদ্ভুত অপূর্ব সেই কথার ভঙ্গি। আজও যে-ভঙ্গির জোরে তুমি করে খাচ্ছ। আমাদের বাড়িতে, সেই বিরাট গুষ্টির সংসারে, তোমার মতো কথায় এমন বুদ্ধির ভঙ্গিমা কারো দেখিনি। ওরা ভোঁতা, ওরা মোটা।

রোগে তুমি সাবধান হতে না। যেন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়েই দুষ্টুমি করে পাখা নাড়তে নাড়তে ছোটোবউয়ের বিছানার একপাশে শুয়ে পড়তে।

আমার ভেতরটা ছটফট করতে থাকত, ইচ্ছে হত তোমায় পাঁজাকোলা করে তুলে অন্য জায়গায় শুইয়ে দিই। বুকের ভেতর তোলপাড় করত, পালিয়ে আসতাম।

তাইতো ছোটোবউ মারা যেতে আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আর—আর ঠিক সেই সময় একদিন সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল। সে-ঘটনার একটি তিলও আমি ভুলিনি। কোনোদিনও ভুলব না। দিনের পর দিন যতই তোমার খোলস খুলে খুলে পড়েছে, যতই ধরা পড়েছে আমার বোকামি আর তোমার চালাকি, ততই সে-দৃশ্যটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছি, করে করে মুখস্থ করে ফেলেছি।

কিন্তু আসলে সেটা কি কোনো ঘটনা? না, শুধুই একটা দৃশ্য? সাজানো থিয়েটারে অভিনয়।

চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে তুমি এসে দাঁড়ালে, বললে, 'সর্দি হয়েছে মনে হচ্ছে, আদা দিয়ে চা করে এনেছি, খাও।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, কই সর্দি তো হয়নি।

তুমি সামন্য একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, 'হয়েছে বই কী তুমি টের পাওনি, আমি পেয়েছি।'

হাসিটায় বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ দরকার ছিল, কারণ তার ক-দিন আগেই ছোটোবউ গেছে।

আমি বললাম, চা খেতে ভালো লাগছে না আজকাল।

তুমি তেমনি বিষণ্ণ মধুর একটু হেসে বললে, 'বউ মরলে পৃথিবীর কিছুই ভালো লাগে না, তার চা। হিংসে হচ্ছে ছোটোবউয়ের ভাগ্য দেখে। মরে গিয়েও মনটা এমন দখল করে রেখেছে যে, যারা বেঁচে আছে তাদের ছায়াটুকুও পড়ে না সে-মনে।'

চমকে উঠলাম আমি। পষ্ট মনে আছে, চমকে উঠলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, তার মানে?

তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'মানে বোঝো।'

আমি ধড়ফড়িয়ে উঠলাম। হঠাৎ আত্মহারা হয়ে তোমার সেই ফেরানো মুখকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, আমার বোঝবার ক্ষমতা নেই, আমি মুখ্যু, আমি লক্ষ্মীছাড়া, তুমি বুঝিয়ে দাও।

তুমি হঠাৎ আমার কোলের ওপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করলে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। নইলে, আমার শরীরের রক্ত-মাংসের বোধ থাকলে কি তুমি সেদিন আবার চোখ মুছে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে ফুলের মতন মুখটি নিয়ে ফিরে যেতে পারতে? তখন আমার দেহের মধ্যে দেহবোধ থাকলে অথবা আমি ছাড়া এ বংশের আর কেউ হলে, সেদিন চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যেতে না তুমি? ওই ফুলের মতো মুখকে ছাইয়ের মতো করে নিয়ে ফিরতে হত না?

তারপর? তারপর থেকে চলছে সেই নাটক, সেই অভিনয়। কিন্তু সেকথা টের পেয়েছি কতদিন পরে। এখন ভাবি বাড়িসুদ্ধ সকলেই হয়তো টের পেয়েছিল তুমি কীভাবে আমাকে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছ, টের পেয়েছিল ওই হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া বৈকুণ্ঠটা, শুধু আমিই মোহের কাজল পরে সব স্বপ্নময় মোহময় দেখেছি!

আচ্ছা আমার গায়ে কি এবাড়ির রক্ত নেই? সন্দেহ হয় আমার! নইলে কী করে তুমি শুধু হাসি আর কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলে আমায়। আমার সত্তর বছরের ঠাকুরদার কাছে কমবয়সি মেয়েরা একা যেতে সাহস করত না, যাবার দরকার হলে দল বেঁধে যেত, আর তুমি একা বাঘের খাঁচায় ঢুকে, তাকে ঘাস খাইয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ফিরে যেতে অটুট অনাহত!

বলছিলাম বাড়ির সবাই কি বুঝতে পারত? এখন ভেবে ভেবে দেখি, নিশ্চয় পারত। নইলে অনেকেই কেমন একরকম বাঁকা হাসি হাসত কেন?

সেই একদিন, যেদিন তোমার ওই আদরের ছেলে-মেয়েদের (যাদের দেখলে বিরক্তিতে মন ভরে উঠত আমার তোমার বন্ধন স্বরূপ ভেবে, আর যাদের বাড়াবাড়ি রকমের ভালোবাসা দেখাতাম তোমার মনোরঞ্জনের মানসে) জন্যে পুজোর পোশাক কিনে নিয়ে এসেছিলাম।

পুজোর সময় বাড়িতে বরাদ্দ হিসেবে সকলের কাপড়চোপড় আসত জমিদারির আয় থেকে। তা ছাড়া সিল্ক সার্টিন জরি মখমল, বোম্বাই শাড়ি, পার্শী শাড়ি, যে যা খুশি নিজেরা কিনত। কিনত, যে যাকে ইচ্ছে উপহার দিত, এ রেওয়াজ ছিল বাড়িতে।

কাজেই আমি কিছু দ্বিধা করিনি।

একথা সত্যি যে, তোমাকে একটা জামদানি শাড়ি কিনে দেবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল তাই তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্যেও সার্টিন ভেলভেট কিনতে হয়েছিল আমায়। আর তোমার জন্যে কিনলাম বলেই লীলার জন্যেও কিনতে হল তেমনি একখানা। আর বুদ্ধি করে লীলার কাছেই আগে গেলাম।

বললাম, এই নে তোর জন্যে শাড়ি আনলাম একটা, পছন্দ কি না বল। ওরখানা খুলে ধরলাম ওর সামনে।

লীলা কিন্তু পছন্দ-অপছন্দর কথা না বলে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'ব্যাপার কী বলো তো ছোড়দা? আমার এমন কপাল ফিরল যে?'

সত্যি বলতে কী, ওকেই দিই। বছরের মধ্যে দশ মাস তো ও বাপেরবাড়িতেই থাকে, শ্বশুরবাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না বলে, আয়েসের অভাব বলে। কাজেই কারণে-অকারণে ওকে এটা-ওটা দিতেই হয়। যখন ছোটোবউ ছিল তখন সে-ই আমায় শিখিয়েছিল এটা। বলত 'ওমা একা আমার জন্যে? ছিঃ! ছোটোঠাকুরঝি আমার সমবয়সি, ওকে না দিলে ভালো দেখায়?'

কিন্তু সেদিন লীলাটা স্বচ্ছন্দে ওইরকম ব্যঙ্গ করে বসল আমায়। এবং আমি যখন অপ্রতিভ প্রশ্ন করলাম কখনো কিছু দেওয়া নিয়ে ও একবিন্দু অপ্রতিভ হল না। আরও হেসে বলল, 'আহা দাও-না, তা কি বলেছি? তবে তখন পেতাম ছোটোবউয়ের ফাউটা, এখন এটা কার ফাউ তাই ভাবছি।'

রেগে উঠে বললাম, অত কথা জানি না, ইচ্ছে হয় পরিস, ইচ্ছে না হয় পরিস না। বলে চলে আসছিলাম বাকি মস্ত প্যাকেটটা না খুলেই। না দেখিয়েই।

লীলা জামার খুঁট ধরে টানল। —আহা-হা ঠাট্টা করলে চটো কেন ছোড়দা। দেখি-না, খোলো-না প্যাকেটগুলো। দেখি আর কার কার কী আনলে, দেখি আমার শাড়িটা ভালো, না সচীবউদিরটা। শচীবউদিই তো বলত সবাই। আমিও সবাইয়ের সামনে তাই বলতাম।

চমকে উঠেছিলাম। ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলাম। কী করে জানল ও? কাউকে বলিনি, কাউকে সঙ্গে নিইনি, নিজে গাড়ি করে গিয়েছি, কিনে নিয়ে এসেছি। লীলা কী করে জানল?

চমকানিটা ওর চোখ এড়াল না নিশ্চয়, কিন্তু সেকথা তখন ভাবছি না। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, শচীবউদির মানে?

চট করে মুখের ভাবটা কী কৌশলেই যে বদলে নিল লীলা। মুখটা একেবারে শিশুর মতো সরল করে অমায়িক গলায় বলল, 'আনলে তো ওর জন্যেই আনা উচিত ছোড়দা। আহা বেচারি। বর তো কখনো একখানা জেলেগামছাও দিল না পুজোর সময়। যা পায় ওই গেরস্থর রাশি নৈবিদ্যির বই তো নয়।'

ততক্ষণে লীলা প্যাকেটগুলো টেনে নিয়ে খুলে ফেলেছে। দেখাতেই তো এসেছিলাম, কিন্তু ও যেন

কেড়ে নিয়ে দেখল। ছেলে-মেয়েদের জামাগুলোর খুব তারিফ করল, কোনো মাপটাপ না নিয়ে গিয়েও শুধু আন্দাজি এমন মাপসই জামা কিনলাম কী করে বলে অবাক দেখাল, তারপর যেন হঠাৎই দেখছে এইভাবে তোমার শাড়িটা, যেটা দেখতে এক ধরনের হলেও লীলারটার চাইতে অনেক বেশি দামি, সেটা টেনে পাট খুলে বলে উঠল, 'ওমা এ যে ঠিক আমারটার জোড়া। সত্যিই এনেছ তাহলে? মানাবে ওকেই বাবা।

আমার দুর্মতি! আমার নির্বুদ্ধিতা। বলে বসলাম, তুই যা ভাবছিস তা কিন্তু নয়। এনেছি তোরই পছন্দর জন্যে। যেটা নিস। একটা 'জাকড়ে' আছে। উঃ, পরে বুঝেছি কী চালাক লীলাটা!

একেবারে নিরীহর মতন বলল কিনা, 'না না ছোড়দা, এটা তুমি শচীবউদির জন্যে রাখো। কত দিকে কত যায়। ওকে এখনও পরলে একেবারে পরির মতন দেখাবে, চোখ ফেরানো যাবে না।'

মনে করলাম, উঃ কী বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম। কত সহজেই হয়ে গেল। আসলে লীলাটা সরল। তাই বললাম, তাহলে তুই বলছিস এটাও রেখে দেব।

—বলছিই তো! কতই-বা দাম! কত দিকে কত যায়।

লীলাকে পুজো করতে ইচ্ছে হল। তবু নিস্পৃহভাবে বললাম, তবে থাক গে। ছেলে-মেয়েদের হয়েছে, মায়েরও হোক। ওদের জন্যে অবিশ্যি মায়ায় পড়েই এনেছিলাম। শচীদা তো সাতজন্মেও কিছু দেয় না।

—সেই মায়ায় পড়ার কথাই তো বলছি। মুচকে হেসে বলল লীলা। তারপর বললে 'নাও দিয়ে এস।'

—আমি আবার কী দেব? তুই-ই দিস। হৃদয়ের দুরন্ত ইচ্ছে রোধ করে বললাম কথাটা।

লীলা বলল, 'আহা, তুমি খরচা করে আনলে আর নিজে হাতে কবে দেবে না?'

লজ্জা! লজ্জা! দারুণ লজ্জা হল।

তাই ভাবি এবাড়ির ছেলে হয়ে এই লজ্জা বস্তুটা কোথা থেকে এল আমার কাছে? এ বস্তু তো এবাড়ির নয়। আমার বাপ-কাকারা প্রকাশ্য স্পর্ধায় ঝিয়ের কোমরের গোট গড়িয়ে দিয়েছেন, গয়লানিকে দিয়েছেন মাকড়ি নাকফুল। তারা সেজোবাবু দিয়েছে, নবাবু দিয়েছে, বলে গরব করে বেড়িয়েছে। দেখে আড়ালে সবাই হেসেছে, মুখের ওপর কেউই কিছু বলেনি।

অথচ আমার এত লজ্জা। সে-লজ্জার বশে বলে ফেললাম, হাতে করে দেওয়ার আর কী আছে? তুই দিয়ে দিস। অথচ এই হাতে করে দেওয়ার ছবিটা কত বার কত রঙে এঁকেছি।

লীলা বেশ হৃষ্টচিত্তেই নিল সেগুলো। আমার প্রাণটা হাহাকার করে উঠলেও চুপ করে রইলাম।

কিন্তু তারপর? তারপর কোথা থেকে যে তীক্ষ্ণ একটা হাসির শব্দ এসে বুকে লাগল। খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়া বিদ্রূপের হাসি।

এ হাসি লীলার না? 'আসলে সরল' লীলা। সে হঠাৎ এক্ষুনি এমন করে হেসে উঠল কেন? কেন? কেন? কিন্তু তাই কি সম্ভব? ও তো নিজেই—

সেদিন পারিনি হিসেব মেলাতে। পরে বুঝেছি সাংঘাতিক ধূর্ত ও। সরল সেজে কথা দিয়ে কথা নিল।

কিন্তু তুমি? তুমি কী? ধূর্ততায় লীলা তোমার কাছে ছেলেমানুষ নয় কি? তুমি কী করলে?

সেই জামদানি শাড়ির সূত্র ধরে আরও একখানা শাড়ি আদায় করলে তুমি, আর আদায় করলে শচীদার জন্যে এক জোড়া কলকাপাড় সিমলের ধুতি।

আশ্চর্য! কী অন্ধই করেছিলে আমায়। বুঝতেও পারিনি কার জন্যে তোমার প্রাণ ফেটে যায়।

তুমি চোখ ভরা অভিমান আর মুখ ভরা বিষণ্ণতা নিয়ে এসে দাঁড়ালে। হাতে সেই শাড়ি, বললে, 'কে বলেছিল আমার জন্যে জামদানি শাড়ি আনতে?'

থতোমতো খেয়ে বললাম, না বললে আনতে নেই?

—আনতে যদি থাকে, চোখ ছলছল করে উঠল তোমার, —তো নিজে হাতে করে দিতেও থাকে। অমন করে পরের হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারতে নেই।

উত্তর আর দিয়ে উঠতে পারি না। তোতলার মতো থেমে ভেবে হোঁচট খেয়ে বলি, ইয়ে লীলা দেখতে চাইল। ইয়ে—ও বলল, মানে আর কী বলতে পারলাম না ওকে—

তুমি অভিমানের ঝংকার তুললে, 'তবে লীলাঠাকুরঝি বলল তুমি বলেছ, এখানা দিয়ে দিগে যা সুখবউদিকে! বলেছ, লীলার জন্যে এনে আমার একটা না আনলে ভালো দেখায় না তাই— কেন? কেন? কেন তুমি—?' ভেঙে পড়লে তুমি। —বোঝো না কেন ওরা ঠাট্টা করে তামাশা করে। নাই-বা দিতে আমায় শাড়ি, কী দরকার আমার শৌখিন শাড়িতে, ও কি আমি পরব?'

—পরবে না? আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—কেন পরব? আবেগের ঝংকার তুললে তুমি, যে-জিনিস নিজে হাতে করে দিতে পারলে না, তার আর মূল্য কী?

হঠাৎ এক খেয়াল চাপল মাথায়, বসে বললাম, আর যদি আবার দিই?

তুমি ভুরু কুঁচকে বললে, 'কি, আমার কাছ থেকে নিয়ে?'

লজ্জায় ছি ছি করে উঠলাম আমি। বললাম, বাজারে কি আর কাপড় নেই?

আর সেই মুহূর্তে, হ্যাঁ, ঠিক সেই মুহূর্তে ফিক করে হেস ফেললে তুমি।

আজও যেন সেই ছবিটা দেখতে পাই আমি। চোখে তখনও তোমার অভিমানের গাঢ় ছায়া, আর ঠোঁটের কোনায় হঠাৎ হেসে ফেলার হাসির আলো। হাসা নয়, হেসে ফেলা।

বললে, 'ভেবেছিলাম পুরোপুরি পাগল হতে এখনও একটু বাকি আছে তোমার। দেখছি তা নেই।'

কিন্তু বাকি আমার তখন ছিল না। পুরোপুরিই হয়ে বসেছিলাম। তাই বললাম, সেটা যখন ধরেই ফেলেছ, তখন আর বাধা কোথায়? কিন্তু পাগল বলেই যখন মার্কামারা হচ্ছি, পাগলামিটাই সহ্য করতে হবে। আর একটা শাড়িও নিতে হবে, এ শাড়িটাও পরতে হবে।

তুমি তখন বার বার না না করলে তা মনে আছে, কিন্তু আমারও জোর খেয়াল চেপেছে, তাই রাজি করিয়ে ছাড়লাম। আর ছলনাময়ী তুমি, উঃ, এখন এই বিছানায় পড়ে পড়ে যত ভাবি, নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নইলে ছলনাময়ী, নানা ছলাকলায় নানা কথার খেলায় তুমি কিনা শেষ অবধি আমায় এই বোঝালে, পুজোয় ছেলে-মেয়েদের পোশাক এবং তোমায় শাড়ি উপহার দিয়ে, যদি শচীদার কথা ভুলে বসে থাকি, তাহলে সেটা নাকি হবে সন্দেহজনক।

মূঢ় আমি তোমার কথার ছটায় সেই কথাই বিশ্বাস করলাম, আর যে-হতভাগা লোককে দু-চোখে দেখতে পারিনে, তার জন্যে বাজারের সেরা সিমলের কলকাপেড়ে ধুতির জোড়া কিনে নিয়ে এলাম।

উঃ, না-জানি কী হাসিই হেসেছ তুমি তখন মনে মনে। ভেবেছ কী বাঁদরনাচই নাচাচ্ছি।

এ তো একটামাত্র কাহিনি। এমন কত হাজার কাহিনি ছড়ানো রয়েছে আমার জীবনের ঘাটে ঘাটে। তার সমস্ত কাহিনিই আমার নির্বুদ্ধিতা আর তোমার নির্লজ্জতার সাক্ষী। তাই প্রতি বারই তোমার হত জিৎ।

তুমি আমারই কাছ থেকে তোমার সন্তানদের আর তোমার স্বামীর যত কিছু বাড়তি প্রয়োজন তা মিটিয়ে নিতে, কিন্তু সেটা এমনভাবে করতে, যেন দিতে পেরে ধন্য হচ্ছি আমি।

তোমার এই অদ্ভুত সুন্দর চোখ দুটোতে কত ভাবই-না ফোটাতে পারতে তুমি। সে-চোখ কখনো অশ্রুতে টলটল, কখনো অভিমানে ছলছল, কখনো কৌতুকে জ্বলজ্বল, আর কখনো সারল্যে ঝলমল!

এতরকম চোখের শরাঘাতে কে পারে স্থির থাকতে? ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকলেই বড়ো পারে, তা আমার তো ঘরই শূন্য!

আমার যথাসর্বস্ব সবই তোমার এতটুকু পরিতৃপ্তির জন্যে উৎসর্গ করতে থাকলাম তোমার চরণে। বাড়িতে হাসিঠাট্টা চলতে লাগল আমাকে নিয়ে, কিন্তু নিজেকে ফেরাতে পারলাম না।

আর হাসিঠাট্টা যা, সে তো আমাকে নিয়ে, তোমায় ঠাট্টা ব্যঙ্গ কে করবে? তুমি এমন এক মহিমময়ীর ছদ্মবেশ পরে থাকতে।

কিন্তু ভাগ্য চিরদিনই তোমার দিকে। চিরদিনই তোমার জিৎ।

তাই আজও, যখন তোমার দেওয়া খাবার মুখে তুলতে গিয়ে প্রত্যেক সময়েই সন্দেহ হয়, এ খাবারে বিষ মেশানো আছে কি না, তখনও তোমার দরদ-ভরা চাউনির দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠতে পারিনে আমি, হাসি বিহ্বলের হাসি।

তার কারণ কী জানো? ভাবি এটুকুই-বা ছাড়ি কেন? এই ছলনার আড়ালটুকু যদি দু-হাতে ঠেলে ভেঙে ফেলি, দু-হাত ভরে ধরবার কি কিছু থাকবে? কিছুই তো না। সবটাই ফাঁকা, সবটাই শূন্য।

তাই তোমার ভানকে বিশ্বাস করার ভান করে, এখনও বিহ্বল হাসি হেসে হেসে তোমাকে আমার কাছে আটকে রাখি। জানি যখন তোমার আমাকে বিষ খাইয়ে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে, তখনও তুমি আমার কাছ ঘেঁষে বসে আমার সঙ্গে দাবাখেলার খেলা খেলবে। কারণ এও জানি বিষ তুমি খাওয়াতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমার বিষয়সম্পত্তির অংশটুকু তোমার ছেলেদের নামে লিখে দিচ্ছি। নেই নেই করে আজও যা আছে, নেহাত কম তো নয়।

তোমার এই যন্ত্রণা দেখে অনবরত ইচ্ছে হয়, দিই সব লেখাপড়া করে, দানপত্র করে। তোমারও এই অসতী সাজার যন্ত্রণা ঘুচুক, আমারও ভবযন্ত্রণা ঘুচুক। কিন্তু লিখে দিই না। মরতে চাইলেই কি সত্যি মরতে চায় মানুষ?

মরতে পারব না। অন্তত ইচ্ছে করে না।

তবু তো এখনও আমার কপালে হাত রেখে বলছ ' কী গো মশাই, চোখ দুটো এমন ছলছল করছে কেন? জ্বরটর আসেনি তো?'

তবু তো আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে সেই আমার চিরআকাঙ্ক্ষিত হাতখানা চেপে ধরে বলছি,—ছানি পড়ে আসা চোখের আবার ছলছল। একি আর তুমি, যে ষোলোয় যা, ছেচল্লিশেও তাই।

গোঁয়ারতুমি করে এটুকুই-বা হারাই কেন? আর তোমাকে এতবড়ো আঘাত করবার সাধ্যই কি আছে? এখনও কি সে-সাধ্য জন্মেছে? যখন দেখেছি আমার সমস্ত সম্পত্তির উপস্বত্বেও তোমার প্রয়োজন মিটছে না, আমার লোহার সিন্দুকের মধ্যেও তোমার লোভের হাত বাড়িয়েছ, ছোটোবউয়ের গয়নাগুলোসুদ্ধ, একটি একটি করে নষ্ট করে ফেলছ তখনও?

না, তখনও না। যা দিয়ে তোমাকে প্রাণ ভরে সাজাতে ইচ্ছে করত, তাই তুমি চুরি করে নিচ্ছ, এতে আর আমার কী? একটু আক্ষেপ ছাড়া?

তাই তোমাকে আমি ধরে ফেলেছি, একথা তোমার সামনে প্রকাশ করে ফেলতে পারব না। ভেঙে ফেলতে পারব না তোমাকে, ভেঙে ফেলতে পারব না আমার তাসের প্রাসাদ। তাই ওই হারামজাদা বৈকুণ্ঠকে যখন গুলি করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে, তখনও ওর হাতের সেবা নিই। চলুক এমন যতদিন চলে।

কী ভুল! কী ভুল! শোবার আগে গরম জলে মুখ ধুয়ে কোল্ড ক্রিমটা মুখে মেখে নেওয়া হল না। কী করি এখন গো, আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। কেন এমন ভুল করে মলাম! মা-র সঙ্গে অতক্ষণ রান্নাঘরে থাকতে হল বলেই শেষটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

মা-রও তেমনি বিচার, আজকের দিনে কিনা আমাকেই ডাকলেন রান্নাঘরের কাজের সাহায্যে! কেন নীরো পারত না এটুকু? পারত খুবই, হিংসে করে এল না। মাও ভয়ে ডাকলেন না। মা যে ওকে ভয়ে মরে যান, চিরদিনই যান, তার ওপর তো এখন আরোই। কিন্তু কার কী দোষ?

দোষ যদি বলতে হয় তো বলি নীরো, দোষ তোর কপালের। মা তো আগে তোকেই দেখিয়েছিলেন। আমার আশা আমি তো অনেক দিন ছেড়েছিলাম, মা-রও ছিল না, তাই আমাকে খরচের খাতায় লিখে রেখে তোকে আর সরোকেই তো কনে দেখতে বসিয়েছিলেন, কিন্তু পাত্রপক্ষ যদি আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে ডেকে এনে পছন্দ করে বসে, আমি কী করব?

নীরোটা বলে কিনা, 'তুই ইচ্ছে করে ওদের সামনে ঘুরঘুর করছিলি। শুনলে রাগ হয় কি না? এতটুকু বাড়ির মধ্যে কোথায় যাব আমি? হিংসের জ্বালার আরও কত কথা শোনাল নীরো। টেনে টেনে হেসে হেসে বলল, 'খুব ঠকানো গেল ওদের, কী বলিস দিদি? মা বলল, অসুখ করে চুল উঠে গেছে, তাই ওরা বিশ্বাস করে মরল। ধরতে পারল না দেড়কুড়ির ওপর বয়েস হয়ে গেছে তোর, টাক ধরেছে মাথার মাঝখানে। তোর ভারি মজা নয়! তোর ওই ফ্যাকফেকে রংটা দেখেই মজল ওরা, বেকুব বলবে এরপর, যখন টের পাবে সাদা রং শুধু গায়েরই নয়, চুলের খাঁজে খাঁজেও সে-রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে।' হি-হি-হি করে হেসেই চলল কতক্ষণ।

আমি ওর কথার উত্তর দিতে পারিনি, কোনোদিনই পারিনি, এখন তো আরওই পারব না। এখন যে ওর কাছে চোর দায়ে ধরা পড়েছি। তা ওর তো তেজ কম নয়? গলা ছেড়ে বলছে, 'আমায় পছন্দ করে গেলেই কি আমি ওই কেলে কুচ্ছিৎ বরের গলায় মালা দিতাম না কি? মরে গেলেও না। মেজোজেঠির কাছে শুনেছি এ বরটা কেলে। হ্যাঁ, সরোটা তবু বলতে হবে জিতেছে, ছোটো বরটা নাকি রূপে-গুণে আলো-করা। কিন্তু তোর কী হবে রে দিদি? বরের গলায় মালা দিতে গিয়ে চোখ বুজে ফেলবি না তো?' উঃ, বলতে বলতে যেন চাবুক হয়ে উঠছিল ও। ওর ওই টাইট টাইট মাজা মাজা শরীরটার সঙ্গে আমার খালি চাবুকের তুলনাই মনে আসে। কথাগুলোও যে চাবুক। বলে কিনা, 'তা বলা যায় না দিদি, তোর এখন যা অবস্থা, ওই বর পেয়েই হয়তো ধন্য হয়ে যাবি।'

ওর কথায় চোখে জল এসে যায় আমার, তাইতো উত্তর দেওয়া হয় না, নইলে বলতে ইচ্ছে করেছিল, হ্যাঁ, তাই যাব! ধন্যই হয়ে যাব। জীবনের সমস্ত আশা বাসনা চুকিয়ে দিয়ে ইট পাথরের মতো পড়েছিলাম, ভাবিনি আবার কোনোদিন জীবন আমায় ডাক দেবে। সেই ডাক যদি এল তো তাকে কি আমি ফিরিয়ে দেব? ফিরিয়ে দেব, যাকে দিয়ে ডাক পাঠিয়েছে, সে কালো বলে, কুশ্রী বলে?

আজ সকালে যখন ঘুম ভেঙে পুবের কোণের দিকের ওই জানালাটা খুলে দিলাম, অবাক হয়ে গেলাম যেন। মনে হল, এত আলো বুঝি কোনোদিন দেখিনি। অবাক হয়ে গেলাম আকাশের রং দেখে। কত রঙের খেলা। পৃথিবীতে যে আজও আলো আছে, আকাশে এখনও রং আছে একথা কি আর মনে ছিল? সেটুকুও সইল না নীরোর, ভেঙিয়ে হেসে উঠে বলল, 'কী রে দিদি, সাতসকালে উঠলি যে বড়ো? রাতে ঘুমিয়েছিলি তো? না কি আহ্লাদে সারারাত জেগে কাটিয়েছিস?'

জেগেই কাটিয়েছি আমি সত্যি, মনের মধ্যে সমুদ্রের তোলপাড়। কিন্তু তুই-ই কি ঘুমিয়েছিলি? আমি

টের পাইনি বুঝি, সারারাত তুই বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছিস আর বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলেছিস। সে-নিশ্বাসে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

এমন নিশ্বাস আমিও যে অনেক ফেলেছি রে, তাই তো ওটা বড্ড চেনা। নিশ্বাস ফেলেছি সেই কোন অতীত যুগে যখন বসন্তের বাতাস বার্তা নিয়ে আসত, আর এবাড়ির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত সেই বাতাসের প্রবেশ নিষেধ করে।

আমি চাইনি নীরোরও বিয়ে হোক!

আমি কি লজ্জায় মরে যাইনি, যখন নীরোকে দেখার পর সেই পাত্রের মা হঠাৎ আমাকে দেখে বলে উঠলেন, 'এ মেয়েটি?...ওমা! বড়ো মেয়ে? তা এটিকে অতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন?'

তারপর অনেক বিস্ময় প্রকাশ করলেন ওঁরা, বড়ো থাকতে মেজো মেয়েকে দেখাবার জন্যে। আরও বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই বলে যে, বড়ো আর ছোটো এ দুটি মেয়ের চেহারায় এত মিল, অথচ মেজোটি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম কেন? একটু বেশিই বললেন হয়তো, মেজোকে নাকচ করে দেবার জন্যেই বাড়াবাড়ি করলেন। নইলে নীরোও তো ফেলনা নয়, নীরোও সুশ্রীই। কিন্তু সেদিন ওর হার হল। সেই হারের লজ্জা কি আমার প্রাণে বাজেনি? বেজেছে বলেই কি আমি হঠাৎ পথে কুড়িয়ে পাওয়া পরম ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করব?

মরুভূমিতে চলতে চলতে যদি পরমপ্রিয়জনেরও তেষ্টার জলটুকু গড়িয়ে পড়ে যায়, কেউ কি সেই আক্ষেপে নিজের জলের সম্বলটুকুও মরুভূমির বালিতে আছড়ে ফেলে দেয়?

ওরা যদি নীরোকে পছন্দ করে চলে যেত, আমি কি হিংসে করতাম? তা কক্ষনো করতাম না। আমি নিশ্চয়ই দুটি ছোটো বোনের বিয়ের জামা সেলাই করতে বসতাম। হয়তো ছুঁচের কাজ করতে করতে চোখটা একটু জ্বালা করে আসত, হয়তো তাও আসত না।

কিন্তু এ যে অভাবনীয়, এ যে প্রত্যাশার অতীত। এ সৌভাগ্যকে আমি মাথায় করে না নিয়ে পারি?

মা কি এতে দুঃখিত হয়েছেন? মনে হয় না।

মনে হল মা বুঝি এইটাই চাইছিলেন মনে মনে। আমাকে মুছে ফেলে ছোটো দুই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে মা-র মনে কোথায় যেন বাধছিল। অথচ মেজোজেঠিকে তো একথা বলতে পারেন না, দুটি পাত্র খুঁজে এনেছ তুমি, খুব ভালো কথা, কিন্তু আমার যে আরও একটি চাই। মেজোজেঠিমা অবশ্য প্রথমে একবার আমার কথাটাও তুলেছিলেন, কিন্তু বয়সের হিসেব করে নিজেই পিছিয়েছিলেন।

এরা বয়সের হিসেব মানল না। বলল, 'বর-কনে সমবয়সি, এমন আজকাল আকছার হয়।'

বর-কনে! শব্দটার মধ্যে কী রোমাঞ্চ! কী রোমাঞ্চ, জীবনের বহু বার শোনা ওই শব্দগুলো! শুভদৃষ্টি, মালাবদল, বাসর, ফুলশয্যা। এগুলোকে এতদিন বিয়ের কয়েকটা অনুষ্ঠানের নাম বলেই জেনে এসেছি, আজ হঠাৎ অদ্ভুত নতুন একটা অর্থ বহন করে নিয়ে এল ওরা।

বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে, বিশ্বাস হয়েও বিশ্বাস হচ্ছে না। তবু বিশ্বাস করতে কী ভালোই লাগছে। রাত পোহালেই পাকাদেখা।

পাকাদেখা। কাল সকালেই পাকাদেখা?

ওগো আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে, কী ভুল করলাম আমি, কোল্ডক্রিম মেখে নিতে ভুলে গেলাম। কাল সকালেই যে পাকাদেখা গো! মুখের চামড়াটা যদি শুকনো দেখায়, যদি রংটা তেমন উজ্জ্বল না দেখায়!

রাত কত হল কে জানে! একটা? দুটো?

মা এখনও রান্নাঘরে, এখনও বাসনের টুং টাং আওয়াজ পাচ্ছি। ভাবি কুটুমদের তোয়াজ করবার জন্যে আপ্রাণ খাটছেন।

অনেক দিন পরে, বহু বহু দিন পরে মা-র মুখে আজ একটু সত্যিকার হাসি দেখেছি, প্রাণের হাসি। বেশ যেন 'মা মা' হাসি। দেখে চোখ জুড়োল, বুক জুড়োল। মা-র ওই দাবার আড্ডায় টেনে টেনে খিলখিলিয়ে হাসি শুনে শুনে হাসিতে অরুচি এসে গিয়েছিল। মনে আর হত না এখনও মা এমন করে হাসতে পারেন।

রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে কাছে বসিয়ে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু হেসে বললেন, 'একটু হাত লাগা, তোর শ্বশুরকে বলব সমস্ত খাবার আপনার বউয়ের হাতের তৈরি, ফেলতে পারবেন না।'

আমি বোধ হয় মায়ের দিকে হাঁ-করে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ, মা বললেন, 'অমন ফ্যালকামুখো হয়ে কী দেখছিস রে?' লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে বললাম, কই কিছু না তো!

মাকে ভালো লাগলে সমস্ত পৃথিবীই বুঝি ভালোলাগায় ভরে যায়!

কিন্তু সরোটা কী চাপা! কী চালাক! বিয়ের কথা হয়ে পর্যন্ত ও এমন মুখ করে বেড়াচ্ছে, যেন ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। লাজুক একটু ও চিরকালই, এখন দেখছি চালাকও কম নয়।

বিয়ে হচ্ছে, সেটা যেন আহ্লাদের ব্যাপারই নয়, বরং ভারি একটা যন্ত্রণার। সারাক্ষণ সেই যন্ত্রণার ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে থাকতে পারাও একটা বাহাদুরি বাবা! আমি পারি না, মনের ভাব অত চেপে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তাই দেবাটা অনিলটা ছোটো ভাই হয়েও আমাকে ঠাট্টা করছে, 'কীরে বড়দি, তুই যে একেবারে আহ্লাদে ডগমগ করছিস। তোর চোখ-মুখ-নাক-কান-হাত-পা সব থেকে যে স্ফূর্তি ছিটকে ছিটকে বেরোচ্ছে।'

বলুক গে। তা বলে আমি সরোটার মতন বিষাদের অভিনয় করতে পারব না। আমার ভাবনা শুধু বাবার জন্যে।

আমি চলে গেলে বাবার আর অযত্নের শেষ থাকবে না। আর তো কেউ ফিরেও তাকায় না। মা যদি মন্টুকাকার সেবাযত্নের দিকে যতটা মনোনিবেশ করেন, তার শতাংশের একাংশও বাবার জন্যে করতেন! সেটুকুও করেন না।

অথচ বাবার ওপর কি মা-র টান নেই? বুঝতে পারি না। অসীম অবহেলার অন্তরালে কোথায় যেন প্রচণ্ড একটা টান লুকানো আছে। কী জানি এ আমারই মনের ভুল কি না। এই এক জায়গায় মা এক আশ্চর্য রহস্য আমার কাছে।

তবু মাকে আমার ভালো ভাবতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার ভাই-বোনদের সামনে কি সে-ইচ্ছে প্রকাশ করবার উপায় আছে? মাকে ওরা ঘেন্না করে। মাকে একটু দরদ দেখালে ওরা ব্যঙ্গ করে, ধিক্কার দেয়! ভগবান! মা যদি এমন না হতেন। যদি লোকেদের মায়েদের মতো শান্ত সুন্দর পবিত্র হতেন।

যেখানে যাচ্ছি সেই মা-টি কেমন হবেন কে জানে। এমনিতে তো দেখে একটু ভয় ভয় করছিল। তবু নিশ্চয় ভালো হবেন, নিশ্চয় ভালো হবেন। আচ্ছা কালকে কি আর তিনি আসবেন? বোধ হয় না। বোধ হয় শুধু পুরুষরা। তারা কি আমার মুখের চামড়ার লালিত্যের ত্রুটি ধরতে পারবে? পুরুষের চোখ কি অত তীক্ষ্ণ হয়? আচ্ছা, আমাকে জানালার মুখোমুখি বসানো হবে? যদি তা হয়।

এখন আস্তে আস্তে উঠে ক্রিমটা একটু মেখে নেওয়া যায় না? নীরোটা কি দেখতে পাবে? বিশ্বাস নেই, পেতেও পারে। ও তো জেগেই আছে, এই তো খানিক আগে পাশ ফিরল। আমি যত সাবধানেই

সরতে যাই, ও ঠিক টের পাবে। তারপর ওর ওই ছুরির মতো শানানো গলায় হেসে উঠে ঠিক বলবে, আর কেন কষ্ট করে মরছিস দিদি, টিকিট কেনা তো হয়ে গেছে।

টিকিট নাহয় কেনা হয়েছে, সিটটা রিজার্ভ না-হওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায়? পাকাদেখাটা হয়ে গেলে বরং সিট রিজার্ভ হয়েছে বলা যায়।

সরোটা শুনছি সম্পর্কে আমার জা হবে। মামাতো না মাসতুতো কী যেন। ভালোই তো, ছোটো দ্যাওর ছোটো ভগ্নীপতি হবে আমার।

বিয়েটাও হবে দু-দিনের আড়াআড়িতে। বিয়ে। এবাড়িতে তাহলে বিয়ের শাঁখ বাজবে? মঙ্গলধ্বনি উঠবে? পিঁড়িতে আলপনা পড়বে, দেয়ালে পড়বে বসুধারার দাগ।

কিন্তু নীরোটারও যদি একটা উপায় হত।

ভগবান, কোনো অলৌকিক উপায়ে ওরও একটা বর জোগাড় করে দিতে পারো না? তাহলে তোমার আশীর্বাদের আনন্দ ষোলো আনা ভোগ করতে পাই। ওর একটি খুব সুন্দর বর জুটলে আমার চাইতে খুশি আর কেউ হবে না। ওর সৌভাগ্যে খুশি, আমার লজ্জা থেকে পরিত্রাণের খুশি।

আমার নিজের হোক কালো, হোক কুশ্রী, তা নিয়ে আমার দুঃখ নেই। তবু তো সে আমাকে এবাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

।। শচীপতির কথা ।।

এ সংসারে আমার কোনো ভূমিকা নেই। এমনকী দর্শকের ভূমিকাও নয়। তবু আমি এবাড়ির চারখানা ঘরের একখানা দখল করে দিব্যি আছি। তা দিব্যিই বই কী!

আমার কোনো কাজ নেই, কোনো কর্তব্যের দায় নেই, এ সংসারের ভালো-মন্দ হিতাহিত নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। যথেচ্ছাচারে পারমিট আছে আমার। আমি খাই-দাই আর যত পারি ঘুমোই। অথচ হাতের কাছে সব এসে জোটে। উৎকৃষ্ট খাদ্য, দামি দামি পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট তামাক, সেরা মদ। মদটা অবশ্য বৈকুণ্ঠ লুকিয়ে লুকিয়ে জোগায়। ঈশ্বর জানেন কোথায় টাকা পায়। জিজ্ঞেস করি না। কেন করব? কী দরকার? কোন উত্তর পেলে খুশি হতে পারব? আমার দরকার, আমি পাচ্ছি। অযাচিতভাবে পাচ্ছি। ব্যাস, এর পরে আর কথা কী?

একসময় আমাকে বলতে হত, 'আমার দরকার, আমার চাই, এইটেই হচ্ছে শেষ কথা।' আজ যখন চাইতেও হচ্ছে না, তখন আর কী কথা আছে? 'শেষ কথা'র পর আর কোনো কথা থাকতে পারে?

আগের আমি, আর এখনকার আমিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আগের আমিকে যারা দেখেছে, তারা যদি এখন দেখে, চিনতে পারবে না, বিশ্বাস করবে না। তাইতো আমার এই ঘুমের কোটরে আশ্রয় নেওয়া। আগে যে-পাহাড়েনদীটা ছিল উদ্দাম উন্মাদ, এখন সে-নদী শান্ত স্তিমিত। দুরন্ত নদী হঠাৎ কখন তার দুর্বার বেগ হারিয়ে থেমে গিয়ে বালির চরে মুখ লুকিয়েছে। কখন থামল, কেন থামল, নদী নিজে ভিন্ন আর কে জানবে?

জানবার ইচ্ছেই-বা কার আছে?

নদীটা থেমে গিয়েছে এইটাই শুধু সমাচার।

এ সংসারে আমার কোনো ভূমিকা নেই, দর্শকেরও না, তবু কত কী-ই দেখতে পাই। কিছুটা অনুমান দিয়ে, কিছুটা অনুভূতি দিয়ে। অনুমান দিয়ে টের পাচ্ছি এবাড়িতে এক জোড়া বিয়ের আয়োজন চলছে।

এও টের পেয়েছি পাত্রপক্ষকে জানানো হয়েছে, যাদের বিয়ে, তাদের বাপ রুগ্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। হয়তো ঠিক পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে। আসন্ন বিয়ের আহ্লাদে বাড়ি মুখর।

অনুমান দিয়ে আরও টের পাচ্ছি যে, এই পুরোনো ভিটের আনাচেকানাচে তলায় তলায় আর এক মিলনের ষড়যন্ত্র চলছে। আমি টের পাচ্ছি, বাধা দিচ্ছি না। কেন দেব? আমি কে? আমার তো কোনো ভূমিকা নেই এ সংসারে।

এই যে সেদিন দেখলাম এ সংসারের বড়োছেলে তার মা-র আঁচল থেকে চাবি চুরি করে মোমের ছাঁচ তুলে নিল, চাবির ডুপ্লিকেট করিয়ে নেবে বলে, আমি কি কিছু বললাম? না কাউকে বলেই দিলাম? কী দরকার? ওই বড়োছেলেকেই কি আমি বলে দিতে গিয়েছি যে, ওহে তোমার ওই চাবি গড়ানোর মজুরি পোষাবে না। সিন্দুক ফোঁপরা। না, কথা আমি কই না।

মরা নদী কি কথা কয়? সে শুধু চুপচাপ পড়ে থাকে। আমিও চুপচাপ পড়ে থাকি। আমিও চুপচাপ বসে আছি নাটকের শেষ দৃশ্য দেখবার অপেক্ষায়।

এবাড়ির কেউ আমার ছায়া মাড়ায় না, আমি তাতে অনুযোগ করি না, অনুযোগ করবার দাবি থাকলে তো? এবাড়ির বড়ো মেয়েটা আমাকে যত্ন করতে আসে, সেবা করতে আসে, আমি প্রতিবাদ করি না, প্রতিবাদ করতে গেলেও তো কথা কইতে হবে?

বিয়ে হয়ে ও নাকি পরের ঘরে চলে যাবে, এই সম্ভাবনার স্বপ্নে আরও বেশি মমতাময়ী হয়ে উঠেছে ও, আরও বেশি সেবাপরায়ণা। কিন্তু এ স্বপ্ন যখন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে? মাঝে মাঝে ভাবছি কী হবে তখন ওর?

আমি অবিশ্যি কারুর কথাই ভাবি না, তবু মাঝে মাঝে অলস মেঘের মতো ভাবনাগুলো মনের আকাশে ভাসে। ভাবি, মেয়েগুলোর বিয়ে দেয় না কেন এবাড়ির মালিক আর মালিকানি। তিন-তিনটে বুভুক্ষু প্রাণের তিন দুগুণে ছ-টা চোখ ওদের কীর্তিকলাপের দিতে চেয়ে আছে, এ অবস্থাটাই কি সুখের? যাহোক মতো একটা বিয়ে দিয়ে ওই চোখগুলো তো সরিয়ে ফেলা যেত। এইটা আমার অঙ্কশাস্ত্রে কিছুতেই মেলাতে পারি না।

টাকা খরচের ভয়ে? কিন্তু তাই-বা বলা যায় কী করে? ওদের পুষতেও তো টাকা লাগে। চিরদিন লাগবে।

সত্যি বলতে, এ জগতে কারুর পরেই আমার মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালোবাসা নেই। আমি অহংব্রহ্ম, কিন্তু নেহাত জীবে দয়া হিসেবে মনের মধ্যে যেটুকু আছে, তার বশেই বলছি—ওই মেয়েগুলোর জন্যে একটু আমার আক্ষেপ হয়।

যদিও আমি ভুলে গেছি এবাড়ির এই ছেলে-মেয়েগুলোর আমিই নাকি বাপ, তবু কোথায় যেন খচখচ করে একটু ফোটে।

ওই বড়ো মেয়েটা। কী সুন্দরই না ছিল, আর বড়ো হয়ে হয়ে, উঠেছিল ঠিক যেন ফুটন্ত পদ্ম। নিটোল মোমের পুতুলের মতো গড়ন, কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো একরাশ চুল, হাতের আঙুলগুলো দেখলে মনে হত স্বচ্ছ। একটু চেষ্টা করলে খুব ভালো বিয়ে হয়ে যেতে পারত ওর। সেটুকুও হল না।

প্রথম প্রথম চেষ্টার অভিনয় একটু হয়েছিল, তাও চুকে গেল।

অনেক দিন ধরে ও শুধু ওর লাবণ্যের পসরা নিয়ে এই চারখানা ঘরের মধ্যে আলো ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল। হাসল মুক্তা ছিটিয়ে, গান গাইল সুর ঝরিয়ে, সম্বোধন আমায় কখনো কিছু করত না, তবু এঘরে এসে হাজির হত ছুতোয়নাতায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম আমি আর ভাবতাম, হঠাৎ

একদিন মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোনো এক ব্যাটা রাজপুত্তুর জামাই ধরে বিয়ে দিয়ে ফেললে কেমন হয়।

ওই ভাবতামই! আর কিছু না। তাই ধীরে ধীরে চোখের সামনে ঝরে পড়তে লাগল সেই লাবণ্য, শুকিয়ে গেল সেই রং-রূপ-রস।

চিরদিনই আমি শুধু অলস ভাবনা করে কাটাই।

দাদামশাই মরতে যখন এবাড়িতে আমার পোস্টটা অবান্তর হয়ে উঠল, তখন তো ভেবেছিলাম নিজের ওই স্ত্রী-পুত্রগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি এই অভিশপ্ত প্রাসাদের চৌকাঠ ডিঙিয়ে।

ভেবেছিলাম পৃথিবীতে এত কোটি কোটি লোক নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করছে, আমিই-বা পারব না কেন? কিন্তু সেও ওই ভাবা পর্যন্তই। এই অভ্যস্ত আরামের নাগপাশ ছাড়িয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে সত্যিই পথে বেরিয়ে পড়বার উৎসাহ আর এল না।

প্রেরণা? তাই-বা কই এল? তা যদি আসত! তাহলে হয়তো আজ এ সংসারের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা হত। কিন্তু না, প্রেরণা এল না কোনো দিক থেকে। বরং এই নাগপাশের বন্ধন যাতে চিরস্থায়ী হয়, এই আরামের সুখশয্যা যাতে অক্ষয় হয়, তার জন্যে তখন অদৃশ্যলোকে চলছে এক অস্বাভাবিক সংগ্রাম। ক্লেদাক্ত কুশ্রী প্রাণান্তকর সেই সংগ্রাম!

আমি কি তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম না? পারতাম না তার অস্ত্র-ধরা হাত চেপে ধরতে? বলতে পারতাম না, তোমার ওই কলে কৌশলে আদায় করা কল্কাপাড় সিমলের ধুতি দিয়ে পা মোছবার ইচ্ছেও হয় না আমার। চলো পৃথিবীতে বেরিয়ে দেখি ঝাঁকামুটেরা কী খায়, চাষাভুসোরা কী পরে?

পারতাম, তা পারতাম। যদি আমার শিরায় শিরায় ঘরজামাইয়ের রক্ত বহন না করতাম।

আমি আমার মাতামহর কাছ থেকে চরত্রহীনতার নেশা পেয়েছি, কিন্তু তাঁর পৌরুষ পাইনি, তেজ পাইনি, পাইনি আত্মমর্যাদাবোধ। সেখানে শুধু আমার ঘরজামাই বাবার নিবীর্য রক্তধারা। সে-রক্তে আগুন ধরে না।

হঠাৎ কখন একসময় দেখলাম দিব্যি বেঁচে গেছি আমি। রাজার হালে টিঁকে রয়েছি এই বাড়িতেই, যে-বাড়ি থেকে অনেক পরগাছা বিতাড়িত হয়েছে, আর হচ্ছে।

বাঃ বাঃ! আমার বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে বাহবা না দিয়ে থাকব কী করে? তার বুদ্ধিতেই তো আমাকে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে এই বৃহৎ পৃথিবীর রাস্তায় গিয়ে পড়তে হল না। টের পেতে হল না ঝাঁকামুটেরা কী খায়, চাষাভুসোরা কী পরে।

অনেকে চলে গেল এ আস্তানা থেকে। দেবরায় বংশের অনেকে। অথচ আমি আমার বুদ্ধিমতী জীবনসঙ্গিনীর অলৌকিক বুদ্ধিবলে শেকড় গেড়ে বসে রইলাম এখানে। বরং আগের চাইতে ভালো অবস্থায়। আমার দাদামশাইয়ের সাজানো ছকটায় আমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল দেখতে পেলাম।

কেন এই ঘরটাই আমার ভোগের জন্য পড়ল, কেন দাদামশাইয়ের এত পৌত্র-পৌত্রী থাকতে তাঁর খাটপালঙ্ক, আয়না, দেরাজ, টেবিল, র‍্যাক, আরামকেদারা আমারই সেবায় তাদের ক্ষয়িত দেহ আরও ক্ষয় করছে তা আমি জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। কোনো ব্যাপারেই কোনো প্রশ্ন করা আমার নিয়মবিরুদ্ধ। চিরকালই। চোখের ওপর কত কিছু ঘটে গেছে, কখনো বলিনি 'এ কী! এ কেন! এ কোথা থেকে এল! হয়তো আমার এই স্বভাবের জন্যেই অনেকের অনেক কিছু দুঃসাহস।

হাতের কাছে ভোগের উপকরণ জুটলেই আমি বিনাবাক্যে তা হাত দিয়ে তুলে নিই, তাই সেই উপকরণ যারা জোগায় তারা দ্বিধাহীন।

দাদামশাইয়ের ঘরটা আমি পেলাম, তার সমস্ত সাজসজ্জাসহ। আর আমিও সেটা নিঃসংকোচে গ্রহণ করে তাঁর সেই কারুকার্যমণ্ডিত মেহগিনীর পালঙ্কে দেহ এলালাম, তাঁর আলনায় পরিত্যক্ত জামাকাপড় রাখতে লাগলাম, তাঁর পাথরের টেবিলে খাবারের থালা বসাতে দিতে বাধা দিলাম না। ক্রমশ এই ঘরটার মধ্যেই নিজেকে নিজে বন্দি করে ফেললাম।

এই ঘরের বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে, সেটা মনে রাখতে ভুলে গেছি। মনে রাখতে ইচ্ছেও হয় না। এই খাটখানাই আমার সমস্ত পৃথিবী!

একদা না কি চরিত্রহীন ছিলাম। এখন তাতেও আর উৎসাহ আসে না, ছেলেমানুষি মনে হয়। হয়তো পূর্বে মহাপুরুষগণের অমিতাচারের ফল স্বরূপ আমার দেহের ভিতরকার রক্তটা এত তাড়াতাড়ি স্তিমিত হয়ে গেছে!

তবু তবু হঠাৎ এক-এক দিন যখন দেখতে পাই বৈকুণ্ঠ বেটা ঘর-সংসারের এক-একটা সোনা-রুপো নিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ধূর্ত শেয়ালের মতো ছুঁচোলো মুখটা আরও ছুঁচোলো করে, তখন ইচ্ছে করে দিই একটা গুলি করে। চিরদিনের মতো ওর ওই বদমাইসি থেমে যাক। কিন্তু গুলি করা আর হয় না। হঠাৎ আবার আমি নিজস্ব জীবনদর্শন ফিরে পাই। কে ওই বৈকুণ্ঠ? কাদের এই বাড়ি? কার সম্পত্তি ওসব? আমার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?

আমার এই জীবনদর্শন ফিরে পেলেই, কিছু আগের দুরন্ত রাগটার জন্যে কৌতুক অনুভব করি। তখন খাটের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে পায়ের চেটো নাচাই।

আর ফেরার সময় বৈকুণ্ঠ যখন সেরা মদের বোতলটা আমার ঘরে এনে রাখে, তখন অম্লান বদনে সেটা টেনে নিই।

মদ খেয়ে খেয়ে আর দিনে অবিরত ঘুমিয়ে রাতের ঘুমটা আমার গেছে। শুধু জেগে পড়ে পড়ে প্রহর গনি।

আর এই ঘরেই দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁসে মাটিতে যে আরেকটা সরু বিছানা পাতা হয় রাতে, তার অধিশ্বরী যখন আমাকে ঘুমন্ত ভেবে নিঃশব্দে উঠে যায়, তখন অঘোর ঘুমের ভান করি।

শেষরাত্রেও তাই করতে হবে। তিনি আবার এসে শোবেন কিনা। এখন তাঁর বিছানা খালি। তিনি তাঁর রাতের রোঁদে বেরিয়েছেন।

মেয়েদের বিয়ের আশায় তাঁর মুখে যেন প্রসন্নতার জ্যোতি খেলছে ক-দিন। এতই যদি, এতদিন হয়নি কেন বিয়ে?

ও কী, সারাবাড়িটাতে হঠাৎ এমন আলো জ্বলে উঠল কেন? কত রাত এখন? তিনটে? সাড়ে তিনটে? তাইতো দেখছি?

বাড়িতে আকস্মিক কারুর অসুখ করল না কি? না কি এবাড়ির মালিক মন্টু দেবরায়ের অজর অমর হৃদ্‌যন্ত্রটা অসাবধানে হঠাৎ ফেল করে বসল?

ভয়ানক একটা কিছুই ঘটেছে মনে হচ্ছে। ঘরে ঘরে সবাই জেগে উঠেছে, এখানে-সেখানে দালানের সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি, উত্তেজিত চাপা কণ্ঠস্বর, যেন কার কোথায় কী সর্বনাশ হয়ে গেল, অথচ ডাক ছেড়ে কাঁদবার উপায় নেই তার, গিলে ফেলতে হবে সে-সর্বনাশকে।

কিন্তু মন্টু দেবরায়ের হৃদ্‌যন্ত্রটা যদি হঠাৎ বন্ধই হয়ে যায়, কার এমন কী সর্বনাশ ঘটবে?

একমাত্র ভয় তো ওর অংশের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যেটুকু আছে, অর্থাৎ যার উপস্বত্বে এই

পরগাছাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলছে, আসছে দামি খাবার, দামি পোশাক, দামি মদ, সেটুকু যদি দেবরায় বংশের আর কোনো শরিক এসে দাবি করে। এই তো?

তা সে ভয়ের প্রতিকার কি আর করে ফেলা হয়নি এতদিনের মধ্যে? লিখিয়ে নেওয়া হয়নি দানপত্রের পাকা দলিল?

না না, মন্টু দেবরায় নয়। তার হৃদযন্ত্র যে এখনও অটুট আছে, টের পাওয়া যাচ্ছে সেটা। গলা পাওয়া যাচ্ছে তার। পঙ্গু অশক্তের ব্যাকুলকণ্ঠের একঘেয়ে প্রশ্ন বার বার এসে ধাক্কা দিচ্ছে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে, 'কী হল', 'কী হল?'

কিন্তু চাপা কণ্ঠের উত্তেজনা তো হ্রাস হচ্ছে না। তবে কি এবাড়ির বড়ো ছেলে সিন্দুক সাফাই করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে? না তাও নয়। তার গলাও পাচ্ছি।

ধরা-পড়া অপরাধীর আর্ত কণ্ঠ নয়, আস্ফালনের স্বর। 'দেখে নেব! পুলিশে দেব, জেল খাটিয়ে ছাড়ব।'

কিন্তু কাকে? বৈকুণ্ঠকে নয় তো? বৈকুণ্ঠটা কিছু বোকামি করল না তো? উহু, বৈকুণ্ঠও কথা বলছে, নির্ভীক গলায়।

আমি এ সংসারের কেউ নয়। আমি ওই ঠান্ডা নিরেট দেওয়ালটার মতো। তাই রাত তিনটেয় হঠাৎ সারাবাড়িতে আলো জ্বলে উঠলে, আর সারাবাড়ি চাপা উত্তেজনায় থমথম করে উঠলেও আমি আমার দু-খানা গদিপাতা বিছানা ছেড়ে উঠি না।

কিন্তু কানটা একটু মর্যাদাজ্ঞানহীন, একটু হ্যাংলা স্বভাব, তাই নিজেকে বালিশে চেপে রেখে পড়ে থাকতে পারছে না। বারে বারে উচ্চকিত হয়ে উঠছে, টুকরো টুকরো শব্দ আদায় করবার আশায়।

কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

এবাড়ির বড়োমেয়ের গলা না? হ্যাঁ তাই। এবাড়ির গিন্নির আর মেজোমেয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি। একটা স্বর তীক্ষ্ণ তীব্র ধারালো, আর একটা স্বর ক্লান্ত বিপর্যস্ত হতাশ।

ওই দুটো বিপরীতধর্মী স্বর কি পরস্পরকে অভিযুক্ত করছে? করছে একটা কোনো সর্বনাশের দায়ে।

কিন্তু এবাড়ির ছোটোমেয়ে! তার কণ্ঠস্বর? কই?

।। চারুদাসীর কথা ।।

কী কেলেঙ্কার মা, কী কেলেঙ্কার। এমন কীর্তিকাণ্ড বাবার জন্মে কখনো দেখিনি, শুনিনি। ভদ্দরঘরের মেয়ের এ কী রীতচরিত্তির গো। আজ বাদে কাল বে, পাকা দেখা হয়ে গেছে, সেই মেয়ে কিনা ঘর ভেঙে পালাল? আমাদের গাঁয়েগেরামে ছোটোজাতের ঘরেও তো এমন পিরবিত্তি দেখিনি।

এবাড়িতে কাজে ঢুকে ইস্তক অনেক নীলে দেখছি, কিন্তু ছোটো দিদিমণি যা নীলে দেখাল, একেবারে তাজ্জব। বে হবার আশাভরসা তো কিছুই ছেল না, কোথাকার কে এক জেঠি না কে এসে পড়ে একেবারে হাতে সগ্গো পেড়ে এনে দিল, আর তুই এই কাজ করলি?

তা সগ্গো ছাড়া আর কী? শুনলুম ডাক্তার বর রাজপুত্তরের মতন চেহারা, তা ছাড়া বড়োমানষের বাড়ি, এর ওপর আর কী চাই? আর কী হতে হয়? সেই পাত্তর ফেলে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, ভদ্দঘরের মেয়ে তুই কুলে কালি দে বেইরে গেলি একটা ফুলওয়ালা ছোঁড়ার সঙ্গে।

ছোঁড়ার সঙ্গে ফুস ফুস গুজগুজ করতে তো আমি দেখিছি, সিঁড়ির কোটরে, সিঁড়ি থেকে নেবে বাজারের চাতালের কোণে, দেখিছি আর মনে মনে হেসেছি। বলি যেমন গাছ তেমনি ফল তো হবেই।

আমড়া গাছে কি আর ন্যাংড়া ফলবে? কিন্তু মাইরি বলি, এ সন্দ কোনোদিন হয়নি যে ছোঁড়ার সঙ্গে বেইয়ে যাবে। ভাবতুম বয়েস গড়িয়ে গাছ-পাথরে ঠেকছে, বে-র নামগন্ধ নেই, একটা পুরুষের সঙ্গে দুটো কথা কয়েও সুখ। মরুক গে, আমার দৃষ্টি দেওয়ার দরকার কী? দাসীবাঁদি মানুষ, নীচু দিকেই নজর রেখে চলা ভালো। উঁচু দিকে নজর দিতে গেলেই তো গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

গিন্নির নিজের তো ওই রীতনীত। মেয়ের নামে নাগিয়ে দিতে গেলে যদি উলটে আমায় তেড়ে আসে? যদি বলে, তোর অত কথায় কাজ কী? তুই চুপ করে থাক? ওই ভেবে আর মুখে রা টি কাড়িনি। তাপ্পর তো যখন বে-র সম্বন্ধ হল, বলি বাঁচলুম বাবা, ছুঁড়ির আনাচেকানাচে নজর দিতে যাওয়া ঘুচল। বড়োমানুষের বাড়ি বে, এর পর দাসী চাকরদের দু-পয়সা নাভ হবে, তত্ত্বতাবাসে বকশিস মিলবে ভালো। হরে কেষ্ট। সব গুড়ে বালি। সকল আশায় ছাই।

আহা, বড়োদিদিমণিটার জন্যেই প্রাণটা বড়ো চড়চড় করছে। তুই তো ছুঁড়ি মনের মানুষের সঙ্গে ভেগে পড়লি, ও-মানুষটার যে বড়ো আশায় ছাই পড়ল। বড়ো আনন্দে নিরানন্দ হল। তোর এই বেইরে যাবার খবর শোনার পর, তোর ওই হবু শাউড়ির বোন কি আর ঘরে আনতে চাইবে এঘরের মেয়েকে? পিরবিত্তি হবে আর?

তার মানে দুটো বেই ফাঁসল।

আহা বড়দিমণির সে কী ফুঁইপে ফুঁইপে কান্না। লোকে মনে করল হয়তো বোনের শোকে, কিন্তু আমি বাবা বুঝেছি। অত কান্না বোনের শোকে নয়, নিজের শোকেই। শুকনো কাঠে ফুল ধরেছিল, মরা গাঙ্গে বান ডেকেছিল, আচমকা সব তছনছ হয়ে গেল গা!

ছোড়দিদিমণির মুখ্যুমির কথা ভাবছি আর আমার হাত-পা কামড়ানি আসছে। গেলি গেলি তো আগে গেলিনে কেন? কূলে এসে তরি ডোবালি কেন? ফুলওয়ালার সঙ্গেই যদি এমন মজেছিলি তো পাকাদেখা অবদি অপিক্ষে করলি কেন?

আসল কথা ছোঁড়াটাই বোধ হয় রাজি হচ্ছিল না, য্যাতেই হোক গরিবের ছেলে তো। 'অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ' না হলে আর ফুলের দোকান দিয়েছেল? কিন্তু আমাদের ইই ছক্কাপাঞ্জা মেয়েটি তাকে পটিয়ে পাটিয়ে লইয়েছে।

আহা! গায়ে হলুদের তত্ত্বয় কত গয়নাগাটি শাড়িজামা আসত, কত তত্ত্বতাবাস আনাগোনা করত, কত ঘটাপটা হত, তার কিছু হল না গো! নিজে বঞ্চিত হলি, অপরকে বঞ্চিত করলি। বড়দিমণির দীর্ঘনিশ্বাসে তোর জেবনটা জ্বলেপুড়ে খাক হবেনি? আর বংশের মুখেও তো চুনকালি দিলি।

এতদিন যদি ধৈর্য ধরেছিলি ছুঁড়ি, আর ক-টা দিন সবুর সইলনি? ঘর বর গয়না কাপড়, আদর আহ্লাদ মানময্যেদা, এ সবের আস্বাদ পেলে কি আর তোর ওই ছেঁড়া ভালোবাসার ভাবের নোকের কথা স্মরণেই থাকত?

রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করল তিন বোনে, কথাবার্তাও হল, কিচ্ছুটি তো বোঝা যায়নি। শুধু বড়দিমণির একটা কথা কানে এল, 'সরো, তুই কিচ্ছু খাসছিস না কেন রে?'

ছোড়দিমণি বোধ হয় তাড়াতাড়ি লুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিতে দিতে বলল, 'না, কই খাচ্ছি তো?'

মেজদি অমনি বলে উঠল, 'ওলো সরো, তুই বড়দির শ্বশুরবাড়ির লোক হবি কিনা, তাই তোর ওপর দরদ উথলে উঠছে বড়দির।'

মেজোদিদিমণির কথার ঢঙই অমনি মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তার ওপর আবার এই উলটোপালটা বে-র ব্যাপার ঘটল। বাব্বাঃ যেন ফণাতোলা ফণিনীর মতন ফুঁসে বেড়াচ্ছে। অবিশ্যি

হয়েছে বড্ডই অপমান্যি। দেখতে এল ওকে, পছন্দ করে গেল বড়োকে। আমাদের গাঁ-গেরামে অমন হলে ডোবার জলে ডুবে মরত।

একটা বেষয় কিন্তু কেমন খটকা লেগেছে।

মেজোটাও তো ইদানীং ওই ফুলওলা ছোঁড়ার সঙ্গে নটঘটি করত।

অবিশ্যি অমন লুকিয়েচুরিয়ে নয়, রাস্তা দে বেইরে, সদর বাজারে দোকানের সামনেই। হাসি কথা, মালা নিয়ে মাথায় জড়ানো, ছোঁড়া কী সব বই-কেতাব পড়ে সেইসব টেনে টেনে দেখা, কত ছলাকলা! মনে করে কেউ কিছু বুঝতে পারে না। হুঁ!

বৈকুণ্ঠ আমায় চোখ টেপে, আমি বৈকুণ্ঠকে চোখ টিপি, আর অন্তরালে দু-জনে হাসাহাসি করি। বলি, এদের সব হয়েছে কী জানিস? দুর্ভিখ্যের আহিঙ্কে! একপাত ভাত দেখেছে তো দু-জনেই হুমড়ে পড়েছে। এখন কিন্তু মন নিচ্ছে বোধ হয় মেজোটার সঙ্গে সড় ছেল। হিঁসকুটি তো? এরা মনে করল, 'মেজদি আমাদের কত হিতুষী', আসলে মেজদি যে তোদের সব্বনাশের গোড়া বাঁধছে তা কি ছাই বুঝলি? ছোটোটা বড়োটা দুটোর ভালো ঘরে বে হত, ও পড়ে থাকত। তাই সব নিম্মুল করতে সড় করল। আমার তো বাপু এ বিশ্বেস।

বৈকুণ্ঠ কিন্তু অন্য কথা বলে।

ও বলে, 'নারে চারু, না। তুই যা ভাবছিস ওকথা না। সড় নয়, এমনি? এদের সংসারে এতটুকুবেলা থেকে আছি। অনেক দেখিছি। একটা ফুলে পাঁচটা ভ্রেমরকে পড়তে দেখেছি ঢের। ওরই মধ্যে যে পারে বোঁটা কেটে লুঠে নিতে। তাই বলছি সড়টড় কিছু নয়, মেজোটাও নিজের শখেই ঢল নাবিয়েছেল। আমি তো ভাবছিলুম ষাঁড়ের শত্তুর বাঘে মারে বুঝি। তা আর হল না।

কে জানে বাবা হবেও বা! ও হচ্ছে অনেক কালের লোক, এদের আদি অন্ত সব জানে। আমি ভাবছি তাই হলেই বরং ভালো হত, আপদ চুকে যেত। দুটোর বে হয়ে যেত, একটা নিজের পথ দেখত, সংসার ফর্সা হয়ে যেত। তাল গাছ প্রেমাণ আইবুড়ো আইবুড়ো মেয়ে দেখলে যেন প্রাণ হাঁপায়। হল না, সব ভেস্তে গেছে।

গিন্নিমাগি দেখে-শুনে যেন কেমন পাথর হয়ে গেছে।

সেই রাত্তিরেই যা ছুটোছুটি করে বেড়াল, এক-শো বার নীচে নাবল ওপর এল, মাথায় জল দিল, ফ্যান খুলে বসে পড়ল, সে এক দিশেহারা অবস্থা। ওমা সেই অবস্থায় মেজোটার কী কাটা কাটা বুলি, 'হবেই তো, এইরকম তো হবেই। আরও কত হবে, এখুনি হয়েছে কী!'

মা কেঁদে বলল, 'আমায় এমন করে বলছিস, আমার অপরাধ?'

মেয়ে বলে, 'সেকথা আমায় জিজ্ঞেস না করে জিজ্ঞেস করো গে তোমার ভগবানকে। অবিশ্যি যদি থাকে।'

সেই একবার দেখলুম গিন্নিকে, কান্না শুকিয়ে হঠাৎ যেন বাঘিনীর মতন ফুলে উঠল, চোখের তারায় যেন আগুন। গলায় চিৎকার নেই চাপা গলায় গজ্জন। দাঁতে দাঁত দিয়ে বলল, না নেই! আমার ভগবান নেই। তাই তোদের জিজ্ঞেস করছি, বল বল তোরা, তোদের কাছে কী অপরাধ করেছি আমি?'

এসব কথার মাথামুণ্ডু বাপু বুঝতে পারিনে। তাপ্পর তো গিন্নি কেমন ভিরমি যাওয়ার মতন শুয়ে পড়ল, ছোড়দাদাবাবু তাড়াতাড়ি মুখে-মাথায় জল দিল, কাকাবাবু চ্যাঁচাতে লাগল ঘরের মধ্যে থেকে। সে কী আতান্তর! মাঝখান থেকে আমরা যেন চোর।

কিন্তু ধন্যি বলি বাড়ির কর্তাকে। এতবড়ো কীর্তি ঘটে গেল, কিছু কি আর টের পেলি না তুই? ওমা

ঘর থেকে বেরোল না গো মানুষ। যেমন বালিশ বিছানার মতন চব্বিশ ঘণ্টা পালঙ্কে পড়ে থাকে, তেমনি থাকল। কার দোষ কার গুণ বিচের করব?

তা কত্তার বড়ো ছেলেটিও পেরায় তাই। ছোটো বোনকে হঠাৎ মাঝরাত্তিরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে একবার অবিশ্যি থতোমতো খেয়ে বেইরে এয়েছিল, সারাবাড়িতে ফটাফট আলো জ্বেলে দেখলও। তাপ্পর একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলে গেল, 'সরোটাকে চিরদিন বোকা বলে জানতুম, এত চালাক তা তো কোনোদিন টের পাইনি।'

ওমা, বলল, বলে ফের গে চাদরচাপা দে শুলো।

কী বলব মা, কী বলব! সাধে আর বলি, এদের বাড়ি চাকরি করতে এসে অনেক তাজ্জব দেখলাম।

প্রেথম প্রেথম যেন গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতুম, ভাবতুম কী রে বাবা, কে কত্তা কে গিন্নি? যখন এলাম, ওপর দ্যাখতা তো দিব্যি সংসার, কত্তা গিন্নি, পাঁচ ছেলে-মেয়ে, পুরোনো চাকর। তা ছাড়া বুড়ো নড়বড়ে একটা পুরোনো ঝিও ছেল, আবার মামাতো সম্পক্কের এক দ্যাওর—সাজন্ত সংসার।

কিন্তু দু-চার দিন যেতেই কেমন একটা খটকা লেগেছে, বলি সংসারের কোনখানে যেন একটা ইসকুরুপ আলগা। যা সাজন্ত বলে মনে হচ্ছেল, সেসব যেন লোকদ্যাখতা সাজানো।

ক্রেমশ বৈকুণ্ঠর নেকট সবই টের পেলাম। বুড়িটা আমাকে দেখতে পারত না, কথা কইলে মুখ ঘুইরে বসে থাকত। মোলো, বাঁচলুম।

সেই অবদি আছি টিকে, কাজ কম মাইনে বেশি, বলি দরকার কী আমার ভেতরের কথায়। কিন্তু ছোড়দিদিমণিটা এ কী করল বলো দিকি? আর এ সংসারে থাকতে ইচ্ছে নেই বাবা। দম আটকানো প্রাণ হাঁপানো বাড়ি। গতর খাটালে ঢের কাজ মিলবে।

বৈকুণ্ঠ মুখপোড়া একটু চারু চারু করে, ইয়ে করে, পান খেতে টাকাটা সিকেটা দেয় মাঝে মাঝে, এই যা!

মরুক গে। অবিশ্যি আছি যে আমি খুব মন্দ তা নয়।

কাজ আর কতটুকু? বৈকুণ্ঠ মুখপোড়া বাবুয়ানা করে বেড়ালেও তো একাই এক শো। তা ছাড়া গিন্নির আমাদের গতর আছে খুব। আর ছেলে-মেয়েদের খাওয়াটি তো কারুর হাতে ছাড়বে না। বাঘিনীর মতন আগলে থাকবে। সকাল বেলাই তো গিন্নি নিজে নীচের বাজারে নামবেন তোলা সাধতে, সেও এক কেলেংকার। আমি যে দাসীবাঁদি, আমারও ওনার রকমসকম দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যার যার সেরা জিনিসটা যেন চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নেবে।

এই তো কালই সকালে, কেলে মেছুনি মাগির কাছে গোটাকতক মাত্তর খয়রা মাছ ছেল, রুপোর মতন চকচকে এতখানি-খানি মাছ ক-টা। ওমা, খপ করে তার থেকে চার-চারটে মাছে থাবা বসাল! আর কেলে মাগিও তেমনি, সেই মাছের রক্তমাখা হাতে মায়ের হাতখানা চেপে ধরল। আমি তো দেখেশুনে বলি, 'মা ধরণী দ্বিধা হও।'

মাগি খরখরিয়ে বলে উঠল, 'মাছে হাত দিয়ো না গো, ওর পাঁচ ট্যাকা সের।'

গিন্নির মুখখানা হয়ে গেল যেন পাঙাসে। তবু টেনে টেনে হেসে বলল, 'তোদের ছোটোদিদিমণি বড্ড ভালোবাসে রে, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হয়ে যাবে—'

মাগি প্যাঁচাপানা মুখ করে বলল, 'তা হোক ও মাছ নিয়োনি।'

তবু গিন্নি নাছোড়, কালিমুখে হেসে হেসে বলল, 'নাঃ তোরা বাপু বড্ড পয়সা পিচেশ হয়েছিস আজকাল, একদিন বই তো নয়? সবদিন কি খয়রামাছ মেলে?'

—মেলে না বলেই তো বলছি যে নিয়োনি।' বলে মাগি বাকি মাছ ক-টা হাতের পোঁছা দিয়ে আগলে

কোলের গোড়ায় টেনে নিয়ে বলে উঠল, 'রাখো গো বলছি মা ঠাকরুন, তামাশার কথা নয়, এই ইদিকে চারা কই আছে ন্যাও মেয়ের জন্যে।'

বললে না পেত্যয় যাবে, তবু গিন্নি মুঠো আলগা করল না, মাগির মুখের ওপর মাছ ক-টা ছুঁড়ে মারল না, —আচ্ছা বাবু আচ্ছা, তোর মাছের দাম আমি দিয়ে দেব। বলে তড়বড় করে সরে এল।

জেলেমাগি নিমের পাঁচনগেলা মুখে গজরে উঠল, 'হুঁ, দাম যে তুমি কত দেবে মা ঠাকরুন তা আর আমার জানতে বাকি নেই।'

আমি আড়ালে এসে বললুম, 'ছোটোলোক মাগির আসপদ্দার উচিত জবাব দিয়ে দিন দিকি মা, এই ডণ্ডে পয়সা ফেলে দিয়ে যান।'

মা ঠাকরুন দিব্যি হেসে গা পাতলা করে বললেন, 'ও-মাগির কথার ধরনই ওই চারু, ও আর ধরতেই হয় না। তবু সত্যি বলব, মাগির মনটা ভালো, মুখেই অমনি। আমি না নিলে, হয়তো নিজেই গিয়ে পৌঁছে গিয়ে আসত।'

শুনে মনে মনে কত হাসব। জেলেমাগির এত মানুষ মনিষ্যত্ব আবার কবে প্রকাশ পেল। তা কী আর বলি, ভালোমানুষের মতন বললাম, 'তা হোক মা, তুমি বাড়ি গিয়েই বজ্জাত মাগির পয়সাগুলো গুনে ফেলে দাও গে। দাও-না আমার কাছে, মাগির মুখের সামনে ফেলে দিয়ে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যাই।'

মা ঠাকরুনের মুখ এবার লাল হয়ে উঠল।

তবু ভাঙে তো মচকায় না। বলল, 'একদিন যদি ওদের তেজ ভাঙতে দাম ফেলে দিই, তাহলে বাজারসুদ্ধু কেউ আর তোলা দেবে না রে চারু! বুঝলি? ছোটোলোকের ছোটো বুদ্ধি, গুরুলঘু জ্ঞান কি আছে ওদের? কাকে কী বলতে হয়-না-হয় জানেই না।'

জানতুম এমনিতর উত্তরই দেবে। ওই কথার কারসাজিটিই তো জানে! আর ছেলে-মেয়ের খাওয়া খাওয়া করেই গেল মানুষটা।

কিন্তু যাই বলো আর তাই বলো, কী নেমকহারাম মেয়েছেলে। এই ছোটোদিদিমণির কথাই বার বার মনে আসছে, আজ বাদে কাল তোর বিয়ে হবে, তুই পরের ঘরে চলে যাবি বলে যে মা এত অপমান্যি হয়েও তোর মুখরুচি জিনিসটুকু জোগাড় করল, সেই মায়ের বুকে এমনি করে শেল হানলি তুই?

এখনকার মেয়েছেলেরা সব নাকি খুব খুব লেখাপড়া জানা, তা বলি, এ-ই লেখাপড়ার গরিমা? মনকে বশ করতে পারিস না? যাকে ভালো লাগবে তার হাত ধরেই বেরিয়ে পড়বি? মা-বাপ, লোকসমাজ, কিছুর মুখ চাইবি না?

তেমনি সুযোগ সুবিধেও করে দিয়েছে ভগবান, লেজেস্টরি বিয়ের ব্যবস্থা খুলে দিয়েছে, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে দু-জনে হাত ধরাধরি করে এক বার লেজেস্টি আপিসে গিয়ে ঢুকতে পারলেই ব্যাস নিশ্চিন্দি।

আচ্ছা বলি তারপর?

বে হলেই তো ঘর-সংসার ছেলেপিলে হেন তেন সেসব নিয়ে নাস্তানাবুদ হবি না? কে যাবে ম্যাও সামলাতে? দায় দৈবি দেখবে কে? জানিনে মা, বি. এ, এম. এ. পাস করিনি, সে-বিদ্যের মধ্যে ঢুকতেও পারব না।

মরুক গে ঘুমোই।

পোড়া চক্ষে যে ঘুম আসেও না ছাই। বিশেষ করে ছোটোদিদিমণি পালিয়ে যাওয়া ইস্তক তো দুটি চোক্ষের পাতা এক করিনি। ইঁদুরটি খুট করলেও মনে হয়, ওই বুঝি কে কোথায় খিল খুলল, ওই বুঝি

আর কেউ পালাল। বড়োদিদিমণিটা কোনদিন যে মনের দুঃখে আত্মঘাতী হয় এই আমার চিন্তে। এ বাড়িতে শুনেছি পূব্ব পূব্ব কালে অনেক আত্মহত্যে হয়েছে। বৈকুণ্ঠ আমায় বলেছে। অবিশ্যি ওরও শোনা কথা। তবে বৈকুণ্ঠ এমন করে কথা বলে ভয় ধরিয়ে দেয়। বলে কিনা, 'আমায় এসব কথা কে বলেছে জানিস চারু, এই দেয়ালগুলো। এই সব দেয়ালের পরতে পরতে লাখ লাখ কথা জমানো আছে, মাঝরাত্তিরে দেয়ালে দেয়ালে ফিসফিসিয়ে কথা কয়, চোখ বুজে কান পাতলেই সব শুনতে পাওয়া যায়।'

শুনে অবধি আমি আর অন্ধকার করে ঘুমোতে পারিনি। ভাঁড়ার ঘরের এই আলোটা প্যাটপেটিয়ে জ্বেলে রেখে শুয়ে পড়ি। গিন্নিঠাকরুন এত রাতে আর ইদিকে আসেন না তাই বাঁচোয়া, নইলে হয়তো এই আলোজ্বালার জন্যেই কত কৈফৎ দিতে হত।

ওই আলোর জন্যেই ঘুম আসতে দেরি হয়। কিন্তু কী করব, ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মুখপোড়া বৈকুণ্ঠ।

তবু কি নিস্তার আছে? আলো জ্বালা থাকলেও, রাত একটু বেশি হলেই, কেবল যেন কাদের পায়ের শব্দ কানে আসে, কারা যেন হাসে কাঁদে। কারা যেন উঁকি মেরে মেরে ঘুরে বেড়ায়।

দূর ছাই বাবা, এই ভূতুরে বাড়িতে কেনই-যে পড়ে আছি। আর থাকব না। এবার কাজ ছেড়ে দেব।

।। পুরোনো দেওয়ালের কথা ।।

আমি দেওয়াল।

আমি স্তব্ধ মৌন উদাসীন। আমার এই মৌন উদাসীনতার সঙ্গে তুলনা করে তোমরা তোমাদের নির্বোধ উদাসীন লোকদের উপহাস করো, কিন্তু কোনোদিন কেউ কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের এই মানুষের জগতে আমার ভূমিকা কতখানি?

আমিই কি মানুষকে অরণ্যচারিতা থেকে টেনে এনে সভ্যতার স্বাদ দিইনি? দিইনি নিরাপত্তার শান্তি? দিইনি আশ্রয় আর আবরণ? মানুষের কাছ থেকে মানুষকে আড়াল করবার দায়িত্ব এমন আর কে নিয়েছে আমার মতো? মানুষকে মানুষের পর্যায়ে এনে পৌঁছোল কে আমি ছাড়া?

মানুষ যেমন আমায় গড়েছে, আমিও তেমনি গড়েছি মানুষকে।

কিন্তু মানুষ সে-ঋণ স্বীকার করে কই? আমাকে সম্মান সমীহ করে কই? আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করে কই? ব্যঙ্গ করে মাঝে মাঝে বলে বটে, আমারও নাকি কান আছে। কিন্তু সে ওদের নিছকই ব্যঙ্গের কথা। আমাকে ওরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। সেই অসম্ভ্রম নীরবে পরিপাক করতে হয় আমাকে।

তাইতো আমি মানুষের সমস্ত দুর্বলতা, আর সমস্ত নির্লজ্জতা আর বীভৎসতার সাক্ষী। আমি নীলকণ্ঠের মতো সমস্ত হলাহল পান করে নিঃশব্দ মহিমায় স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি।

কিন্তু যদি তা না থাকতাম? যদি কথা বলতাম? তাহলে মানুষ নিজেই কি নিজেকে দেখে শিউরে উঠত না?

তা ছাড়া ইতিহাস লেখার দায়িত্বও তো আমিই পারতাম নিতে।

এই যে আমি, এই দেবরায় বংশের পুরোনো ভিটের দেওয়াল, আমার মর্মে মর্মে কি সঞ্চিত হয়ে নেই এদের পাঁচ পুরুষের ইতিহাস? আর সে কি শুধুই ইতিহাস? সে তো এক-একটা বিরাট বিরাট উপন্যাস।

দেবরায় বংশের প্রথম কৃতী পুরুষ কৃষ্ণনারায়ণ দেবরায়। প্রথম যে এই ইমারতখানা বানিয়েছিল,

যে দিয়েছিল আমার ইটের কাঠিন্যের ওপর সাদা পঙ্খের পালিশ লাগিয়ে, ফুটিয়েছিল ফুল, সে-লোকটা অমন শৌখিন সভ্য আর সুরুচিবান হওয়া সত্ত্বেও তার দু-দুটো পরিবার আত্মহত্যা করে মরেছিল কেন, সে-কাহিনি উদ্ঘাটন করলে কি তোমাদের একটা আধুনিক উপন্যাসের প্লট হয় না?

আর শুধু কি ওই দুটো আত্মহত্যাই? প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত আত্মহত্যাই ঘটেছে এবাড়িতে তার হিসেব আর কে রেখেছে আমি ছাড়া?

কত বালবিধবা খুন হয়েছে, কত অজাতশিশু পৃথিবীর আলো দেখতে পায়নি, মানুষের নিষ্ঠুরতার ঋণ শোধ করতে।

আবার কত পুজোর কাঁসর-ঘণ্টা বেজেছে, কত আরতির ধূপ পুড়েছে, কত দুঃখী আতুর আশ্রয় পেয়ে 'রাজা হও' বলে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে গেছে, কত দরিদ্র দূরাত্মীয় এখানে শেকড় গেড়ে বসে রামরাজত্ব করেছে।

কত ঝাড়লণ্ঠন জ্বলেছে, কত নূপুরধ্বনি এই মার্বেল মোড়া মেজেয় ঠিকরে উঠেছে, কত উৎসবের সমারোহে আশপাশের লোকের চোখ ঝলসে দিয়েছে।

আমি এদের রুপোর পালকির নবাবি বিলাস দেখেছি, দেখেছি ল্যান্ডো ফিটন জুড়িগাড়ির বাবুয়ানা, আবার মোটরগাড়ির সাহেবি কায়দাও দেখলাম।

কত প্রোষিতভর্তিকার অশ্রু আর গোপন দীর্ঘশ্বাসের ভারে আমার পাথুরে পাঁজরাগুলোও কেঁপে উঠেছে, আবার কত নব মিলনোৎকুণ্ঠিতার থরথর হৃদয়ভাবে আনন্দে থরথর করেছে আমার বুক।

আমারই বক্ষকোটরে রচিত হয়েছে কত বাসরশয্যা, আর কত শেষশয্যা। এ কোটরে পাঁচ পুরুষ ধরে চলেছে জীবনলীলা আর জৈবলীলার বহু বিচিত্র অভিনয়। আমারও যৌবনের চাকচিক্য ঝরে পড়তে পড়তে এখন শেষ অবশিষ্ট আছে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই জরাজীর্ণ দেহখানা, আর হতাশ বিবর্ণ মনটা।

হ্যাঁ হতাশ বই কী! আমার এই নুয়ে পড়া দেহখানাকে যে আবার কেউ কোনোদিন ঠেলে সোজা করে তুলতে চেষ্টা করবে, আমার এই ভাঙা পাঁজরের ক্ষতচিহ্নে মমতার প্রলেপ লাগাবে, আমার চামড়ায় লাগাবে এতটুকু রঙের ছোঁয়া, এ আশা আর রাখি না।

দেবরায় বংশের ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব এবাড়িতে আর কারও নেই। এখন যারা এখানে আছে, তারা সকলেই যেন বিষের ছোঁওয়ায় নীল হয়ে গেছে। আমি সারাদিন কান পেতে শুনি এদের সেই বিষাক্ত চিত্তের তপ্তশ্বাস, সারারাত স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করি সে-চিত্তের এই নিঃশব্দ মুখরতা। ওরা ফিসফিস করে যা বলে, আমি তো বুঝতে পারি, বুঝতে পেরে ক্ষুব্ধহাসি হাসি।

বুঝতে পারছিলাম সমস্ত সংসারটা ক্রমশই যেন পাথরের মতো ভারী আর পাথরের মতোই কঠোর হয়ে আসছিল। আর এরা দিনের কথা সংক্ষিপ্ত আর রাতের কথা দুরন্ত করে তুলছিল।

তারপর ভেঙে গেল সেই বুকচাপা অসন্তোষের কঠিন পাথর, দম আটকানো সংসারটা দমটাকে আর রাখতে পারল না, ফেটে পড়ল চেঁচিয়ে উঠল, সকালের প্রখর আলোতেও ওরা মুখর হয়ে উঠল।

আমি সব জানি, আমি সব দেখছি, কিন্তু ব্যক্ত করি কী করে?

আমার মনে হচ্ছে আমি চ্যাঁচাচ্ছি, কিন্তু জানি তা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

নাঃ, সত্যি ঠিকই বলো বটে তোমরা, আমার শুধু কানই আছে, আর কিছু না। সেই কানে আছড়ে পড়ছে এদের সমস্ত কোলাহল।

বাড়ির ছোটো মেয়ে তার প্রেমাস্পদের হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়েছে তাই এই কোলাহল।

সেই পালানোর সাক্ষী তো আমিই ছিলাম শুধু, আর কেউ না। ওরা হঠাৎ টের পেল, টের পেয়ে চিৎকার করে উঠল।

প্রথম চ্যাঁচাল বড়ো মেয়ে। কী যেন নাম ওর? বিরজা বুঝি। হ্যাঁ, বিরজা, নীরজা আর সরোজা এই তো তিনটে বোন।

পুরোনো আমলের বড়ো ওই ঘড়িটার গেঙিয়ে গেঙিয়ে তিনটে ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গেই বিরজা ঘুমের থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠল 'নীরো।'

নীরজা পাশ ফিরে অলসভাবে সাড়া দিল 'কী?'

—সরো কোথায়? সরো? বিছানায় দেখছি না যে তাকে?

নীরজা বিরক্ত গলায় বলল, 'ন্যাকামি করছিস কেন, বাথরুমে গেছে বোধ হয় আবার যাবে কোথায়।'

বিরজা ততক্ষণে উঠে চৌকি থেকে নেমে আলো জ্বেলেছে।

'বাথরুমে।' বিরজা একটু থেমে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই বটে। আমার যে কী মরণদশা। একবার ঘুমের ঘোরে মনে হল ও যেন আলমারি খুলে শাড়াটাড়ি কী সব বার করছে, তারপর কেমন ঘুমিয়ে গেছি। আবার আচমকা চোখ মেলে দেখি বিছানায় নেই, বুকটা দুরদুরিয়ে উঠল।'

আমি মনে মনে হাসলাম। আমি তো জানি বিরজাসুন্দরী, ঘুমের ঘোরে ঠিকই দেখেছ তুমি। আলমারি খুলে শাড়ি ব্লাউজ বাছাই করে নিয়ে গেছে তোমার ছোটো বোন।

নীরজা ঘুমন্ত চোখেই ভেঙিয়ে উঠল, 'তোর বুক তো সবসময়ই দুরদুর করে।'

কিন্তু ক্রমে নীরজার শক্ত বুকও দুরদুর করল। কারণ বাথরুম থেকে তো আর ফিরল না সরোজা।

আবার খানিক পরে আর্তনাদ করে উঠল বিরজা, 'অ নীরো, সরো তো কই এল না।'

—তাহলে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বলে নীরোজা ফের পাশ ফিরছিল। বিরজা কেঁদে উঠল। —সেই সর্বনাশই বুঝি ঘটেছে রে নীরো, তাকিয়ে দ্যাখ আলমারি খোলা পড়ে।

নীরোজা উঠে বসল। দেখল বিছানার একাংশের শূন্যতা, আলনার একটা রেলিঙের শূন্যতা, কপাটখোলা আলমারির মধ্যেকার শূন্যতা, আর দেখল বড়ো বোন বিরজার দুই চোখের ধূসর দুটি তারকার অতল শূন্যতা। দেখে বুক দুরদুরিয়ে উঠল তারও।

—নির্ঘাত পালিয়েছে রাক্ষুসি! সেই ফুলওয়ালাটার সঙ্গেই পালিয়েছে।

'ফুলওয়ালা!' বিরজা হকচকিয়ে তাকাল। নিরেট বোকা বিরজা, সংসারের বহু লীলা যার বুদ্ধির আর দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়।

—হ্যাঁ, ওই নীচেরতলার ফুলওয়ালা ছোঁড়াটা। —নীরজা হিসহিসিয়ে উঠল। —ওই হতভাগার সঙ্গেই তো প্রেম চালিয়ে যাচ্ছেন সুন্দরী।

বিরজা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে খানিক, তারপর কেমন ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে, 'কই একথা তো বলিসনি কোনোদিন?'

—বলব আবার কী? ঝংকার দিয়ে উঠল নীরজা। —কপালের নীচে দুটো চোখ তো তোমারও আছে, না কি সে দুটো শুধুই মুখের শোভা?

নীরজা যে এমন ছিটফিটিয়ে জ্বলে মরবে তাতে আর বিচিত্র কী! শুধু তো আর ছোটো বোনের কুলত্যাগের জ্বালা নয়, ওর জ্বালার কারণ আরও অনেক, অনেক তীব্র। আমি তো জানি সবই। ছোটো বোনের প্রেমপাত্রটিকে ভাঙিয়ে নেবার জন্যে তো আর কম কাঠখড় পোড়াননি ইনি। ছোকরা কিন্তু সত্যিই খুব চালাক, হঠাৎ এর এত ঢলাঢলি দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিল। তাই এর সঙ্গেও করে

চলেছিল প্রেমের অভিনয়। তাতে করে এনার সন্দেহের আর শ্যেনদৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিল ছোকরা।

এই তো দিন দু-তিন আগে, বড়ো ছোটো দুই বোনের পাকাদেখা হয়ে যাবার খবরে ছোকরা হেসে হেসে মেজোকে বলল, 'পাকাদেখা কোথাও-বা বামুনপুরুত দিয়ে ঘটে, কোথাও-বা বিধাতাপুরুষ স্বয়ং ঘটান। বিয়ের মন্ত্রের অভাব যদি-বা কোথাও ঘটে, পাকাদেখায় ঘাটতি থাকে না, কী বলো?'

মেজোটা এদিকে এমন চাবুকের মতন, ও-ছোকরার কাছে গেলেই হয়ে ওঠেন যেন কুসুমকলি। তাই মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল 'তোমাদের মতন পাকা ছেলেদের ভারটাই বোধ হয় বিধাতাপুরুষ স্বয়ং নেন?'

এনার তো আর আড়ালে-আবডালে চোরা সিঁড়িতে সন্ধের আঁধারে নয়, একেবারে খোলা রাজরাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই প্রেমের বিকিকিনি।

তাই তো বলছিলাম ছোকরা মহা চালাক। চোরেরা যেমন আগে থেকে পাহারাদারকে ঘুস দিয়ে হাত করে ফেলে, এও তেমনি।

নীরজা যে এত চালাক তবু বুঝতে পারেনি ওর চালাকি। আসল কথা লোভে মানুষ অন্ধ হয়, বোকা হয়।

বিরজার চোখ দুটো একটু ধূসররঙা, তবু তারও একটা শোভা আছে বই কী। ফর্সা মুখের ওপর ওই রংটা বেশ একটা আলাদা সৌন্দর্য। বোনের কথায় সেই ধূসর চোখ দুটো খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোর মতো অত সব বুঝতে পারি না। বল তাহলে সরো সত্যিই চলে গেছে?'

—গেছে না তো কি লুকোচুরি খেলেছে? নীরজা ঝাঁপিয়ে উঠল। —গেছে, গেছে, গেছে। জন্মের শোধ গেছে। তোর বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিয়ে চলে গেছে।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরজা চিৎকার করে উঠল, 'ও মা, মা গো!'

এই চিৎকারের পরমুহূর্তেই কলরব উঠল সমস্ত বাড়িটা ভরে। জেগে উঠল সবাই। সারাবাড়িতে জ্বলে উঠল আলো, বাড়ির ছাত থেকে মেজে পর্যন্ত ধাক্কা উঠল, 'কোথায় গেল! কোথায় গেল!'

কিন্তু চট করে বাইরে বেরিয়ে পড়বার উপায় ওরা পেল না, ধুরন্ধর মেয়ে-ছেলে দুটো বেরিয়ে পড়বার আগে এদের বাইরে বেরোবার দরজা দুটো বাইরে থেকে আটকে দিয়ে গিয়েছিল। যেমন চোরেরা দেয়। অনেক চেষ্টায় যখন সে-দরজা খোলা হল তখন পাখি উড়ে গেছে।

তখন খানিকক্ষণ চলল খালি পরস্পরকে অভিযোগ। বেশি কথায় নয়, বেশি চেঁচামেচি করে নয়, শুধু চোখের চাউনিতে। শুধু টুকরো এক-একটা মন্তব্যে।

ছোটোছেলে বলে উঠল, 'ঠিক করেছে ছোড়দি, বেশ করেছে। দেখে আনন্দ হচ্ছে, এবাড়িতে একজনও এবাড়ির মুখের মতো জবাব দিল।'

মেজোমেয়ে বলল, 'বড়দি রে, তোরও তো সরির চেয়ে রূপ কম ছিল না, নীচেরতলায় বাজারও বসেছে কম দিন না, একটা আলুওয়ালা বা পটলওয়ালাও যদি জোগাড় করে নিতে পারতিস! আহা আজ তাহলে এমন দুর্দশা হত না তোর!'

বড়োটা ভালো মানুষ তো! বেশি কিছু বলতে জানে না। কেঁদে ফেলে বলল, 'নিজেই-বা তুই কী?'

ও ঠিকরে উঠে বলল, 'আমার কথা বাদ দে। আমি হচ্ছি কাল-কাসুন্দে, বাজারে আমার দর নেই।'

বিরজা তখন উঠে গিয়ে ওর ওই টাক পড়ে আসা মাথার মাঝখানটায় থাবড়ে থাবড়ে জল দিতে লাগল।

মেজো মেয়েটার সঙ্গে মা-র সঙ্গে কী যেন একটা কথা কাটাকাটি হল, হঠাৎ সুখলতা এতক্ষণ যা

করোন, তাই করল, উঠল চেঁচিয়ে। চেঁচিয়ে উঠে কী বলে ঢলে পড়ল অজ্ঞান হয়ে।

তবু বলব ছোটোছেলেটার একটু মায়া মমতা আছে। সে মায়ের মাথায়-মুখে জল দিল। শুয়ে পড়ে থাকতে বলল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে যে একটা পঙ্গু মানুষ গেঙিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছে, তার দিকে তাকাল না। এমনকী চাকর বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত না।

এবাড়ির ইট-কাঠের মালিক মন্টু দেবরায়, যার পুরো নাম মনোতোষ নন্দন তিনি অশক্ত দেহ নিয়ে বিছানায় বসে ডাকহাঁক করতে লাগলেন, 'কী হয়েছে কী হয়েছে?'

অনেকক্ষণের পর বৈকুণ্ঠ এসে বলল কী হয়েছে। আমি তো চিরজাগন্ত, আর আমার কানই সব। তাই কান পেতে শুনতে পেলাম বৈকুণ্ঠ ফিসফিস করে খবরটা দিল, আর মন্টুবাবু চাপা হাহাকার করে উঠল, 'বুঝতে পারছিলাম, বুঝতে পারছিলাম এইরকম একটা কিছু হয়েছে।'

বৈকুণ্ঠ সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল।

আমি আমার খাড়া দেহটা নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম মন্টুবাবুর হাঁসফাসানি কাতরানি। —ওরে শালা বৈকুণ্ঠ চ্‌লে গেলি কেন? এক বার আমায় ধরে নিয়ে চল-না ওখানে, প্রাণ হাঁপিয়ে যাচ্ছে আমার!

বুঝতে পারছি প্রাণ হাঁপাচ্ছে ওঁর, ওই ওঁর সুখবউদির জন্যে। এই দুঃসময়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে।

এই অদ্ভুত ভালোবাসা দেখলাম!

একজনের ছলনা বুঝেও তাকে এমন করে ভালোবেসে যাওয়া, ভালোবাসার এ এক অপূর্ব নমুনা। এবাড়িতে অনেকরকম ভালোবাসা দেখেছি, আমার এই ভাঙা পাঁজরার নীচে অনেক ইতিহাসই তো আছে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কখনো দেখলাম না!

লোকে বলবে পরস্ত্রী আসক্ত চরিত্রহীন!

কিন্তু আমি তো সাক্ষী! আমি তো সবটাই দেখছি।

আমি তো আজীবন পাহারাদারের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছি। আমি ওকে মহৎ লোকই বলব। জেনেশুনে একটা মস্তবড়ো ফাঁকির কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকতে কে পারে?

পারে, বিয়ে-করা স্ত্রী হলে, হয়তো লোক জানাজানি হবার ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারে, পারে কিল খেয়ে কিল চুরি করে থাকতে। কিন্তু যেখানে সবটাই অবৈধ, সেখানে জেনে বুঝে একটা নাটকের কাছে জীবন বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকা, এ এক আশ্চর্য! এ শুধু তো ওর অপরিসীম ভালোবাসার দায়ে।

সুখলতার স্বার্থপরতা প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছে মন্টু দেবরায়, তবু তার এতটুকু কষ্ট দেখলে প্রাণ কড়কড় করে ওর। মেয়ে হারিয়ে কী না জানি করছে সুখলতা সেই চিন্তায় ছটফটিয়ে মরছে দেবরায়ের বংশধর।

সুখলতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল খানিকক্ষণ, কিন্তু ধন্যি বলি মনের বল। সকালের রোদ মুখে এসে লাগতেই আবার উঠল, চান করল। চান করে এসে বাকি সকলের জন্যে নিত্য নিয়মে জল-খাবার সাজাতে বসল। সেই কনেবউ বেলা থেকে দেখছি তো সুখলতাকে। বরাবার ওর এমনই আশ্চর্য মনের বল। ঘরের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, অথচ তন্মুহূর্তেই ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সদ্যফোটা গোপালের মতো মুখ নিয়ে। হ্যাঁ, সুখলতার মুখের সঙ্গে তুলনা করতে ওইটেই কাছাকাছি।

কাল পর্যন্তও সে-মুখকে বুঝি সদ্যফোটা গোপালের সঙ্গে না হলেও, ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলত, আজ আর চলবে না। আজ সুখলতার মুখটাকে ঠিক বাসি শাকের মতো দেখাচ্ছিল।

সেই শাকের মতো মুখ নিয়ে দুপুরের সময় মন্টু দেবরায়ের ঘরে ঢুকল সুখলতা, তার ষোড়শোপচারের নৈবিদ্যি সাজিয়ে।

আশ্চর্য! আমার এই অদৃশ্য চোখ দুটো দিয়ে অনেক অবাক দৃশ্যই দেখছি, অনেক ঘৃণা আর ধিক্কারে শিউরে উঠেছি, তবু আজকের মতো এমন ছিছিকার বুঝি কোনোদিন ওঠেনি আমার বুক থেকে।

আজকেও তুমি এই ষোড়শোপচার সাজিয়ে নিয়ে এসেছ সুখলতা, তোমার অবৈধ প্রেমের নায়কের জন্যে? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গিয়েছে না তোমার? তোমার না আস্ত একটা সন্তান হারিয়ে গেছে আজ? আর সে হারানো মারা গিয়ে নয়, বংশের মুখে চুনকালি দিয়ে কুলত্যাগ করে। লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার? মনে হচ্ছে না দেশ ধর্ম মেয়ের এই প্রবৃত্তির জন্যে দায়ী করবে তোমাকেই?

হ্যাঁ, তোমাকেই করবে। ওর বাপ শচীপতিকে করবে না। শচীপতির রীতচরিত্তির একসময় খারাপ ছিল বটে, কিন্তু বহুদিন থেকে সেসব আর কিছু নেই। বহুদিন থেকে ইট পাথরের মতো হয়ে গেছে ও। এই আমার সঙ্গেই তুলনা করা চলে ওকে।

অবিশ্যি তোমার রান্না ষোড়শোপচারের অগ্রভাগটা শচীপতির ঘরেই পৌঁছায়, সেটা তো আর কিছু নয়, লোকদেখানো।

নেহাত শুধু মামাতো দেওরের জন্যে এত পরিপাটি ব্যবস্থা করলে লোকে বলবে কী! অথচ সেখানেও তোমার ফাঁকি।

তবু বলি সুখলতা, আজ তুমি কোন প্রাণে বসে বসে এতরকম বাঁধলে তাই ভাবছি। কে খাবে তারিফ করে?

ওই তো শচীপতি খেয়েছে কিছু? যতই নির্লিপ্ত হোক, তবু মানুষের প্রাণ তো? খায়নি, যেখানকার অন্নব্যঞ্জন সেখানেই পড়ে আছে ঢাকা দেওয়া। অথচ আজই কিনা সুখলতার সাধ গিয়েছে শচীপতির সবচেয়ে প্রিয় তরকারিগুলো করতে! আশ্চর্য!

যাক শচীপতির ভাতের থালা তো পড়ে রইল, কে-বা দেখেছে? বড়ো মেয়েটাই বাপকে দেখে, তা সে তো আজ শয্যে নিয়েছে।

মন্টুঠাকুরপোর ঘরে এলেন সুখলতা।

টেবিলের ওপর গুছিয়ে সাজিয়ে দিলেন খাদ্য পানীয়। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলেন।

মন্টু দেবরায় দেখল তাকিয়ে, তাকিয়ে ওর চোখে ফুটে উঠল একটা বিজাতীয় ঘৃণা। আর সেই ঘৃণা উপচে উঠল ওর কথার স্বরে। বলল, 'সুখবউদি, জীবনে অনেক বার তোমায় দণ্ডবৎ করেছি, আজ আরও একবার করলাম!'

সুখলতা কী করল শুনলে বিশ্বাস করবে কেউ?

সুখলতা হাসল। বিষাদের হাসি নয়, দস্তুরমতো শব্দ করে হেসে ওঠা হাসি। হেসে বলল, 'সেটা আর বাহুল্য কী? দণ্ডবৎ করারই তো সম্পর্ক।'

মন্টু কিছুক্ষণ হাঁ-করে তাকিয়ে দেখল সেই উছলে হেসে-ওঠা বাসি শাকের মতো মুখখানার দিকে, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'জীবনে এইটাই চরম পরাজয় রয়ে গেল সুখবউদি, তোমাকে কোনোদিন বুঝতে পারলাম না।'

—এই দ্যাখো আহাম্মুকি! যে-কাজ দেবতায় পারে না, হার মানে, সেটাকে পারবার আশাই-বা বাপু করলে কেন জীবনভর?

—কী জানি কেন?

মন্টু দেবরায় আর একটা নিশ্বাস ফেলল।

—আচ্ছা আর দীর্ঘশ্বাসে কাজ নেই, খেয়ে নাও।'

—খেয়ে? নাঃ আজ আর খেতে ইচ্ছে করছে না। মন্টু দেবরায় এক বার টেবিলটার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'জিনিসগুলোর দিকে তাকাতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না।'

—কেন? হচ্ছে না কেন? সুখলতা রূঢ়স্বরে বলে উঠল 'আমার রাঁধবার প্রবৃত্তি হল আর তোমাদের খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।'

—না হচ্ছে না। দেবরায় বংশের ভস্মস্তূপ থেকে ছিটকে উঠল এককণা আগুন। —তোমার কী করে প্রবৃত্তি হল তাই ভাবছি।'

—তাই ভাবছ? সুখলতা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে খাটের ওপর বসল, তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'কিন্তু কেন শুনি? আমার কাছে আজকের চাইতে ভালো দিন আর কবে এসেছে?'

—ভালো দিন।

—নিশ্চয়! আজকে আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর দিন, সারাজীবন যে সাধনা করলাম তার পূর্ণ ফল লাভের দিন, আজ ভালো দিন, নয়? আজকেই তো আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমার জীবনের মূল্য। আজ দেখছি আমার দুটো ছেলের একটা চোর, আর একটা স্বার্থপর, তিনটে মেয়ের একটা মনের ব্যাধিতে ভুগে ভুগে অকালে বুড়িয়ে গেছে, একটা মেয়ে কেউটে সাপের মূর্তিতে আমাকে ছোবল মেরে বেড়াচ্ছে, আর একটা মেয়ে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেল। এর চাইতে আনন্দের আর কি আছে বলো দিকি ঠাকুরপো? পাশ করে বেরোলাম, এবার ছুটির আনন্দ উপভোগ করব, এ কী কম মজা? হঠাৎ বেয়াড়াভাবে হাসতে শুরু করে সুখলতা, হাসতে হাসতে বিষম খায়।

—কী হচ্ছে কী? নির্লজ্জ কুৎসিত অসভ্য।

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। না দেবরায় বংশের ভস্মস্তূপ থেকে নয়, বাজ পড়ল তার ছাঁট থেকে। দেবেশ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

সুখলতা হাসি থামিয়ে বলে, 'ওমা দেবু? হঠাৎ এঘরে যে?'

দেবেশ ঘৃণার চরম অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে বলে ওঠে, 'মানুষের নির্লজ্জতার যে কোনোখানেও একটা সীমা থাকা উচিত, সেই কথাটাই মনে করিয়ে নিতে এসেছিলাম।'

—ওমা তাই নাকি? সুখলতা যেন উল্লসিত হয়ে ওঠে। —ও ঠাকুরপো মানুষের নির্লজ্জতার যে সীমা থাকা উচিত সেকথা মনে করিয়ে দিতে এসেছে আমার চোর ছেলে! চোর হোক, ছ্যাঁচোড় হোক, ছেলেটার উচিত-অনুচিত বোধটা আছে—কী বলো গো ঠাকুরপো?

দেবুর মুখটা সাদা হয়ে উঠেছে। তবু সে ভাঙে তো মচকায় না। তাই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'এটা আবার কোন ধরনের চাল?'

সুখলতা হঠাৎ সেই পাগলের মতো হাসিটা থামায়, তারপর বড়ো ছেলের দিকে কেমন একরকম তাকিয়ে থেমে থেমে বলে, 'চালটা ঠিক হল না বুঝি? হ্যাঁ রে দেবু? বোধ হয় তাই, বোধ হয় তাই। শুধু আজ কেন, সারাজীবনের সব চালই বুঝি ভুল হয়েছে রে! কিন্তু আর হবে না, আর হবে না, সত্যি বলছি দেবু, কথা দিচ্ছি তোদের, আর চালে ভুল হবে না। ওস্তাদের মা-র শেষ রাত্রে কী বলো ঠাকুরপো তাই না?'

আবার হাসতে থাকে সুখলতা। ওর হাসির ধাক্কা যেন আমার গায়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ে। গা-টা কেমন শিরশির করে আমার।

তখন সুখলতা ছেলেরা দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমি কি চালে ভুল করেছি? সেই প্রশ্ন করল সুখলতা নিজেকে, সমস্ত দিন ধরে। শুধু আমার কানেই সেকথা ধ্বনিত হতে থাকল। সারাজীবন ধরে আমি যা করেছি সব ভুল! কিন্তু এখন বুঝে কী হবে!

তারপর সারা দিনের আর সারা সন্ধ্যার কাজ মিটল, এবেলাও অনেক যত্ন করে রান্না করল সুখলতা। দেখলাম আমি, হঠাৎ দরকারের জন্যে ভাঁড়ারের গোপন কোণে সঞ্চিত কৌটোয় কৌটোয় ওর যে ঘি ছিল, চিনি ছিল, দামি আতপচাল, কিসমিস, মশলা, সেগুলো টেনে টেনে বার করে রাঁধল পোলাও, মেয়েদের আইবুড়ো ভাত খাওয়ার দিনে ভাজবে বলে অনেক শখ করে যে পোস্ত আর কালোজিরে দিয়ে ফুলবড়ি বানিয়ে রেখেছিল, সেগুলো ভাজল সব।

ও যখন এইসব করছে, তখন মনে হচ্ছিল না কোনো মানুষ এসব করছে, ঠিক যেন একটা যন্ত্র কারও নির্দেশে চলেছে। তারপর সকলের খাওয়া মিটে গেলে রান্নাঘরে এসে ঢুকল সুখলতা।

ছোটোছেলেটা বুঝি একবার বলেছিল 'মা, তুমি খেলে না? সুখলতা না শোনার ভার করে পিঠ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। মেজোমেয়েটা সেই ফেরানো পিঠের দিকে বাঁকা কটাক্ষ করে মুখ টিপে বলল, 'এত বাহার করে রাঁধতে যখন পেরেছেন, তখন খেতেও বাধবে না রে অনিল, মিছে ভাবিসনে।'

আজ দু-বেলাই এত রান্নার ঘটা কারুরই ভালো লাগেনি। আমিও অবাক হয়েছি। যে-সুখলতা সবচেয়ে আদরের মেয়েটার পালিয়ে যাওয়ার শোকে সকাল বেলা জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সে আবার আজই এত ফিরিস্তির রান্না করছে কেন? বড়ো ছেলে ভালোবাসে বলে আজকেই যে ওর পোলাও রাঁধতে হবে তার কী মানে আছে?

তবে নিজের জন্যে যে দু-বেলার এক বেলাও এক চামচও কিছু রাখেনি সে তো দেখলাম আমি বসে বসে।

তারপর সবই বুঝলাম, যখন বাড়িসুদ্ধ সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেল, নিশুতি হয়ে গেল বাড়ি। তখন সুখলতা আস্তে আস্তে রান্নাঘরের ভিতরের খিলটা লাগাল।

এ খিল কোনোদিনই বোধ হয় কেউ লাগায়নি, তাই লাগাতে চাপ পড়েছিল, শব্দ হবার ভয়ে খুব সাবধানে বন্ধ করল সুখলতা, তারপর হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল আধভিজে নোংরা মেজের ওপর।

উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সুখলতা অনেকক্ষণ ধরে, কেঁদে কেঁদে মৌন উচ্চারণে বলতে লাগল, 'ভগবান! আজ তোমার এই আলোর রাজ্য থেকে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে, এখানে আর সবই থাকবে, শুধু আমি থাকব না। জানি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তোমার পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমি ভোগ করতে পেরেছি, আমার চলে যাওয়ার মধ্যে এত হাহাকার থাকবার কথা নয়, তবু বলি তুমি তো সর্বজ্ঞ, তুমি তো জানো, সত্যিই কি কিছু ভোগ করেছি আমি? তোমার ওই আলোর দিকে তাকিয়ে, আলোর তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে শুধু অন্ধকারের গুহা পার হবার চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু আমার সারাজীবনের সমস্ত চেষ্টাই যে নিষ্ফলা, সেকথা একদিনের জন্যে বুঝতে দাওনি কেন তুমি?

এই যে আমি পৃথিবীর সমস্ত অবিচার মাথায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, এতে কি তোমার মনে এতটুকুও রেখাপাত করবে না?

এ পৃথিবীতে আমার চাইতে দুঃখী কে আছে? আমার সব আছে, স্বামী আছে, সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, তবু আমার মৃত্যুতে কেউ কাঁদবে না।

হ্যাঁ, চালে ভুল আমার হয়েছিল, ভেবেছিলাম কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু তা হয়নি, সবাই সব বুঝেছে, হয়তো জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছে, তাই ওরা আমায় ঘৃণা করেছে, তাচ্ছিল্য করেছে,

অসতী মা-র সন্তান বলে নিজেদেরকে ধিক্কার দিচ্ছে। কিন্তু বুঝলই যদি, আরও ভালো করে বুঝল না কেন?

আমাকে কেউ বুঝল না, এই ভয়ংকর যন্ত্রণার ভার নিয়ে আমায় যেতে হবে। আমার স্বামীও যদি আমায় এতটুকু বুঝতে চেষ্টা করতেন। হে ভগবান, নিশ্চয় জেনো সেটুকু পেলেও আমি মরতাম না। বাঁচার বড়ো ইচ্ছে ছিল আমার, একদিন বাঁচব, এই আশায় তিলে তিলে মরেছি, তবু বাঁচতে পেলাম না।

অনেকক্ষণ কান্নার পর আস্তে আস্তে উঠে বসল সুখলতা। ঘরের কোণের দিকে যে উঁচু টুলটা ছিল চালি থেকে জিনিসপত্র পাড়তে, সেই টুলটা নিঃশব্দে টেনে আনল ঘরের মাঝখানে, আর জালি আলমারির পিছন থেকে টেন বার করল একগাছা দড়ি। দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। মনে পড়ল, এঘরের কড়িতে সাবেক কাল থেকে একটা আংটা লাগানো আছে বাতি ঝোলাবার জন্যে।

না, দোতলার এঘরটা তো আর সাবেককালের রান্নাঘর ছিল না? এঘরে বড়ো একটা মজবুত টেবিল পাতা থাকত, আর ছড়ানোছিটানো, খান কয়েক চেয়ার। বাড়ির পড়ুয়া ছেলেরা লেখাপড়া করত এঘরে, মন্টু, শচীপতিও পড়েছে একসময়। অন্তত পড়ার কায়দাটা বজায় রেখেছে। মাস্টার এসেছে দু-বেলা, বাড়ির মধ্যে থেকে মাস্টারের জন্যে চর্ব-চোষ্য জলখাবার এসেছে দু-বেলা, বাতির জোর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সন্ধার পর।

আরও পরে মাস্টারকে তলব পড়েছে অন্তঃপুরে ঠাকুর সেবার জন্যে। পুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছে, মাস্টার ব্রাহ্মণসন্তান উপবীতধারী, কাজটা করতে পারলে দক্ষিণাটা পাবেন।

তারপর হঠাৎ একদিন আর মাস্টার এল না অথচ আবার মাস্টারের বাড়ি থেকেই খবর নিতে এল সে বাড়ি ফেরেনি কেন? কিন্তু এরা তার কী জানে?

বছর বারো চোদ্দোর ভাইটা তার কেঁদে কেঁদে বার বার এল, 'দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' বিধবা মা-র দু-টি ছেলে, বড়োটি সবে উপায় করতে শিখেছে। মস্তবড়ো গাছে নৌকো বেঁধেছে তাই মা নিশ্চিন্ত, ভাই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বেঁধেছে বলেই গাছের দায়িত্ব থাকবে নৌকোর খবর রাখবার, এমন কোনো কথা নেই। দু-বেলা পড়াতে আসত, মাসান্তে মাইনে পেত, ব্যাস। তার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক? আসছে না, আর মাইনে পাবে না, চুকে গেল। কে দেখতে যাচ্ছে সে বাড়ি ফিরল কি না? তবু ছেলেটা আবার এখানেই আসে।

ছোটো ভাইটা একবার এ কর্তার কাছে, একবার ও-কর্তার কাছে, লুটোলুটি করে বেড়ালো মায়ের হাতের লেখা চিঠি নিয়ে। হতভাগী মা-টা কেঁদে-ককিয়ে অশুদ্ধ বানানে আর ব্যকরণে চিঠি একটা লিখেছিল মহানুভব অন্নদাতা মহাশয় যদি তার অকস্মাৎ হারিয়ে যাওয়া ছেলেক অনুসন্ধান করেন।

মহানুভবেরা বললেন, 'বিরাট এই কলকাতা শহরে মশা-মাছি কীটপতঙ্গ কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, তার অনুসন্ধান তাঁরা করবেন কোথা থেকে? করবার সময়ই-বা কোথা? গরজই-বা কী? তবে হ্যাঁ, অনাথা বিধবা নাবালক ছেলে নিয়ে অন্নকষ্টে পড়েছে সে কষ্টের কিছু লাঘব করলেও করতে পারি?' তা করেও ছিলেন এঁরা।

আর সেই অনাথা ব্রাহ্মণ-বিধবা কৃতার্থ হয়ে নিত্য দু-বেলা আশীর্বাদও করেছেন এঁদের। তবু আশাপথ চাওয়া তাঁর জীবনে ঘোচেনি। বড়োলোকের বাড়ির মাসোহারার টাকায় নিশ্চিন্তে জীবন চলেছে, আর অবিরত জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত হাঁ-করে থেকেছেন তাঁর সেই সরু গলির মধ্যকার ছোট্ট ভাঙা বাড়িটার আরও ছোট্ট জানলাটা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে!

এদিকে এবাড়ির সেজোকর্তা সেই বৃদ্ধ পুরোহিতকে গোপনে ডেকে বলেছেন, 'দেখুন স্পষ্ট কথা বলি, ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেছে, এখন প্রায়শ্চিত্ত কী?'

'ব্রহ্মহত্যা!' পুরোহিত সভয়ে নিজের উপবীতের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে উত্তর দিয়েছেন, 'আ—আজ্ঞে ব্রাহ্মণকে বৃ—বৃত্তিদান—'

—সে-ব্যবস্থা হয়েছে, দেওয়া হচ্ছে। আর কিছু করবার আছে?

ব্যবস্থা হয়ে গেছে শুনে পুরোহিত একটু দমে গেলেন, তারপর বললেন, 'একটা চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত—'

—না ওসব হবে না। শুধু দান করে কিছু হয় তো বলুন।

পুরোহিত পুলক গোপন করে বললেন, 'সদ্‌ব্রাহ্মণকে একটি সবৎসা গাভীদান করলে—'

—সদ্‌ব্রাহ্মণকে? হঠাৎ ভারি হেসে উঠলেন সেজোকর্তা, —তাইতো, এ যে আবার এক ফ্যাচাং তুললেন! ভাবছিলাম এ দানটা আপনার ঘরেই উঠবে, তা উঠছে কই?

পুরোহিত হাঁ-করে তাকিয়ে থাকলেন।

সেজোকর্তা হাসি থামিয়ে বললেন, 'শুনুন আপনার ব্যবস্থা থেকে ওই সদ্ কথাটা উঠিয়ে দিন, শুধু ব্রাহ্মণই থাক, বুঝলেন? ভালো গাইয়ের দুধটা আপনার নাতি খাক, এটা আমার ইচ্ছে।'

পুরোহিত মাথা নীচু করলেন। তার বেশি আর কী করবেন?

তার পিতা-পিতামহও তো এই করেছেন, চাঁদির জুতো খেয়েছেন আর মাথা নীচু করে থেকেছেন। নইলে কি আর এই দেবরায় বংশের কুলোপুরোহিত হতে পারতেন তাঁরা?

সবৎসা গাভী গেল পুরোহিত বাড়ি, এখানে-ওখানে দেবমন্দিরে পুজোও পড়ল কিছু। মনের আকাশ নির্মেঘ হল সেজোকর্তার। চোরকুঠুরির পিছনে, নতুন গাঁথা দেওয়ালের আড়ালে কোনো ব্রাহ্মণ সন্তানের কাঁচা রক্ত-মাংস ক্রমশ শুকনো হাড় হতে থাকল, তার সাক্ষী আর কেউ থাকল না আমি ছাড়া। দিন চলতে লাগল সহজভাবে।

কিন্তু সহজকে সহজ করে রাখতে এরা জানে কই? জানলে কি আর এখানকার এই রান্নাঘরে, সাবেক কালের সেই ছেলেদের পড়বার ঘরের মধ্যে সে-রাত্রেও এই একই নাটকের অভিনয় হত?

অবশ্য সেদিন সেজোকর্তার আর কোনো ভূমিকা ছিল না, সেজোকর্তার দ্বিতীয়পক্ষ চাঁদমালাই দীর্ঘদিন ধরে তার মনের মানুষের অপেক্ষা করে করে অবশেষে একদিন দারুণ অভিমানে—একদিন নয়, এক রাত্রে।

বেঁটেখাটো মানুষ, পড়ার টেবিলটাকে ঘরের মাঝখান থেকে সরিয়ে এনে ছাদের মাঝখানে আটকানো ওই মোটা আংটাটায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দড়িটাকে পরাল, যেমন করে এখন সুখলতা পরাচ্ছে।

সুখলতাও তো ছোটোখাটো হালকা মানুষটি।

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দড়িটাকে ফাঁস লাগিয়ে আবার টুল থেকে নেমে এল সুখলতা।

আবার একবার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে উথলে উথলে কাঁদতে লাগল।

তারপর হঠাৎ যখন দালানের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে তিনটে ঘণ্টা বাজল, তখন ধড়পড় করে উঠে বসল।

উঠে পড়ে হাত জোড় করে অনেকক্ষণ ধরে নমস্কার করল, ঈশ্বর জানেন কাকে!

নমস্কার করে গায়ে-মাথায় কাপড়টা ভালো করে গুছিয়ে নিয়ে ফের উঁচু টুলটার ওপর উঠে দাঁড়াল সুখলতা।

কিন্তু সুখলতার বোধ হয় একটু হিসেবের ভুল হয়েছিল। তাই টুলটা যখন ছিটকে গিয়ে পড়ল, তখন

ঘরের ফাঁকা দিকটায় না পড়ে পড়ল গিয়ে কাচের বাসনের শেল্‌ফটার গায়ে। ঝনঝন করে উঠল পেয়ালা পিরিচগুলো। গোটাকতক হয়েতো-বা গুঁড়োই হয়ে গেল। শূন্যে ঝুলন্ত সুখলতা বুঝি শিউরে আঁতকে উঠল একবার। কে জানে কী ভেবে।

ঝনঝন শব্দটা ঘুমন্তপুরীর কানে ধাক্কা মেরে সবাইকে জাগিয়ে দেবে এই ভয়ে, না অনেক দিন অনেক যত্নে সঞ্চিত শৌখিন কাচপাত্রগুলির লোকসানের দুঃখে?

বুঝতে পারলাম না। মূক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সুখলতার সেই মুখের দিকে। যে-মুখকে বহুদিন বহুজনের সঙ্গে আমিও তুলনা করেছি সদ্যফোটা ফুলের সঙ্গে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সেই মুখ—সেই মুখের অদ্ভুত পরিণতি।

দেওয়ালের শুধু কানই আছে, প্রাণ বলে কিছু নেই, তাই না?

কাচের বাসনের ওপর টুল পড়বার শব্দটা ঘুমন্তপুরীর কানে পৌঁছেছিল বই কী। কিন্তু কে আর সে-শব্দকে গুরুত্ব দিয়েছে? পাশের বাড়ির শব্দ হতে পারে, বাসনকোসনের ওপর বেড়াল লাফিয়ে পড়ার শব্দ হতে পারে, আরও কত কিছুই তো হতে পারে। পাশ ফিরে আবার ঘুমানো ছাড়া, আর কে কী করবে?

শুধু বিরজা পাশ ফেরবার আগে এক বার ভাবল, রান্নাঘরের জানলাটা বোধ হয় খোলা ছিল, ঘরে মাছ কি খাবার কিছু নেই তো? তা এত রাত্রে আর কী থাকবে? গতকাল রাত্রে কেউ ঘুমুতে পায়নি, আজ তার জের চলছে।

বৈকুণ্ঠ এক বার ভাবল, চোরটোর নয় তো? গিন্নি তো অনেক রাত অবধি ঘুরঘুর করছিল, সিঁড়ির দোর বন্ধ করতে ভুলে যায়নি তো? মরুক গে, দোষ হলে ওরই হবে, আমার তো আর হবে না। মুচকে একটু হেসে পাশ ফিরে শুলো বৈকুণ্ঠ। আর কোন দামি মালটাই-বা চুরি করতে আসবে চোর? সবই তো শেষ। সবসেরা দামি মালটিও তো কাল চোরে হরণ করে নিয়ে গেছে। ঘুম ভেঙেছিল মন্টু দেবরায়েরও। অনড় মানুষ ও আর কী করবে? ও শুধু অনেকক্ষণ হাঁ-করে তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে। ওর বোধ হয় ভাবতে ভালো লাগছিল, এই আকস্মিক শব্দে বাড়ির গিন্নির ঘুমটা নিশ্চয় ভেঙে যাবে, সে হয়তো এদিক-ওদিক দেখে এঘরে উঁকি মেরে বলবে, 'কী ঠাকুরপো, তোমার হাত থেকে কাচের গেলাসটেলাস পড়ে গেল না কি?

কিছুক্ষণ জেগে থেকে হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে-ও।

আর আমি? আমি আর তখন নিশ্চল হয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার নিজের মাথাটা নিজের গায়ে কুটে কুটে চেঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে ওদের পায়ে পড়ে বলি, ওগো এখনও হয়তো সময় আছে, এখনও যদি তোমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে ছুটে দেখতে যাও কোথায় কী পড়ল, তাহলে বুঝি একটা প্রাণ রক্ষে হয়।

বুঝি আর্তনাদ করেওছি। কিন্তু দেওয়ালের আর্তনাদ দেওয়ালের নীচেই চাপা পড়ে গেল।

তারপর দেখলাম শেষরাত্রে বৈকুণ্ঠ উঠল। বোধ করি জল খেতে!

একটা ঘটি হাতে করে গেল কলতলায়। কিন্তু জল পেল না কলে, জল আসেনি। ও তখন রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে গেল। রোজ বাইরে থেকে শেকল তোলা থাকে, অভ্যাসের বসে ও শেকলটায় হাত লাগাল, দেখল খোলা ঝুলছে। লাগাতে ভুল হয়েছে ভেবে ধাক্কা দিল, দিয়েই ও কেমন হাঁ হয়ে গেল।

এতক্ষণ আলো জ্বালায়নি, দালানের আলোটা জ্বালাল। তারপর দরজাটায় আর একবার ধাক্কা দিয়ে নিঃসন্দেহ হল ভেতর থেকে বন্ধ।

তাড়াতাড়ি শেকলটা তুলে বন্ধ করে দিল বৈকুণ্ঠ।

ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছি ভয় পেয়েছে ও, বিড়বিড় করে বলল, 'রাম রাম! ব্যাটা ভূত না চোর।'

তারপর হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

যেটুকু আশা হচ্ছিল আমার সেটুকু গেল। ভাবছিলাম যদি বৈকুণ্ঠ চেঁচামেচি করে ওঠে, যদি আবার গত রাত্রের মতো বাড়িসুদ্ধ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে, যদি তখনও অবশিষ্ট থাকে এতটুকু প্রাণস্পন্দন। কিন্তু হতাশ হলাম। বৈকুণ্ঠ ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন? এতে ভয় পাবার কী হল ওর? ও তো কিছু জানত না?

নাঃ স্বস্তি নেই বৈকুণ্ঠর। ও আবার উঠে এল পা টিপে টিপে। এবার তার হাতে একটা বেঁটে মোটা লোহার রড। হাতিয়ার হাতে করে বোধ করি সাহসে বুক বেঁধে দরজার পাশ ঘুরে জানালার কাছে এল বৈকুণ্ঠ।

ছোট্ট এই জানলাটার কপাট নেই, শুধু শার্সি। রান্না ঘরের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সে-কাচ কালো অন্ধকার! তবু বৈকুণ্ঠ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ঘরের মধ্যেটা দেখবার চেষ্টা করল, আর তারপরই দেখলাম অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে হাতের লোহাটা ফেলে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে।

শুয়ে হাঁপাতে লাগল হাপরের মতো।

তবু জানি কিছুক্ষণ পরে বুকের ওই ওঠা-পড়া কমবে ওর, আর এমন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে যে সাত ডাকে উঠবে না।

আর যখন উঠবে, ওর মুখ-চোখ দেখে মনে হবে সাত দিন-সাত রাত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল ও।

শুনতে পাই এযুগের বিজ্ঞান কত কীই নাকি অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনা ঘটাচ্ছে। আকাশ চষে বেড়াচ্ছে, চন্দ্র সূর্যে ঢুঁ মেরে আসছে, বেতারে ফটোগ্রাফ ছাপছে, মাতৃগর্ভের বাইরে শিশু সৃষ্টি করছে, আরও কত কীই করছে। মাঝে মাঝে ভাবি এত পারছে আধুনিক বিজ্ঞান, কেন তবে পারছে না দেওয়ালকে কথা বলাতে?

দেওয়ালকে কথা বলাতে পারলে কত সহজেই-না দেওয়ালের আড়ালে সংঘটিত যাবতীয় অপরাধের সুবিচার হতে পারত। বিচারকের বুদ্ধিভ্রংশতা আসবার অবকাশ পেত না।

দেওয়াল কথা কয়ে উঠলে জগতে আরও কী কী হতে পারত, অথবা পারে, তাই ভাবছিলাম আমি, হঠাৎ আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। হয়তো তোমরা শুনলে বলতে 'দেওয়ালটা জঘন্য মিথ্যুক', বলতে মিথ্যা রটনার একটা মাত্রা থাকে, কিন্তু শোনবার উপায় তোমাদের নেই। আধুনিক বিজ্ঞান আজও এখানে পরাজিত। দেওয়াল চেঁচাতে পারে না। তবু—

তোমরা শুনতে পাচ্ছ না জেনেও চিৎকার না করে তো থাকতে পারছি না আমি। গলা ফাটিয়ে বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলছি পৃথিবীর সব্বাইকে, ওগো নীরজা উঠেছিল। খুব সকাল বেলা উঠেছিল। উঠে চারিদিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার! কেউ এখনও ওঠেনি না কি।

কেউ অর্থে সুখলতা, সে আমি জানি। সুখলতাই খুব ভোরে ওঠে। উঠে বৈকুণ্ঠকে ওঠায়! সংসারের চাকাটাকে ঘুরিয়ে দেয়। তাই কেউ অর্থে নীরজার মাকেই বোঝাল।

মা-র সন্ধান নিতেই হয়তো রান্নাঘরের দিকে এল। এল মা-র জন্যে মন কেমন করাতে নিশ্চয়ই নয়, এল বোধ করি নিজেরই কোনো দরকারে। হয়তো সকাল বেলাই গরম জল চাই ওর। হয়তো-বা তাড়াতাড়ি চা চাই।

হয়তো কোনো দরকার নেই নীরজার, তবু প্রায়ই দেখি সুখলতা যখন খুব ব্যস্ত, তখন কাট কাটা মুখে গিয়ে যেন বাতাসকে উদ্দেশ করে বলছে, এইভাবে বলবে, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি চা-টা পাওয়া যাবে? অবিশ্যি অসুবিধে হলে দরকার নেই!'

নয়তো বলবে, 'একটু গরম জল পাওয়া সম্ভব হবে?'

আজও হয়তো এ ভোর বেলাই মায়ের সঙ্গে ওইরকম মধুর কোনো আলোচনার বাসনা জেগেছিল। তাই রান্নাঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

—চমৎকার! এখন সব বন্ধ।

বলেই যেন আক্রোশভরে ছেকলটা খুলল ছড়াৎ করে।

আশ্চর্য আশ্চর্য! এত স্পষ্ট একটা শব্দেও কারুর টনক নড়ল না, কারুর ঘুমের দেওয়ালে আঁচড় পড়ল না।

নীরজাও সেই বৈকুণ্ঠর কাজেরই পুনরাবৃত্তি করল। দরজায় ধাক্কা দিল, জানলার ধোঁয়া পড়া কাচে চোখ রাখল আর অবাক, অবাক যে ঠিক বৈকুণ্ঠর মতোই অস্ফুট একটা চিৎকার করেই তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল নীরজা। তারপর বিছানায় শুয়ে হাঁপাতে লাগল। মাইনে করা চাকরের চাইতে এতটুকু ভালো ব্যবহার করল না নীরজা তার মায়ের ওপর।

তাইতো বলি দেওয়ালের বাড়া সাক্ষী আর কে আছে? আর একজন সাক্ষী রইল বটে, কিন্তু একটা দিশেহারা অবস্থায় রইল সে। শেকল খোলার শব্দটা পেয়েছিল বৈকুণ্ঠ। পরিচিত শব্দ।

শুনেই শিউরে উঠে বসেছিল। তারপর কান খাড়া করে রইল আচমকা এই শব্দের পর আর কোনো শব্দের প্রলয় তরঙ্গ ওঠে কি না।

কিন্তু অনেকক্ষণ কান খাড়া করে থেকে অবশেষে হতাশ হয়ে বুঝল সে, তার মতন চালাক লোক আরও আছে এ সংসারে।

কিন্তু কে সে? কে?

নীরজাও অনেকক্ষণ ধরে হাপাল, তারপর ঘুমের ভান করে নিভাঁজ রয়ে পড়ে থাকল।

আমি আমার দাঁত খিচোনো পলস্তারা ঝরা দেহটা নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম নীরজার ওই মিথ্যে ঘুমের শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে। আর ভাবতে লাগলাম সুখলতা নীরজার মা।

কিন্তু আগেকার আমলে ঠিক এমনটা হত না। যারা বুদ্ধিমান, তারাই বুদ্ধিমান থাকত, দেশসুদ্ধু সবাই বুদ্ধিমান হয়ে ওঠেনি তখন।

সেজোকর্তা ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হতে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী গাভী দান করলেন, কেউ জানতে পারল না, দানটা কেন। পুরোনো পুরোহিতের নাতিটা ভালো দুধটুকু খাক এই ইচ্ছেয় দিয়েছেন, এইটাই রাষ্ট্র হল। বুদ্ধিমান লোক তিনি সামলে নিতে জানতেন সব।

কিন্তু বাড়ির আর সকলে বুদ্ধির পরিচয় দিল কই?

যেই না কে যেন টের পেল চাঁদমালা ছেলেদের পড়ার ঘরে খিল দিয়েছে, অমনি শুরু হয়ে গেল দরজায় ধাক্কাধাক্কি। রাতদুপুরে পাড়া মাত হয়ে উঠল সেই চিৎকারে। তারপর ঘর ভাঙা। কিন্তু দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ব্যাপার তদন্ত করতে যতক্ষণ লেগেছিল, ততক্ষণে চাঁদমালার প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর ছাড়া হয়ে গেছে।

কারণ কাজের চেয়ে গুলতানিই করছিল লোকে বেশি। সেজোকর্তা? তিনি বাগানবাড়িতে ছিলেন সে-রাতে।

অবাক হয়ে ভাবি চাঁদমালাকেই টেনে নামাল পুলিশের লোক, কিন্তু কই ওই আংটাটাকে তো টেনে

উপড়ে নামাল না! তা যদি নামাত, আজকে হয়তো শুধু সিলিঙে একটা আংটার অভাবেই সুখলতা বেঁচে যেতে পারত।

আহা বেচারি সুখলতা! বাঁচবার বড়ো শখ ছিল তার। মানুষের মতো বাঁচা।

ছেলে দুটোকে তাই মানুষ করে তুলছিস সে শচীপতির প্রভাবমুক্ত করে। হয়েওছিল তাই।

বাইরের জগতে সুখলতার ছেলেদের হিরের টুকরো বলে লোকে।

তবে সুখলতাকে মরতে হল।

সরোজা চলে যাবার পরও, যদি সুখলতা তার স্বামী আর সন্তানদের কাছে এতটুকু সহানুভূতি পেত তাহলে হয়তো মরতে পারত না সুখলতা। হয়তো মরতে হত না তাকে।

মর্মান্তিক লজ্জাটা গড়িয়ে গেলে, হয়তো সুখলতা তার মিথ্যের জালে ঘেরা জীবনে আর একটা নতুন মিথ্যে সংযোজন করত। হয়তো সরোজার আকস্মিক মৃত্যুর একটা গল্প রচনা করে রটনা করত সেই রটনা নিয়ে ভাবী কুটুম্বের কাছে চোখের জল ফেলে বিরজার বিয়েটা ঘটিয়ে তুলত। হয়তো সরোজার জন্যে নির্দিষ্ট বরটার সঙ্গে নীরজার বিয়ের চেষ্টা করে মরত।

কিন্তু তা হল না। সুখলতাকে মরতে হল।

আর সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা, শচীপতি ওর স্বামী, যার জন্যে সুখলতা—কিন্তু ওকথা থাক। ওইটাই বড়োকথা একটা ঘরে তিরিশ বছর ধরে বাস করছে ওরা। সেই শচীপতি টের পেয়েছিল সুখলতা কী করতে যাচ্ছে, তবু অবিচলিত থেকেছে, ঘুমের ভান করে পড়ে থেকেছে।

রান্নাঘরে আসার আগে সুখলতা শচীপতির খাটের পাশে বাজুটায় হাত ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কতক্ষণ ধরে এ কি টের পায়নি শচীপিত? ভারী নিশ্বাসটাকে চাপতে গিয়েও ঘরের বাতাস তো তার সেই চাপা নিশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছিল। কেন সুখলতা এমন দাঁড়িয়ে আছে. এ সন্দেহ কি মনে আসেনি শচীপতির? আর তারপর যখন সুখলতা ওর পায়ের কাছে মাথাটা ঠেকাল?

গভীর রাতে এরকম কেন করছে সুখলতা, এটা ভেবে শচীপতি কি এক চিলতে বিচলিতও হতে পারত না? আমি তো প্রত্যাশার দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলাম, শচীপতি নিশ্চয় চমকে উঠে বসে বলবে, একী! কী হচ্চে?

কথা তো বন্ধ ছিল না ওদের।

সুখলতা শুতে এসে বলত, 'জল চাই?'

শচীপতি বলত, 'না।'

ভাত বাড়বার আগে একবার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে সুখলতা বলত, 'চান হয়েছে?'

শচীপতি বলত 'হ্যাঁ!'

সন্ধ্যার খাবার আগে আবার আসত সুখলতা, বলত, 'এখন খেতে দেব?'

শচীপতি বলত, 'সুবিধে হলেই দেবে।'

পরিষ্কার পাথরের টেবিলটা বাড়তি আর একবার মুছত সুখলতা, সাবধানে খাবারটা এনে নামাত, আস্তে আস্তে চলে যেত। জানত, যতক্ষণ সুখলতা ঘরে থাকবে, খাওয়া আরম্ভ করবে না শচীপতি।

তবু শেষের দিকে আর একবার এসে দাঁড়াত দরজার কাছে। শান্ত নম্র গলায় বলত, 'আর কিছু চাই?'

জানত এর উত্তর কী, জানত, কোনোদিনই কিছু চাইবে না শচীপতি, দরকার হলেও না, আর পাতের আগায় সে নুনটি থেকে আচারটি লেবুটি থেকে লংকাটি এমন করে গুছিয়ে দেয় আর এত পর্যাপ্ত সব কিছুই দেয় যে, দরকার হবার প্রশ্নই ওঠে না, তবু প্রতিদিনই এই বাহুল্য প্রশ্ন।

কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিদিনকার এই বাহুল্য প্রশ্নে কোনোদিন অসহিষ্ণুতাও দেখাত না সচীপতি। বলে উঠত না 'না না, কিছু চাই না আমার। রোজ রোজ কেন জিজ্ঞেস করতে আসো?' বলত না।

শুধু ওর সেই নির্দিষ্ট সুরে বলত, 'না।'

তবু কথা তো ছিল। সেই গভীর রাতে একবার কি বলতে পারত না শচীপতি, 'কী হল হঠাৎ?'

বলল না, জেনে বুঝে চুপ করে পড়ে থাকল।

নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল সুখলতা।

তারপর চলে গেল রান্নাঘরে। তখনই একটু সন্দেহ হল আমার, বুকটা কাঁপল। এরকম আরও যে দেখেছি। ভেবেছিলাম হয়তো ওর ছেলে-মেয়েদেরও এক বার দেখে যাবে। তা গেল না। মন্টু দেবরায়ের ঘরেও না। চিরদিনের আশ্রয় এই দেবরায় বংশের ইট-কাঠগুলোর কাছেই বুঝি বিদায় নিল সেই তখন হাত জোড় করে অনেকক্ষণ ধরে।

এই যে সকাল বেলা নীরজা ধোঁয়া ধরা শার্সির কাচে চোখ লাগিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, এ যদি বিরজা হত পালাত কি? আমি ভাবছি, সেই থেকে ভাবছি, বিরজা কি ডুকরে কেঁদে উঠত না?

কিন্তু তাতেই-বা কী এসে যেত সুখলতার?

ওর মরুভূমির মতো তৃষিত আত্মা কি ওই জলের ছিটেটুকুতেই তৃপ্ত হত?

যাক সেসব কিছু হল না। বিরজা না এসে নীরজা এল।

অনেকখানি বেলা অবধি, রান্নাঘরের দরজাটায় রোদ এসে পড়া অবধি সিলিঙের আংটায় ঝুলতে থাকল সুখলতা।

ওর ভিতরের সত্ত্বাটা অবিরত যেভাবে দমবন্ধ হয়ে মরছিল, বাইরের চেহারাটায় তারই ছায়া ঘনিয়ে রইল।

যবনিকা উঠল সকাল বেলা।

খবরটা কে কখন কেমন করে টের পেল, কীভাবে সে-খবরের আগুন সারা বাড়ি থেকে বাড়ির বাইরে, আর বাড়ির বাইরে থেকে থানায় গিয়ে উঠল সেকথা আমি বলতে পারব না, আমি উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম, অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। চমক ভেঙে দেখলাম বাড়ির চারপাশে পাড়ার লোকের জটলা, বাড়ির নীচেরতলায় বাজারে চাপা উত্তেজনার গুঞ্জন, আর বাড়ির মধ্যে পুলিশের লোকের কূটকচালে প্রশ্নের শরজালে বিব্রত সুখলতার ছেলে-মেয়েরা।

এত জানত সুখলতা, আর এটুকু কি জানত না যে, আত্মহত্যারও একটা আইনমাফিক পদ্ধতি আছে। অত হুঁশিয়ার মেয়ের একটু হুঁশ হল না যে গলায় দড়ি দেবার আগে পুলিশের উদ্দেশ্যে জানিয়ে যেতে হয়, 'স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে গলায় দড়ি দিচ্ছি আমি, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, দোষী নয়।'

সেই স্বীকারোক্তিটুকু লিখে রাখলে তো আর সুখলতার এত আদরের ছেলে-মেয়েরা এত বিপর্যস্ত হত না।

তাদের মা গেল, আর সেই যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী গেল, কতটা গেল এ বোঝবার অবকাশই পেল না তারা। জেরার সময় শুকনো মুখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিক তাকাতে তাকাতে শুধু এই ভাবতে লাগল, উঃ মা তাদের সঙ্গে কী শত্রুতাই করে গেলেন! ভাবল, চিরদিন অনিষ্ট করে এলেন আমাদের, মুখ পোড়ালেন চিরকাল, মরলেন তাও জন্মের শোধ মুখে কালি দিয়ে গেলেন।

না সুখলতা, রাত-দিন যে তুমি ভাবতে, আমি মরলে তোরা আমার মূল্য বুঝবি। তা হল না। মরেও তুমি সহানুভূতি পেলে না জগতের কাছে। তোমার মৃত্যুতে কেউ 'আহা' করছে না বরং সবাই 'ছি ছি' করছে।

বলছে, 'গলায় দড়ি গলায় দড়ি। পঁয়তাল্লিশটা বছর পার করে এসে এখন মরল গলায় দড়ি দিয়ে।' বয়েসকাল থাকলে তার এই আত্মহত্যা নিয়ে পড়শিরা অনেক মুখরোচক কাহিনি সৃষ্টি করতে পারত, সে-সুখে বঞ্চিত হল তারা, কাজেই তাদের পক্ষে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

বাজারের ফড়েরা হয়তো অনেকে ভাবল, ওমা কী সর্বনাশ, অমন জলজ্যান্ত মানুষটা! হয়তো কেউ কেউ ভাবল, যাক বাবা, নিত্যদিন তোলা দেওয়ার হুজ্জুত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

পৃথিবী এমনই। যেই একটা মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় অমনি সমস্ত সংসার উদ্‌গ্রীব হয়ে হিসেব কষতে বসে ওর যাওয়াতে কার কী লাভ আর কী লোকসান হল।

পুলিশ বাইরের দরজা ঘেরাও করে জেরা করছে জনে জনে। চারু, বৈকুণ্ঠ, বিরজা, নীরজা, কতজন তাদের খোরাক জোগাবে।

দেবু যখন প্রশ্নের জবাবে শুকনো গলায় বলছিল, 'কী করে জানব বলুন? কালও তো যথারীতি রান্নাবান্না করেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন। তখন আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হলেন শচীপতি, যাঁর উপস্থিতিটা এখনও পর্যন্ত লোকলোচনের অন্তরালে ছিল।

শচীপতির পরনে মিহি কাঁচির কোঁচা লুটোনো ধুতি, মাখনের মতো গায়ে সেঁটে ধরা ঘি-রঙের সিল্কগেঞ্জি, তার ওপর শিথিল ভঙ্গিতে জড়ানো একখানা উড়ুনি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। কিন্তু শচীপতির চুল অবিন্যস্ত, চোখ লালচে, সমস্তটা মিলিয়ে কেমন একটা বাসি বাসি ভাব।

শচীপতি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন না কোনো দিকে। সোজা এগিয়ে মামাতো ভাইয়ের ঘরে ঢুকলেন। যে-ঘরে বোধ হয় যুগযুগান্ত ঢোকেননি।

পুলিশ কর্মচারীটি এঘর থেকে তাকিয়ে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'উনি কে?'

—উনি।

দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল, তাকাল অদূরে বসে থাকা নতনয়না দুই বোনের দিকে, তারপর ছোটো ভাই মুখ তুলে বলল, 'আমাদের বাবা!'

—বাবা! ভুরু আরও কুঁচকে গেল প্রশ্নকর্তার। —উনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

—ও ঘরে!

—ও ঘরে? মানে এই বাড়িতেই?

—হ্যাঁ।

'বলেন কী? ওঁকেই তো তাহলে আগে ডাকা উচিত ছিল।

উচিত ছিল সেকথা কি এরাই জানে না? কিন্তু এবাড়িতে উচিতমতো কাজ কবে হয়েছে? তবে সেই অনুচিতের জন্যে সুখলতার ছেলে-মেয়েদের কখনো কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়নি, আজ সুখলতা তাদের এই ঝড়ের মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। আর একবার ভাবল ওরা, পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে। 'উঃ মা কী শত্রুতাই করে গেলেন।'

—ওঁকে ডাকেননি কেন?

—উনি অসুস্থ।' বলল অনিলেশ।

—অসুস্থ! অসুস্থতার তো কিছু দেখলাম না। কীরকম অসুস্থ?

আর একবার চোখ চাওয়াচায়ি করল দুই ভাইয়ে, তারপর মাথা নীচু করে বলল, 'মানসিক রোগ।'

—মা-নসিক! বলতে চাইছেন পাগল।

সাহস ফিরে পেয়েছে দেবেশ, তাই এবার মাথা তুলে বলে, 'পুরোপুরি নয়, তবে খানিকটা। কারও সঙ্গে কথা বলেন না, বাড়ির কোনো ব্যাপারে যোগ রাখেন না। দেখছেন তো আজকের এই ব্যাপারেও—'

—ওঁকে আমাদের চাই। রায় দিলেন পুলিশ অফিসার জলদগম্ভীর স্বরে।

—চাইতে পারেন, কিন্তু জেরার যথাযথ উত্তর পাবেন কি না সন্দেহ।

—কোথায় গেলেন উনি?

—ওই যে আমার কাকার ঘরে। যাঁকে দেখে এলেন এইমাত্র। প্যারালিসিসড্।

—হুঁ! ওঁর সঙ্গে আপনার বাবার সম্প্রীতি আছে?

—সম্প্রীতি বা অসম্প্রীতি কারও সঙ্গেই কিছু নেই ওঁর।

বাড়িটা আপনার এই কাকার, তাই বললেন না?

—হ্যাঁ।

—অথচ আপনারা সপরিবারে থাকেন। কারণ?

হঠাৎ দেবেশের বদলে উত্তর দিয়ে উঠল নীরজা, 'যে-কারণে পরের বাড়িতে থাকে লোকে, সেইটাই কারণ!'

পুলিশ অফিসার একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত হেসে বলে ওঠেন, 'উত্তরের জন্য ধন্যবাদ। অবশ্য বলতে বাধ্য হচ্ছি, এখন এঁদের স্টেটমেন্ট নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন পরের বাড়িতে কেবলমাত্র একটা কারণেই থাকে না মানুষ। পৃথিবীটা জটিল জায়গা। আপনার এই ভাইয়েরা উচ্চশিক্ষিত, অপরের আশ্রয়ের উপর নির্ভরশীল থাকবার কারণটাও তো স্পষ্ট নয়। সে যাক। তা ছাড়া এটাও কি সত্য নয়, কাল এবাড়ি থেকে একটি মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

—সত্যি!

—আপনার মা-র মৃত্যুর সঙ্গে সে ঘটনা বিচ্ছিন্ন নাও হতে পারে।

—সেইটাই কারণ। লোকলজ্জায়—

নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটির নাম বয়েস চেহারা সব লিপিবদ্ধ করে নিয়ে পুলিশ অফিসার পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'এঁর চলে যাওয়া সম্পর্কে আপনারা পুলিশে জানাননি কেন?'

এবারেও নীরজাই কথা কয়ে উঠে, 'জানাবার মতো বিষয় নয় বলে।'

—কী আশ্চর্য! জানাবার মতো বিষয় নয়? পুলিশ অফিসার মর্মাহত। —আস্ত একটা মানুষ বাড়ি থেকে হঠাৎ হারিয়ে গেল—

—আশা করি আপনি আমাদের ব্যঙ্গ করতে আসেননি? রুক্ষ গলায় বলে ওঠে দেবেশ।

অফিসারও গম্ভীর হল। —না, অতটা ফালতু সময় আমার হাতে নেই। তবে আপনার বোনের এই পালিয়ে যাওয়া খবরটা আমার কাজে লাগবে। এখন আপনার বাবাকে—

সমস্ত কথা কাটাকাটির মাঝখানেও পুলিশ অফিসারের শ্যেনদৃষ্টি মন্টু দেবরায়ের ঘরের দিকে ছিল। যেখানে তাঁর সহকারী তাঁর চোখের নির্দেশমতো শচীপতির সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

—ডাকান। বলল অনিলেশ।

—তার আগে আপনাদের সঙ্গে আর কয়েকটা কথা সেরে নিতে চাই। খুবই অপ্রীতিকর কথা, তবু—মানে, আমাদের কর্তব্যটাই অপ্রীতিকর বোঝেন তো? আপনার ওই কাকার সঙ্গে আপনার মা-র সম্পর্ক কীরকম ছিল?

চারু আর বৈকুণ্ঠর সঙ্গে আলাদা আলাদা করে ইতিমধ্যেই নিভৃতে একথা হয়ে গেছে, তবু ধর্মবীর পুলিশ অফিসার তাঁর অপ্রীতিকর কর্তব্যকর্ম করেন, —বলুন! চুপ করে থাকার অর্থই অনর্থের বাহক এটা মনে রাখবেন।

কিন্তু কে এর উত্তর দেবে? লজ্জা! লজ্জা!

এই মুহূর্তে এই ভগ্নদশাগ্রস্ত অভিশপ্ত প্রাসাদটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে না?

জগতে সীতার লজ্জাটাই শ্রেষ্ঠ আসন নিয়ে বসে রইল, কিন্তু সীতার লজ্জার গ্লানিকে নিষ্প্রভ করে দেবার মতো লজ্জাও কি নেই পৃথিবীতে?

—কই বলুন! ধমকে উঠলেন পুলিশ অফিসার।

দেবেশ আবার চোখ তুলল, তীব্রকণ্ঠে বলল, 'আপনার অপমানকর প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।'

—দেবেন কি না, সেটা তাহলে হাজতেই দেখা যাবে। উঠে এগিয়ে গেলেন অফিসার দাম্ভিকের প্রতীকের মতো।

মন্টু দেবরায় তার অর্ধপঙ্গু দেহখানাকে হিঁচড়ে টেনে খাট থেকে মাটিতে নেমে বসেছিল ঠিক ফুটপাথে বসে থাকা পঙ্গু ভিখিরির মতো।

বোধ করি বার বার শুধু ভাবছিল সুখবউদি নেই। সুখবউদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। জীবনে সবচেয়ে ধিক্কার এলেই না কি আত্মহত্যার জন্যে সম্ভ্রান্ত কোনো উপকরণ খুঁজে বেড়ায় না, গলায় দড়ি দেয়। বিনা চেষ্টায় বিনা পয়সার এই আদি ও অকৃত্রিম উপকরণটা।

বিষ জোগাড় করতে পারেনি সুখবউদি, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থেকেছে সারাটা রাত।

সরোজা। সরোজাই কি একমাত্র কারণ?

শচীপতিকে এঘরে ঢুকতে দেখে একবার বিহ্বলভাবে তাকাল মন্টু, তারপর বিহ্বলভাবেই আর্তনাদ করে উঠল, 'শচীদা।'

ঘরের চারদিকে এক বার চোখ বুলোলেন শচীপতি, তারপর তাকালেন ঘরের মেজেয় ছড়িয়ে বসে থাকা ওই বিকৃত জীবটার অসহায় মুখের দিকে। শচীপতির নিজের মুখ দেখে মনে হল, মন্টুর এই অদ্ভুত অবস্থাটা বুঝি তাঁর অজ্ঞাত ছিল। যেন এইমাত্র দেখে শিউরে উঠলেন।

অবশ্য কথার কোনো পরিবর্তন হল না তাঁর শুধু ওর ওই কান্নায় কুৎসিত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিনিট খানেক, তারপর আস্তে আস্তে নীচু হয়ে একটা হাত বাড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বললেন, 'মাটি থেকে ওঠ!

—শচীদা!

—হবে হবে পরে হবে! ওঠ এখন। এভাবে বসে না।

সহসা ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠল মন্টু দেবরায়, 'দয়া করতে এসেছ আমায়? দয়া? করুণা? কৃপা? দোহাই তোমার, ওটা সইবে না, বরং মেরে ফ্যালো আমায়, একেবারে শেষ করে ফ্যালো। সেটা সইবে।

পাহারাদারটা আরও কাছে সরে আসছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে দু-জনকে, কিন্তু এদের লক্ষ্য নেই।

শচীপতি নিরুদ্‌বিগ্ন।

মৃদু হেসে বলেন, 'মরাকে আর মারব কী? ওঠ, ধর আমায়, ভালো করে শুইয়ে দিয়ে যাই। ঠান্ডা লাগাসনে। এখন থেকে তো নিজেকেই নিজে দেখতে হবে রে! দেখবার আর কেউ রইল না তো।'

—আপনারাই বোধ হয় কর্তব্যপালন করতে এসেছেন?

ঘুরে দাঁড়ালেন শচীপতি পুলিশ অফিসারের দিকে। বললেন, 'তা হলে চলুন। যিনি মারা গেছেন তিনি আমার স্ত্রী। আর তাঁর মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী। আমি তাঁকে খুন করেছি।'

—বাবা! চেঁচিয়ে উঠল বিরজা।

শচীপতি হেসে বললেন, 'চ্যাঁচাচ্ছিস্ কেন? এটাই তো সত্যি কথা। আদালতেও এই কথাই বলব।'

শচীপতির অন্য মেয়ে-ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে, যে-মুখের দিকে জ্ঞানের উন্মেষ থেকে আর তাকিয়ে দেখেনি।

—উনি মানসিক রোগগ্রস্ত। স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল অনিলেশ।

—বেশ তো, সেটা আদালতেই প্রমাণিত হবে। এখন আমি এঁকে এবং আপনাদের সকলকেই অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।

—বেশ করুন! হাতকড়া দিতে চান? বলল দেবেশ হাতটা বাড়িয়ে ধরে।

—না, তার দরকার নেই।'

দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি পুলিশ অফিসার তীব্রকণ্ঠে আদেশ দিলেন নিজের সাঙ্গপাঙ্গকে, 'চলো!'

—দেহটা দাহ হবে না!

ঘর থেকে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে মন্টু দেবরায়।

তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

ভারী জুতোর আনাগোনা আর হাঁটাহাঁটিতে পুরানো বাড়ির মেঝে কাঁপতে থাকে।

তারপর একসময় বুটের শব্দ নীচে নেমে যায়।

আবার একসময় নিঃশব্দ হয়ে যায় সব দিক। মৃতা সুখলতা আর সুখলতার জীবন্ত পরিজনবর্গ সকলকে লম্বা একটা কালো গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায় তারা, ধর্মক্ষেত্রে কর্তব্যক্ষেত্রে।'

না, সুখলতার আর পাড়ার চোখের সামনে দিয়ে ফুলের মালা গলায় পরে যাওয়া হল না, সারাজীবন নিজেকে যেমন টুকরো টুকরো করে সংসারের নৈবেদ্য সাজিয়েছিল সুখলতা, পুলিশের আইন তেমনি করে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখবে তাকে।

গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

পাড়ার লোকের কৌতূহল চরিতার্থ হল না। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, কে কে গেল সেই গাড়ি চড়ে।

আমিই শুধু স্তব্ধ হয়ে দেখলাম, মাথা হেঁট করে একে একে সে-গাড়িতে গিয়ে উঠল—দেবেশ, অনিলেশ বিরজা আর নিরজা, উঠল বৈকুণ্ঠ আর চারু।

সবার শেষে মাথা উঁচু করে শচীপতি।

আশ্চর্য!

শচীপতি আজ দেবেশ অনিলেশের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, ওদের সামনে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, চোখাচোখি হলেই যিনি মাথা নীচু করতেন!

সুখলতা নিজের জীবন দিয়ে কি তাকে সাহস দিয়ে গেল? দিয়ে গেল মর্যাদা?

জানালাবন্ধ গাড়িটা চলে গেল।

প্রতিবেশীদের কৌতূহলী খোলা জানালাগুলোও একে একে বন্ধ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ আগের মুখর বাড়িটা সুখলতার দেহটার মতোই স্তব্ধ কঠিন শীতল হয়ে গেল। তারই একটা কোটরে শুধু পড়ে রইল মন্টু দেবরায়।

আশ্চর্য! ওকে কেউ নিয়ে গেল না, হয়তো ওর কথা ভুলেই গেল, হয়তো-বা পঙ্গু অনড় মানুষটাকে নিয়ে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করল, হয়তো-বা নিয়ে যাওয়া একটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ভেবে ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

কী হল, কেন হল, সেকথা সে নিজে কিছুই জানতে পারল না শুধু অসহ্য জ্বালাভরা ঠিকরে আসা শুকনো চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকিয়ে রইল ওই খোলা দরজার দিকে আর কেউ আসবে ভেবে নয়, তাকিয়ে রইল শুধু চোখ বুজতে পারছে না বলে।

আমি জানি ওর দরজা দিয়ে আর কোনোদিন কেউ আসবে না।

অবশ্য এইমাত্র যারা চলে গেল, এই বাড়িতেই আবার ফিরে আসতে হবে তাদের, এবেলা হোক ওবেলা হোক, আজ হোক কাল হোক, ফিরবে ওই বাজারের দেউড়ি দিয়েই। শুধু এক জন বাদে। তার কাটা ছেঁড়া টুকরো দেহটাকে দেখতে পাবে না কেউ।

বাজারওয়ালারা তাকিয়ে দেখে ভাববে, যাক বাবা ডালার সেরা জিনিসটা খপ করে তুলে নেবার জন্যে কেউ হাত বাড়াবে না আর, হয়তো-বা ভাববে, আহা অতটা দুর্ব্যবহার না করলেই হত মানুষটার সঙ্গে।

এরা উঠে যাবে।

নীচেরতলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইবে, এমন নীচু ওরা আজও হবে না। চলে যাবে সোজাচোখে। তারপর গিয়ে উঠবে নিজের নিজের জায়গায়। শোবে ঘুমুবে, হয়তো-বা কাঁদবেও কেউ কেউ, কিন্তু মন্টু দেবরায়ের ঘরে ঢুকবে না।

মন্টু দেবরায় অমনিভাবে পড়ে পড়ে পচবে। হয়তো চারু এক বার করে আসবে ঘরটার গায়ে দু-ঘা ঝাঁটা মেরে যেতে, হয়তো বৈকুণ্ঠ আসবে মন্টুর ভাতের থালা দিয়ে যেতে। মানে, যতদিন সে পারবে দু-মুঠো করে ভাত গলা দিয়ে নামাতে। তারপর দুধ-সাবুর বাটি আর জলের গ্লাসটা মাথার কাছে বসিয়ে রেখে যাবে কিছুদিন, তারপর যখন দেখবে সেটাও পড়ে থাকছে, মাছি পড়ে আছে, পিঁপড়ে ধরেছে, তখন আর তাও দেবে না। উঁকি মেরে দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করবে, কী খাবে আজ? দেবরায় কিছু বলবে না, বলতে পারবে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে, আর চেয়ে থাকতে থাকতে একদিন চোখ বুজে যাবে ওর।

সেই মৃত্যুর প্রতীক্ষার সাক্ষী থাকব শুধু আমি। যতদিন না আমিও পড়ব মুখ থুবড়ে, এই দেবরায় বংশটার মতো।

এমনি করেই তো কত দেব আর কত রায়, কত রায় আর রায়চৌধুরি, কত বসু, মিত্র, মল্লিক, মজুমদারদের ভিটের কঙ্কাল দুমড়ে পড়ল মাটিতে, মিশিয়ে গেল ধুলোতে। এখনও যাচ্ছে।

হয়তো আরও শতাব্দী কাল ধরে শুধু ভাঙবে। তারপর আবার আসবে কোনো নতুন বংশ, তাদের নতুন চেহারা আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তারা আবার গড়বে নতুন প্রাসাদ।

কিন্তু পাপে আর অনাচারে, লোভে আর বঞ্চনায়, হতাশায় আর লজ্জায়, যাদের পাঁজরের হাড়ে ঘুণ ধরল, তারা ঝরে ঝরে ধুলোয় মিশিয়ে যাবে।

শুধু যতদিন এই আমার মতো ভাঙা ইটের স্তূপগুলো পড়ে থাকবে, ততদিন সেই ভাঙা ইটের খাঁজে খাঁজে আনাগোনা করবে অভিশপ্ত প্রেতেরা। ঠান্ডা শিরশিরে দীর্ঘশ্বাসে আর ফিসফিসে কথায় মুখর করে তুলবে রাত্রি।

যেমন মুখর হয়ে ওঠে দেবরায়দের ভাঙা ইটের পাঁজর।

হয়তো এ ভিটে আজ থেকে আরও মুখর হয়ে উঠবে রাত্রিতে।

হয়তো সুখলতা আসবে অনেক রাত করে। এসে ওর সেই সাজানো সংসার আর হতভাগা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দেখবে নিরুপায় হতাশ দৃষ্টি মেলে।

তারপর ক্ষুব্ধ বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাবে।

না, নিশ্বাস ফেলবে ওদের জন্যে নয়, ফেলবে নিজের জন্যে।

ভাববে কী তুচ্ছ মূল্যেই বিকিয়ে দিয়ে এসেছি এতবড়ো দামি জীবনটা। তা দামি বই কী। জীবনমাত্রেই তো দামি।

শুধু জীবনটা থাকতে সেকথা ধরা পড়ে না সকলের কাছে। তাই-না রাত্রির বাতাস এত ভারী। সমস্ত ব্যর্থ আত্মারা যে রাত্রির বাতাসে এসেই আশ্রয় নেয়?